শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতীর

মাসিক পত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা ১ম — ১২শ

মাঘ ১৩৩১ সাল

Printed & Published by—Jagadananda Roy
at the Santiniketan Press, P. O. Santiniketan, E.I.Ry. Loop.

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ | মাঘ, সন ১৩৩১ সাল। | ১ম সংখ্যা

অভিভাষণ *

আপনারা আমায় আপনাদের বার্ষিক সভায় আহ্বান ক'রে আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন। আমি নিজেকে এ আহ্বানের এ সম্মানের নিতান্ত অযোগ্য ব'লে মনে করি। ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনে অবস্থান আর অধ্যয়ন কর্‌বার সুযোগ আমার হয়-নি, সুতরাং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ব'লে যে গৌরব আপনারা অনুভব করেন, তা-থেকে আমি বঞ্চিত। কিন্তু গত আট দশ বছর আগে যখন আমি প্রথম শান্তিনিকেতন আশ্রম দেখ্‌তে আসি, তখন-থেকেই আশ্রমের সঙ্গে মনে মনে আমি একটি যোগ অনুভব ক'রে আস্‌ছি। তাতে আমিও যে শান্তিনিকেতনেরই একজন, এই রকম একটা ধারণার অধিকারী হ'তে পেরেছি। আর তা ছাড়া, আপাতত আমাকে শান্তিনিকেতনের একজন ছাত্র ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। শান্তিনিকেতনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা আদরের সঙ্গে দেখি ব'লে, আর এখানকার অধ্যাপক আর ছাত্র অনেকের স্নেহ আর প্রীতি লাভ ক'র্‌তে পেরেছি ব'লে আপনাদের এই আহ্বান আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছি।

যে পুরুষশ্রেষ্ঠের চরণতলে ব'স্‌তে পাওয়ার ফলে আপনাদের ছাত্রজীবন মহনীয় হ'য়ে উঠেছিল,—সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হ'লেও, কৈশোরের অবসানের সময়-থেকেই পরোক্ষভাবে তিনি আমার আর আমার মতন অনেকেরই গুরুদেব। আপনারা তাঁকে বরাবরই অতি নিকটে পেয়েছিলেন, পেয়ে আছেন; শ্রেষ্ঠ এক গৌরবের অধিকারী আপনারা। এই মহৎসান্নিধ্য দ্বারা আপনাদের জীবন উজ্জ্বল হ'য়েছে নিশ্চয়ই—জীবনে কতগুলি উচ্চ প্রেরণা আপনারা লাভ ক'রেছেন নিশ্চয়ই। যাঁরা আপনাদের মতন তাঁকে কৈশোরে বা যৌবনে ব্যক্তিগতভাবে আচার্য্যরূপে দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ করে-নি, তাদেরও অনেকের কাছে তাঁর গান আর কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সেই প্রেরণা অন্তত কিছু পরিমাণে এসে পঁহুছেচে। কারণ খালি

* শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত। (৮ই পৌষ ১৩৩১।)

বাঙালী বা বাঙলা-পাঠীর কাছে নয়, পৃথিবীর সব দেশের চিন্তাশীল মানুষের কাছে তিনি একজন বরেণ্য আচার্য্য, অন্যতম যুগন্ধর গুরু।

যে বাণী নোতুন-ক'রে আমাদের গুরুদেব এই শান্তি-নিকেতনের মধ্যে থেকে প্রচার ক'রে বিশ্বকে আহ্বান ক'র্ছেন, যে বাণী এই ঘৃণা-দ্বেষ দ্বন্দ্বময় জগতে লোকের মনে প্রীতি-মৈত্রী-শান্তির ভাব আনতে সাহায্য ক'র্বে আর ক'র্ছে, সেই বাণী হ'চ্ছে বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষেরই বাণী। সুদূর অতীতে ভারতে আর্য্যের সঙ্গে কোল-দ্রাবিড়-মোঙ্গো-লের মিলন আর সংমিশ্রণের পর থেকে, যখন ভারতের সভ্যতা বিশিষ্টতা লাভ ক'রে দাঁড়াল, তখন-থেকেই ভারত-বর্ষ এই বাণী প্রচার ক'রে আস্ছে। যুগ যুগ ধ'রে ঋষি যতি ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পরিব্রাজক, সাধু সন্ত বৈরাগী, এমন কি ভারতের মুসলমান পীর ফকীর দরবেশ, সেই একই বাণী বহন ক'রে আস্ছেন। সেই বাণী হ'চ্ছে অহিংসার আর ত্যাগের, মৈত্রীর আর করুণার, জিজ্ঞাসার আর পরি-পৃচ্ছার, আর শ্রেয়ের অনুসন্ধানের। উপনিষদ্ মহাভারত, বৌদ্ধশাস্ত্র, মধ্যযুগের সাধুসন্তদের কবিতা গান, দক্ষিণের ভক্ত-দের গান প্রভৃতি যে-সমস্ত রচনায় এই বাণী রক্ষিত হ'য়ে আছে, সেই সব রচনা; যে-সমস্ত ব্যক্তিগত আর সমাজগত আচার-অনুষ্ঠানে এই বাণীর পরিপোষকতা ক'র্তে সাহায্য ক'রেছে সেই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান; যে-সমস্ত সুকুমার কলায় শিল্পে গানে কাব্যে সাহিত্যে এই বাণীর দ্বারা অনু-প্রাণিত ভারতীয় চিত্তের মনোহর প্রকাশ হ'য়েছে সেই-সমস্ত সুকুমার শিল্প আর সাহিত্য; যে-সমস্ত গভীর দর্শনে আর অন্ত আলোচনায় এই বাণীর দৃঢ় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হ'য়েছে সেই-সব দর্শন আর চিন্তা; এক কথায়, গত আড়াই বা তিন হাজার বছর ধ'রে ভারতের যা কিছু সুকৃতি ভারতের যা কিছু সৃষ্টি, যা মানুষকে উচ্চ-লোকে নিয়ে যেতে চায়, সে-সবই হ'চ্ছে আমাদের অর্থাৎ জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতীয়দের পিতৃপুরুষদের কাছ-থেকে পাওয়া রিক্থ। এই রিক্থ হ'চ্ছে মানব জ্ঞান-ভাণ্ডারে, মানবের সৃষ্ট সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে একটি শ্রেষ্ঠ জিনিষ। এই রিক্থ এখন আর কৃপণের ধনের মত কেবল ভারতবর্ষেরই সম্প্রদায়-বিশেষের পেটক-বদ্ধ রত্ন ক'রে রেখে দেবার বস্তু নয়। বাইরের লোকে এখন এই রত্নের খবর পেয়েছে—আর আমাদের কাছ থেকে এর উদ্ধার ক'রে তাকে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। সমস্ত বিশ্ব এখন এই রিক্থের অধিকার চায়। আর আমাদের প্রসন্ন মনে যতদূর আমাদের দ্বারা সাধ্য হবে তাদের সেই অধিকারের দাবী দিতে হবে। আমাদের কাছ থেকে বিশ্বের যা আবশ্যক তা বিশ্ব নেবেই। আমাদেরও কর্ত্তব্য আছে—পরিবর্ত্তে বিশ্বের কাছ থেকেও কিছু নেওয়া। বিশ্বের মানব কোথায় কখন্ সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ লাভ ক'রেছে, কোথায় সৎ-এর কোন্ দিক দেখ্তে পেয়েছে তা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা ক'রে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষ থেকে প্রাপ্ত রিক্থকে আরও শোভা সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণতা উপযোগিতায় সমৃদ্ধ ক'রে তুল্তে হবে। তা না হ'লে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকটে আমাদের যে ঋণ আছে তা শোধ ক'রতে পার্বো না। যখনই বাইরের মানুষের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগ ঘ'টেছে, আমরা তখনই তাদের কাছ থেকে তাদের শ্রেষ্ঠ জিনিস যা আমাদের ছিল না বা থাক্লেও যাতে আমরা প্রাবীণ্য লাভ করতে পারি-নি, তা কিছু-না-কিছু তাদের শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে শিখে নিয়েছি। আর এই নেওনের ফলে আমাদের জাতীয় সভ্যতা জাতীয় আত্মা বিশেষ-ভাবে পরিপুষ্টি লাভ ক'র্তে পেরেছে। এইতেই না কতকটা গ্রীকের শিক্ষায় ভাস্কর্য্য-শিল্পে আর জ্যোতিষে প্রাচীন ভার-তের উন্নতি; এইতেই না আমাদের জ্ঞাতি ইরানী মুসলমানের সংস্পর্শে এসে ভারতের মধ্য-যুগে কবীর নানক প্রমুখ সন্ত গুরুদের চিন্তার আর অনুভূতির অপরূপ বৈচিত্র্য আর তার অমৃতময় প্রকাশ, এইতেই না আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, বিদেশের সাহিত্যের সোনার কাঠি ছোঁয়ানোর ফলে, নোতুন প্রাণ পেয়ে অপূর্ব্ব শক্তি আহরণ ক'রে বিশ্বসমক্ষে দাঁড়াবার অধিকারী হ'য়েছে।—কিন্তু আমাদের দেবারও যে-কিছু আছে; কাজেই এখানে নেবার কোনও লজ্জা নেই; এ হ'চ্ছে প্রদানের

পরিবর্ত্তে আদান,— এ বিনিময়, ভিক্ষা নয়। বিশ্বের অংশ আমরা, আমরা বিশ্বের সঙ্গে সাহচর্য্য ক'রে চ'ল্‌বো। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা রামমোহন থেকে আমাদের পূজনীয় গুরুদেব, সমস্ত দুরদর্শী মহাপুরুষ আমাদের এই সাহচর্য্য ক'রতেই উপদেশ দিচ্ছেন, আর তাঁরা নিজেরাও সেই সাহচর্য্য ক'রে আমাদের পথ দেখিয়েছেন।

আমাদের বিশ্বভারতী বিশ্বের সামনে ভারতের আদর্শকে ধ'রে তুল্‌তে চান। মানবের সুখশান্তি পরমার্থ লাভের পথে পৃথিবীতে এ আদর্শের সার্থকতা আছে; বিশেষত পাশ্চাত্য জগতে যে আছে, এ কথা বহু পাশ্চাত্য মনীষী স্বীকার ক'রেছেন। The world must be Indianised, ভারতকে বিশ্বময় ছ'ড়িয়ে দিতে হবে; ভারতের সভ্যতার বাহ্য বর্ণ-চিহ্ন বা তকমা সব জাতকে পরাবার চেষ্টা ক'রে নয়, কারণ এই বর্ণ-চিহ্নটী ভেদ আর বিরোধের সৃষ্টি করে; কিন্তু ভারতের সূক্ষ্ম গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে যে পরমত সহিষ্ণুতা আছে, ভারতের জীবনের সবদিকের মূলে যে তিতিক্ষা যে মৈত্রী যে শান্তি যে অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান, তাদের জীইয়ে' রেখে, জাগিয়ে' রেখে, সবল রেখে; আর বিশ্বমানবের মনে যেখানে এর অনুকূল ভাব প্রকট বা সুপ্ত, অস্ফুট বা পীড়িত হ'য়ে আছে, তার সঙ্গে ভারতের এই জীবনীবাহী শিক্ষার সঙ্গে যোগ সাধন ক'রে। আর কেবলমাত্র সেইটী কর্‌বার চেষ্টা ক'রে নয়; নিজেদের আত্মিক উন্নতির জন্য বিশ্বকেও আমরা ভারতের ভিতরে আন্‌বো। কাউকে আমরা অস্বীকার ক'র্‌বো না; কারণ সকলেই বিরাট্ বিশ্বপুরুষের অংশ। সকলের উৎকর্ষ আমরা গ্রহণ ক'র্‌বো, সকলের সুকৃতির ফল আমরা নেবো। খ্রীষ্টান সাধুর এই উক্তি আমাদেরও মন্ত্র ক'রে নিতে হবে—

Finally, brethern, whatsoever things are true,
Whatsoever things are just,
Whatsoever things are pure,
Whatsoever things are lovely,
Whatsoever things are of good report :
If there be any virtue, and if there be any
praise, think on these things.

পৃথিবীর মধ্যে সৎচিন্তার পোষক যা কিছু, মানুষের দেহের মনের আর আত্মার স্বাধীন বিকাশের অনুকূল যা কিছু আছে, তার সম্বন্ধে আমাদের ভারতীয় প্রাণের সম্পূর্ণ অনুমোদন আর সহযোগ আছে। আমরা যে অতি সহজেই সকলকে মেনে নিয়েছি—আমাদের ঋষি আচার্য্য সাধক সকলেই বিশ্বমৈত্রীর উপদেশ আমাদের যুগ যুগ ধ'রে দিয়ে আস্‌ছেন:

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং, ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

যিনি সমস্ত প্রাণীকে আপনাতে দেখেন, আর আপনাকে সমস্ত প্রাণীতে দেখেন, তিনি কারও কাছ থেকে নিজেকে স'রিয়ে নেন না, কাকেও ঘৃণা করেন না।

'আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ', 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকং'—এ সব তো আমাদের দেশের অতি সাধারণ কথা; লাটিন লেখকের homo sum, humani nihil a me alienum puto—'মানুষ আমি, মানুষ সংক্রান্ত এমন কিছু নেই যাকে আমি নিজের থেকে দূরের জিনিস ব'লে মনে করি'—এইরূপ ভাব আন্‌বার মতন মানসিক অবস্থায় আস্‌তে আমাদের বেশী পরিশ্রম ক'রতে হয় না।

আমরা মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে আস্থাবান্। যদিও এখন আমরা চারিদিকে নানা অত্যাচার অশান্তি অধঃপতন অন্যায় দেখ্‌তে পাচ্ছি, তবু মোটের উপর মানুষ উচ্চ থেকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হ'চ্ছে, এটা আমরা মনে করি। অন্যায় অত্যাচার দুঃখ ক্লেশ নেই এমন সত্যযুগ কোনও কালে ছিল না; একথা ইতিহাস আমাদের ব'ল্‌ছে, যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচার ক'র্‌লে এ কথা মান্‌তেই হবে। কল্পনায় এক সত্যযুগকে খাড়া ক'রে তার উপর অন্ধ ভক্তি এনে বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা ক'র্‌লে জাতীয় জীবনে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কিছু হবে না। আগেকার যুগে মানুষের অনুভূতির প্রসার ছিল অল্প, অল্প জায়গার মধ্যে নিজের গণ্ডীর অন্তর্গত ভাবরাজী নিয়েই সাধারণতঃ তার কারবার

ছিল; সে জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী হ'লে তার সেই অল্পকেই তাকে অত্যন্ত গভীরভাবে জান্‌তে হ'ত, তার পক্ষে আর অন্য উপায় ছিল না। সাধারণ লোকে সেই অল্প-টুকুর ভিতরে কি খুব গভীরভাবে নাম্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ত, বা নাম্‌ত? হয়-তো কোথাও কোথাও তা ক'র্‌ত, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা বলা যায় না। কিন্তু এখন আমাদের ভাবরাজ্য বহুবিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে। এতে গভীরতার বদলে বিস্তারের দিকেই আমাদের ঝোঁক হ'য়েছে। বিস্তার জিনিসটা মন্দ নয়, যদি তা কেবল উপর-উপর, কেবল ভাসা-ভাসা না হয়। কিন্তু যথার্থ পণ্ডিতের পক্ষে বিস্তার আর গভীরতা দুই-ই সাধন করা এখনই সম্ভবপর হ'য়েছে। আগে সে সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে সাধারণ লোক যারা, তাঁদের দুটো সাধন করা সব সময়ে সম্ভব হবে না। একটা বিষয় আমরা ভাল ক'রে জানি, আর বাকী সবের যেন রসাস্বাদ কর্‌বার অধিকার রাখ্‌তে পারি। একটা বিষয়ে গভীর না হ'লে আমাদের তাল ঠিক থাক্‌বে না, বহু বিস্তারের ফলে আমরা পথভ্রষ্ট হ'য়ে মনো-রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাক্‌বো, জ্ঞানের লক্ষ্য আমাদের ঠিক থাক্‌বে না। আবার কোনও বিশেষ ভাবরাজীকে ভাল ক'রে জান্‌তে হ'লে কেবলমাত্র তাতেই আবদ্ধ থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। ব্যাপকভাবে দেখ্‌লে তবে প্রত্যেক জিনিসের যথার্থ পরিচয় হয়। পরিধি না থাক্‌লে কেন্দ্র কোথায়? মানসিক রাজ্যে কেন্দ্রের যেমন আবশ্যকতা, পরিধিরও তেমনি আবশ্যকতা আছে। আমাদের মনের গতি এই যুগে হ'চ্ছে পরিধিমুখী; আগে ছিল কেন্দ্রমুখী। শ্রেষ্ঠ মানসিক উৎকর্ষ হয় দুইয়ের সামঞ্জস্যে। নানা রাজনৈতিক কারণে, আত্মরক্ষার চেষ্টায়, বাইরের পরিধির প্রতি আমাদের দেশের লোকের একটা অশ্রদ্ধা একটা অবজ্ঞার ভাব এখন জেগে উঠেছে। যাতে বাহির এসে আমাকে ডুবিয়ে দিতে না পারে, আমাকে ভাসিয়ে' নিয়ে না যায়, সেই-জন্যে বাহিরকে অস্বীকার ক'রে বর্জ্জন ক'র্‌তে পারলেই, আমার কেন্দ্রকে আঁক্‌ড়ে' ধ'রে থাক্‌তে পারলেই আত্মরক্ষা হবে। এইরূপ মনোভাবের কারণ বুঝ্‌তে পারা যায়, আর এর স্বপক্ষে হয়-তো যুক্তিও থাক্‌তে পারে। কিন্তু পরিধির দিকে চাইলেই কেন্দ্রচ্যুত হয় তারা, যারা জানে না কেন্দ্রের স্বরূপটা চিনে নিয়ে ঠিকমত কোথায় তার সঙ্গে বজ্র বাঁধনে অচ্ছেদ্য-যোগে বদ্ধ থাক্‌তে পারা যায়। আমাদের জাতীয় জীবনের জাতীয় উৎকর্ষের কেন্দ্র কোথায় তা যদি আমরা সত্যরূপে জান্‌তে পারি, আর তা জেনে, আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনে তার আবশ্যকতা প্রণিধান ক'রে, আমাদের কাছে তা কতখানি সত্য তা যদি বুঝ্‌তে পারি, তা-হ'লে বাইরে যতদূরেই আমা-দের চিন্তার ব্যাসার্দ্ধ প্রসারিত হোক্ না কেন, আমরা ঠিক্ থাক্‌বো। আগে নিজেকে জানা দরকার, ভাল ক'রে জানা দরকার; আবার সেই জানা পূর্ণ ক'র্‌তে গেলে বাহির-কেও জানা দরকার। এই দুইয়ে জড়িয়ে এক চক্র। আত্মজ্ঞানের জন্যে বাহিরের উপযোগিতাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হয়।

আমাদের ভাবরাজ্য বহুবিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে। খ্রীষ্টীয় বিংশ-শতকে আমরা অবস্থান ক'র্‌ছি। এক আমাদের নিজেদেরই ভারতীয় জগৎ র'য়েছে—তার ভাবরাজ্য কত বড়! আমাদের প্রাচীন কথা বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে, বৌদ্ধ কাল, মৌর্য্য-যবন শক-গুপ্ত-কালের কত বিচিত্র উৎকর্ষকে অবলম্বন ক'রে, উত্তর-ভারতীয় আর দক্ষিণ-ভারতীয় আর্য্য দ্রাবিড় জাতের কত কীর্ত্তি কত সৌন্দর্য্য আর সাহিত্য সৃষ্টিকে নিয়ে আমাদের মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের কথা; তারপর নানা নূতন কৃতিসম্ভার নিয়ে আমাদের মুসলমান যুগ আছে। এক ভারতেই কত না বৈচিত্র্যের সমাবেশ, কত না বিভিন্ন প্রকারের ভাবসম্পদ্। তেমনি অন্য-অন্য কত দেশে মানুষ কত না ভিন্ন রূপে সভ্য হ'য়ে, কত নোতুন জিনিস আমাদেরই জন্য উদ্ভাবন ক'রে ইতিহাসের পথ বেয়ে চ'লে এসেছে, আস্‌ছে,—আর কত ভিন্ন ভিন্ন যুগ ধ'রে। সে-সবের ছিটে-ফোঁটা তো বাঙলাদেশেই ব'সে-ব'সে আমি আস্বাদ

ক'র্‌তে পার্‌ছি। Culture বা মানসিক উৎকর্ষ এখন জাতিবিশেষের কৃতিকে অবলম্বন ক'রে নেই, Culture এখন বিশ্বমানবের সাধারণ সৃষ্টি আর সাধারণ সম্পদ্, সমগ্র জগতে এখন এক, এতে আজ কোনও জাত বাদ প'ড়্‌তে পারে না। এই সাত-আট হাজার বছর ধ'রে সভ্য হবার পর মানুষ যা ক'রেছে, সে সমস্তের হক্-ওয়ারিসান মালেক হ'চ্ছি আমরা—অর্থাৎ সব দেশের শিক্ষিত লোকেরা। এত বড় একটা অধিকার—একে কি ছেড়ে দিয়ে, কারুর উপর রাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিজের কোণে ব'সে থাক্‌বো? এর দ্বারা আমার তো নৈতিক বা মানসিক অবনতি আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না—জগতের আর সকলের কাছে আমি হীন আমি দরিদ্র আমি ভিখারী, এ রকম ভাবে পরের ঐশ্বর্য্যে অভিভূত হ'চ্ছি না; কারণ আমার যা আছে তা আমি জানি। আমি বাঙালী হিন্দু; মিসরের গ্রীসের চীনের আধুনিক ইউরোপের সাহিত্য কলা চিন্তা আধ্যাত্মিকতা সবই আমার যুগের কল্যাণে আমার মানবত্বের দাবীতে আমি পেতে পার্‌ছি। এ-সব ছেড়ে দিয়ে কোনও অজ্ঞাত বৈদিক যুগে আমি ফিরে যেতে চাই না—পরবর্ত্তী কালের সঙ্গে তুলনায় যে-যুগ সত্যি-সত্যিই অর্দ্ধবর্ব্বর, কিন্তু উপনিষদের আলোকে কল্পনার রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে তার উপর ফেলে আমরা তাকে মহত্ত্বে শোভায় শ্রীতে যুক্ত ক'রে নিয়েছি। আর Back to the Vedas কথার চরম বিচার ধ'র্‌লে, একে-বারে আদিকালের মানুষ হ'য়ে পাথরের অস্ত্র হাতে ক'রে পশু-হননের চেষ্টায় জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে' বেড়াতে রাজী হবো না। আরও নাই-আঁকুড়ে' হ'লে পরে, আরও এগিয়ে-গিয়ে বানরের অবস্থায় বা protoplasm অবস্থায় পঁউছে যেতে পার্‌লেই বোধ হয় অনেকে ভাল মনে ক'র্‌বেন—কিন্তু সেই অজ্ঞাতের মোহান্ধকারে আমি ফিরে যেতে চাই না। আনাতোল-ফ্রাঁসের কথায়—J'ai passé l'age heureux où on admire les choses qu'on ne comprend pas. J'aime la lumière অর্থাৎ 'যে সদানন্দ বয়সে লোকে যে জিনিস বোঝে না সেই জিনিসের আদর করে, সে বয়স আমি পেরিয়েছি। আমি আলো ভালো-বাসি।' পার্থিব সভ্যতার নানা সুবিধার, নানা দৈহিক আরামের কথা ধ'র্‌ছি না; সে-জিনিসটা খুব একটা বড় জিনিস নয়; কিন্তু সভ্য মানুষের, আধুনিক মানুষের স্বাধীন মন আমি পেয়েছি আমাদের এই যুগধর্ম্মের ফলে। আর ভারতীয় ব'লে, ভারতের প্রাচীন চিন্তার আব-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছি ব'লে আমার পক্ষে সেই মন লাভ করা অতি সহজেই ঘ'টেছে; সে সহজলভ্যতার সৌভাগ্য থেকে বহু সভ্যদেশ এখনও বঞ্চিত আছে। এই যে মনোজগতের স্বাধীনতার কথা ব'ল্‌ছি, একমাত্র এই স্বাধীনতাই বাহ্য পরাধীনতার সব-কিছু আঘাতকে কোমল হাত বুলিয়ে' আরাম ক'রে দেবার চেষ্টা করে। এই মানসিক স্বাতন্ত্র্য আছে ব'লেই সভ্য মানুষ পরতন্ত্র থাক্‌লেও স্বাধীন মানুষ হিসাবে প্রাণধারণ ক'র্‌তে সমর্থ হয়, অন্যথা কেবলমাত্র দাস হ'য়ে পশুবৎ হ'য়ে যেত।

বাইরের পরাধীনতা যতই কেন নিষ্ঠুর যতই কেন কঠোর হোক্ না, মন যদি স্বাধীন থাকে তা হ'লে সে পরাধীনতা কিছুতেই স্থায়ী হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। সব চেয়ে সর্ব্বনাশকর হবে মনের স্বাধীনতার হানি। এই স্বাধীনতা-নাশের চেয়ে বাহ্য পরাধীনতা সহস্র গুণে শ্রেয়। আমি চিন্তাশক্তিকে পরিচালনা করবার যোগ্যতা লাভ ক'রে, কি হ'চ্ছে তা জেনে কাজ ক'র্‌তে চাই; আমি জান্‌তে চাই, আমি বুঝ্‌তে চাই। যদিও সেই জানার পর, প্রতীকার ক'র্‌তে পারার শক্তি না থাকার দরুন, মনে আমি দারুণ অশান্তি বা অস্বস্তি মাত্র লাভ করি—কারণ জেনে শক্তির অভাবে প্রতীকার ক'র্‌তে না পারার মত কষ্টকর, তার মত বুক ভাঙা আর কিছু নেই—কিন্তু তবুও আমি জান্‌বো; আমি pathetic, placid contentmentএ থাক্‌তে চাই না। হয়তো কখনও উপলব্ধি বা অনুভূতির বন্যা এসে আমাকে ভাসিয়ে' নিয়ে যেতে পারে; হ'তে পারে, জানার নির্ম্মল আনন্দে মত্ত্ হ'য়ে ব'সে থাকার চেয়ে,

বা তার যে divine discontent তা'তে ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়ানোর চেয়ে, অনুভূতি বা উপলব্ধির রসের সাগরে ডুবে যাওয়াটাই মানুষের মন বা আত্মার পক্ষে চরম লাভ, তার পক্ষে পরমার্থ, পুরুষার্থ। কিন্তু যতক্ষণ আমার ঈশ্বর-দত্ত বা প্রকৃতি-থেকে-লব্ধ বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ তাকে মেরে আমি আত্মঘাতী হ'তে চাই না।

অসুর্য্যা নাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

অন্ধ তমোদ্বারা আবৃত অসুরদের উপযোগী অসুর্য্য নামে যে-সকল জগৎ, আত্মঘাতী হয় যে-সব মানুষ তারা পরলোকে গিয়ে সেই-সকল জগতে পঁউছয়।

আমরা চাই, অন্ধকারের বাইরে গিয়ে আমরা যেন জ্যোতি দেখ্‌তে পাই; আমাদের প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', এবং More Light; আমাদের প্রার্থনায় আছে 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ', তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করুন; 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু', তিনি আমাদের শুভ বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত করুন; বাইরের জগতের সৌন্দর্য্য আর মোহ যেন আমাদের অভিভূত ক'রে সার সত্যের সন্ধানের পথে বাধা না দেয়—

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্ পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত; হে পূষাদেবতা, সত্যধর্ম্ম দর্শনের জন্য তুমি তা সরিয়ে দাও।

আমাদের প্রার্থনা, যেন 'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ,' হে দেবগণ, যা ভদ্র তা আমরা কান দিয়ে যেন শুনি; 'ভদ্রং পশ্যেম অক্ষিভি র্যজত্রাঃ', হে পূজিত দেবগণ, যা ভদ্র তা আমরা চোখ দিয়ে যেন দেখি।

নানা দিক দিয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থায় প'ড়ে আমাদের ভারতীয় মানবের মনের স্বাধীনতাটুকু লোপ পেতে ব'সেছে, বহুস্থলে লোপ পেয়েছে,—লোপ পেয়েছে ব'ল্‌বো না—মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছে, কারণ ভারতের সভ্যতার মূলে যে মন্ত্র আছে, সে মন্ত্রটি অমর; সে মন্ত্র হ'চ্ছে মানুষের মানসিক আর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মন্ত্র। ভারতের জীবনের বাইরের আবর্জ্জনার মধ্যে, বাইরের রঙচঙ জগ্‌জগা, বাইরের প্রতিমার নশ্বর অলঙ্কারের মধ্যে সেই মন্ত্র হ'চ্ছে অক্ষয় মণি। যতদিন উপনিষদ্ আর গীতার মধ্যে, বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে, সন্তবাণীর মধ্যে আর অন্যান্য ভারতীয় আচার্য্যদের বাণীর মঞ্জুষার মধ্যে সেই অক্ষয় নীতি বিদ্যমান থাক্‌বে, আর যতদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অনুশীলনের আর জীবনে প্রতিফলিত করণের স্বল্পমাত্রও চেষ্টা আমাদের মধ্যে থাক্‌বে, ততদিন আমরা সকল দারিদ্র্যের সকল দৈন্যের সকল অভাবের মধ্যে একেবারে নিঃস্ব হবো না—আর বাহ্য পরাধীনতার রাহু আমাদের সভ্যতাকে একেবারে পূর্ণগ্রাস ক'র্‌তে পারবে না।

ভারতের নিজস্ব প্রাচীন কৃতির বিশেষত্ব কোথায়, সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে, আর তা থাক্‌বেও। কেউ কেউ ভারতের ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের বর্ণাশ্রম ভেদেই ভারতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে মনে ক'রে, সেইটিকেই রক্ষা কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর। কেউ বা ভারতের সমাজবিশেষের সাধন বা সাধনের অঙ্গকে পরম পদার্থ ব'লে মনে করেন, যেন ভারতের সভ্যতার বা সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা সেখানেই। আজকালকার মত প্রাচীনযুগে এ বিষয়ে চিন্তা কর্‌বার আবশ্যকতা ছিল না, কারণ ভারতের বাইরের জগতের প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে ভারতের সমাজের সংঘর্ষ হ'লেও, ভারতের ভাবরাজ্যের উপর বাইরে থেকে আজকালকার মতন এত বড় সংঘাত কখনও ঘটে-নি—আজকাল যেমন ক'রে খ্রীষ্টান আর অখ্রীষ্টান ইউরোপ আর আমেরিকা, আর আরব-মনের সৃষ্টি ইস্‌লাম, আর ওদিকে কিছু পরিমাণে চীন-জাপান, ভারতের মানসিক প্রগতির আর তার প্রাচীন সভ্যতানুমোদিত জীবনযাত্রার উপরে এসে প'ড়েছে, আর আমাদের বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে। এই সব নানা দিক থেকে আমাদের উপর সংঘাত এসে পঁউছানোতে, মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা কিসে ভারতের ভারতীয়ত্ব, আর সেই

ভারতীয়ত্ব রক্ষা করা আমাদের পক্ষে তথা বিশ্ব-মানবের পক্ষে কল্যাণকর হবে কি না, সে বিষয়ে চিন্তা ক'র্‌তে আর ভারতবাসীকে আশ্বস্ত কর্‌বার জন্য অভিমত দিতে বাধ্য হ'য়েছেন। ভারতের জীবনে যা সত্য যা শিব আর সুন্দর, তা এঁরা আংশিকভাবে বা পূর্ণভাবে আমাদের চোখের সাম্‌নে ধর্‌বার প্রয়াস ক'রেছেন। ব্যক্তিগত পারিপার্শ্বিক, শিক্ষা আর রুচি অনুসারে এঁদের মতের ইতরবিশেষ হ'লেও, একটি বিষয়ে এঁরা সকলে একমত; সকলেই সত্যকে শ্রেয় ব'লে মেনে নিয়েছেন, আর বিশেষ পরীক্ষা ক'রে নিয়ে তবে সত্যকে স্বীকার ক'র্‌তে উপদেশ দিয়েছেন। সত্য নির্ণয় বড়ই কঠিন ব্যাপার; সত্য তো কখন পূর্ণরূপে মানুষকে ধরা দেয় না। মানুষের বুদ্ধির সাহায্যে সত্যনির্ণয় ক'র্‌তে হ'লে কিন্তু যুক্তিতর্কের অনুমোদিত পথ ধ'রে চলা চাই। এই পথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে আমাদের অপ্রিয় কিছুতে যদি আমাদের নিয়ে যায়, তা-হ'লে দুঃখিত বা বিচলিত হ'লে চ'ল্‌বে না। যাতে আমাদের বিচলিত না ক'র্‌তে পারে, তদনুরূপ সত্যদিদৃক্ষুর উপযোগী দৃঢ়চিত্ততা আমাদের হওয়া উচিত। এইরূপ দৃঢ়চিত্ততা, সত্যদ্রষ্টার অটল নির্ভীকতা প্রাচীন ভারতে ছিল। আধুনিক ইউরোপেও বহু ক্ষুদ্রস্বার্থ-প্রণোদিত মিথ্যার মধ্যে এই অটল সত্যানুসন্ধিৎসা যথার্থ জিজ্ঞাসুদের মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে নির্ভীকভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই জিনিসটী নোতুন ক'রে ইউরোপ আমাদের দান ক'রেছে; রেলগাড়ী, বিজ্ঞান কলকারখানার চেয়ে এই দানই শ্রেষ্ঠ দান। হ'তে পারে, দু-পাঁচজন ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ বা লেখক আধুনিক ভারতবর্ষকে পরাধীন, হীন, ভেদ-দ্বেষে পরিপূর্ণ দেখে, তার প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ ক'রে, প্রাচীন ভারতেরও প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখিয়েছে, প্রাচীন ভারতের লাঘব কোনও জায়গায় ক'র্‌তে পেলে হর্ষের আতিশয্য দেখিয়েছে, সেদিকে আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছে। কিন্তু যে কৌতূহল যে অনুসন্ধিৎসা আমাদের কাছে বুদ্ধকে অশোককে গুপ্তরাজগণকে তাঁদের যথার্থস্বরূপে এনে দিয়েছে, আমাদের গৌরবময় অতীতকে বিস্মৃতির অতল-থেকে আবার উদ্ধার ক'রেছে, Serindia বা মধ্য-এশিয়া, Indo-china ইন্দোচীন, Insulindia বা ভারত দ্বীপপুঞ্জে যে এক বিরাট বহির্ভারত ছিল তাতে আমাদের পিতৃপুরুষ তত্তৎদেশের অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য অধিবাসীদের সাহচর্য্যে যে বিরাট সভ্যতা গ'ড়ে তুলে'ছিলেন তার খবর আমাদের এনে দিচ্ছে, আমাদের পুরাতন সুহৃৎ সতীর্থ বৌদ্ধ চীনের মনোরাজ্যের সঙ্গে আমাদের পুনঃপরিচয় করিয়ে' দিয়েছে,—এক কথায়, 'আত্মানং বিদ্ধি', নিজেকে জানো, এই অনুজ্ঞা পালনের জন্য আমাদের পূর্ণ সহায়তা ক'রেছে, ক'রছে,—সে জিনিস নিতান্ত তুচ্ছ নয়, সে বিদ্যা আর সে বিদ্যালব্ধ ফলকে 'ওদের' ব'লে উপেক্ষা ক'র্‌লে আমাদেরই হানি—মানসিক, ঐহিক উভয়বিধ হানি।

রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা আমাদের সত্যদ্রষ্টার উচিত নিরপেক্ষভাব নিতে ব'লেছেন। এঁরা বিশ্বকে ভয় করেন-নি, বিশ্বকে বর্জ্জন করেন-নি; জ্ঞাতি, ব'লে বন্ধু ব'লে সাদরে মনোরাজ্যে বরণ ক'রে নিয়েছেন। যেখানে ভারত বিশ্বের, বাইরের ভয়ে পালিয়ে' বেড়াচ্ছে না, কিন্তু নিজের গৌরবে দশের মধ্যে এক হ'য়ে বিরাজ ক'রছে, আমাদের দেশের সেইরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের এই শান্তিনিকেতন আর তার এই নবীন মূর্ত্তি বিশ্বভারতী হ'চ্ছে অন্যতম। এখানে ভারত তার নিজ কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাক্‌তে চা'চ্ছে, নিজের স্বরূপকে ভুল্‌তে চাচ্ছে না; কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠানগত স্বরূপকে নয়, তার অন্তরতম মানসিক আর আত্মিক স্বরূপকে; মনের স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দিয়ে, সত্যের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিব আর সুন্দরকেও বরণ ক'রে নিয়ে, বিশ্বের জ্ঞান আর সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার থেকে রত্নরাজী আহরণ ক'রে এনে, তার দ্বারা দেশের চিত্ত আর প্রাণের ভাণ্ডারকে পূর্ণ কর্‌বার চেষ্টা ক'রে।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমাদের যাদের যোগস্থাপনের সুযোগ হ'য়েছে, তাঁদের পক্ষে এই আদর্শের মূল্য বোঝা কঠিন হবে না। এখন আমাদের সকলের যত্ন করা উচিত যাতে আমরা শান্তিনিকেতনের বা বিশ্বভারতীর যোগ্য কর্ম্মী হ'তে

পারি। আমাদের দায়িত্ব খুবই গুরুভার। বিশেষ এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে, যখন আমাদের এই যে শ্রেষ্ঠ রিকৃথ—স্বাধীন-চিন্তা—তার উপর নানাদিক দিয়ে আক্রমণ আর আঘাত প্রত্যক্ষে আর পরোক্ষে এসে প'ড়ছে। বাহ্য স্বাধীনতার চেয়েও প্রার্থিত, এমন কি আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই যে মানসিক স্বাধীনতা, এর আলো-কে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে জ্বালিয়ে' রাখ্‌তে হবে—অধ্যয়ন, আলাপ, আর চিন্তা দ্বারা। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে আমাদের বড় কাজ আছে। যারা আমাদেরই মতন একই পিতৃপুরুষ-থেকে জাত, আমাদেরই মতন ভারতের প্রাচীন ধনের অধিকারী, তাদেরও মনে তাদের সেই ভারতীয়ত্বকে জাগিয়ে' রাখ্‌তে হবে। ভারতের বাইরে যে সমস্ত গুরু, যে সমস্ত ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষ জ'ন্মেছেন, মৈত্রী করুণা জীবে দয়ার বাণী যাঁরা নিজ জীবনের দ্বারা প্রচার ক'রেছেন, যেমন জরথুশ্‌ত্র বা লাউৎসি, সোক্রাতেস্‌ বা যীশু, মানী বা সন্ত ফ্রান্সিস্‌, মন্‌সূর অল্‌-হল্লাজ বা বহাউল্লাহ—তাঁরা আমাদের নমস্য, তাঁদের আমরা আমাদের নিজেদেরই ব'লে মনে করি। যদি কেউ তাঁদের কাউকে শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র ধর্ম্মগুরু ব'লে মেনে নেন, তাতে তাঁর ভারতীয়ত্বের সঙ্গে বিরোধের কোনও কারণ নেই। কিন্তু এ রকমও হ'তে পারে, যে কেউ-বা হয়-তো অন্ধ বিশ্বাস প্রণোদিত হ'য়ে, ভারতের সভ্যতার মধ্যে নিহিত ভাবসমূহের, বিশেষত তার মৈত্রীভাবের আর তার পরমত-সহিষ্ণুতার মূল্য বুঝ্‌তে না পেরে বা স্বেচ্ছায় বুঝ্‌বার সুবিধা ত্যাগ ক'রে, তার বাইরের নানা জঞ্জালকে দেখেই সেইটেকেই তার প্রাণের স্বরূপ ব'লে মনে ক'রে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; আমরা যাকে সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে, প্রাণের চেয়ে প্রিয় ব'লে যে জিনিসকে মনে করি, তার নাশের চেষ্টায় তার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ ক'র্‌তে পারে। কেউ যদি এইরূপে আমাদের এই Indianism, এই 'তহন্দুদ' এই আমাদের 'ভারত-পন্থ', এর হানি ক'র্‌তে উদ্যত হয়, অশান্তি দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ প্রচার ক'রে চড়াও হ'য়ে আসে, তা-হ'লে সেখানে আমাদের চুপ ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না,—আমাদের সেখানে সমস্ত শক্তির সঙ্গে বাধা দিতে দাঁড়াতে হবে। কারণ এই Indianism, এই আমাদের ভারত-পন্থ আমাদের কাছে বাইরের স্বাধীনতার চেয়ে, প্রাণের চেয়েও বড় জিনিস। মনে আমরা নিজের সম্বন্ধে স্বাধীন, আর পরের সম্বন্ধে উদার থাক্‌তে চাই; এটা থাক্‌লেই আমরা সভ্য, না থাক্‌লেই বর্ব্বর। বাইরের প্রতিকূল শক্তি সেইখানেই জোর পায়, যেখানে আমরা দুর্ব্বল, others are strong only in our weakness। আমাদের দৌর্ব্বল্য হ'চ্ছে অ-জ্ঞান আর অজ্ঞান-প্রসূত ভেদ-বুদ্ধিজনিত। ভিতর-থেকে আমাদের এই দৌর্ব্বল্যের বিপক্ষে ল'ড়তে হবে, তা-হ'লেই বাইরের আক্রমণকে রোধ করা যাবে। ভারত-পন্থকে বাঁচিয়ে' রাখ্‌তে হ'লে, যারা এইরূপ মনোভাবের প্রতি সহজেই আস্থাশীল তাদের দৈহিক স্বাস্থ্যে আর স্ফূর্ত্তিতে আর মনের আনন্দে বাঁচিয়ে' রাখ্‌তে হবে। যারা ভারতের সভ্যতার উত্তরাধিকারী হ'য়েও হেলায় তাকে বর্জ্জন ক'র্‌ছে, ভারতের উদার মনোভাবের আর অনুসন্ধিৎসার পরিবর্ত্তে অসহিষ্ণুতা, আর আত্মঘাতী তামসিক অন্ধ বিশ্বাস এনে দেশে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ক'র্‌ছে, বাইরের কোনও এক অর্ব্বাচীন জাতিকে গুরু ব'লে মেনে নিয়ে, তাদের অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণগুলিকে ধ'র্‌তে না পেরে কেবলমাত্র বাহ্য বিষয়ে আচারে অনুষ্ঠানে তাদের অন্ধ অনুকরণের বৃথা চেষ্টা ক'র্‌ছে, নানাপ্রকারে পিতৃপুরুষের অপমান ক'র্‌ছে, নিজেদের উপর অবিচার ক'র্‌ছে, আর দেশের প্রতিষ্ঠার পক্ষে অন্তরায় হ'চ্ছে,—আমাদের সমগ্র শিক্ষা সাধনা আর বোধনী শক্তি দিয়ে তাদের এই পরমতাসহিষ্ণুতা আর বিদ্বেষ-ভাব, অন্ধ অননুসন্ধিৎসা আর নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞতা, এই সবের বিরুদ্ধে ল'ড়্‌তে হবে। ভারতীয় মনোভাবকে বাঁচিয়ে' রাখ্‌বার জন্য এই অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ একটা বড় আবশ্যকীয় কার্য্য। পিতৃ পিতামহদের কৃতির মূল্য বোঝেন, আর তার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চান এমন প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ের এদিকে কর্ত্তব্য আছে। এটা রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এটা হ'চ্ছে সামাজিক সংগঠন, আর সমস্ত জাতের মানসিক শিক্ষা। রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্য চ'ল্‌বে, তাকে বাদ

দিলে হবে না, কারণ সেটী হ'চ্ছে বাইরের মুক্তির জন্ত, কিন্তু সামাজিক মুক্তি, মনের স্বাধীনতা যাতে হয়,—যাতে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত ছুঁৎ-মার্গী পুরোহিত আর ছুঁৎ-মার্গী মোল্লার দলের অনুচিত প্রভাবের ফলে আর প্রকৃত শিক্ষার অপ্রভাবে আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে ঐহিক আর পারত্রিক নানা প্রকার ভীতি চিরকাল ধ'রে রাজত্ব ক'রতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া বিশেষ দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। এ জিনিসটীকে রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে নীচুস্থান দিলে আমাদের জাতের বাঁচ্‌বার বা অগ্রসর হ'বার সম্ভাবনা অতি অল্প।

আমাদের শান্তিনিকেতনের বড় আদর্শ হ'চ্ছে Culture and Service, উৎকর্ষ-সাধন আর সেবা। এই Culture কেবল একটীমাত্র বিশেষ জাতের বা সমাজের মনোভাবের অবলম্বনে নয়; নিজেদের ভারতীয় Cultureকে তো আগে রাখ্‌তে হবে সে বিষয়ে কোনও কথা নেই; কিন্তু একে রাখ্‌তে হবে এর প্রসার ক'রে, এর সমৃদ্ধি এনে, সব জায়গা থেকে Sweetness and Light মাধুর্য্য আর জ্ঞানালোক আহরণ ক'রে এনে; আর Service হ'চ্ছে এই Cultureকে বিতরণ ক'রে,—নিজের জাতীয় Cultureকে জাতের মধ্যে সুদৃঢ় করার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু Culture বিতরণ ক'রবো কোথায়? যাদের কাছে এই Culture এর আদর, যারা শ্রদ্ধা ক'রে একে মেনে নেবে, যারা আমাদেরই, তারা বেঁচে ব'র্ত্তে থাকলে তবে তো? তারা একে গ্রহণ করবার উপযুক্ত মানসিক অবস্থায় থাক্‌লে তবে তো? নইলে আমাদের দ্বারা সৃষ্ট বা পুনরুজ্জীবিত অভিনব ভারতীয় Cultureএর সৌধ কেবল চোরাবালির উপর গড়া হবে মাত্র—তার কোনও সার্থকতা থাক্‌বে না, দুদিনে তা আকাশ-কুসুমের মত বিলীন হ'য়ে যাবে। গ্রামকে অবলম্বন ক'রে ভারতীয় সভ্যতার অনেক কিছু শ্রেষ্ঠ অঙ্গের বিকাশ হ'য়েছে। গ্রামের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টান ক'মে আস্‌ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রপদ বাচ্য ব্যক্তি আমরা, আমরা ভারতীয় Cultureএর উন্নতি সাধন ক'রছি বটে, কিন্তু আমরা নিজেরা শহুরে, হ'য়ে প'ড়েছি। ছবিতে গল্পে কবিতায় গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করি বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার ভয়ে আর বিজলীর বাতী নেই ব'লে গ্রামে যেতে ভয় পাই—গ্রামের বাস্তু ভিটা ত্যাগ ক'রেছি, গ্রামের জনকে বর্জ্জন ক'রেছি। প্রত্যেক লোকের প্রশস্ততম কার্য্যক্ষেত্র সাধারণতঃ হ'চ্ছে যতদূর সম্ভব নিজের সমাজের মধ্যে। Charity begins at home। প্রতিভাশালী ব্যক্তির কথা অবশ্য আলাদা, তারা কেবল জানপদ বা পৌর মাত্র নন, তাঁদের ক্ষেত্র আরও বিরাট, সমস্তদেশ বা কথনও কথনও সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ে হ'য়ে পড়ে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিজের দেশের আর নিজের নিজের সমাজের কথা ভুলে গেলে চ'ল্‌বে না।

শান্তিনিকেতনের Culture বা উৎকর্ষ যাতে দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তা যেন শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক ছাত্রের চিন্তার বিষয় হয়। দেশ আমাদের দারিদ্র্যের নিপীড়নে ছারে খারে যা'চ্ছে; তার উপর নানাপ্রকার সামাজিক আবর্জ্জনা আর বিভীষিকা আছে। তার জঙ্গলে' আওতায়, তার যত আগাছার জটের মধ্যে প'ড়ে আমাদের দেশে সমস্ত প্রাণ শুকিয়ে' যাচ্ছে, ম'রে যাচ্ছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, উপনিষদের শিক্ষা যেন আমাদের শান্তিনিকেতনের মধ্যে দিয়ে এই শুষ্ক ক্লিষ্ট মৃতকল্প দেশে অমৃতের প্রবাহ আন্‌তে সাহায্য করে। যেন তার আলোর সাম্‌নে, তার তীক্ষ্ণ দর্শন আর উৎসাহশীল প্রয়াসের সাম্‌নে সমস্ত অন্ধকার সমস্ত আবর্জ্জনা দূরীভূত হ'য়ে যায়। এখানকার কলাভবনের ছাত্রদের দ্বারা দেশের জনসাধারণের মাঝে আগেকার কালের মত সহজ সৌন্দর্য্য-বোধ আবার ফিরে আসে। আমাদের এখানে যে পটুয়ারা তাঁদের গুরুকে আশ্রয় ক'রে শিক্ষালাভ ক'রছেন, তাঁদের মধ্যে দু-চার জনে বড় চিত্রকর হ'য়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল ক'রবেন, এ আশা আমরা সহজেই ক'রতে পারি। কিন্তু দেশের লোকের মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধ ফিরিয়ে' আন্‌বার জন্য বিশ্বভারতীর ছাত্রদের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই—যে সৌন্দর্য্য-বোধকে

আমাদের দেশে এখনও সুদূর পল্লীগ্রামে সুন্দর সুন্দর তৈজসে নানাপ্রকার মনোহর গৃহশিল্পে ফুটে' উঠ্‌তে দেখা যায়। এ বিষয়ে যাঁর দ্বারা যেখানে যেটুকু সম্ভব হবে সেটুকু ক'রতে পার্‌লে, ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেকটা কাজ ক'রতে, দেশবাসীর সেবা ক'রতে পারা যাবে। সেইরূপ ইতিহাস দর্শন সাহিত্যের ছাত্র সংগ্রহ, রক্ষণ আর শিক্ষার কাজ দিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ ক'রতে পার্‌বেন। গ্রাম সংগঠন বিষয়ে আমাদের শ্রীনিকেতন থেকে কিছু পরিমাণে কাজ আরম্ভ হ'য়েছে, সেটা দেশের অনুচিকীর্ষু, শান্তিনিকেতনের চিন্তাশীল ছাত্রের প্রণিধানের বিষয়। সমস্ত জাতকে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। নইলে আমাদের Culture নিয়ে আমরা কনকতক ভারতবর্ষের ভদ্রশ্রেণীর লোক নিজের দেশেই পুরো পরবাসী হ'য়ে প'ড়বো, আমাদের ভারত, ভারতীয় Culture হিসেবে, অতীতের বস্তু হ'য়ে প'ড়বে,—অন্তরের শক্তির অভাবে আর ক্ষয়ে আর বাহ্য আক্রমণে। এই ক্ষয় রক্ষিত করাই হ'চ্ছে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়—আমাদের Culture অবলম্বন ক'রে যাতে আমাদের জাত বেঁচে থাকৃতে পারে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া চাই। যে শিক্ষা তাঁরা এখানে পাচ্ছেন বা পেয়েছেন, কর্ম্ম-জীবনে যেন তার পূর্ণতা হয়, যেন তার প্রয়োগ সাফল্য-মণ্ডিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রাচীন ভাগবতধর্ম্মের এই তিনটি জিনিষ দু হাজার বছর আগে এক অনুসন্ধিৎসু গ্রীকের মন আকৃষ্ট ক'রেছিল; গ্রীক হেলিও-দোর, বৈষ্ণব ভাগবতধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে তাঁর উৎকীর্ণ বিদিশা অনুশাসনে লিখে' গিয়েছেন—

'ত্রীণি অমুত পদানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগং দম চাগ অপ্রমাদ'—

তিনটি অমৃতপদ ভাল ক'রে পালন ক'র্‌লে স্বর্গে নিয়ে যায়—দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ; অর্থাৎ আত্মদমন, নিস্পৃহতা, আর শুভ বুদ্ধিকে পরিহার না করা। এই তিনটি অমৃতপদ প্রত্যেক মানুষের আত্মিক উন্নতির সহায়ক। এর পালনের দ্বারা যোগ্যতা অর্জ্জন ক'র্‌তে হবে—সমাজের সেবার জন্য, নিজের শ্রেয়স্ লাভের জন্য।

তারপর আমাদের কাজ ক'র্‌তে হবে 'প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'—শ্রদ্ধার সঙ্গে আচার্য্যদের শিক্ষাকে শ্রবণ ক'রে; সত্যানুসন্ধিৎসা প্রণোদিত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রে; আর মৈত্রীপরবশ হ'য়ে সেবা ক'রে—যেখানে যে অসহায় দুর্ব্বল আতুর আত্মবিশ্বাসহীন আত্মজ্ঞানহীন, তার সেবা ক'রে—তার সহায় হ'য়ে, তাকে বল দিয়ে, তাকে জ্ঞান দিয়ে তার মনে আত্মবিশ্বাস এনে। এইভাবে কাজ ক'র্‌লেই আমরা ব্যক্তিগত পরমার্থ লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো, আর আমাদের পিতৃপুরুষ, আমাদের সমাজ, আমাদের জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতা, তথা বিশ্ব-মানবের প্রতি এইরূপেই আমাদের কর্ত্তব্য ক'র্‌তে পার্‌বো, যথাশক্তি সমাজের সম্বন্ধে আমরা আণৃণ্য লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গান

সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে।
খাঁটি জিনিষ হয়রে মাটি নেশার পরমাদে।
কথায় ত শোধ হয় না দেনা
গায়ের জোরে জোড় মেলে না।
গোলমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ছাঁদে।
কে বলো ত বিধাতারে তাড়া দিয়ে ভোলায়?
সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে জাদুকরের ঝোলায়?
মস্ত বড়র লোভে শেষে
মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,
ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্ব্বনাশার ফাঁদে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিংহলীকথা

কোলম্বের শ্মশান ভূমি এক বস্তু। জাতিভেদের গণ্ডী সেখানেও পুরামাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে আছে। হিন্দু বৌদ্ধ ও খৃশ্চানদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ জায়গা নির্দ্দিষ্ট আছে। হিন্দুদের দেহ দাহ করা হয়। বৌদ্ধদের কতক দাহ আর কতক সমাহিত করা হয়। খৃশ্চানদের সমাধিই দেওয়া হয়।

ভিক্ষুদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া (সাধ্যমত) বেশ জাঁক জমকের সঙ্গে হয়। বড় দরের ভিক্ষু দেহত্যাগ করলে ৭ দিন পর্য্যন্ত তাঁর দেহটিকে তুলে রাখা হয়। সৎকারের দিন মহা সমারোহ সহকারে সুসজ্জিত শবাধারে ভিক্ষুর দেহ রেখে প্রসেসনের সঙ্গে শ্মশান ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভগবান্ বুদ্ধকে যে চিতাতে দাহ করা হয়েছিল তার মাপ ছিল নয় হাত চওড়া নয় হাত লম্বা ও নয় হাত উঁচু। কাজেই চিতার পরিমাণ যতদূর হয়ে ওঠে ঐ পরিমাণের সঙ্গে মিলিয়ে করা হয়। চারদিকে চারটি সুপারী গাছ ও তার মাথায় নূতন চাঁদোয়া প্রভৃতি দিয়ে চিতা সাজান হয়। দেহ চিতার ওপর তোলা হলে যেসব বড় বড় ভিক্ষুগণ ও গৃহস্থগণ সেখানে উপস্থিত থাকেন তাঁরা মৃত ভিক্ষুর নানাবিধ গুণ ব্যাখ্যা করেন, অনেকে ছোট ছোট কাগজে মৃত ভিক্ষুর সম্বন্ধে শোক উচ্ছ্বাস পদ্যে ছাপিয়ে বিলি করেন। শ্মশানে অনেকক্ষণ দেরী হয় বলে লেমনেড সোডা চা পান প্রভৃতির যোগাড় থাকে বিশিষ্ট ভিক্ষুর দেহ সৎকারের সময় শ্মশানে যেন একটা মেলা বসে যায়। বক্তৃতাদি শেষ হয়ে গেলে চিতার ওপর দু তিন ক্যানাস্তারা কেরোসিন তেল ঢেলে চিতা জ্বালিয়ে যে যার ঘরে চলে আসেন। দাহের সময় বাদ্য ভাণ্ড চলতে থাকে। বর্ম্মার ভিক্ষুদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আরো জাঁকে-হয় সেখানে এক একটি মৃত ভিক্ষুদেহ ছয় মাস পর্য্যন্ত রাখা হয়।

হিন্দুদের আচার ব্যবহার দক্ষিণ ভারতের আচারের মত। তামিল বাদ দিলে সিংহলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোক অনেক আছে। যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য করছেন—এমন পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারি, মারাঠী গুজরাটি অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছিল। এক বাঙালীর সংখ্যা কম; নেই বল্লেই হয়। যাই হোক স্থায়ীভাবে সিংহলে বাস করছেন শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়। ইনি উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। ইনি অতিশয় স্বজাতি প্রিয় ও নিরহঙ্কার। যে সব বাঙালীরা অন্ততঃ অল্পদিনের জন্যও কোলম্বে যান ইনি তাঁদের খোঁজ খবর নেন। ইঁহারি আলয়ে অনেকগুলি আগন্তুক বাঙালীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। ইনি সপরিবারে সেখানে বাস করেন।

দীর্ঘ দিন সিংহলে মাননীয় ভিক্ষুগণের অমায়িক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জীবনের যে অংশটুকু কেটে গেছে তার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। একটি কথা আমার মনে হয়েছিল যে সিংহলী ভাষায় অনেক ভাল ভাল কাব্য আছে। আর সিংহলী ভাষার সঙ্গে বাঙ্লা (অবশ্য প্রাচীন বাঙলা) ভাষার সাদৃশ্যও আছে বলে বোধ হয়। যদি কোন ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন তবে বড়ই ভাল হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের লীলাভূমি সিংহলের কাছে অবনত মস্তকে বিদায় নিয়ে আজ এইখানেই আমার "সিংহলীকথা" শেষ করলাম।

বর্ম্মার কথা আজকাল ঘরের কথার মত হয়ে গিয়েছে কাজেই তার পুনরুক্তি করা বৃথা, তবে বর্ম্মার ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক কিছু আছে যা আমাদের সকলের জানা নেই, যদি সুযোগ মেলে তবে সময়ান্তরে সেই সব আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

গিরি গহ্বরে এক রাত্রি *

২৮শে ডিসেম্বর, ১৩ই পৌষ।

সঙ্গী—মাসোজী কারসনজি নির্ম্মাল্য

* * * *

ডুমকার পথ ছেড়ে বাঁ দিকে চল্লাম, ত্রিকূটের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে যাচ্ছি, চৌপো, ডুধুনিয়া, চাকরমা মোহনপুর ছোট ছোট গ্রাম পথে পড়ল ; এর ভিতর মোহনপুর একটু বড়। পাহাড়ের খুব নিকটেই মোহনপুর। একটি মন্দির আছে, সাম্‌নে ঘাট বাঁধান পুকুর। দোকান থেকে দই চিড়ে কিনে পুকুর পাড়ে খেয়ে নিলাম, তাও গুড় ছাড়া, কারণ দোকানে কোনো মিষ্টি নাই।

ঝোপ জঙ্গল ভেঙে পাথর ডিঙিয়ে ত্রিকূটে উঠতে আরম্ভ করেছি, কারণ আমরা যে দিকে চলেছি, সে দিকে লোকের চলাচল নেই। মাঝে মাঝে চলার মত একটু আধটু ফাঁকা জায়গা দেখছি ; পাহাড় থেকে বাঁশ কেটে নিয়েছে তাই ফাঁকা হয়েছে। বাঁশ ঝোপ রয়েছে বিস্তর। এ বাঁশগুলি মোটা নয়, আর ফাঁপা নয় ঠাসা, বেশ লাঠি হয়। সঙ্গে একখানি কুড়ুল ছিল, দেওঘর থেকে কিনে এনেছিলাম। গোটাকতক বাঁশ কেটে নেওয়া গেল। চিতে বাঘ, নেকড়ে টেকড়ের ভয় নাকি আছে, একেবারে নিরস্ত্রভাবে, বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে যাওয়া ঠিক না। জানোয়ার টানোয়ার কিছু পথে পড়ে নি, এমন কি একটা নেংটি ইঁদুর পর্য্যন্ত নয়।

* ৭ই পৌষের উৎসবের পর ভ্রমণের ছুটীতে কলা-ভবনের আর্টিষ্ট এবং শান্তিনিকেতন Boys'scout এর কাপ্তেন শ্রীযুক্ত মাসোজী এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান কারসনজি ও নির্ম্মাল্যকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দেওঘর হইতে ডুমকায় হাঁটিয়া যাই। পথে এক রাত্রি ত্রিকূটে অবস্থান করি—তারই কাহিনী।

লেখক

তবে মাঝে মাঝে মাটী খোঁড়া দেখেছি, হয়ত বুনো শূয়র থাক্‌তে পারে। আমাদের পথ ঠিক করে যাওয়া ভারি মুস্কিল হয়েছিল। মাঝে মাঝে উঁচু পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে ঠিক করতে হয়েছে, কোথাও একটু পা ফেলার মত জায়গা আছে কিনা। পথ না মেনে চলেছি, কেবল উঁচু দিকে, চূড়ায় গিয়ে পৌঁছতে হবে।

গাছের ফাঁক দিয়ে ঐ চূড়া দেখা যাচ্ছে এগিয়ে চল, কেবল এগিয়ে চল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গুহার মত দেখছি, এবার হুসিয়ার।

হঠাৎ আমাদের পথ চলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, সাম্‌নে বড় বড় পাথর। চূড়া খুবই কাছে দেখা যাচ্ছে; গম্য স্থানের এত কাছে এসে, শেষে কি ফিরে যেতে হবে? হয়রান হয়ে বসে পড়লাম। নীচের সমতল জমি দেখা যাচ্ছে, মানুষেরা ছোট ছোট প্রাণীর মত চলেছে। ডুমকার পথ সোজা চলে গেছে দেওঘরের দিকে। ঐ মনোহরপুর গ্রাম, ঐ মন্দির আর দীঘি, যেখানে বসে দই চিড়ে খেয়েছিলাম। রাখালের হাঁক পর্ব্বতের নিস্তব্ধতাকে উদাস করে তুলেছে, গরুর গলার টুং টাং ঘণ্টাধ্বনি গানের মত থেকে থেকে কানে মধুবর্ষণ করছে, আকাশ ছন্দের ঢেউ তুলেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সবল হয়ে নিলাম। যেতেই হবে পাথর ডিঙিয়ে, পর্ব্বত শিখরে পৌঁছতে হবে। দু পাথরের ফাটালের মাঝ দিয়ে ওধার থেকে একটা গাছের ডাল এঁকিয়ে বেঁকিয়ে এসে পড়েছে, সেটা ধরে, পাথরের খাঁজে পা দিয়ে টানা হেঁচড়া করে কোন রকমে ওপারে যাওয়া গেল। এদিকে গাছপালা জঙ্গল বেশী নাই। পাথরের রাজ্যে এসে পড়েছি কোথাও হেলান পাথরের তল দিয়ে উবু হয়ে চলতে হচ্ছে, কোথাও পাথর আঁকড়ে ধরে গাছের শিকড় ধরে এগুতে হচ্ছে। Narrow is the gate that leads to the way of salvation, সেই পথের কৃচ্ছতা মেনে নিয়েছি।

একটা সুড়ঙ্গের মত জায়গায় এসে পড়েছি। বাঁয়ে ডানে পাথরের প্রাচীর, মাথার ওপরে প্রস্তর খণ্ড ছাদের মত

হয়েছে। আলো কমে এসেছে। সামনে বন্ধ ওপরের দিকে একটা ছিদ্র পথ চলে গেছে, বেশ খাড়া, ওঠা খুবই মুস্কিল। বটগাছের একটা শিকড় অনেক ওপর থেকে পাথরের গা বেয়ে দড়ির মত নেবে এসেচে, আর একটা পাথর এর ওপর ঝুকে পড়েছে। বসতে গেলেও মাথা ঠেকে যায়। জুতা খুলে ফেলে পাথরের গায়ে শুয়ে পড়ে শিকড় ধরে সুড়ঙ্গ পথের শেষে পৌছালাম।

আলোক! আলোক! ছোট্ট একটি কোঠার মত আলোয় ভরে গেছে। ওপরে বড় একটা হেলান পাথর ছাদের কাজ করছে। একটা দিক আকাশের দিকে একেবারে খোলা। সুড়ঙ্গ পথ শেষ করে, এখানে এসে একেবারে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখান থেকে আবার সমতল ভূমি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আবার ঘণ্টাধ্বনি কানে পৌছচ্চে। প্রাণটা যেন বিশ্রাম এবং সোয়াস্তি পেল, মনে আনন্দে ভরে উঠল, চক্ষু সৌন্দর্য্য সাগরে নিমগ্ন হল।

সূর্য্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে—আরতো দেরি নয়। এখনি ত রাত আস্‌বে, ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র জন্তু সকল তাদের গর্ত্ত ছেড়ে বেরিয়ে আস্‌বে। এখানেই রাত্রি যাপনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সমস্ত রাত্রি জ্বালাবার জন্য যথেষ্ট শুক্‌না কাঠ চাই। তাই সকলে কাঠের সন্ধানে বেরুল। দলের ভিতরে আমি বৃদ্ধ সকল প্রকার পরিশ্রমের কার্য্যে অক্ষম। আমাদের কুঠরীর সামনে খোলা বারান্দার মত একটা জায়গা আছে—একেবারে দেওয়ালের মত খাড়া, ৭০।৮০ হাত নেবে গেছে। সেখানে গিয়ে চুপ করে বসলাম। আমাদের খুব কাছেই ত্রিকুটের উচ্চতম চূড়া, একটা আস্ত পাথর ২০০ হাত কি তার চেয়েও বেশী উচু। এর ওপর আর ওঠার জো নাই।

সূর্য্যাস্তের আয়োজন হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সূর্য্য যেন মাঠের ওপর এগিয়ে এসেছে, আর দূরের গ্রামের সব কত রকম চেহারা হচ্ছিল। প্রথম দেখছি আগুনের থালা, পরে ফুলের কলির মত, একটা বাটীর মত শেষে একটা নৌকা হয়ে গেল; মেঘের মধ্যে একেবারে ডুবে গেল। আবার অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে মেঘের নীচে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল সমতল ভূমি এবং পশ্চিম দিক-চক্রবাল আলোকিত করে সহস্র শীর্ষ মরীচিমালী আকাশের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিগন্ত রেখা কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে; পৃথিবীর আলোক সজ্জার উপর অন্ধকারের যবনিকা ধীরে ধীরে নেবে আসছে। তারার মত দূরে দূরে কুটীরে একটি একটি আলো জ্বলে উঠ্‌ল।

আশ্রম বালকেরা সমিধভার বহন করে গহ্বরে প্রবেশ করল। আগুন জ্বালা হল। এর পাশে বসে ইচ্ছা করছিল জনপ্রাণীহীন নীরব সন্ধ্যায় একবার বেদমন্ত্র উচ্চারণ করি "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে ঋষিরা পর্ব্বত গহ্বরে এমনিই বুঝি জীবন কাটাত।

যত রাত্রি যতই হতে লাগল কবিত্ব টবিত্ব সব ছুটে যেতে লাগল, কুড়ুলখানা হাতের কাছে রেখেছি, সুড়ঙ্গ মুখে চোখ রেখেচি কখন যেন দেখব অন্ধকারে বাঘের দুটো চোখ জ্বলছে। বাপরে বাপ! এমন জায়গাতেও মানুষ রাত কাটায়; কি ভীষণ জায়গা! বুক দুরু দুরু করছে। আমি বুড়ো মানুষ কখনই এমন সাহস করতাম না। কাপ্তেন সাহেব যুবক—অদম্য উৎসাহ। বালকদ্বয়ের ততোধিক, তাদের খুব স্ফুর্ত্তি। কেবলই বলছে একটা কিছু এ্যাডভেঞ্চর করা চাই; আশ্রমে গিয়ে তাদের বন্ধুদের সে সব কাহিনী বলে সবাইকে একেবারে থ মেরে দেবে। এদের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের জীর্ণ অস্থিতে সাহস সঞ্চারিত হল।

ভয়ের কারণ যে একেবারে হয়নি, তা নয়। সমস্তদিন হাঁটা তাতে আবার এক রকম অভুক্ত। পকেট ভরে চিড়ে এনেছিলাম, তাই খিদের চোটে মুঠো মুঠো নিয়ে শুকনো খাচ্চি।

পাহাড়ে একফোঁটা জল খাবার জো নেই। রাত্রি অল্প হলে বালকদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ল, ভারি চিন্তায় পড়লাম। মানুষের সাহায্য কোথাও ত পাওয়া যাবেই না তার উপর আবার জলাভাব। তাকে কম্বল টম্বল জড়িয়ে, ভাল করে শোয়ার বন্দোবস্ত করে দিলাম। ঘুমালে পর

অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। পালা করে এক এক জনের জাগতে হবে। আমরা তিনজন আছি।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে ওপরের আকাশ আর নীচের সমতল ভূমি অন্ধকারে সব একাকার হয়ে গেছে। আকাশের তারার মত নীচেও অন্ধকারে অগণিত দীপ জলছে। আমরা যেন আকাশ-জাহাজে চড়ে অসংখ্য তারকা ছাড়িয়ে অনেক উর্দ্ধে উঠে দেখছি। পৃথিবী এই অন্ধকার সমুদ্রে ক্ষুদ্র এক বাষ্পকণার মত কোথায় যে মিলিয়ে গেছে, তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। ম্লান চন্দ্রকলা অন্ধকারকেই ব্যক্ত করেছে।

নীচে চৌকীদার হাঁক দিয়ে যাচ্ছে সুস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ভারী মিষ্টি শোনাচ্চে। অগ্নিকুণ্ডের দীপ্তি কমে আসছে গহ্বরে কালো ছায়া পড়েছে, তাই শুক্‌না কাঠ ঠেলে দিলাম, আগুন ভাল জলে উঠল, গহ্বর আলোকময় হল, কেবল সুড়ঙ্গ মুখের অন্ধকার, রহস্য সৃষ্টি করে তুলেছে।

ঐ খুস্ খুস্ শব্দ শোনা গেল, চুপ্ চুপ, কাণ খাড়া করে রয়েছি, কিছু হেঁটে যাচ্ছে কি? না, কিছু না, শীতের হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

—কে বল্লাম একটু ঘুমিয়ে নাও। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর কিছু ঘুম না হলে ক্লান্তি ঘুচবে না, ভোরে ত আবার হাঁটতে হবে। ঘুম আমার আসচে না বল্ল। উৎসাহ এবং আনন্দ একেবারে কানায় কানায়, একটুও কম্‌তি নাই।

অগ্নিকুণ্ড থেকে ধুয়া বেরুচ্ছিল, আমার তার কাছে বেশিক্ষণ টিকে থাকা চল্ল না। আমার স্থান বালককে দিয়ে সরে আসলাম।

—ছোট ছেলে অনেকক্ষণ জেগে থেকে অগ্নিকুণ্ডের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আধ জাগা আধ ঘুমে আছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম; দেখি কি গড়িয়ে পড়ছে। ঢালু পাথরের ওপর দিয়ে বালকের মাথা থেকে টুপিটা খসে গিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। গড়াতে গড়াতে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নীচে গিয়ে পড়ল।

* * * * *

২৯শে ডিসেম্বর, ১৪ই পৌষ।

গহ্বরে ভোরের আলো প্রবেশ করেছে। আধ ঘুমে আধ জাগরণে, ভয়ের রহস্যময় আনন্দে রাত কেটে গেছে। কৈ কিছুই ত হল না। একটা টিকটিকি পর্য্যন্ত দেখলাম না, জয় বৈদ্যনাথের জয়, যাঁর কৃপায় রাত নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল।

আমাদের কাপ্তেন সাহেব কিন্তু নিরামিষ রাত কাটিয়ে খুসী হল না, বল্ল I would have liked to meet some animals.

সমতল ভূমি নিশি অবসানে আবার জেগে উঠেছে। আমরা অনেক উঁচুতে বসে অন্য সব পাহাড়গুলিকে ছোট বলে মনে হচ্চে। দূরে আমাদের পাহাড়ের নীচে শালবন ঘেরা স্বচ্ছ সরোবর দেখা যাচ্ছে; আকণ্ঠ পুরে জল পান করার জন্য মনটা উদ্‌গ্রীব হয়েছে।

এবার নাবতে হবে। নবোদিত সূর্য্যকিরণে আলোকিত ত্রিকূট শিখরকে দেখে নিলাম। আশ্রয়দাতা গহ্বরকে প্রণাম করে রওনা হলাম।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত।

Artificial Gems and their Manufacture

As early as 1837 Gaudin made artificial rubies by heating ammonia, alumina, and potash by means of an oxy-hydrogen blow-pipe; the intense heat volatilised the potash and alumina afterwards producing crystals in rhombohedral (figures of 4 equal sides with unequal angles.) forms identical with those of the natural stone; and having the same specific gravity and hardness. Methods of

producing crystals of corundum, ruby, sapphire, etc., were discovered about 1858, but both these and Gaudin's processes had but little commercial value, the great expense precluding their adoption. Until quite recently, the only artificial gems known to commerce were coloured glass, and, in some cases, wax preparations backed with silver or a mercury amalgam. Now however, the chemist can produce imitations that, in hardness and lustre, equal the real gems. Here the word "imitation perhaps is not the correct word, as the composition of both manufactured and natural stones is the same. Sometimes it is quite impossible to distinguish between the two kinds of gems, although, generally, examination under the microscope reveals some difference. When seen through a microscope, natural rubies contain minute cracks which shew the lines of cleavage ; the artificial gem shows very minute bubbles or gas holes. Analysis has proved that the sapphire is pure alumina, that is oxide of aluminium (Al_2O_3). This is found in the form of a white powder fusible at high temperature only. The colour of a sapphire is supposed to be due to the presence of chrome, and is dichroitic, that is, it varies with the point of observation ; thus it is successfully imitated only with difficulty. M. Sidot, the French chemist, accidently discovered a method of producing gems that possessed dichroitic properties. His method is to heat an iron pot to dark red colour and to place in it 4 oz. of superphosphate of lime ; this is brought to the same heat and stirred with an iron rod, being then converted to crystallised pyrophosphate, which on being further heated becomes a fluid resembling molten glass. It is supposed that in this state a part of the phosphoric acid is changed to a tribasic phosphate. The fused mass is stirred continuously until it is quite transparent and free from bubbles, when it is transferred to another pot, and kept at a white heat for two hours, the stirring being kept up all the time. After standing for an hour, it is poured on to a metallic surface and allowed to cool slowly until it is as soft as putty, when it is put on plate glass. When cold, a number of stones almost equal to the genuine sapphire may be cut from the plate. Another formula is :— Smelt a mixture of 4 oz of oxide of aluminium and 4 oz of red lead (Pb_3O_4), and stir in 10 gr. of bichromate of pottasium ($K_2Cr_2O_7$) and 17 gr. of oxide of cobaltum (Co O.). When cold, stones may be cut that are as hard, if not quite so brilliant, as the genuine ones. The ruby, also, is oxide of aluminium coloured with chrome. Crystals of the rose coloured ruby may be produced by melting together aluminium oxide and powdered silica, with the addition of flouride of barium to form a flux, and then adding a trace of bichromate of potassium ; 500 ℔s of these ingredients after

perhaps a week's fusion, will produce rubies of 5 or 6 carats which may vary much in colour, running through all the shades of bluish sapphire and rose to the deep colour of the so-called pigeon blood ruby. Ordinary borax fused with a little chromium oxide for a week or so produces large ruby crystals ; but 200 lbs of ingredients may be required to obtain even two or three gems of any marketable value. One method of making artificial rubies is to smelt a mixture of 4 oz of oxide of aluminium and 4 oz of red lead, and add from 7 gr. to 16 gr. of bichromate of potassium. Natural emeralds are a combination of the rare element of beryllium or glucinum with silicon; chrome gives the colour. Beryllium is too expensive for use in producing imitations, so oxide of aluminium is used, 4 oz. of this being smelted with 4 oz. of red lead to which from 8 gr. to 12 gr. of uranate of sodium ($Na_2 U_2 O_7$) have been added. Perry and Hautefeuille the French chemists, produced some beautiful emerald crystals by fusing silica, alumina, glucina, and a trace of chromium oxide with acid molybdate of lithia. After a fusion of 15 days some very small crystals having all the mineralogical and physical characters of the natural emerald, may be obtained. The longer the fusion the larger are the crystals. Emeralds and other gems have been produced from gas retort, refuse by a method discovered by Mr. Greville Williams, F. R. S., who modelled an emerald composed of from 67 to 68 % of silicia, 15 to 18 % of alumina, 12 to 14 % of glucina, and traces of magnesia, carbon, and carbonate of lime. The colour was an intense green, due, it is believed, to the presence of sesquioxide of chromium. Imitations of the amethyst, topaz, etc., have been made very successfully by Donault Wielaud, of Paris, whose method of preparing. "Parisian Dianonds," or "Alaska Diamands," is to smelt a mixture of 65 % of pulverised crystal quartz, 20 % of red lead, 8 % of pure carbonate of potash, 5 % of boric acid, and 2 % of white arsenic. The brilliancy of the resultant stone depends principally on the purity of the red lead and the carbonate of potash.

[From Modern Review]

Madhavakrisna Naidu
F. R. S., (Sc). etc.

গান

একি মায়া লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে ?
আমার সয়না প্রাণে কিছুতে সয়না যে !
কৃপণ হয়ে হে মহারাজ
রইবে কি আজ
আপন ভুবন মাঝে ?
বুঝতে নারি বনের বীণা
তোমার প্রসাদ পাবে কিনা ?
হিমের হাওয়ায় গগনভরা ব্যাকুল রোদন বাজে।
কেন মরুর পারে কাটাও বেলা রসের কাণ্ডারী ?
লুকিয়ে আছে কোথায় তোমার রূপের ভাণ্ডারী।
রিক্তপাতা শুষ্কশাখে
কোকিল তোমার কই গো ডাকে,
শূন্য সভা মৌন বাণী আমরা মরি লাজে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি

সা সা -া II রা -া -া। গা -া -া I মা পা -ধা। ধপা মা -গা I মা -ধা ধা।
এ কি ০ মা • ০ য়া ০ ০ লু কা ও কা য়া ০ জী র্ ণ

ধা ধা -না I না র্সা -া। র্সধা ধা -ণা I ণর্রা -া -া। র্রর্সা -া -া I ণর্সা -া -া।
শী তে র সা জে ০ আ মা র স য় ০ না ০ ০ স য় ০

ণা -া -ধা I পা -ণা ণা। ণা ধা -া I -া -া ধা। ধা ধা -ণা I ধপা া- র্সা।
না ০ • স য় না প্রা ণে ০ ০ ০ কি ছু তে ০ স ০ য়

র্সণা -া -র্সণা I ণধা -া -া। সা সা -া I রা -া -া। গা -া -মা I রা -া -পা।
না ০ ০ যে ০ • কৃ প ণ্ হ ০ ০ য়ে • ০ হে • ০

পা মা -পমা I মগা -া -া। -া -া -মগা I রা -গরা গা। মা পা -গা I মা মা -ধা।
ম হা ০ রা ০ ০ ০ ০ জ্ র হি বে কি আ জ্ আ প ন্

ধা ধা -না I না র্সা -া। র্সধা ধা -ণা I ণর্রা -া -া। র্রর্সা -া -া I ণর্সা -া -া।
ভু ব ন্ মা ঝে ০ আ মা র স য় ০ না ০ ০ স ০ য়

ণা -া -ধা I পা -ণা ণা। ণা ধা -া I -া -া ধা। ধা ধা -ণা I পা -া -র্সা।
না ০ ০ স য় না প্রা ণে ০ ০ ০ কি ছু তে ই স য় ০

র্সণা -া -র্সণা I ণধা -া -া। সা সা -া II
না ০ ০ যে ০ ০ এ কি ০

II মা -ধা ধা। ধা ধা -না I না র্সা -না। নর্রা -া -র্সনা I নর্সা -া -া।
বু ঝ্ তে না রি ০ ব নে র্ বী ০ ০ ণা ০ ০

মা মা -া I মা -া -া। পা -া -ধা I ধপা পা -ধা। ধপা -র্সণা -ধণা I ধা -া -া।
তো মা র প্র ০ ০ সা ০ দ্ পা বে ০ কি ০ ০ না ০ ০

ধা ধা -ণা I ণপা -া -ধণা। ধা -া -া I সা সা -া। রা গা -া I মা পা -া।
হি মে র্ হা ০ ও য়া য় ০ গ গ ন্ ভ রা ০ ব্যা কু ল্

ধা না -া I না র্সা -া। সা সা -া I রা -া -া। গা -া -মা II
রো দ ন্ বা জে ০ কৃ প ণ্ হ ০ ০ য়ে ০ ০ ইত্যাদি

ধা ধা -ণা II ণর্রা র্রা -া। র্সা র্সা -ণা I ধর্সা -ণা -ধা। ধমা -া -পমা I মগা -া -া।
কে ন ০ ম রু র্ পা রে ০ কা টা ও বে ০ ০ লা ০ ০

-া -া -া I সা সা -রা। গা -রা গা I মা -া -া। -া -া -া I মা মা পা। পা পা -া I
০ ০ ০ র সে র কা ন্ ডা রী ০ ০ ০ ০ ০ লু কি য়ে আ ছে ০

পা পা -ধা। ধপা -া -ধণা I ণধা -া -া। -ণধা -া -া I পা ধা -া। না -ধা না I
কো থা য় তো ০ ০ মা ০ ০ ০ ০ র্ রূ পে র্ ভা ন্ ডা

র্সা -া -া। -া -া -া I ধা -া ধা। ধা ধা -না I না -া র্সা। র্রা -া -র্সনা I
রী ০ ০ ০ ০ ০ রি ক্ ত পা তা ০ শু ষ্ ক শা ০ ০

র্সা -া -া। মা মা গা I মা -া -া। পা -া ধা I ধপা -র্সা র্সা। র্সণা -া -র্সণা I
খে ০ ০ কো কি ল তো ০ ০ মা ০ র্ ক ই গো ডা ০ ০

ণধা -া -া। -া -া -া I ণা -া ণা। ণা ণা -া I ধা -া ধা। পা মা -া I সা -া সা।
কে ০ ০ ০ ০ ০ শূ ০ ন্য স ভা ০ মৌ ০ ন বা ণী ০ আ ম্ রা

রা গা -া I মা পা -া। সা সা -া I রা -া -া। গা -া মা II II
ম রি ০ লা জে ০ কৃ প ণ্ হ ০ ০ য়ে ০ ০ ইত্যাদি।

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার।

আশ্রম সংবাদ

উৎসব

এবারকার পৌষ উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সমবেত চেষ্টা করিয়াছিলেন। উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কয়েকটি সমিতির উপর ভার দেওয়া হয়। সেই সকল সমিতি উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গের সৌষ্ঠব সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রমে আগত অতিথিদের সন্নিবেশের জন্য ছোট বড় ছয়টি তাঁবু খাড়া করা হইয়াছিল এতৎ ব্যতীত ছাত্রাবাসের তিনটি ঘর এবং শান্তিনিকেতন অতিথি-বাসটি এই নিমিত্ত ছিল। এবার উৎসব উপলক্ষ্যে মেলাক্ষেত্রে ও আশ্রমের পথগুলিতে বৈদ্যুতিক আলোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আলোর অভাবে এবার কষ্ট পাইতে হয় নাই। মেলাক্ষেত্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা এবার অন্যান্য বারের চেয়ে উত্তম হইয়াছিল। আশ্রমের বড় কুয়াটি হইতে ইঞ্জিনে জল তুলিয়া দুইটি চৌব্বাচা ভরিয়া রাখা হইয়াছিল এবং সেখান হইতে নল দ্বারা জল রান্নাঘরে এবং মেলাক্ষেত্রের চৌব্বাচায় সরবরাহ হইতেছিল। মেলার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আশ্রমের ব্রতীবালকগণ (Boys' Scouts) বিশেষভাবে দায়ী ছিলেন। এবং মেলাক্ষেত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ভার আশ্রমের বয়স্ক ছাত্রগণ লইয়াছিলেন। মেলাটির পারিপাট্য যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবার সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য বারের মত দোকানগুলি এলোমেলোভাবে না সাজাইয়া পথের দুই পাশ দিয়া এবং মেলাক্ষেত্রের পূর্ব্ব এবং উত্তর সীমাতে স্থাপিত করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় মেলার মধ্যে জায়গার অভাব হয় নাই—এবং আগত দর্শকরা অতি অনায়াসে চলাফিরা করিতে পারিয়া ছিল। মেলাতে ৬০ খানি দোকান আসিয়াছিল—তন্মধ্যে খাবারের দোকানই অধিকাংশ। এতৎ ব্যতীত কাপড়ের দোকান, বাসনের দোকান, গালার খেলনার দোকান, মনোহারী জিনিষের দোকানও ছিল। কলাভবনের পৌষ-কার্ড এবং ছবির একটি দোকান ছিল। দুইদিন মেলা—তন্মধ্যে ৭ই দ্বিপ্রহরে যাত্রাগান হইয়াছিল। আশ্রমের নিকটবর্ত্তী আদিত্যপুর গ্রামের যাত্রাদল বায়না লইয়াছিল। প্রথমদিন তাহারা জহ্নুমুনির গীতাভিনয় করিয়াছিল। দর্শকগণ সকলেই বিশেষভাবে অধ্যাপক স্টেন কোনো তাহাদের অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়াছিলেন।

অপরাহ্নে মেলাতে ক্রীড়া প্রদর্শনী হইয়াছিল। সাঁওতালদের তীর ধনুক ছোঁড়া, দৌড়, ইহার একাংশ ছিল। মুষ্টি যুদ্ধ (Boxing), বালিশ যুদ্ধ, প্রভৃতি দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইয়াছিলেন। হাডুডু খেলাও বাদ যায় নাই। রাত্রে সকলের চিত্ত বিনোদনার্থ বাজি পোড়ানো হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন মেলা প্রথম দিন অপেক্ষা বেশি জমিয়াছিল। এই দিন দ্বিপ্রহরে মেলাতে মল্লক্রীড়ার আয়োজন ছিল। রাত্রে কলিকাতা হইতে আনীত বায়োস্কোপ সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল—এতৎব্যতীত প্রথম দিনের ন্যায় বাজী পোড়ানো হইয়াছিল। এই দিন রাত্রে পুনরায় যাত্রাগানের ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বোক্তদল এই দিন থনাদেবী অভিনয় করিয়াছিল। এইবারকার মেলাতে একটি সার্কাসের দল আসিয়াছিল।

৭ই পৌষ অতি প্রত্যুষে আশ্রমবাসীগণ ও সমাগত অতিথিগণ বালকদের বৈতালিক সঙ্গীতে ও রসুনচৌকির সুমিষ্ট রাগিনী আলাপে শয্যা ত্যাগ করিয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। স্নান ও জলযোগ সমাপন করিয়া সকলে সুসজ্জিত উপাসনার মন্দিরের দিকে চলিতে লাগিলেন। প্রাতে আচার্য্যের কাজ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উপাসনার সময় অনেকগুলি সঙ্গীত হইয়াছিল।

মন্দিরের পর সকলে মেলা দেখিতে গমন করিলেন। ১১টার সময়ে সকলের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সমাগত অতিথিগণ অতিথি-সেবক বালকগণ দ্বারা চালিত হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে যাইতেছিলেন তাঁহাদের আহারের তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয় ছিলেন। আহারান্তে সকলে মেলার যাত্রাগান শুনিতে চলিলেন। অপরাহ্নে সকলের জলযোগের ও রাত্রে প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্ব প্রথামত আশ্রমস্থ সকলেই এই দিনের জন্য আশ্রমের নিমন্ত্রিত অতিথি। বোলপুর সহরের, সিউড়ির, এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক ভদ্রলোকও এইদিন নিমন্ত্রিত হইয়া আশ্রমে আসিয়া থাকেন।

৮ই পৌষ প্রাতে জলযোগের পরে আম্রকুঞ্জে প্রাক্তন ছাত্রদের সভা হয়। এই সভায় আশ্রমের বর্ত্তমান ছাত্র ও অধ্যাপক মহাশয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। সমাগত অতিথিগণও ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহা বর্ত্তমান মাসের পত্রিকায় প্রথমে স্থান পাইয়াছে। এই সভা ভঙ্গ হইলে প্রাক্তন ছাত্রদের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্য কারকগণ নিযুক্ত হন।

আশ্রমিক সংঘের সম্পাদক—শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

ধনাধ্যক্ষ— শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী।

সংসদের সদস্য— শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

পত্রিকার সম্পাদক—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীশশধর সিংহ।

৮ই পৌষ সন্ধ্যাকালে নাট্যঘরে গানের মজলিশ হয়। ইহাতে আশ্রমস্থ ওস্তাদগণ ও ছাত্রগণ নানারূপ গান বাজনা করিয়া সকলকে প্রীত করেন।

৯ই পৌষ সকালে আম্রকুঞ্জে পরিষদের অধিবেশন হয়। অধ্যাপক ষ্টেন কোনো সভারম্ভে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপরে এণ্ড্রুজ সাহেব, শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেন। দ্বিপ্রহরে কলাভবনে পরিষদের পুনরায় অধিবেশন হয়। এইখানে নানারূপ কাজের কথা হয়। এইদিন রাত্রে আশ্রমস্থ যাত্রার দল বীরভূম বিজয় নামক একটি যাত্রা গান করিয়া সমাগত অতিথি ও আশ্রমবাসিদিগকে তৃপ্ত করেন।

দিগ্বিজয়

উৎসবের পরে ভ্রমণের জন্য এক সপ্তাহ ছুটি থাকে এইবার নানা দলে ছাত্র অধ্যাপক মহাশয়গণ বিভক্ত হইয়া নানাদিকে দিগ্বিজয়ে গিয়াছিলেন। একদল নেপালবাবু,

প্রমদাবাবু ও নন্দলালবাবুর সাথে মালদহ অভিমুখে গিয়াছিলেন। ইঁহারা গৌড় ও আদিনার প্রাচীন শিল্পকার্য্যাদি দেখিয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা যুদ্ধ জয়ের চিহ্ন স্বরূপ গৌড় আদিনার শিল্পকলার অনেক অনুঅঙ্কন আনিয়াছেন।

অন্য একদল সন্তোষবাবু ও অক্ষয়বাবুর সাথে অজয় নদীর তীরবর্ত্তী বনমধ্যে প্রসিদ্ধ লাউসেনের গড় দেখিতে গিয়াছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে প্রায় ত্রিশ জন লোক ছিল। আশ্রমের কয়েকটি ছাত্রীও এইদলে ছিলেন। ইঁহারা উক্ত শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে যে সব ভীষণ জন্তুর আভাস পাইয়াছেন তাহাদের কাহিনী বহন করিয়া আনিয়াছেন।

তৃতীয় দল মণীগুপ্তের সঙ্গে গিয়াছিল। তাঁহাদের ভ্রমণের সব চেয়ে লোমহর্ষণকর অংশটুকু পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে।

চতুর্থদলে কোপাই আবিষ্কারকেরা ছিলেন। তাঁরা পূর্ব্ব রীতি অনুযায়ী কোপাই নদী অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু উৎস পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারেন নাই; পথ মধ্যে একটি গ্রামের আথিত্য-প্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেইখানেই তাঁবু করিয়া কয়দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

নগেনবাবুর সহিত ছোট ছেলেদের একদল কাটোয়া নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছে।

কেন্দুলি মেলা

প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি জয়দেবের কীর্ত্তিপীঠ কেন্দুলির মেলাতে আশ্রমের অনেকেই এবার গিয়াছিলেন। অধ্যাপক ষ্টেন কোনো এই মেলা দেখিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় কালীমোহন বাবুর সাথে আশ্রমের কয়েকজন বালক স্বেচ্ছা সেবক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সেখানে সুচারুরূপে কার্য্য করিয়াছে।

আশ্রম-সম্মিলনী

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় ছাত্র পরিচালক ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীতারকনাথ জাহিড়ী আশ্রম সম্মিলনীর নূতন সম্পাদকদ্বয় নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্মিলনীর নূতন নিয়ম অনুসারে সম্পাদক নামের পরিবর্ত্তে ছাত্র-সচিব নাম করণ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ছাত্র ও ছাত্রীরা ছাত্রদের সাহিত্য সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীকানাইলাল সরকার
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীঅমিতা চক্রবর্ত্তী।

বিশ্বভারতীর ছাত্রদের সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিতগণ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র
শ্রীইভা বসু

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পুস্তকালয়

আশ্রমের পুস্তকালয়ের কলেবর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসর ফাল্গুন মাসে ইহার পুস্তক সংখ্যা একুশ হাজার ছিল। এ বৎসর মাঘ মাসে উক্ত সংখ্যা ত্রিশ হাজারের কাছে গিয়া ঠেকিয়াছে।

ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

বর্ত্তমান বৎসরে আশ্রমের বিদ্যালয় বিভাগে—

মোট ছাত্র সংখ্যা—১৪০
ছাত্রী সংখ্যা—২৫

কলেজ বিভাগে—

ছাত্র সংখ্যা—১৪
ছাত্রী সংখ্যা—৬

এবারে মাঘ মাসের প্রথমে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন তাঁহারা এখানে এরূপ শীত পড়িতে কখনো দেখেন নাই। অন্যান্য বার পৌষের শেষেই আমের মুকুল ও শালের পাতা ঝরিতে দেখা যায়। কিন্তু এবার মাঘ মাসের ৪ঠা তারিখেও আমের মুকুল উঁকি দিতে বা শালের পাতা ঝরিতে দেখা গেল না।

আশ্রমের স্বাস্থ্য এখন ভালই আছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে সর্দ্দি কাসির প্রকোপ বাড়িয়াছিল। এখন হাঁসপাতালে কোনো কঠিন রোগী নাই।

গত মাসে আমরা ছাপাইয়াছিলাম—আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বিলাত যাত্রা করিয়াছে—পরে সংবাদ পাইলাম ইহা সত্য নহে।

উৎসের অনুসন্ধানে

[বিক্রমজিতের অপূর্ব্ব আবিষ্কার ও জীবন কাহিনী]

১

তিন দিনের মধ্যে আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত বন্ধুবর শশাঙ্ক সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। কাজের সমগ্র চেহারাটাকে শশাঙ্ক যেমন এক পলকে দেখিয়া একাগ্রভাবে অনুসরণ করিতে পারে তাহা বাস্তবিক প্রশংসার। সে এই স্বল্প সময়ে আমাদের আসন্ন-প্রায় অজ্ঞাতবাসের খুঁটিনাটি সব আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে—রান্নার পাঁচফোড়ন হইতে আরম্ভ করিয়া কে কে আমাদের সঙ্গে যাইবে--সমস্তই। সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া যাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতেছে কেবল ঘরে বাহিরে চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ নাই আমারই। সেদিন রবিবার আমি আমার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছি এমন সময়ে শশাঙ্ক আসিয়া আমার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে পথের কোন চিহ্ন না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার আগেই বলিয়া উঠিলাম—আমাকে দলে টেনে তোমার গৌরবের ভাগ আধা-আধিকর কেন? নূতন কলম্বস হবার পূর্ণ সৌভাগ্য তোমারই হোক্। শশাঙ্ক একটানে আমার হাতের বইখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল—সে হচ্ছে না কোথায় অজ্ঞাত দেশে গিয়ে আমরা মরবো আর তুমি—

"আমি ইতিহাস লিখবার জন্য বেঁচে থাকব। সেটা একান্ত দরকারী।" এমন সময় দরজার কড়া ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম না এই খাঁটি বাংলাতে বসিয়া বিলেতী অনুকরণে দরজায় কে ঘা দেয়? বন্ধুবর ইংরেজী ফ্যাসানে বলিয়া উঠিল ভিতরে এস। অমনি দরজা খুলিয়া একব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই মনে হইল মূর্ত্তিমান ডন কুইক্‌সট অভিনব একটা কিছুর সন্ধানে এখানে আসিয়াছে। দুইপায়ে তার মেসোপটেমিয়া ফেরৎ একজোড়া পাঁচসেরি বুট ঢল ঢল করিতেছে; শততালি বিচিত্র মোজাজোড়া বুটের উপরে নামিয়া পড়িয়াছে, কাপড় মালকোঁচা করিয়া পরা; কাপড় এক পায়ের অনেক নীচে প্রায় মোজার কাছে নামিয়াছে অন্য পায়ে উঠিয়াছে হাঁটুর উপরে। গায়ে যে মোটা জামাটা শোভা পাইতেছে তাহা দেখিয়া সেই পৌষমাসেও আমার গা যেন ঘামিয়া উঠিল। মাথায় বাঁকাভাবে বসানো একটা টুপি; বুকে গোজা লাল গোটা কয়েক ফুল। কাঁধের উপর বোধ হয় আকবরের আমলের অতি জীর্ণ একটা গাদা বন্দুক; মুখে এক জোড়া বিরাট গোঁফ; চোখে আওনা-আও গোছের একটা ভাব! তাহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল এ রকম ব্যক্তি বিরল—ইহার বর্ণনাটা টুকিয়া রাখিলে নভেলে লাগিবে। বন্ধু কাজের লোক সে জিজ্ঞাসা করিল মশায়ের নাম? আগন্তুকের গোঁফের তলে একটি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিরাত বেশী মহাদেবকে চিনিতে না পারিয়া অর্জ্জুন যখন তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তখন তিনি নিশ্চয়ই এই রকম হাসি হাসিয়াছিলেন। হায় কলিকাল! মহাপুরুষের চেহারা দেখিয়া আজকাল আর চেনা যায় না। তাহাকেও অতি সাধারণ লোকের মত বাপ পিতামহের উল্লেখ করিয়া সনাতন প্রথায় পরিচয় দিতে হয়। ইহার পর যদি হতভাগ্য ব্যক্তি মহাপুরুষের মাহাত্ম্য সম্যক্ উপলব্ধি না করিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করে মশায়ের "ব্যাতন"---তবেই চক্ষুস্থির। কারণ সব চেয়ে ওই প্রশ্নটাই মহাপুরুষের অধিক ব্যথিত করে। তাঁহারা সাধারণ উমেদারের মত সাহেবের আপিসে কাজ খুজিয়া বেড়ান না। তাঁহাদের কোন প্রশংসাপত্র নাই, ছোট বড় ডিগ্রি নাই, মুখজোর মুরুব্বি নাই কিন্তু স্বয়ং প্রতিভা

লক্ষ্মী যে তাঁদের ললাটে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন প্রতিভার রাজটীকা! কিন্তু অবিশ্বাসী কলিকাল হাতে হাতে প্রমাণ চায় কপালের অদৃশ্য রাজটীকার প্রতি তাহার লক্ষ্য নাই। এই ভাবে আমরা কত মহাপুরুষেরই না সঙ্গচ্যুত হইতেছি। সত্যযুগের মত আজকালও মুনিঋষি তেমনি সুলভ কেবল তাঁহাদের চিনিবার কোন উপায় নাই। আধঘণ্টা কলিকাতার পথে চলিলে অন্তত ৬ জন মহাপুরুষ দেখিবার সম্ভাবনা। বাতাসে যেমন বীজাণু থম থম করিতেছে রাজপথে এবং মেলায় তেমনি মহাপুরুষ। একেবারে যে তাঁহাদের দর্শন পাইনি এমন কথা বলা চলে না। এক একদিন এক একটি লোকের চোখের অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিয়া সন্দেহ হইয়াছে এ ব্যক্তি নিশ্চয় ছদ্মবেশী বশিষ্ঠ বা ব্যাস। কিন্তু তার পরেই যখন তাহার পকেট হইতে কেশরঞ্জনের উপহার—সচিত্র গার্হস্থ্য নবন্যাস কুন্দকুমার, এক শিশি তেলের সহিত বিনামূল্যে—বাহির হইয়া পড়িয়াছে তখন ভাবিয়াছি ইহা মহাপুরুষদের লীলা। কিন্তু এই লীলাতে যাহাদের বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত কম তাহারা তাহাকে যে সব কথা বলে তাহা বন্দনা বা স্তবস্তুতির ভাষা নয়। যাহা হৌক্ আমাদের মহাপুরুষটী পকেট হইতে একখানা কার্ড বাহির করিয়া বন্ধুর হাতে দিলেন। কার্ডের দুইদিকে দুইখানা তলোয়ার ও বন্দুকের ছবি মাঝে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা :—

Vikramjit of Natavarpur
Doctor of Discovery & Adventure

কার্ড পড়িয়া সবই বুঝিলাম কেবল বাকী রহিল জানিতে বিক্রমজিৎ লোকটী কে? এবং নটবরপুরই বা পৃথিবীর কোন্ মহাদেশের অন্তর্গত কোন্ মহানগর! উপাধিটী বুঝিলাম Home university হইতে প্রদত্ত অতএব তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন প্রশ্ন থাকিতে পারে না। এতদিনে দ্বিতীয় ভাগের অমূল্য উপদেশটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলাম

"পড়ার সময় পড়া কর দিয়া মন,
জীবনে তাহলে দুঃখ পাবে না কখন"।

কিন্তু জিওগ্রাফি ক্লাশের সময়টা আমরা বিশেষভাবে ডাংগুলি খেলিবার জন্যই রাখিয়াছিলাম এবং ধরা পড়িয়া মাঝে মাঝে পণ্ডিত মশাই পিঠের উপরে ডাংগুলি খেলিয়াছেন। তাই আজ এত বড় মহানগরের নামটা (মহানগর নিশ্চয়ই নইলে মহাপুরুষের বাসা কেন হইবে) না জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইল তাহা কোথায়?

এতক্ষণে আগন্তুকটী কথা বলিলেন যেন শান বাঁধানো মেজের উপরে কেহ খাটের খুরা টানিয়া লইল। কুতুব মিনারের মত মোটা স্বর ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়া পাঁচ মিনিট ধরিয়া চারিদিকে গম্‌গম্ করিতে লাগিল। বিক্রমজিৎ বলিলেন—"নটবরপুর কোথায় তা জানোনা? এর পর জিজ্ঞাসা করবে কোথায় পলাশডাঙার ভীষণ অরণ্যানী?" হায় মা সরস্বতী এবং তথা গদাধর পণ্ডিত তোমরা দুইজনে মিলিয়া এমনি ছাত্র তৈয়ার করিয়াছ যে তাহারা জানেনা কোথায় নটবরপুর এবং কোথায় পলাশডাঙার ভীষণ অরণ্যানী।

শশাঙ্ক চালাক ছেলে সে ব্যাপারটা সম্যক্ বুঝিয়া লইয়া বলিল পলাশডাঙার বন সে যে ইতিহাসে বিখ্যাত। যেমন নিবিড় অরণ্য তেমনি দুর্দ্দান্ত সব শ্বাপদ। বিক্রমজিৎ একটী বাক্যে সব পরিষ্কার করিয়া বলিলেন আমারই শীকার কাহিনী সেই বনকে বিখ্যাত করেছে। শশাঙ্ক বলিল সে কাহিনী আমাদের পড়তে বাকী নেই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার এখানে আগমনের কারণ কি জানতে পারি? বিক্রমজিৎ একখানি বেতের চেয়ারে বসিয়াছিলেন এ পাশ ও-পাশ ফিরিয়া তাহাকে আর্ত্তনাদ করাইয়া বলিলেন তোমাদের সাহায্য করতে। এই বলিয়া পরম পরিতোষ সহকারে হেলান দিয়া বসিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কাঁধ হইতে বন্দুকটা নামান নাই। শশাঙ্ক বলিল আপনার অসুবিধা হলে বন্দুকটা নামিয়ে রাখুন। "অসুবিধা" এই কথা বলিয়াই বিক্রমজিৎ চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া বন্দুক শিকার করিবার কায়দায় ধরিলেন। বন্ধু স্মরণ করাইয়া দিল ইহা পলাশডাঙার বন নয় সুতরাং কোন দুর্দ্দান্ত সিংহ বা ভালুকের প্রবেশের আশু সম্ভাবনা নাই। বিক্রমজিৎ

বলিতে লাগিলেন অসুবিধা! বন্দুক ছাড়া আমি কখনো জীবনে হইনি। বন্দুক ছেড়ে পৃথিবীকে বিশ্বাস করতে নাই। চারিদিকে শত্রু সুযোগ পেলেই তারা আক্রমণ করবে। বিশেষত আমি যে Doctor of Discovery & Adventure। কথা শেষ করিয়া মোরগ যেমন সগর্ব্বে ঘাড় দুলাইয়া এদিক্ ওদিক্ তাকায় তেমনিভাবে তিনি গোঁফে তা দিতে দিতে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে লাগিলেন আর মাঝে মাঝে অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন Doctor of Discovery & Adventure.

অনেক কষ্টে মহাপুরুষের আসিবার কারণ যাহা জানিলাম তাহা এই।

আমরা পনেরো দিনের জন্ত যে যাত্রায় বাহির হইব স্থির করিয়াছিলাম তাহার উদ্দেশ্য ছিল একটা আবিষ্কার কার্য্য। আমাদের গ্রামের পাশের পাহাড়ী নদীটার নাম হিংলো। নদীটা বোধ হয় সাঁওতাল পরগণার কোনো পাহাড় হইতে উঠিতেছে। বাংলার গেজেটিয়ারে তাহার নক্সা বেশ আঁকা আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে আবিষ্কারের বাকী বিশেষ কিছু নাই। আমরা ঠিক্ করিয়াছিলাম এই নদীটা অনুসরণ করিয়া ইহার উৎপত্তি স্থানে যাইব। এবং জাঁক করিয়া আমাদের অভিযানের নাম দিয়াছিলাম Hingla Discovery Expedition। শশাঙ্ক স্থানীয় খবরের কাগজে উক্ত নামে একটি প্রবন্ধও পাঠাইয়াছিল। অতএব তাহা Doctor of Discovery মহাশয়ের চক্ষু এড়ায় নাই! তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন আমাদের সাহায্য করিতে এবং সহযাত্রী হইতে—কারণ তাঁহার নাকি কাজই এই। বন্ধুবর খুসী হইয়া উঠিল যে এমন একটা লোক সঙ্গে থাকা ভাল—কারণ সময়টা গোলমালে কাটিয়া যাইবে। আমরা আমাদের অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাহাকে বলিলাম—যাত্রার আয়োজনের ভার আপনার উপর—আমরা অত্যন্ত অজ্ঞ! তিনি আমাদের অনুগৃহীত করিয়া বলিলেন—সেইজন্তই তো এসেছি—এসব অতি জটিল কাজ। তোমরা পারবে কেন? কাল তোমরা আমার বাড়ী যাবে—সেখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করব। উৎসাহে তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না উঠিয়া জুতার ভীষণ শব্দ করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—See me to-morrow at Natavarpur, বিক্রমজিৎ চলিয়া গেলে শশাঙ্ক বলিল মন্দ মজা হবে না। কাল চলো একবার নটবরপুরে গিয়ে বাকী তামাসা খানা দেখে আসিগে। স্থির হইল কাল ভোরে নটবরপুরে যাত্রা করিব।

পুস্তক পরিচয়

বিদ্রোহ (নাটক) শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল, প্রণীত। দত্ত-গোবিন এণ্ড সন্স মুঙ্গের কর্তৃক প্রকাশিত। ৬৬ পৃঃ মূল্য বারো আনা।

পুস্তকখানি পড়িয়া মনে হইল ইহা একখানি রূপক নাট্য। নাট্য লিখিবার ছলে লেখক কতকগুলি সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। লিপি-কৌশলের উপর যে দক্ষতা থাকিলে সমস্যাগুলি ঢাকা পড়িয়া ভাবে ও রসে মিলিয়া অবিচ্ছিন্ন একটি সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়া ওঠে—পুস্তকখানিতে তাহার অভাব আছে দেখিলাম। মাঝে মাঝে সমস্যার কঙ্কালময় মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে—অনন্যমনস্ক পাঠকের মনোযোগে হঠাৎ হুঁচট লাগে। তবু ভাল যে লেখক চিরাচরিত প্রথামত পঞ্চমাঙ্কে বীররসের অবতারণা না করিয়া চতুর্থাঙ্কে সমস্যামূলক সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় বাংলাদেশে আজকাল যে সব সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে বাংলা সাহিত্য তাহার সমাধান করিবার জন্ত চিন্তা করিতেছে। চিন্তাশীল পাঠকের ইহা ভালো লাগিবে। অধিকাংশ পাঠক যাহা দেখিয়া বই ক্রয় করেন তাহা ইহাতে আছে অর্থাৎ ছাপা, কাগজ, মলাট বেশ ঝক্ঝকে এবং ঝর্ঝরে।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ } ফাল্গুন, সন ১৩৩১ সাল। { ২য় সংখ্যা

তীর্থযাত্রা

ওঁ

ত্রিবেণী সঙ্গম, তীরথ পরম,
ত্রিদিব বলা যায় বলিলে।
চল ভাই দ্রুত, স্নান হবে পূত
মন্দাকিনীর সলিলে ॥

প্রথম বেণী।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

টীকা

আর্ত্ত চায় দুঃখ মোচন, জিজ্ঞাসু চায় সংশয়মোচন, অর্থার্থী চায় দৈন্য মোচন, জ্ঞানী চায় সেই পরম ধন—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে ॥

দ্বিতীয় বেণী।

Seek ye first the kingdom of God and all things shall be added unto you.

ইতি ঈসা মহাপ্রভু।

টীকা

Kingdom of God কিরূপ স্থান? ইহার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন অভিধানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লেখে। এ দেশের পূর্ব্বতন ঋষিদিগের হিরণ্ময় অমর কোষে উহার অর্থ স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে এইরূপ যে, উহা সেই পরম স্থান—তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং—যাহা সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং—মহোচ্চ স্বর্গে যেন তাঁহাদের চক্ষু আতত রহিয়াছে অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে—অনির্বচনীয় আনন্দে ভোর রহিয়াছে।

তৃতীয় বেণী।

দেহি জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান, দেহি প্রীতি—শুদ্ধ প্রীতি, তুমি মঙ্গল আলয়। ধৈর্য্য দেহি, বীর্য্য দেহি, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহি, বিবেক বৈরাগ্য দেহি, দেহি ও পদ আশ্রয় ॥

ইতি দিব্য ধামবাসী পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব।

টীকা

সাধারণ সুলভ জ্ঞানে ভগবৎ প্রেম মোহপাশ হইতে ভক্তের আশানুরূপ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। দিব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে বিশুদ্ধ নিষ্কাম ভগবৎ প্রীতি মনোমধ্যে আপনা হইতেই উদ্‌বেলিত হইয়া ওঠে—"যাতি মোহান্ধ-তমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ভাতি তত্ত্বং বিমলং।

তাহা যখন হয়, তখন কৃতার্থংমন্য ভক্তের মনোমধ্যে—একমাত্র ভগবান্ সকল মঙ্গলের আকর এইরূপ বিশ্বাস পরাকাষ্ঠা বল উপার্জ্জন করে। এই অমূল্য বিশ্বাসটি সংসারের বাধা বিঘ্নে আক্রান্ত হইয়া যাহাতে কোনো-কালে বিচলিত না হয়, তাই ভক্ত সাধক পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করেন যে, ধৈর্য্য দেহি, বীর্য্য দেহি, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহি, বিবেক বৈরাগ্য দেহি। দিব্য জ্ঞান নারিকেলের শাঁসের সহিত উপমেয়, শুদ্ধ প্রীতি নারিকেলের জলের সহিত উপমেয়, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে অটল বিশ্বাস নারিকেলের রসমাধুর্য্য এবং উপকারিতার প্রতি ধ্রুব বিশ্বাসের সহিত উপমেয়, এবং ধৈর্য্য বীর্য্য, তিতিক্ষা সন্তোষ, বিবেক বৈরাগ্য নারিকেলের তিনপুরু কঠিন আবরণের সহিত উপমেয়—এই সকল দুর্ভেদ্য আবরণ ভিতরের সামগ্রীকে বাহিরের সমূহ-উপদ্রব হইতে বাঁচানো কার্য্যে ফলদর্শী। ভক্ত সাধকের শেষ প্রার্থনা এই যে, দেহি ও পদ আশ্রয়, কেননা তিনি দিব্যজ্ঞানে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পা'ন যে, ভগবানের চরণের আশ্রয় পাইলে আর কোনো কিছু পাইবার অবশিষ্ট থাকে না।

ইহারই নাম ত্রিবেণী সঙ্গম।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিঠি

(আশ্রমের জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের নিকট লিখিত)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের জীবনে একটি শুষ্কতা ও প্রতিকূলতার আক্রমণ চল্‌চে—আমি নিশ্চয় মনে জানি সেটা কেটে যাবে। তোমাদের জীবনের এই বেদনায় আমি মনের মধ্যে যথেষ্ট বেদনা অনুভব করচি কিন্তু মঙ্গলের পরে আমি এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখেছি যে তোমাদের চিত্তক্ষেত্রের এই অনাবৃষ্টির যুগ তোমাদের জীবনে কোনো স্থায়ী অনিষ্ট করতে পারবে না। এতে তোমাদের যে একটা কঠোরতা দান করবে তাতে তোমাদের উপকার করবে। বর্ষার পূর্ব্বে গ্রীষ্মের উত্তাপে একবার মাটি যে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় তাতে চাষের একটা মস্ত উপকার এই হয় যে, মাটি থেকে সমস্ত অনাবশ্যক আগাছা শুকিয়ে মরে যায়। সেটা ভাবী ফসলের পক্ষে দরকার। আমাদের জীবনে অনেক জিনিষ জঙ্গলের মত আপনি বেড়ে ওঠে; খুব কঠিন নীরসতার আক্রমণে সেগুলো সাফ্ হয়ে যায়; তারপরে আবার বর্ষণের ঋতু আসে তখন সমস্ত বাহুল্য বর্জ্জন করে যা আমাদের চির জীবনের ফসল কেবলমাত্র তারি চাষ করবার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই জন্যে মঙ্গলের সাধনায় কঠোর প্রতিকূলতার প্রয়োজন আছে, সমস্তই যেখানে অনুকূল সেখানে অনেক সময় জড়তা উপস্থিত হয়, সেই জড়তায় ভিক্ষার সৃষ্টি করে ও তখন অনেক ধার করা জিনিষকে নিজের বলে কল্পনা করি, যা আমার জীবনের পক্ষে চিরন্তন সত্য নয় তাও আমার চিরন্তনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকে। তাদের ভেদ বুঝতে পারিনে; যা আমার ভাল লাগে এবং যা আমার সত্য এই দুয়ের মিশল করে আমরা অনেক জঞ্জাল তৈরি করে তুলি। এই জন্যে সাধনার পথে বারম্বার আঘাত পাওয়াই চাই—যেদিকে মন স্বভাবতই যেতে চায়, ভাল হলেও সেদিককার দ্বার মাঝে

মাঝে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মঙ্গল আছে। এই সমস্ত কঠোর আঘাত এবং গভীর বেদনার মূল্য দিয়ে আমরা যা পাই তাতেই আমাদের সত্য অধিকার এবং সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। যত দামী জিনিষের দিকে মন দেব ততই বেশি করে দাম দিতে হবে—এতে কুণ্ঠিত হলে চল্‌বে না। সহ্য কর—বিনা জলে বিনা বিশ্রামে মরুভূমি পার হতে থাক একদিন তোমাদের এই অভিসার নিশ্চয়ই সার্থক হবে। যাঁর জন্যে এই কষ্ট সহ্য করচ তাঁর কথা মনে রেখেই এই কষ্টের মধ্যে বল, গৌরব এবং আনন্দ লাভ কর। তাঁকে পাওয়া যদি সহজ না হয় তাহলেই তাঁকে পাওয়া একদিন অত্যন্ত নিবিড় হবে। জীবনে যদি কঠোরতা ভোগ কর তাহলেই জীবনের মূল্য জন্মাবে এবং সেই জীবন তাঁকে উপহার দেবার উপযুক্ত হবে। যে কেউ সত্যসাধনা অবলম্বন করেচেন সকলকেই বারম্বার দুঃখ বিঘ্ন স্বীকার করতে হয়েছে। যিশুকে জীবনের আরম্ভ কালে মরুভূমিতেই সাধনা করতে হয়েছিল তোমরাও তোমাদের জীবনের আরম্ভে সেই মরুভূমির সাধনার মধ্যে দিয়ে যাচ্চ এই কথা মনে রেখে অবিচলিত ভরসার সঙ্গে অগ্রসর হতে থাক, অবসাদের কাছে কোনোমতেই পরাভব স্বীকার কোরো না। বীর্য্যের দ্বারাই তোমরা শ্রেয়কে জয় করে নাও এই আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।

ইতি ২২শে ভাদ্র, ১৩১৭।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিক্রমশিলার পথে

২৫শে ডিসেম্বর, বেলা আটটা :—

এখন আমরা নৌকা করে যাচ্ছি সেই পুরাণ বিক্রমশিলায় যেখানে প্রায় হাজার বছর আগে বৌদ্ধরা একটি সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিল। নৌকা করে আমাদের ৮ মাইল যেতে হবে। সকাল বেলা শীতকালের রোদ এসে নদীর জলে পড়েছে, আমাদের নৌকাখানি বেশ দুলতে দুলতে চলেছে। গঙ্গা এখানে খুব চওড়া, গঙ্গার মাঝখান দিয়ে অনেক পাহাড় উঠেছে ছোট ছোট, সেই রকম একটি ছোট পাহাড়ে দেখি একটি সাধু কুটীর বেঁধে রয়েছেন, তিনি যেন সংসারের কলরব থেকে পালিয়ে এসেছেন—এই নির্জ্জনে। কিছুদূর নৌকা এলে দেখি, দুপাশে দুটো পাহাড় উঠেছে, তার মাঝখান দিয়ে ছোট খালের মত, তারি মাঝ দিয়ে আমাদের নৌকা গেল। এই সমস্ত রাস্তাটা নৌকা করে জলপথে খুবই ভাল লাগ্‌ছিল, কেন না এতক্ষণ রেলে আসায় আমাদের কি রকম একটা ক্লান্তি এসেছিল, এখন নদীর এই মুক্ত বাতাসে এসে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দুপারের দৃশ্য দেখতে দেখতে আর গল্প করতে করতে আমরা অনেকটা দূর এসে পড়লাম। তখন হঠাৎ মাঝি বলে উঠ্‌ল—"ঐ যে বাবু বিক্রমশিলার পাহাড় দেখা যাচ্ছে।" আমরা অমনি সামনের পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখলাম। এখান থেকে দৃশ্যটী ভারি সুন্দর, সামনে গঙ্গার জল অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে, আর পাহাড়টী যেন জলের দিকে এগিয়ে এসেছে, তাতে মনে হয় গঙ্গার জল যেন পাহাড়টীকে ঘিরে ধরেছে। দূর থেকে পাহাড়টীও বড় সুন্দর দেখায়, নৌকা থেকে আমরা দুএকটি নতুন মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম। মনে হল এই স্থানটীর নির্ব্বাচন খুব সুন্দর হয়েছিল, এটী বাস্তবিক সাধনার ও বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত স্থান। এটী এত শান্ত ও নির্জ্জন যে বিদ্যাশিক্ষার পথে কোনই বাধা এখানে সহজে আস্‌তে পারে না। অনেককাল আগে নানান্ দেশ থেকে বৌদ্ধরা যেমন এই তীর্থস্থান দেখ্‌তে আস্‌ত, আমাদের মনে হল আমরাও এই বাঙালী, মারাঠী, গুজরাটী ও মাদ্রাজী ছেলেরা সবাই মিলে চলেছি এই পবিত্র তীর্থস্থান দেখ্‌তে। দুঃখের বিষয় তখন ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় জীবন্ত, তখন তার প্রাণ ছিল, এখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণহীন বিরাট দেহটী পড়ে আছে, তার প্রাণ, তার জীবন কোন্ জাদুমন্ত্রে লুপ্ত হয়ে গেছে।

ফেরার পথে, সাড়ে ৫টা :—

এতক্ষণ ধরে আমরা সমস্ত পাহাড়টার উপর ছুটোছুটী করলুম। করে সত্যি করে অনুভব করলুম—কি বিরাট সত্যের উপর এ প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হয়েছিল। ঠিক পাহাড়-টীর মাথার উপর বিশ্ববিদ্যালয়টী স্থাপিত হয়েছিল; স্থানটী বড়ই সুন্দর। এর তিনদিকে গঙ্গার জল একে আঁকড়ে ধরছে, আর একদিকে ধানের ক্ষেত, আর তার সবুজ শস্য সম্ভার। যেখানে পুরাণ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, আজ তার স্থানে কতকগুলো গাছ আর আগাছা জন্মে নিজেদের গৌরব জাহির করছে। এইটাই যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার কোন সন্দেহ নেই, এর নানা জায়গায় যে সব বৌদ্ধ মূর্ত্তি আছে উত্তর পশ্চিম দিকে একটি বুদ্ধেরমূর্ত্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ও আর একটি বুদ্ধ এখনও রয়েছে, তা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া তারানাথের কথা আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না। এর উত্তর দিকে যে ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, সেইটাই যে সত্যিকার তোরণ ছিল তার কোন সন্দেহ নেই। পাহাড়ের যেখানে এই দ্বার রয়েছে, সেটী প্রায় গঙ্গার তীর থেকে ৩০০ ফুট উঁচু হবে। সেখানে উত্তর দিকে চমৎকার স্থাপত্যের চিহ্ন রয়েছে। একটীতে মনে হয় রাজা দাঁড়িয়ে আছেন, পিছনে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছেন আর একটি পুরুষ একটী মেয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আর একটীতে মেয়েরা মন্থন করছে ও গরু সব চরছে। সেখানে যে স্থাপত্য রয়েছে তার জোড়া অনেক জায়গায় পাওয়া ভার। এগুলি এখনও তাদের পুরাতন গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেছে। এই যে ছোট পাহাড় তার উপরে ছিল সেই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে এখনও অনেক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, সেগুলো হয়ত পরবর্ত্তী যুগের চিহ্ন। এই মনোরম স্থানে বসে শ্রীজ্ঞানদীপঙ্কর বোধ হয় অধ্যাপনা করতেন বা উপদেশ দিতেন। সেখানে বসে কত ভিক্ষু হয়ত সাধন পথে অগ্রসর হতেন। বাস্তবিক এটী শিক্ষায় ও সাধনায় প্রকৃষ্ট স্থান, এখানকার দৃশ্য, শান্ত ও উদারভাব মনকে স্বতঃই সাধন পথে অগ্রসর করায়।

আমরা যেমন নদীতে নৌকা বেয়ে ফিরে যাচ্ছি, তেমনি হয়ত কত ভিক্ষু কত সন্ন্যাসী গেছে। এখন কাল সেই গৌরব সব নষ্ট করে ফেলেছে, তবু তার বিরাটস্মৃতি যেন এখনও জড়ান রয়েছে এর পাথরের আর গাছের চারি ধারে। *

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

ছবির দরদ

মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের কাছে এক কাবুলী বালক বসে আছে, বয়স ১৫।১৬ বছর হবে। সুন্দর, উজ্জ্বল, সরলতা ব্যঞ্জক সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। শ্মশ্রু গুম্ফের রেখা এখনও দেখা দেয়নি এই বালকই বড় হলে দুর্দ্ধর্ষ কাবুলিওয়ালায় পরিণত হবে। নামে সোমাল খাঁ। একে দেখে খুবই ভাল লাগল। হিন্দু মন্দিরের পার্শ্বে মুসলমান বালক বসে আছে, ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা তীর্থ যাত্রীরা তারই সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করছে, কারও কিছু আপত্তি হচ্ছে না। আমরা অনেক সময় বিভেদকেই বেশী করে দেখি, ঐক্যকে দেখি না। কাগজ তুলি নিয়ে বালকটির স্কেচ্ করতে লেগে গেলাম। স্কেচ্ হয়ে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কিছু হবে না ত? এ ছবি দিয়ে কি করবে? বল্লাম এমনি করছি। এমনি? সত্যি বলছ কোনো ভয় নেই? হিংস্র কাবুলী ওর ভিতর এখনো জাগেনি; সরল বালক খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পথে আমাদের আর একবার ধরেছিল—সত্যি বলছ আমার কোন ক্ষতি করবে না? হেসে তার কল্পিত ভয় উড়িয়ে দিলাম।

---

* বিক্রমশিলা এখনকার কহল-গাঁওএর কাছে। এটী লুপলাইনের একটি ষ্টেশন। বিক্রমশিলার বর্ত্তমান নাম পাথরঘাটা বা বটেশ্বর।

মন্দিরের কিছু দূরে এক বড় দীঘি, ঐ দীঘিতে তীর্থ যাত্রীরা স্নান করে। দীঘির পারে বড় একটা বটগাছ, গাছের নীচে বাঁধান ঘাটালার চত্বরে সন্ন্যাসীরা ছাই মেখে সাম্‌নে আগুন জ্বেলে বসে আছে। এক বাঙালী এক কাবুলীওয়ালা থেকে সুর্ম্মা কিনছিল। পরে পরিচয় পেলাম সে সোয়াল খাঁর বাবা। স্কেচ্ আরম্ভ করলাম। এক বাচ্চা পাণ্ডা আমার সাম্‌নে বসে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখছিল। তাকে বল্লাম চাইনিজ ঘষে দিতে। কাবুলিওয়ালা উঠে এসে বল্ল তার ছবি এঁকে দিতে হবে। জিজ্ঞেস করল কত দাম লাগবে। তার কত দেওয়ার ইচ্ছা জানতে চাইলাম। বল্ল যদি ভাল ছবি হয়, ২৲ টাকা দিতে পারবে। তথাস্তু বলে আঁক্‌তে লাগ্‌লাম। কাবুলিওয়ালা ভাল করে চোখে সুর্ম্মা দিয়ে, ঝুলির ভিতর থেকে একটা ছোট্ট আয়না বের করে বার বার চেহারা দেখতে লাগল। ছবি হয়ে গেলে দেখালাম। পছন্দ করল না, বল্ল আচ্ছা নেই, রং নাই।

একটা কথা উল্লেখ করার দরকার। ছবি আঁকার নামে, রাস্তায় রীতিমত ভিড় জমে গিয়েছিল। সকলেরই তাক লেগে গিয়েছিল, কি করে ছবি তোলার কল ছাড়া, শুধু হাতে ছবি আঁকে। রাস্তায় চল মুস্কিল হয়েছিল, সকলেই ছবি দেখতে চায়, আর বলে, তাদের চেহারা এঁকে দিতে হবে।

লোকেরা জনতা দেখে ভাবছিলাম, এরা ত লেখা পড়া জানে না। হাতে আঁকা একটা সাধারণ স্কেচের জন্য কত আগ্রহ। আর আমাদের শিক্ষিত লোকেরা? তারা এ সব পছন্দ করবে না, তারা ভিড় করবে বাজে Salon picture দেখার জন্য।

সাধারণের মধ্যে আর্টের এই কদর দেখি, ৮ম শতাব্দীতে চীনের টেং রাজত্বের সময়। সম্রাট সিং হুয়াং নেই, আর সেই লো ইয়াংও নেই। চীনের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট উতাওৎসুর বাড়ীর ভিতর দিয়ে সহরের সদর রাস্তা চলে গিয়েছিল। রাস্তার মুটে, মজুর, সৈন্য, পণ্ডিত, মূর্খ অসংখ্য লোক ভিড় করত তার ছবি আঁকা দেখ্‌তে।

অতীতের গর্ভে তার ছবি সব বিলীন। ইচ্ছে হয়, কালের যবনিকা ফাঁক করে, লো ইয়াং এর নাগরিকদের দলে মিশে উতাওৎসুর কাজ চুপি চুপি দেখেনি, দেখি কি করে তুলির একটানে, দেবতার আলোক মণ্ডল এঁকে ফেলচে। কিন্তু হায়! উতাওতসু তার নিজের হাতে আঁকা পর্ব্বতের গহ্বর মুখে প্রবেশ করে, কোন এক দেব-যোনির সন্ধানে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেছে, দুনিয়ায় সে রহস্য লোকের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। সে শুধু অদৃশ্য হয়নি—নিজের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর গাত্র থেকে নিজের ছবিকেও লোপ করে দিয়েছে। নিস্পন্দ নির্ব্বাক সম্রাট সিং হুয়াংকে শিল্পী অবসরও দেয়নি জিজ্ঞেস করতে, সে কোথায় চলে গেল! পণ্ডিতেরা পুরাতত্ত্ববাদীরা তাদের দূরবীক্ষণে হয়ত তার সন্ধান পাবে না। কিন্তু সে যুগে যুগে শিল্পীদের অন্তরে চিরসঞ্জীবিত।

শ্রীমনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত।

ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ

(আচার্য্য ষ্টেন কোনোর দ্বিতীয় বক্তৃতা, ২৯।১১।২৪)

(শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক অনুলিখিত)

ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আমি বেশী লক্ষ্য করব তার মধ্যে আর্য্য-প্রভাব কতটা আছে। কারণ এই ভারতীয় ধর্ম্ম শুধু ভারতেই বর্দ্ধিত হয়নি, ভারতের বাইরেও তার উৎপত্তির ইতিবৃত্ত রয়েছে। আর্য্যরা যখন ভারতে এলেন তখন তাঁরা ইরানী ও ইন্দো-ইউরোপীয় আচার ব্যবহার সঙ্গে করে আনেন। ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ জান্‌তে হলে আমাদের সেই-ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের ইতি-

কথাও জানতে হবে। কিন্তু সে সময় আর্য্যধর্ম্ম ঠিক কি ছিল তা এখন বলা শক্ত। Maxmuller ঋক্‌বেদের সাহায্যে সেই ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের ধর্ম্ম জানবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার সাহায্যে একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেন। যেমন সংস্কৃতদেব, Latin Deos দিব্‌ ধাতু থেকে হয়েছে, অর্থাৎ দেবতারা আকাশে প্রকাশ পান। আবার, সংস্কৃত উশস্= Greek, Eros=Latin, Aurora,, অথবা সূর্য্য= Heleos. এ ছাড়া ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের দেবতাদের সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিতও ছিল। আমরা যেন মনে না করি যে কোন প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হওয়া দোষের. বরং সেটা খুব গৌরবের বলে আমি মনে করি। দেবতাদের সম্বন্ধে গল্পে গ্রীসে হার্‌কিউলিস, ভারতে ইন্দ্র বা রোমে জুপিটারকে খুব উচু স্থান দেওয়া হয়েছে। ইন্দো ইউরোপীয় যুগে একটী প্রধান দেবতার কথা পাই, যেমন, দৌষ্পিতা= Dauspeter=Sky Father=Jupiter. দৌস্ বা এখানে দেব বলা হয়েছে, তিনি 'অসুর' অর্থাৎ আকাশকে আশ্চর্য্য শক্তি ধারণ করে। অন্য সব দেবতা যেমন মারুৎ, সূর্য্য সব তাঁর পুত্র। আকাশকে যেমন পিতৃভাবে দেখা হয়েছে, পৃথিবীকে তেমনি মাতৃভাবে দেখা হয়েছে। Tacitus এর মতে জার্ম্মাণরা পৃথিবীকে দেবতা হিসাবে পূজা করত, সেই দেবতাকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে গিয়ে জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হত। এতে আমাদের মনে কালী বা দুর্গা পূজার কথা উদয় হয়। এখানে কিন্তু আকাশ বা পৃথিবী দেবতাকে আমরা মানুষের রূপে পাচ্ছি না, এখানে দেবতা এক একটি শক্তির বিকাশ। এখানে আমরা পাচ্ছি শক্তিতে বিশ্বাস, কোন প্রাকৃতিক জিনিষে নয়।

ভারতীয় ধর্ম্মের পুরাণ যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে আমাদের ঋক্ বেদের সাহায্য নিতে হয়। ঋক্ বেদের বয়স আমরা খৃঃ পূঃ ৩০০০ বছরে ফেলতে পারি। সে সময়কার ইরানী শাস্ত্র বড় বেশী পাই না। তখন দেব ও অসুর ছাড়া অন্য অন্য দেবতাদেরও পাওয়া যায়। যেমন—বেদে মিত্রবরুণ অবেস্তায় মিথ্র ও অসুর মজদা (অহুরমজদা)। আর্য্যদের সমাজে সত্যবাদিতা ও শুদ্ধভাবের স্থান খুব উচ্চে। Liuders ১৯১৭ সালে দেখিয়েছেন যে আর্য্যদের মধ্যে সর্ত্তভঙ্গ সম্বন্ধে অনেক বাঁধা নিয়ম ছিল ও প্রত্যেক অঙ্গীকারের (agreement) সঙ্গে একটা পবিত্র ভাব ছিল। সেইজন্য মিথ্র বল্‌তে আমরা কেবল অসুরকে বুঝব না কিন্তু একটি অঙ্গীকার (contract) ও বুঝব। আবার মিত্র বল্‌তেও সেই কথা বুঝব। ঋক্ বেদে দেখি যে তিনি দেখেন যাতে লোকেরা অঙ্গীকার পালন করে। আর্য্যযুগে তাঁরা ঠিক প্রতাপশালী রাজার মত হয়েছেন। তাঁরা রাজার মত সমস্ত রক্ষা করেন। সমস্ত খবর পাবার জন্যে তাঁদেরও চর আছে। ভারতীয় প্রবাদ আছে যে মানুষে যা খায়, দেবতাও তাই খান। এখানে দেবতাতে মনুষ্যত্বের আরোপ করা হচ্ছে, দেবতাকে মানুষের আকৃতিতে গড়া হচ্ছে। এভাবটী একেবারে ভারতীয়, মিত্রভাব এর বিরোধী।

আর্য্যধর্ম্মের ক্রমবিকাশ আলোচনা করলে মনে হয় বুঝি এটা খুব আদিম যুগের ধর্ম্মের মত। আদিম যুগে আর্য্যরা প্রাকৃতিক শক্তি সব দেখেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলোকে তাঁরা শুধু ভাব (idea) রূপে বা abstract ভাবে দেখেননি, তাঁরা ভেবেছিলেন যে এরই পিছনে একটা অনন্ত শক্তি রয়েছে, দেবতারা সেই শক্তিরই বিকাশ। তাই তাঁরা প্রাকৃতিক ক্ষমতাতে বিশ্বাস করতেন না, তার পিছনে যে অনন্ত শক্তি রয়েছে তাতেই বিশ্বাস করতেন। এই ক্রমবিকাশের মধ্যেই আমরা উপনিষদের মহৎ চিন্তার বীজ দেখতে পাই। আর্য্যধর্ম্ম যদিও সুরু হয়েছে আদিম (primitive) ভাব নিয়ে, কিন্তু এ যুগে খুব উচ্চ ক্রমবিকাশের স্তরে এসে পৌচেছে।

ভাবীসভ্যতায় আফ্রিকার প্রতীক্ষা

ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণাশ্রম ভাগকে একহিসবে চরম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কারণ মনস্তত্ত্ব হিসাবে—এই চারি প্রকার জাতিই জগতে আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র।

জগত ভাগ্য-বিধাতা এই চারি জাতির ভিতর দিয়া মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন—ইহারাই ভাগী হইবে ভবিষ্যতের মহামানব সভ্যতার।

এশিয়া হইতেছে ব্রাহ্মণ, সে চিরদিন ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিতেছে। বুদ্ধ তাহার, খৃষ্ট তাহার, মহম্মদ তাহার। সে যুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু কেমন যেন উদাসীনভাবে; রাজ্য বিস্তার করিয়াছে বটে—কিন্তু জানিয়া শুনিয়াই যে তাহা চিরদিন থাকিবে না।

ইউরোপ হইতেছে ক্ষত্রিয় সে যেমন একসময়ে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিয়াছে তেমনি ক্ষত করিয়া প্রাণও লইয়াছে। সে যুদ্ধ করিয়াছে, রাজ্য বিস্তার করিয়াছে—শত্রু জয় করিয়াছে। তাহার ইতিহাস বীরত্বের ইতিহাস! খৃষ্টের অনুরাগের ধর্ম্ম সে রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। এই হননেচ্ছা তাহার রক্তের মধ্যে।

আমেরিকাকে বলি বৈশ্য। তাহার বীরত্বের ইতিহাস নাই, ধর্ম্মের মন্দির নাই—আছে ধনের ভাণ্ডার। সে জন্মিয়াই ব্যবসা করিতেছে। ইউরোপ ব্যবসা করিলেও বহু যুগের বীরত্বে ও ইতিহাসগৌরবে তাহা ম্লান হইয়া যায় নাই। কিন্তু আমেরিকার ধনবৈভব কালো ভবিষ্যতের উপরে এক একবার প্রলয়কালের বিদ্যুৎ রেথার মত ঝলসিয়া উঠে। আমেরিকা বণিক।

হায় শূদ্র আফ্রিকা! চিরদিন তুমি দাসত্বই করিলে!

বিশ্বের এই ভাবী সাম্রাজ্যের ভাণ্ডারে এশিয়া তাহার দেয় দিয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকা দিতেছে। কিন্তু আফ্রিকার কথা কি কেহ ভাবিয়াছে! তাহার দেয় কি কিছুই নাই? সে কি কেবল চিরদিন সভ্যদেশের জন্য ক্রীতদাস জোগাইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে? না—এই ভাবী সাম্রাজ্যের রত্ন ভাণ্ডারে আফ্রিকার দান পৌঁছিলে তবে এই বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণের মালমশলা সম্পূর্ণ হইবে। আসিবেই আফ্রিকার দান; ইহা কল্পনা নয়। আজ যাহা কল্পনা কাল তাহা সত্য।

ইতিহাস-পূর্ব্ব কাল হইতে দেখিতে পাই এসিয়া জীব ধাত্রী। আপন গোপন অঙ্কে শিশুপালন করিয়া তুলিতেছে যখনই তাহারা যৌবনের সীমায় পৌঁছিতেছে তখনই দলে দলে তাহাদিগকে ইউরোপে ভারতে পারস্যে মিশরে চালান করিয়া দিতেছে। এই জন-প্রবাহের নব নব সংঘাতে কত সভ্যতা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, গড়িয়া উঠিতেছে। এই জনস্রোতের একটি প্রবাহ একদিন চলিতে চলিতে ইউরোপের পশ্চিম সমুদ্র তীরে আসিয়া ঠেকিয়াছিল! সম্মুখে সমুদ্র অথচ তরণী নাই। তরণী তাহার গড়িল—কয়েক শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে! তার পর তাহারা পাড়ি দিল আমেরিকায়—অন্ধকার অজ্ঞানের যবনিক দেখিতে উঠিয়া গিয়া নব অরুণের বিকাশ হইল।

একদিন মধ্য এশিয়ার মাটী যেমন সরস ছিল আজ নিশ্চয় আর তেমন নাই। সেদিন যেমন উৎসাহে হাতের স্পর্শ পাইবামাত্র শস্যরাজি উৎসবেগে নীল আকাশের অভিমুখে উৎসারিত হইত—আজ নিশ্চয়ই সে উৎসাহে ভাঁটা পড়িয়াছে! জমির ফসল দিবার ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এইজন্য মানুষ নূতন নূতন দেশ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। ইহা ছাড়া ভৌগলিক পরিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে কত উর্ব্বর জমি মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে। একদিন আসিবে যখন ইউরোপের সরস জমিও তেমন রসবান আর থাকিবে না—শস্য তেমন প্রচুর উৎপন্ন হইবে না। তখন মানুষকে নূতনের সন্ধান করিতেই হইবে!

আরম্ভ হইয়াছে! মানুষ দক্ষিণ আমেরিকায় ও আফ্রি-

কায় যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এই আরম্ভ সার্থকতার আরম্ভ নয়! আজ সেখানে মানুষ যাইতেছে সোণার লোভে! খনির সাথে যোগ জড় ও ক্ষণিক। সেখানে মানুষ পরিশ্রম করিয়া থলি ভরে তার পরে অনুকূল বাতাসে পাল ফুলাইয়া স্বদেশে পাড়ি দেয়।

কিন্তু যেদিন মাটির সম্বন্ধ আরম্ভ হইবে সেই দিনই এই ভাবী সভ্যতার প্রথম সূত্রপাত হইবে। মাটির সম্বন্ধ কোমল তাহা মাতৃক্রোড়ের মত মন কাড়িয়া লয়। মানুষ ইহাতে যাহা পায় তাহা খনিজ দ্রব্যের মত নিশ্চেষ্ট ভাবে নয়। কৃষি-কার্য্যে মানুষের চেষ্টার সহিত ও জমির রসের সহিত সমবায় হয়—মানুষের মনের সহিত ও পৃথিবীর প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য রাখী বন্ধন হয়। তখন আর মানুষের সহসা দেশে ফিরিবার উপায় থাকে না। সেই মিলনের পুণ্যপ্রয়াগে সভ্যতা গড়িয়া উঠে। যত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা এই মাটির সাহায্যেই। সভ্যতা ফসলের মত মৃত্তিকার দান। তাহা যখন শিলাবৃষ্টির মত আকাশ হইতে পড়ে তখন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না কিন্তু মাথাটা বাঁচাইতে পারিলে হয়!

এখনও মানুষ লুব্ধের মত খন্তা কুড়ুল হাতে আফ্রিকার খনিতে যাইতেছে। কিন্তু দিন আসিবে যখন সে অনুসন্ধিৎসুর ন্যায় জ্ঞানের দীপটী সাথে করিয়া আফ্রিকার অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে যাইবে। সেদিন দেখিতে দেখিতে দেশব্যাপী তিমিরাবরণ একটি দুঃস্বপ্ন যবনিকার মত উঠিয়া যাইবে। সেদিনের আফ্রিকীয় সভ্যতার কি দান তাহা জানি না। কিন্তু যত ক্ষুদ্রই তাহা হউক্ না কেন সভ্যতার পরিপূর্ণতার পক্ষে তাহা একান্ত আবশ্যকীয়।

Wireless Telegraphy.

By

S. R. M. Naidu, F. R. S., M. R. A., etc.

Wireless telegraphy is a system for signalling from place to place without connecting wires. Signalling by sounds or by flashes of light both fulfil the definition, and both are very old systems for communication at a distance.

In the case of signalling by sound, some transmitting agent is caused to vibrate, the air in contact with it vibrates too, waves of sound travel off through the air at a speed of about 1100 ft per second and are detected by the ear at the receiving end.

Thus there are necessary, mechanical vibration of the transmitter, waves in the air and a detector capable of responding to such waves, which is useally the ear, but antomatic contrivances are possible.

In the case of light, a transmitting agent is caused to emit light continuously or intermittently, the ether is in consequence set into vibration, and the ether waves travel off in the required direction with a velocity of about 186000 miles per second.

These waves are detected at the receiving end either by the eye, or an antomatic contrivance may be used in this case also. At the transmitting end, if the light is continuous, signalling is carried out by either interposing

a shutter at intervals in its path or by directing the beam towards the receiver or away from it.

If the light is not continuous, then signalling is carried out by turning the light on or off in accordance with a definite code.

The system adopted for light signalling, for ordinary telegraphy and for wireless telegraphy, is known as the Morse code.

It will be noted that a distinction between sound signalling and light signalling is, that in one case the sound waves pass through ordinary matter, air or water if it is submarine signalling, whereas in light signalling ether is mentioned as being the medium by which the light waves travel.

Ether cannot be isolated, felt, weighed or detected in any direct manner, but is un doubtedly everywhere, even permeating all matter.

The properties of the ether are perplexing, inasmuch as it can convey oscillations of the enormous frequency existing in the case of light, and yet it appears to offer no frictional resistance to the motion of the heavenly bodies.

This ether is more or less linked with matter, but its properties appear to be somewhat modified when thus associated with different kinds of matter.

Electric wireless telegraphy is concerned with wave emotion of the ether, either by itself or associated with that kind of matter which forms electrical conductors.

If any elastic medium is disturbed, an oscillation is caused which travels off through the medium with a definite velocity which depends upon the properties of the oscillating substance.

Thus a disturbance will travel through air at tha rate of 1100 feet per second, through water at the rate of 4700 feet per second, and through steel at 18400 feet per second. When ether is caused to oscillate, the velocity is the enormous one of 186000 miles per second.

The number of complete oscillations per second is called the FREQUENCY, but disturbances travel through any particular medium at the same rate independently of the frequency of the oscillation. Thus, in listening to a distant music, we hear simultaneously the high and the low notes of a chord ; they all have taken the same time to reach us, yet their frequencies are different. In the case of ether waves, between certain limits these can affect the human eye and we then call them light waves.

There are ether waves which oscillate much more quickly than the light waves which affect the eye—for example, the ultra-violet rays, which do not affect the eye at all and yet act upon a photographic plate.

There are waves which oscillate much more

slowly than light waves which affect the eye—for example, the infra-red rays, which carry much heat energy but do not affect the eye ; and lastly there are much slower waves which are used for the purposes of wireless.

The fundamental statment concerning ether waves is a follows :—

The velocity of the wave equals the product of the number of oscillations per second (or frequency) and the wave length.

The usual commercial wireless set employs waves between 300 and 600 metres long, and Transatlantic stations ordinarily use waves up to about 7000 metres in length.

The wave length of an oscillation may be defined as being the distance between any point and the next where the oscillating medium is in precisely the same condition at the same time.

Thus wireless is carried out by the use of electric waves which are propagated through space with the speed of light.

The essentials are a generator of electrical oscillations, an apparatus for communicating these oscillations to the ether, at the receiving end an apparatus for picking up the ether oscillations and for passing them, when converted into oscillatiug currents in the connecting wires, through a suitable detecting apparatus.

উৎসের অনুসন্ধান *

[বিক্রমজিতের অপূর্ব্ব জীবনী ও আবিষ্কার কাহিনী]

(২)

পরদিন শশাঙ্ক ও আমি স্বনামধন্য নটবরপুরে যাত্রা করিলাম। কিন্তু পথে বাহির হইয়া বড় মুস্কিলে পড়িতে হইল। যতক্ষণ নটবরপুর কেবলমাত্র আমাদের অজ্ঞাত জানিতাম ততক্ষণ তাহা আমাদেরই অজ্ঞতার পরিচয় স্থির করিয়া নিজেদের ধিক্কার দিতেছিলাম কিন্তু এক্ষণে দেখি পথের কেহই নটবরপুরের খোঁজ জানে না। ইহার পর উক্ত মহানগরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠিতে থাকে। যাহা হোক মাইল দশেক ঘুরিয়া এবং জন পঞ্চাশ লোককে প্রশ্ন করিয়া অবশেষে নটবরপুরে পৌছিলাম। মহাপুরুষের বাসস্থান যে তাহাতে আর ভুল নাই কারণ ব্যাস-বাল্মীকির তপোবনও নিশ্চয় এমন নিবিড় ছিল না। পথের দুইধারে ঘন বাঁশঝোঁপ তাহার আড়ালে মাঝে মাঝে শুক্‌না পাতা চকিত করিয়া শিয়ালগুলি নিবিড়তর আশ্রয় খুঁজিতেছিল।

হায়! স্বগ্রামের মহাপুরুষ সম্বন্ধে এত যাহাদের অবহেলা উন্নতির আশাও তাহাদের সুদূর পরাহত। গ্রামের কেহই বিক্রমজিতের ঠিকানা বলিয়া দিতে পারিল না। অবশেষে Doctor of Discovery & Adventure বলাতে তাহারা এক নিরীহ ডাক্তারের আস্তানা দেখাইয়া দিল। তাঁহাকে অনেক রকম জটিল প্রশ্ন ও জেরা করিবার পর জানিতে পারিলাম বিক্রমজিত স্বগ্রামে রামনিধি হাজরা নামে খ্যাত। মহাপ্রভু! কোথায় বিক্রমজিৎ আর কোথায় রামনিধি হাজরা। অনেক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন জগতে লক্ষ্য করা যায় :—গুটি-

---

* বিজ্ঞ পাঠক বিক্রমজিতের চরিত্রে প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক Dandetর Tartarianএর ছবি দেখিতে পাইবেন.
লেখক।

পোকা হইতে প্রজাপতি হয়, ব্যাং হইতে মানুষ হয় দারোগা সবডেপুটি হয়, কিন্তু রামনিধি হাজরা হইতে বিক্রমজিৎ। শশাঙ্ক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকে সে দেশী বিলাতী বহু নিয়ম অনুসারে ভাবিতে সুরু করিল কেমন করিয়া এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সম্ভব পর। আবার এক মহা ভুল! মহাপুরুষরা যে নৈসর্গিক নিয়ম মানিয়া চলেন না।

বহু অন্বেষণের পর একটা শুঁড়ি পথ দিয়া Doctor of Discovery & Adventure এর বাড়ীর সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ীটি দোতালা—তাহার গায়ে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর তিন যুগের ইতিহাস বর্ষাধারায় ভূমিকম্পের ফাটলে বটগাছের শিকড়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত। উক্ত মহা-পুরুষের বংশ যে অতি প্রাচীন এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরে তাহা আর কেহ নিশ্চয় অবিশ্বাস করিবেন না। নীচু প্রাচিরে ঘেরা ফুল বাগান পার হইয়া স্যাৎসেঁতে অন্ধকার একটা ঘরে প্রবেশ করিতেই একদল চামচিকা সাড়া পাইয়া পাখা ঝটপট করিয়া বাহিরে উড়িয়া গেল—সেই শব্দে দেয়ালের খানিকটা চুন সুড়কি ঝপ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়াতে ঘরের একচ্ছত্র মালিক একটা ছুঁচো করুণ স্বরে আপত্তি প্রকাশ করিল। দোতালায় উঠিলাম। বড় একটি ঘর দরজা বন্ধ—সামে লেখা "শিকার ভবন বিনানুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।" বুঝিলাম ইহারই মধ্যে মহাপুরুষ বিরাজ করিতে-ছেন। দুইজনে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য সঞ্চয় করিয়া বলিলাম ভিতরে কি আসিতে পারি? আমি দরজা খুলিয়া যাইতেই ক্ষিপ্রবেগে বন্দুক উঠাইয়া এক লাফে বিক্রমজিৎ আমাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল—কোথায়? অর্থাৎ আক্রমণ কারীরা কোনদিকে পালাইল? কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমাদের দেখিয়া অবজ্ঞার সহিত হাসিল ভাবটা তোমরা মিত্রপক্ষ হইয়া আমার এতবড় একটা বীরত্বের সুযোগ ফস্কাইয়া দিলে। আমরা মনে করাইয়া দিলাম যাত্রার আয়োজনের জন্য আসিয়াছি। বিক্রম বলিল তোমাদের সময় জ্ঞান নাই তোমরা আসিতে ২১ মিঃ ৭½ সেঃ বিলম্ব করিয়াছ। আমার কোন কাজ ½ সেঃ কম বেশী হয় না। আমার দ্বিপ্রহরের ভোজন ১২—৩৬ মিঃ ১৩ সেঃ সমাধা হয়। সময়জ্ঞান যোদ্ধাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ভেবে দেখদেখি নেপোলিয়ানের সেনাপতি সে রাতটা জলঝড়ের জন্য কোয়ার্ট ব্রাসে গফিলতি না কর্‌লে কি আনন্দের কারণটাই না হ'ত। সম্রাট কি ওয়াটার্লুর যুদ্ধে সহজে পরাজিত হন। ব্লুচারের আসিতে আর আধ ঘণ্টা বিলম্ব হইলেই—ব্যস্। আমাদের মুখে চোখে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ হয় প্রকাশিত হইতেছে না দেখিয়া সরেজমিনে উক্ত যুদ্ধব্যাপারটা দেখাইবার জন্য সে একটানে আমাদিগকে দেয়ালের কাছে লইয়া দেয়ালে আঁটা একখানা নক্সার প্রতি লক্ষ্য আকর্ষণ পূর্ব্বক আঙুল দিয়া দেখাইতে লাগিল। এইখানে সম্রাট দাঁড়াইয়া; এই কালো কালো দাগগুলি Imperial guard, এইখানে ফরাসী গোলন্দাজ, এই পদাতিক, এইখানে ঘোড়সোয়ার—ওই দেখা যায় ওয়াশিংটনের ঘোড়সোয়ার ওই পাহাড়ের উপর প্রথম ব্লুচারের সৈন্যদলের কিরীট রৌদ্রে কিরণে ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। ওই যে কোয়ার্ট ব্রাস চৌমাথা পথ আহা ফরাসী সৈন্যেরা যদি এই ঘাঁটি আগ্‌লাইয়া জার্ম্মান সৈন্যের পথরোধ করিতে পারিত তবেই ব্যস্। বলিয়া নিকটস্থ টেবিলে এক বিশাল চড় মারিল এক রাশ ধুলা উড়িয়া গেল। আমি সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম সম্রাটের রাজ্যত গিয়াছে কিন্তু এদিকে যে আমাদের অভিযানটাও মাটি হয়। "মাটি হয়—কথনই নয় you will see I shall make it a success বলিয়া মুখে চোখে বীরত্বের ছটা উদ্ভাসিত করিয়া বিক্রমজিৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তারপরে অতি সাবধানে পকেট হইতে বহুমূল্য সম্পদের মত একখানা কাগজ আমাদের চোখের সামে ধরিয়া সগর্ব্বে বলিল পড়:—দেখিলাম লণ্ডনের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ঠিকানা। বিক্রম জিজ্ঞাসা করিল কেন বুঝিতে পারিতেছ? স্বীকার করিতে হইল পারিতেছি না। সে দুইহাতে গোঁফের দুই প্রান্ত সূচিকাবৎ করিতে করিতে আমাদের অনুগ্রহ মিশ্রিত আদেশের স্বরে বলিল—বোস। বসিলাম। সে চেয়ারে পা ফাঁক করিয়া বসিয়া বন্দুকটা টেবিলের উপর রাখিয়া হাত দুইখানা

নেপোলিয়ানের মত বুকের উপরে আড়াআড়ি রাখিয়া টান হইয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল আমাদের অভিযানের ফলটা লণ্ডনে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। তখন তাহারা বুঝিবে যে বাঙালী শুধু কংগ্রেস করিতে পারে না স্কট স্যাকল্টনের মত আবিষ্কারও করিতে পারে। আমি কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু আবিষ্কারটা কি এতই বড় হবে? "কেন নয়? আমরা কি কম? এই হিংলা নদী কি কম? ইহার উৎস হিমালয়ে ব্যাটারা ইহার একটা গোঁজামিল রকমের নক্সা গড়িয়া ছোটনাগপুরের পাহাড়ে উৎস নির্ণয় করিয়াছে। সার্ভেয়াররা কষ্ট করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যায় নাই।" তারপরে গলার স্বর কিঞ্চিৎ নামাইয়া করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিল "তাহাদের দোষ দেওয়া উচিত নয় কারণ এই নদীর দুই তীরে ভীষণ অরণ্যানী তাহাতে দিনের বেলায় চরিতেছে ভয়ঙ্কর শ্বাপদ সকল। হরিণ, ব্যাঘ্র, সিংহ, গণ্ডার, ভল্লুক, জলহস্তী, হস্তী,বাইসন" বলিতে বলিতে সে ভীষণ উৎসাহে বন্দুকটি হাতে তুলিয়া লইয়া শিকারের কায়দায় ধরিল। হায় জুগার্ডেনকে পরাজিত করে এমন যে ভীষণ শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যানী তাহাতে এই মুঙ্গেরী গাদা বন্দুকের ভরসায় যাইতে কি সাহস হয়! বিক্রমজিতের বুকে যত তেজ আছে এই বন্দুকের বারুদে তত তেজ নিশ্চয় নাই। সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বলিতে পারিল না বুকের জলন্ত অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা চালাইতে লাগিল। অবশেষে বন্দুক রাখিয়া চট্ করিয়া একখানা নক্সা খুলিয়া আরম্ভ করিল "To the point কারণ যোদ্ধাদের খুব logical হওয়া দরকার এবং দেশ ও কাল সম্বন্ধে খাঁটি হওয়া চাই—নইলে ফরাসী সেনাপতি"—

ফরাসী সেনাপতি তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া প্রবেশের পূর্ব্বেই আমরা বলিলাম কিন্তু নদীটার নক্সা বেশ হয়েছে। অমি বিক্রমজিৎ গোঁফে তা দিয়া প্রশংসাটুকু অক্লেশে আত্মসাৎ করিয়া বলিল—"তা'ত হবেই কারণ যোদ্ধাদের"—

শশাঙ্ক বলিয়া উঠিল "সংক্ষেপে কথা কহিতে জানা চাই!" বিক্রম ইহা শুনিয়া মহা খুসী হইয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল "ঠিক বলেছ—নেপোলিয়ান বল্‌তেন"—উক্ত ব্যক্তি কি বলিতেন তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ আগ্রহ সম্প্রতি ছিল না তাই তাহার মনোযোগ নক্সার প্রতি আকর্ষণ করিলাম। তারপর সে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া ছোট ছোট লাল নীল বেগনী নিশান পিন করিয়া নদীর ধারা নির্ণয় করিতে লাগিল কোথায় ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী, কোথায় নদী পার হইতে নৌকা লাগিবে—কোথায় তাঁবু করিতে হইবে সমস্ত চিহ্নিত হইল। এত আয়োজন বোধ হয় গত যুদ্ধে স্বয়ং ভন হিণ্ডেন বর্গকেও করিতে হয় নাই। তারপরে বিক্রম ডেস্ক হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির একটা ফর্দ্দ বাহির করিল। তাহাতে বন্দুক তলোয়ার, তাঁবু থার্মিমেটার ব্যারোমিটার কম্পাস দূরবীন শীতনিবারণের জন্য ছাগচর্ম্মের জামা বরফের উপর টানিবার জন্য স্লেজ কেহই বাদ পড়েন নাই। আমার ভয় হইল Doctor of Discovery & Adventure মহাশয় যে রূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে দক্ষিণমেরু আবিষ্কারে না বাহির হন। শশাঙ্ক বলিল এসব জিনিষের কি প্রয়োজন? সে বলিল Everything has its use! হরি হরি। সাঁওতাল পরগণার শুষ্কমাঠে স্লেজ এবং ছাগচর্ম্মের জামা!

তারপরে বলিল—"আজ শনিবার—আগামী সোমবার বেলা—৩টা ৪০ মিনিটের সময় আমরা বাহির হব। Be Punctual কারণ Punctuality wins the field। সেইদিন ২ টার সময় তোমাদের গ্রামে স্কুলঘরের সামে আমাদের বিদায় সভা হবে—সব বন্দোবস্ত আমিই করব।" দীনবন্ধু—কি দুর্দ্দশাই না জানি তুমিই করিবে!

"ঠিক্ কথা—আমাদের চড়িবার জন্য কয়েকটা অশ্বের প্রয়োজন।" তিনি ঘোড়া বলেন না—কারণ তাহাতে বাহনের যথেষ্ট গৌরব করা হয় না। কিন্তু অশ্ব পাই কোথায়? "সেজন্য ভেবোনা আমি কয়েকটি অশ্ব সংগ্রহ করব।" তারপরে বিক্রমজিৎ আমাদিগকে নিজের বাড়ী দেখাইবার জন্য লইয়া চলিল—প্রথমেই অস্ত্রশালা! দরজার উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"অস্ত্রশালা—দিয়াশলাই

ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করুন—ধূমপান নিষেধ।" সার্কাস-ওয়ালা যেমন সাবধানে সিংহের খাঁচার দরজা খোলে সে তেমনিভাবে অস্ত্রশালার দ্বার খুলিল। ভিতরে কয়েকটি জীর্ণ বন্দুক! কিন্তু জীর্ণ হইলে কি হয় তাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য কি অভিনব। কোনটি তৃতীয় পাণিপথের, কোনটি কাবুল যুদ্ধের, কোনটি টিপু সুলতানের সেনাপতির। একটি দেখিলাম পলাশীযুদ্ধে লর্ড ক্লাইবের! কি আশ্চর্য্য! এমন বিচিত্র সংগ্রহ। প্রত্যেকটির গায়ে লেবেল মারিয়া সংক্ষেপে পরিচয় লেখা আছে! প্রত্যেকটি বন্দুকের পরিচয় দিবার সময় ক্ষিপ্র তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছিল! পলাশীযুদ্ধের বর্ণনার সময় তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল ভাগ্যিস লর্ড ক্লাইব ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল নহিলে তাঁহার আজ আর রক্ষা ছিল না। তারপরে চলিলাম—তাহার উদ্যান পরিদর্শন করিতে! এখানেও আশ্চর্য্য সংগ্রহ! কোথাও কাশ্মীরের জাফরণ গাছ কোথাও লঙ্কার দারুচিনি, কোথাও জাভার নারিকেল, কোথাও আঙুর, আপেল, কমলা, পাইন, ইউ, সাইপ্রেস। যদিও তাহারা মাটির দোষে কেহই আধ হাতের বেশী উচ্চ হইতে পারে নাই। প্রত্যেক গাছের ডালে আপন আপন পরিচয় বহন করিয়া লেবেল ঝুলিতেছে। এক জায়গায় আফ্রিকার একটি রবার গাছ; তাহার পাশে আসিয়া বিক্রমজিৎ আফ্রিকার ভীষণ অরণ্যানী বিশাল নদী দুর্দ্দান্ত শ্বাপদ লিভিংষ্টোনের ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতির মহা উৎসাহে বর্ণনা করিতে করিতে সহসা আমাদিগকে চমকিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "ওই ওই ওই যায়"—কিন্তু কে যে কোথায় যাইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! আমরা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম! বিক্রম একটু পরে থামিয়া বলিল "না না তোমরা ভয় পেয়োনা আমি আফ্রিকার বনের ভীষণ শ্বাপদের কথা ভাবছিলাম।" ভগবান্! কোথায় আফ্রিকার বন কোথায় নটবরপুরের বাগান! সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া বিদায় চাহিলাম! বিক্রম বিদায়ের পূর্ব্বে বলিয়া দিল "আগামী সোমবার ২ টার সময় সভা--৩ টা ৪০ মিনিটের সময় যাত্রা করতে হবে। Don't forget it কারণ Punctuality wins the day." তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুইজনে বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম!

আকন্দ

(ভূমিকা)

সন্ধ্যা আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগন পারে
অকূল অন্ধকারে,
ছম্‌ছমিয়ে এল রাত্তি ভুবনডাঙার মাঠে
একলা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে।
নতুন-ফোটা গানের কুঁড়ি দেব বলে' দিনুর হাতে আনি
মনে নিয়ে সুরের গুন্‌গুনানি
চলেছিলেম, এমন সময় যেন সে কোন্ পরীর কণ্ঠখানি
বাতাসেতে বাজিয়ে দিল বিনাভাষার বাণী;
বল্লে আমায় "দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ওগো পথিক তোমার লাগি চেয়ে আছি যুগে যুগান্তরে।
আমায় নেবে চিনে
সেই সুলগন এল এতদিনে।
পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি, মনে গোপন আশা,
কবির ছন্দে বাঁধব আমার বাসা।"
দেখা হ'ল, চেনা হ'ল, সাঁঝের আঁধারেতে,
বলে এলেম, তোমার আসন কাব্যে দেব পেতে।
সেই কথা আজ পড়্‌ল মনে হঠাৎ হেথায় এসে
সাগরপারের দেশে,—
মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে
তারি মধ্যে বাজল করুণ সুরে—
"ভুলোনা গো, ভুলোনা এই পথবাসিনীর কথা,
আজো আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাসা আমার কোথা?"
শপথ আমার, তোমরা বোলো তারে
তার কথাটি দাঁড়িয়েছিল মনের পথের ধারে,—
বোলো তারে চোখের দেখা ফুটেছে আজ গানে,—
লিখন খানি রাখিনু এইখানে।

১

যেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসব সভাতলে
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে।
আসিল মল্লিকা-চম্পা-কুরুবক-কাঞ্চন-করবী
সুরের বরণ-মাল্যে সবারে বরিয়া নিল কবি।
কি সঙ্কোচে এলে না যে, সভার দুয়ার হ'ল বন্ধ।
সব পিছে রহিলে আকন্দ।

২

মোরে তুমি লজ্জা কর নাই
আমার সম্মান মানি তাই
আমারে সহজে নিলে ডাকি।
আপনারে আপনি জানালে ;
উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে
পরিচয় রাখিলে না ঢাকি।
মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিনু একা,
তুমি বুঝি ভেবেছিলে কি জানি না পাই পাছে দেখা,
অদৃশ্য লিখন খানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ
বায়ু ভরে পাঠালে আকন্দ।

৩

হিয়া মোর উঠিল চমকি
পথ মাঝে দাঁড়ানু থমকি,
তোমারে খুঁজিনু চারিধারে।
পল্লবের আবরণ টানি
আছিলে কাব্যের দুয়োরাণী
পথ প্রান্তে গোপন আঁধারে।

সঙ্গী যারা ছিল ঘিরে তারা সবে নাম গোত্র হীন
কাড়িতে জানে না তারা পথিকের আঁখি-উদাসীন।
ভরিল আমার চিত্ত বিস্ময়ের গভীর আনন্দ
চিনিলাম তোমারে আকন্দ।

৪

দেখা হয় নাই তোমা সনে
প্রাসাদের কুসুম কাননে
জনতার প্রগল্‌ভ আদরে।
নিদ্রাহীন প্রদীপ আলোকে
পড়নি অশান্ত মোর চোখে
প্রমোদের মুখর বাসরে।
অবজ্ঞার নির্জ্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি,
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিঃশ্বাস মৃদু মন্দ,
নম্রহাসি উদাসী আকন্দ।

৫

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরাণ ডুবাইলে,
শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালবাসা।
দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাখ গৌরব তোমার,
শান্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার।
জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিনু এই ছন্দ
মৌমাছির বন্ধু হে আকন্দ।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৪
চাপাড় মালাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিষ্টি কথা

ইন্দ্রিয়দের মধ্যে সব চেয়ে বাহাদুর হল জিব্। সেতো সন্দেশ রসগোল্লা ও চা প্রভৃতির রস গ্রহণ করে, তা ছাড়া আবার তার ওপরওয়ালা কাণের পর্য্যন্ত (শব্দ উচ্চারণে) রসদ যোগায়। আজ যদি হঠাৎ কোন দৈব বলে জীব-রাজ্য থেকে জিব্ লোপ পেয়ে যায় তা হলে "বিশ্ব" একে-বারেই "নিঃস্ব" হয়ে পড়ে। কান বেচারাদের ঘরোয়া কাজ চলতো শিক্ষকের হাতে আর ফোড়ন-ছুঁচে। কিন্তু এদেরই মধ্যে মনই হচ্ছে সকলের মনিব, কেননা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই ডিরেক্ট বা ইণ্ডিরেক্টভাবে তারই সেবার জন্য ব্যস্ত তাই গীতায় ভগবান্ বলেছেন—"ইন্দ্রিয়াণাংমনশ্চাস্মি।" জিব্‌কে শব্দের ডালি সাজিয়ে কানের ভেতর দিয়ে মরমের কাছে হাজির করতে হয় সে সময় জিব্ যদি মনিবের মর্জ্জি মত ডালার জিনিস চয়ন করতে না পারে তবে তার উপহার অনেক সময় তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না।

এর মানে—মন এক এত অবস্থায় এক এক রকম বিষয় (অর্থাৎ রূপ-রস প্রভৃতি) চায়। অনেক কাল থেকে এই রকম ব্যবহার চল্‌তে চল্‌তে রূপ রসাদিরও মনের ওপর একটি দখল এসে পড়েছে। আজ আমাদের কথার কথা।

কথা হচ্ছে বর্ণাত্মক শব্দ। আমরা দেখি শব্দেরও মনের ওপর অবস্থান্তর ঘটিয়ে দেবার শক্তি নেহাৎ কম নয়। আবার উচ্চারণ ভেদ আর বর্ণ ভেদ ও-বিষয় বেশ পটুত্ব লাভ করেছে, "মশায় শুনে যান্" এই কথাটি একজনকে জোরে কড়া করে' আর একজনকে আস্তে মৃদু করে বল্‌লে কি রকম ফল তা যাঁরা দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন তাঁরা হাতে হাতে পরখ করতে পারেন "ইথে কোন আপত্তি নেই।" পরে বর্ণের বেলায়ও দেখছি অনেকদিন থেকে বাঁধাবাঁধি একটা নিয়ম চালাবার চেষ্টা চলে আস্‌ছে। মোট কথা কি সমাজে কি ছবিতে কি বা সাহিত্যে এই বর্ণ সমস্যায় ভদ্রলোকদের ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়।

পণ্ডিতরা বলেন—এক একরসে অবস্থানের সময় মন এক একরকম মেজাজে থাকে তখন তার কাছে যা দিতে হবে তা তার অবস্থানুযায়ী হওয়া দরকার। যুদ্ধ যাত্রার সময় অস্ত্রের বদলে ফুলের তোড়া আর বিবাহ যাত্রার সময় ফুলের বদলে রাইফল্ উপহারের মত বেখাপ না হয়। কাজেই তাঁরা একটু দিক্-দেখিয়ে দিলেন, করুণ শান্ত আদি প্রভৃতি রসে মন নরম থাকে তখন সেই সব রস বর্ণনায় মরম শব্দ চালান উচিত যেমন ট ঠ ড ঢ প্রভৃতি বর্ণ তাতে বাদ দিতে হবে। আবার বীর প্রভৃতি রসের সময় মন গরম থাকে বলে উত্তেজক বর্ণ (ট ঠ ড ঢ প্রভৃতি) সেখানে দেওয়া দরকার। এতে দেখ্‌ছি বর্ণগুলিরও মনের ওপর ক্ষমতা আছে। রচনার আদিযুগে বর্ণনীয় বিষয়ই প্রধান লক্ষ্য ছিল, যা দিয়ে বর্ণনা চলে তার দিকে চোখ্ ছিল না, তাই বেদে দুরুচ্চার্য্য কটমট বর্ণ দিয়ে খুব সুন্দর খুব কোমল বিষয়ের বর্ণনা দেখ্‌তে পাই। আজকাল যদি আমরা ঐ রকম লিখতাম তবে পণ্ডিতরা তো রেগেই খুন হতেন আর বলতেন—"অ্যাঁ সব মাটি করেছ যে, শ্রুতি কটু আর ক্লিষ্টত্ব দোষে তোমার লেখা ঠিক তোমারই মত হাস্যাস্পদ হয়ে গিয়েছে।" পরে যখন বর্ণনীয় উপকরণের দিকে চোখ্ পড়ল তখন থেকে বোধ হয় ভাষার মধ্যে কোমলতার খোঁজ পড়েছিল।

কোমল কটু যা কিছু সব ওই বর্ণের মারপেঁচ "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" আর "নীরস-তরুবরঃ পুরতো ভাতি" তার প্রমাণ। সংস্কৃত ভাষা আমাদের দিদিমা-ভাষা আমাদের ওপর চিরন্তন মঙ্গল স্নেহ আদর প্রভৃতির ভার তাঁর ওপর। এ হেন সংস্কৃত ভাষার সব রকমের বর্ণ আছে বলে "ললিত-লবঙ্গলতা"র পাশ দিয়ে "ঘোর ঘর্ঘররবা গোদাবরী" ছুটে চলে। অতএব "বজ্রাদপি কঠোরাণি" "মৃদুনি কুসুমাদপি" এই দুই জিনিসই এতে পাই। ক্রমে ক্রমে নরম-ভক্তের দল বেশী জুটে গেল তাতে দিন কতক সংস্কৃতর বদলে প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার বাড়ে, যেহেতু প্রাকৃত শব্দের ঢেউ বেশ কোমল ভাবে চলে। সংস্কৃতের সখ্যঃ প্রাকৃতে

সহিয়ো ; কোনটি মিষ্ট ? কিন্তু মজা হল এই যে সংস্কৃতের অনেক শব্দ প্রাকৃতে চলে গেল—কোমল হতে ; আবার তারা জাত্যন্তর লাভ করে ও অবাধে সংস্কৃত সমাজে এসে ঢুকল। কোমলতার জয় সর্ব্বত্রই। এই দেখুন—শ্লিথিল ॥ শিথিল, প্রিয়াল = পিয়াল, বিকৃত = বিকট, প্রকৃত = প্রকট প্রভৃতি শব্দগুলি, এদের আগেরটির আর পরেরটির একটি সংস্কৃত অপরটি সংস্কৃতজ-প্রাকৃত। এমন কি যে বস্তুটি "সুকোমল গঞ্জনং" সেটিকেও সাদরে গ্রহণ করলেও দেবভাষার কোন গঞ্জনা দেয় না। এরকম ঝুড়ি ঝুড়ি শব্দ সংস্কৃতে আছে।

এই রকম শব্দ সৌন্দর্য্যের তলে যে আত্ম-প্রসাদ হয় তার প্রভাব বড় কম নয়, এজন্য অনেক ক্ষেত্রে শব্দর উপর জবর দস্তি পর্য্যন্ত চলেছিল। রাজশেখরের কাব্য মীমাংসায় দেখি—

মগধের (বিহার) রাজা শিশুনাগ তাঁর অন্তঃপুরে ট ঠ ড ঢ শ ষ হ ক্ষ এই কয়টি বর্ণবাদ দিয়ে কথা বলবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন (ট বর্গের প্রায় সব শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব নয় দ্রাবিড়দের কাছ থেকে নাকি নেওয়া) একথা ঠিক যে কোমলতার সর্ব্বস্ব অন্তঃপুরিকাদের মুখ থেকে লাঠি ঠ্যাঙার চোটের মত কাঠ খোট্টাই কথা বেরুলে চল্‌বে কেন ? শূরসেন দেশের (মথুরার) রাজা কুবিন্দ সংযুক্তবর্ণ আর কানে শুন্‌তে ভাল না লাগে এমন সব বর্ণ তাঁর অন্তঃপুরে বল্‌তে দিতেন না। কুন্তল দেশের (দক্ষিণ ভারতে) রাজা সাতবাহন তাঁর অন্দরে প্রাকৃত ভাষার চলন চালান (ভোজের অলঙ্কারও এর সাক্ষ্য দেয়) কিন্তু একজন আবার এর উল্‌টো কাজ করেন তিনি হচ্ছেন রাজা সাহসাঙ্ক। তাঁর অন্তঃপুরে সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় কথা কওয়া নিষেধ ছিল। তখনকার কালে এইরকম দুঃসাহস করাতে কি তাঁর নাম সাহসাঙ্ক ? শ্রুতিমাধুর্য্য যেন ফ্যাসানের মত হয়ে গিছলো। এইবার সেই বৈদিক যুগের প্রতিক্রিয়া পূর্ণ মাত্রায় দেখা গেল তাতে ক্রমে ক্রমে হল কি—

তখন পোষাক ছিল যেমন তেমন
লোকগুলি সব ভালো।
এখন পোষাক হল ঝক্‌ঝকে আর
লোকগুলি সব কালো ॥

অস্যার্থঃ—কান ধাঁধাঁলো শব্দের আবরণে ছাতা মুড়ি দেওয়া ধেয়ো লোকের মত—ভাব জিনিসটির মুখ দেখা কষ্টকর হয়ে উঠলো। বহুদিনের অভ্যাসের ফলে আমাদের কানও সেই রকম তৈরী হয়ে গিয়েছে বেদমন্ত্রের শব্দে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এমন কি কড়া কবি ভবভূতি পর্য্যন্ত বিকট বরন্তের সময় "প্রণয় সখী সলীল পরিহাস রসাধি গতৈঃ" করে ফেলেছেন, অজ্ঞাতসারে শব্দ মাধুর্য্য অযথা স্থলে হাজ্‌রে দিয়ে গিয়েছে। আর আমরাও "সৎকবের্জ্জিপিতিঃ কর্ণে মধুধারা" ঢেলে দিলেই নেচে উঠি। যাই হোক মিষ্ট সব যায়গায় মিষ্ট হয় না চিনি ডালনা বা চচ্চড়িতে চলে না সেখানে নুনই বরাদ্দ তেমনি শব্দেরও অযথা প্রয়োগে মিষ্টত্ব ঘুরে যায় অতএব পণ্ডিতগণ বাধ্য হয়ে পাঁতি দিলেন ও রকম যা'তা' করলে "বর্ণানাং প্রতিকূলত্বং" অর্থাৎ লাগ্‌সই বর্ণ প্রয়োগ না করার দোষ্‌ হবে। কিন্তু কান হয়ে গেছে নেশাখোর আইন কানুন এড়িয়ে মিষ্টি কথা শুনবার জন্য যদি তাকে লম্বা হতে হয় তাতেও তার কোন আপশোষ নেই। *

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

* বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়াসীগণ পূজনীয় গুরুদেবের শব্দতত্ত্ব ও মাননীয় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের শব্দকথা পড়তে পারেন।

গান

মোরা ভাঙব তাপস ভাঙব তোমার
কঠিন তাপের বাঁধন এবার
এই আমাদের সাধন।
চল কবি চল সঙ্গে জুটে
কাজ ফেলে তুই আয়রে ছুটে,
গানে গানে উদাস প্রাণে,
(এবার) জাগারে উন্মাদন।
বকুল বনে মুগ্ধ হৃদয়
উঠুক না উচ্ছাসি
নীলাম্বরের মর্ম্মমাঝে
বাজাও সোনার বাঁশী।
পলাশ রেণুর রঙ মাখিয়ে
নবীন বসন এনেছি এ
সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে
পুরাণো আচ্ছাদন॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সা সা II রা -া -পা। পমা -া -গমা I মরা -া পা। পমা পা -া I মা -গমা
মো রা ভা ০ ঙ্ ব ০ ০ ভা ঙ্ ব তা প স্ ভা ঙ্

মরা। রা সা -া I ন্ সা -া। রা মা -রা I মা পা -া। পা পা -ধা I ধমা -া
ব তো মা র্ ক ঠি ন্ তা পে . র বাঁ ধ ন্ এ বা র্ এ ই

পা। না না -া I না র্সা -া। র্সা র্সা -া I র্সসা -া -া। রা -া -গা II
আ মা দে র্ সা ধ ন্ মো দে র্ সা ০ ০ ধ ০ ন্

II র্মা -া -র্গর্মা। র্রা র্সা -া I. র্সর্রা -া -না। -র্সা -া -া I র্রা -া র্রা। র্গা র্সা
চ ০ ল্ ক বি ০ চ ০ ০ ল্ ০ ০ স ঙ্ গে জু টে

-া I র্রা -া র্রা। র্সা র্সা -পা I পণা -ধণা -পা। পণা -ধণা -পা I পণা -া ণা। পা
০ কা জ্ ফে লে তু ই আ ০ য় আ ০ য় আ ০ রে ছু

পা -া I মা রা -া। মা পা -া I মা পা -া। না র্সা -া I সা সা -া। রা মা
টে ০ গা নে ০ গা নে ০ উ দা স্ প্রা ণে ০ জা গা ০ রে উ

-া I মা পা -া। পা পা -ধা I মা পা -না। না না -া I না র্সা -া। র্সা র্সা -া I
ন্ মা দ ন্ এ বা র্ জা গা ০ রে উ ন্ মা দ ন্ এ বা র্

I নর্সা -র্রা র্রা। র্রা র্সা -া I না র্সা -া। র্সা র্সা -া I র্সসা -া -া। রা -া -গা II
এ ই আ মা দে র সা ধ ন্ মো দে র্ সা ০ ০ ধ ০ ন্

II সা রা -মা। মা মা -পা I পা -া পা। পা পা -া I পণা ণা -া। ধা ণা -া I
ব কু ল্ ব নে ০ মু গ্ ধ হৃ দ য় উ ঠু ক্ না উ ০

I ধা র্সণা -া। ধা পা -ধা I মা পা -া। পণা ণা -া I ণধা পা -া। -া -া -া I
চ্ছা সি ০ ও গো ০ উ ঠু ক্ না উ ০ চ্ছা সি ০ ০ ০ ০

I মা পা -া। পণা ণা -ধা I ধপা -া মগা। রা সা -া I রা -া -পা। পমা -া -া I
নী লা ম্ ব রে র্ ম র্ ম মা ঝে ০ বা ০ ০ জা ০ ও

I -া -া -া। পা পা -ধা I মা পা -া। পণা ণা -ধা I ধপা -মা -গা। রসা -া -া I
০ ০ ০ তো মা র্ সো না র্ বাঁ শী ০ বা ০ ০ জা ০ ও

I র্মা র্মা -র্জ্ঞা। র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞর্মা র্রর্সা। র্সর্রা -া -না I র্সা -া -া। -া -া
প লা শ্ রে ণু র র ঙ্ মা খি ০ ০ য়ে ০ ০ ০ ০

-া I না র্সা -া। র্সর্রা র্রর্সা -া I র্সনা র্সা -পা। পণা -া -ধণা I ণপা -া -া। -া -া
০ ন বী ন্ ব স ন্ এ নে ০ ছি ০ ০ এ ০ ০ ০ ০

-া I মা রা -া। মা পা -া I মা -া পা। না র্সা -া I সা সা -া। রা মা -া I
০ স বা ই মি লে ০ দি ই য়ু চি য়ে ০ পু রা ০ গো আ ০

I মা পা -া। পা পা -ধা I মা পা -া। না না -া I না র্সা -া। র্সা র্সা -া I র্সর্রা
ছা দ ন্ তো মা র্ পু রা ০ গো আ ০ ছা দ ন্ এ বা র্ -এ

-া র্রা। র্রা র্সা -া I না র্সা -া। র্সা র্সা -া I র্সা -া -া। রা -া -গা II II
ই আ মা দে র্ সা ধ ন্ মো দে র্ সা ০ ০ ধ ০ ন্

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

আশ্রম সংবাদ

প্রশ্নোত্তর

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিম্নলিখিত প্রশ্ন দুইটি শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

১। কোন্ অবস্থায় কিসের জন্য অধিকাংশ লোকে ঈশ্বরকে ডাকে।

২। কোন্ অবস্থায় কিসের জন্য অতি অল্প লোকে ঈশ্বরকে ডাকে।

অনেকেই প্রশ্ন দুটির উত্তর দিয়াছিলেন—তন্মধ্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর উত্তর দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত ভাষায় উত্তর দুইটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১। দৈব প্রতিকূল হইলে বিপদের কশাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অধিকাংশ লোকে ঈশ্বরকে ডাকে।

২। দৈব অনুকূল হইলে সম্পদের মায়াজাল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতি অল্প লোকে ঈশ্বরকে ডাকে।

ইহাঁদের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া প্রশ্নকর্ত্তা-মহাশয় নিম্নলিখিত উপদেশটুকু পুরস্কার রূপ ইহাঁদিগকে দিয়াছেন।

ঈশ্বর আমাদের সকলের উপরে সুমঙ্গল শান্তি বারি বর্ষণ করুন। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—ন বিভেতি কদাচন। ব্রহ্মের আনন্দ সমস্ত জগতের মাতৃক্রোড়। যে বালক মাতৃক্রোড়ে বসিয়া আছে—তাহার আবার ভয় কিসের? তাঁহার আনন্দ আমাদের সকলের একমাত্র অভয় কুল হো'ক্—তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আমাদের একমাত্র ধ্রুবতারা হোক্—তাঁহার চরণচ্ছায়া আমাদের একমাত্র শান্তিনিকেতন হো'ক্ ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি! হরিঃ ওঁ।

৬ই মাঘ

গত ৬ই মাঘ মহর্ষিদেবের মৃত্যু উপলক্ষ্যে যে সভা হয় তাহার দুইটি অংশ ছিল। একটি ছোটদের জন্য অপরটি বড়দের জন্য। ছোটদের অংশে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয় নেপালবাবু মহর্ষির জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও পরে সভাপতি মহাশয় শিশুদের উপযোগী করিয়া কিছু বলেন।

বড়দের অংশের সভাপতি ছিলেন পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এই সভায় আচার্য্য ষ্টেন কোনো ছোট একটি বক্তৃতা পাঠ করেন তাহা মডার্ণরিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহনবাবু ও কালীমোহনবাবু ও সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেন।

আচার্য্য ষ্টেন কোনো

আচার্য্য ষ্টেন কোনোর বিদায় উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আচার্য্যকে একদিন বিকালে জলযোগের নিমন্ত্রণ করেন। তদুপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় গান গরবা নৃত্য হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর ছাত্ররাও আচার্য্যদেবকে একদিন জলযোগে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে বিদায় সভার উদ্যোগ করিয়াছিলেন সেইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। এই সভায় আচার্য্য আচার্য্যপত্নী এবং আশ্রমবাসী সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভায় জলযোগের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। আম্রকুঞ্জে এই সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বশেষে কয়েকটি গান ও "সাতভাই চাঁপা" নামে একটি নাটক অভিনীত হয়।

আচার্য্যদেবের আশ্রম ত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে কলাভবনে একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বিদায় উপলক্ষ্যে আচার্য্য ও তদীয় পত্নীকে বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় কিছু বলেন ও আচার্য্যকে স্বর্ণাঙ্গুরীয় পট্টবস্ত্র এবং তদীয় পত্নীকে পট্টশাড়ী উপঢৌকন দেওয়া হয়। আচার্য্য ষ্টেন কোনো—তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলে বেদমন্ত্র ও শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

কলাভবন

বিশ্বভারতীর কলাভবনের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়। তাঁহার অধীনে ৮টি ছাত্র ৬টি ছাত্রী বিশেষভাবে চিত্রবিদ্যা শিখিতেছেন। বড়ই আনন্দের বিষয় আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও কলাভবনের উদীয়মান তরুণ শিল্পী শ্রীমান মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কলম্বোর আনন্দ-কলেজের চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া সিংহলে গিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সেখানে তিনি বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

শ্রীপঞ্চমী

এবার শ্রীপঞ্চমীর দিন আশ্রমবাসী সকলে কোপাই তীরে বন-ভোজনে মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে দ্বিপ্রহরে আহারের ব্যবস্থা ছিল। এতৎব্যতীত সমস্ত দিন সেখানে গান, আবৃত্তি অভিনয়াদি হইয়াছিল।

সুরুল উৎসব

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সুরুল পল্লীসংস্কার বিভাগের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব সুরুলে সমারোহসহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে পূজনীয় রামানন্দবাবু সকলকে লইয়া উপাসনা করেন। তৎপরে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিপ্রহরে সকলে আহারার্থ মিলিত হইয়াছিলেন। রাত্রে আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা একটি যাত্রা-গান অভিনয় করিয়া সকলকে তৃপ্ত করেন।

সভা সমিতি

ছাত্রদের সাহিত্য সভা দুইটি বিশেষ উৎসাহ সহকারে চলিতেছে। ছোটদের সাহিত্য সভার অধিবেশনও নিয়মিত হইতেছে। বিশ্বভারতীর ছাত্রদের উদ্যোগে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা। এই সভা প্রতিমাসের শেষ বুধবারে বসিবে। গত মাসের অধিবেশনে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্র সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তৎপরে বিশ্বভারতীর চৈনিক অধ্যাপক মিঃ লিম্ রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের ফলাফল সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা করেন।

ছেলেদের আশ্রম সম্মিলনীর কাজ নূতন উৎসাহে চলিতেছে। গত পূর্ণিমা সম্মিলনীতে ছেলেরা "ধ্রুবতারার দেশ" নামে একটি ছোট নাটক অভিনয় করিয়াছিল। গত অমাবস্যা সম্মিলনীতে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়, রামানন্দবাবু নেপালবাবু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

অতিথি সমাগম

কয়েকদিন হইল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আশ্রমে আসিয়াছিলেন ইহাঁকে পাইয়া আশ্রমবাসীরা কৃতার্থ ও আনন্দিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইনি মোটে দুইদিন আশ্রমে ছিলেন। কিন্তু এই দুইদিনেই স্বভাবসিদ্ধ সরলতায়

আশ্রমের ছাত্রগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাঁকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য জগদানন্দবাবু, নেপালবাবু শাস্ত্রী-মহাশয় প্রভৃতি গিয়াছিলেন। সেই দিবস সন্ধ্যাকালে কলাভবনে ইহাঁকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। পর দিবস সন্ধ্যায় ইনি একটি সভায় বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অতি সরলভাষায় নিজের বক্তব্য বলেন। তৎপর দিন প্রাতঃকালে ইনি আশ্রম পরিত্যাগ করেন। এই দুই দিনের অনেকটা সময়ই ইনি পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইয়াছে—শীঘ্রই কোথাও প্রকাশিত হইতে পারে।

পরীক্ষার্থী

এবার আশ্রম হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রীমান্ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ অজয়কুমার সেন
„ হরিপদ ঘোষ
„ হিরণকুমার দাস
„ রনেন্দ্রবিজয় দাস
„ দেবব্রত রায়
„ দাশরথি চট্টোপাধ্যায়
„ সুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

আশ্রমের তরুণ-ছাত্র শ্রীমান্ শিবপ্রসাদ বিশ্বাস এখান হইতে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া বাড়ী গিয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সেখানে উক্ত রোগে সে মারা গিয়াছে। এই সংবাদে আশ্রমবাসী সকলে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন।

কলিকাতা সংঘ

আশ্রমিক-সংঘের কলিকাতাস্থ শাখার বহুদিন কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বড়ই আনন্দের বিষয় সম্প্রতি সেই শাখা পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত শাখার সম্পাদকের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত "শান্তিনিকেতন" সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

"বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫॥০ ঘটিকার সময় Y. M. C. A. Hostel এ কলিকাতা আশ্রমিক সংঘের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রতিবেদন পাঠ হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত সত্যব্রত রায় সহঃ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব করেন যে, এইবার পূজনীয় গুরুদেব বিদেশ হইতে যেদিন হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিবেন, সেদিন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রগণ, ষ্টেশনে সমবেত হইয়া মাল্য ও চন্দন দ্বারা আশ্রমিক সংঘের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিবেন। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর সংঘের অধিবেশনের জন্য Y. M. C. A. Hostel ই একমাত্র সুবিধা জনক স্থান বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে, এই স্থানেই সংঘের অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হয়। এতদিন আশ্রমিক সংঘের লাইব্রেরীটি কলিকাতায় ছিল না, এই সভায়, ঐ লাইব্রেরীটিকে কলিকাতায় Y. M. C. A. Hostel এ আনাইবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত। সভায়, প্রাক্তন ছাত্রদের গৃহ সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হয়। কলিকাতা আশ্রমিক সংঘের অধিবেশনের বিবরণ যাহাতে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং "শান্তিনিকেতন" সম্পাদককে এই বিবরণ প্রকাশিত করিবার অনুরোধ করা হয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতাস্থ প্রাক্তন ছাত্রদের ফুটবল ক্লাবের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হয়। ইতি—

শ্রীঅমিয়নাথ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক
কলিকাতা আশ্রমিকসংঙ্ঘ।

নীলগিরি

বনের ছায়ায় সবুজ বেলা—সাগর তীরে নীল ;
সেথায় আমার কাট্‌ছিল দিন কাট্‌তেছিল হায়—
হঠাৎ আমার কেমন করে' টুট্‌লো দূরের খিল
বনের পারে সুনীল গিরি ওইযে দেখা যায়।

ডালিম ফুলের তরুণ রাঙা—শিরিষ ফুলের বাস;
সেথায় আমার কাট্‌ছিল দিন কাট্‌তেছিল হায়—
হঠাৎ আমার কেমন করে' টুট্‌লো অবকাশ
বনের পারে সুনীল গিরি ওইযে দেখা যায়।

সেই অবধি সুনীল গিরি ডাক্‌ছে ইসারায়
ডাক্‌ছে আমায় ক্ষণে ক্ষণে বর্ষা বসন্তে ;
ছুট্‌ছি আমি মরুর পথে ছুট্‌ছি আমি হায়
ছুট্‌ছি আমি দিবস রাতি তারি তদন্তে।

অনেক বছর আজ সে হ'ল বেরিয়েছিনু হায়
সুনীলগিরি লক্ষ্য করি কোন্ অজানাপুর ;
অসীম দেখি মরুর বালি—পথ যে বেড়ে যায়
আজও হেরি সুনীলগিরি অনেক সে যে দূর।

শঙ্কা লাগে সুনীলগিরি নেই কি তবে নেই ?
মিথ্যা কি সে ! স্বপন শুধু ! আর কিছু কি নয় ?
কিন্তু তবু নয়ন তুলি অমনি পলকেই
শূন্যে জাগে সুনীলগিরি। জয় দুবাশার জয় !

২৩শে বৈশাখ।

পুস্তক পরিচয়

সাজি—(গল্পের বই) শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক 'নালন্দা' ও 'বিক্রমশিলা' প্রণেতা শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু এম, এ,। আর্য্য পাবলিশিং কোং, পি, ৫৬ রসা রোড সাউথ, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ফণীন্দ্রবাবু পণ্ডিত লোক কিন্তু পাণ্ডিত্য তাঁহার মনের সরসতাকে চাপিয়া মারিয়া ফেলে নাই তাহা বাঙালী পাঠক তদীয় "নালন্দা" ও "বিক্রমশিলাতে" দেখিয়াছেন। "সাজি" ছোট ছেলেদের গল্পের বই। ইহার বিশেষত্ব এই যে এই বইয়ের চারটি গল্পের মধ্যে দুটি বিদ্যালয়ের জীবন সম্বন্ধে লেখা। যে জীবনের মধ্যে ছেলেরা বাড়িয়া উঠিতেছে তাহারই সুলিখিত প্রতিচ্ছবি তাহাদের (এবং তাহাদের শিক্ষকদের) ভালো লাগিবে নিঃসন্দেহ। সামান্য জিনিষকে অসামান্য করিয়া তুলিবার অসাধারণ শক্তি ফণীন্দ্রবাবুর আছে তাহা অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি। এই উপলক্ষ্যে তাহা তাঁহাকে ও আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইলাম।

শৈল শিখর হইতে ভগবান্ ঈশার উপদেশ—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী প্রণীত, শিউড়ি। মূল্য দুই পয়সা।

ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি বাইবেলের Sermon on the Mount এর বাংলা তর্জ্জমা। বাইবেলের ভালো তর্জ্জমা বাংলায় আছে বলিয়া জানি না। মিশনারীরা সাধারণতঃ যে সব অনুবাদ বাহির করেন তাহাতে বাইবেলের প্রকৃত অর্থ মিশনারীকৃত হইয়া অর্থাৎ বিকৃত হইয়া দেখা দেয়। সুধাকান্তবাবুর এই অনুবাদে সে দোষ নাই বলা বাহুল্য। বিশেষত সুধাকান্তবাবু নিজে সাহিত্যিক কাজেই তাঁহার অনুবাদ সুপাঠ্য হইবে আশা করি।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ	চৈত্র, সন ১৩৩১ সাল।	৩য় সংখ্যা

বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মূল্য-নিরূপণ

মনুষ্যজ্ঞানের চারিটি স্তর আছে। নিম্নতম স্তর হচ্চে প্রাতিভাসিক জ্ঞান—তাহা জ্ঞানের বীজমাত্র; দ্বিতীয় স্তর বিষয় জ্ঞান; তৃতীয় স্তর ধর্ম্মজ্ঞান; চতুর্থ স্তর ব্রহ্মজ্ঞান। প্রাতিভাসিক জ্ঞান পশুপক্ষীদিগেরও আছে, এমন কি কীট পতঙ্গেরও আছে। বীজ যেমন মৃত্তিকায় জড়িত থাকে—প্রাতিভাসিক জ্ঞান তেমনি বহুল পরিমাণে অজ্ঞানে জড়িত থাকে। পরে যখন তাহা হইতে বিষয়জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়, তখন তাহার গাত্র হইতে কতক কতক করিয়া অজ্ঞান মার্জ্জিত হইয়া যাইতে থাকে; ক্রমে যখন অজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়া গিয়া জ্ঞান সুপরিস্ফুট আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে আমরা বলি – বিজ্ঞান। বিষয়জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দুইই ব্যবহারিক জ্ঞান; প্রভেদ কেবল এই যে, বিষয়জ্ঞান অমার্জ্জিত এবং অপরিস্ফুট—বিজ্ঞান সুমার্জ্জিত এবং সুপরিস্ফুট। বিজ্ঞানের ভিতরের কথা ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিতে হইলে আকাশ এবং কালের সহিত বাহ্য-জগতের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা একবার বিধিমতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের এটা একটা ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, বাহিরের বস্তুমাত্রই আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, অথচ সেই আকাশ-ব্যাপন কার্য্যটি যে, ভৌতিক বস্তু কর্ত্তৃক কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহারা পারতপক্ষে উচ্চবাচ্য করেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে হস্তদ্বারা আমরা যেমন গ্রাহ্যবস্তু-সকল স্পর্শ করি—ভৌতিক বস্তু কি, সেই-রূপ, শূন্য আকাশকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? শূন্যকে কি কেহ কখনও স্পর্শ করিতে পারে? কেহই তাহা পারে না বলা বাহুল্য। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোনো দুই বস্তু যখন পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া রহে, তখন, তাহাদের মধ্য হইতে কি আকাশের ব্যবধান একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, অথবা, উভয়ে খুব ঘনিষ্টভাবে পরস্পরের সহিত লিপ্ত থাকিলেও দুয়ের মধ্যে আকাশের ব্যবধান থাকে? দুয়ের মধ্যে আকাশের ব্যবধান যে, থাকে, একথা বৈজ্ঞানিক

পণ্ডিতেরা অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হ'ন—তাঁহারা বলিতে বাধ্য হ'ন যে, একটা দুর্ভেদ্য কঠিন ধাতুখণ্ড আদ্যোপান্ত ফোঁপ্‌রা পদার্থ (porous)। এ বিষয়টির প্রকৃত তথ্যটি পরীক্ষার নিক্তির ওজনে একবার ভাল করিয়া তৌল করিয়া দেখা যা'ক্‌।

একটা মৃৎপিণ্ড আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত করে বলিলে বুঝায় এই যে মৃৎপিণ্ডটা স্বীয় বিস্তৃতির পরিমাণানুযায়ী আকাশ-খণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, আর, সেইসঙ্গে বুঝায় যে, মৃৎপিণ্ডটার অর্দ্ধাংশ আকাশ-খণ্ডটির অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে—মৃৎপিণ্ডটার সিকি অংশ আকাশ খণ্ডটির সিকি অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে—মৃৎপিণ্ডটার সিকির সিকি অংশ আকাশ-খণ্ডটির সিকির সিকি অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে—মৃৎপিণ্ডটার শতসহস্রতম অংশের একাংশ, $(\frac{1}{১০০})^৫$, আকাশ-খণ্ডটির $(\frac{1}{১০০})^৫$ অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। এইরূপ ক্রমবিভাজনের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা পাইতেছি এই যে, মৃৎপিণ্ডটার মাত্রাতীত ক্ষুদ্র অংশ আকাশ খণ্ডটির মাত্রাতীত ক্ষুদ্র অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। এখন কথা হইতেছে এই যে, মৃৎপিণ্ড-টিরই বা কি, আর আকাশ-খণ্ডটিরই বা কি—দুইয়ের কোনটির মাত্রাতীত ক্ষুদ্র অংশ বলিলে অগত্যা এইরূপ বুঝায় যে সে অংশটি জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় শূন্যেরই আর এক নাম। তবেই হইতেছে যে ভৌতিক পিণ্ডও যেমন আর তাহার অধিকার্য্য আকাশখণ্ডও তেমনি দুইই শূন্য বিন্দু নিচয়ের সমষ্টি। গণিতশাস্ত্রে যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাদের ইহা বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় না যে, ব্যষ্টি শূন্যও যেমন শূন্য (০)—সমষ্টি শূন্যও তেমনি শূন্য (০+০+০+০) দুয়ের মধ্যে একচুলও প্রভেদ নাই। কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িল। অসীম শূন্য আকাশ একটিমাত্র শূন্য বিন্দুতে পর্য্যবসিত হইল, আর সেইসঙ্গে আকাশব্যাপী সমস্ত ভৌতিক জগত শূন্যে পরিসমাপ্ত হইল।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন—সুদূর ভবিষ্যতকালে সমস্ত জগত ঐরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অবস্থায় পর্য্যবসিত হইবে। প্রভেদ কেবল এই যে, প্রলয় কালের সেই মাত্রাতীত সূক্ষ্ম অব্যক্ত জগত ঘনীভূত হইয়া পুনর্ব্বার কেমন করিয়া যে তাহা হইতে এখনকার মতো এইরূপ দৃশ্যমান বিশ্ব সংসার উদ্ভূত হইবে—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহার সুদূর সম্ভাবনাও দেখিতে পান না। তাহারা বলেন যে জগতের সেরূপ অন্তিম অবস্থায় তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতদূর শীতল হইতে পারে হইয়া তাহার কোনস্থানেই উত্তাপের তারতম্য না-থাকা প্রযুক্ত তাহা একেবারেই মৃতবৎ অসাড় হইয়া যাইবে,—সে তাহার অগাধ মহানিদ্রা হইতে আবার যে সে জাগিয়া উঠিয়া সৃষ্টিপথে যাত্রারম্ভ করিবে তাহার কোন লক্ষণই দেখিতে পান না। পক্ষান্তরে দেশীয় শাস্ত্রে বলে যে, প্রতিলোম ক্রমে বিশ্বসংসার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম এবং সূক্ষ্মতম হইতে অব্যক্ত অবস্থায় পরিণত হইলেও অনুলোম ক্রমে পুনর্ব্বার সৃষ্টির উদ্যোগ আরম্ভ হইবে। Transformation of forces বলিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে একটি মন্ত্র বচন আছে, তাহা যদি সত্য হয় তবে তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে জগতের প্রলয় অবস্থায়—তাহার পরমাণুগণ যেমন লোপ পায় না—সেই পরমাণুগণের অন্তর্ভূত শক্তিজালও তেমনি লোপ পায় না। আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে যে, প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যসমূহ কারণ শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়; দেশীয় দার্শনিক ভাষায় শক্তিলীন অবস্থার নামই প্রলয়াবস্থা। অতঃপর দেখিতে হইবে এই যে জড়পিণ্ডের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র যেমন আকাশ,—শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র তেমনি কাল। কালেতেই শক্তি জগতরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং কালেতেই তাহা অব্যক্ত মূল প্রকৃতির অন্তর্ভূত হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, একটা দোলক পিণ্ড (Pendulum) বামপার্শ্ব হইতে ডাহিন পার্শ্বে এবং ডাহিন পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিতে থাকিলে মধ্য পথ হইতে ডাহিন দিক বাগে বা বামদিক বাগে প্রধাবিত হইবার সময় তাহার বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে হইতে শেষে তাহার একতম

গতি পথের চরম প্রান্তে যখন সে উপনীত হয়, তখন তাহার গতি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া-গিয়া গতিশূন্য স্থিতি মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সেই মাত্রাতীত ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তব্যাপী গতিশূন্য অবস্থার মধ্যেও শক্তির কার্য্যকারিতা যেমনতেমনি বর্ত্তমান থাকে—বর্ত্তমান থাকিয়া দোলক পিণ্ডটাকে প্রথমে মাত্রাতীত মন্দ বেগ হইতে ঈষৎ দ্রুত বেগে এবং শেষে দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করে?

প্রলয়ের গতিশূন্য অবস্থা হইতে সৃষ্টির পুনরাবর্ত্তন যিনি বলেন অসম্ভব সেই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত চূড়ামণিকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে দোলক পিণ্ডটা তাহার গতিপথের প্রান্ত স্থানীয় গতিহীন অবস্থা হইতে ফের আবার যাত্রারম্ভ করে তো—না, করে না?

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত॥ অবশ্য উহা যাত্রারম্ভ করে।

জিজ্ঞাসু॥ কতমাত্রা বেগে উহা যাত্রারম্ভ করে?

বৈজ্ঞানিক॥ অতীব অল্পমাত্রা বেগে যাত্রারম্ভ করে।

জিজ্ঞাসু॥ ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার বেগমাত্রা অতীব অল্প—এত অল্প যে তাহা চলিতেছে কি চলিতেছে না দৃষ্টিমাত্রেই তাহা কাহারও চক্ষে ধরা পড়িতে পারে না—এমন কি একটি সপ্তম বর্ষীয় বালককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে সন্দেহ নাই যে ঘণ্টার কাঁটা একটুও চলে না। দোলকপিণ্ডটা গতিশূন্য স্থির অবস্থা হইতে গতিপথে যাত্রারম্ভ করিবার সময় ঘণ্টার কাঁটার বেগে যাত্রারম্ভ করে কি?

বৈজ্ঞানিক॥ তোমার জানা উচিত যে প্রান্তস্থানীয় গতিহীন অবস্থা হইতে গতিমান অবস্থায় উপনীত হইবার মুখ্য সময়টিতে দোলক পিণ্ডটা ক্রমবর্দ্ধমান বেগে গতিপথে যাত্রারম্ভ করে, আর সেইসঙ্গে এটাও তোমার জানা উচিত যে কোন একটি গতিমান বস্তুর ক্রম বর্দ্ধমান বেগ ঘণ্টার কাঁটার বেগের অর্দ্ধমাত্রা না মাড়াইয়া পূর্ণ-মাত্রায় উপনীত হইতে পারে না—সিকিমাত্রা না মাড়াইয়া অর্দ্ধমাত্রায় উপনীত হইতে পারে না—সিকির সিকি মাত্রা না মাড়াইয়া সিকি মাত্রায় উপনীত হইতে পারে না; তাহা যখন সে পারে না তখন দোলক পিণ্ডটা যে তাহার যাত্রারম্ভের প্রথম উদ্যমেই ঘণ্টার কাঁটার বেগ ধারণ করিতে পারে না—ইহা বলা বাহুল্য।

জিজ্ঞাসু॥ তুমি কি তবে বলিতে চাও যে দোলক-পিণ্ডটা তাহার চরম প্রান্ত স্থানীয় গতিশূন্য স্থিতি হইতে গতিপথে যাত্রারম্ভ করিবার প্রথম উদ্যমে শূন্যমাত্রার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতমমাত্রা বেগে যাত্রারম্ভ করে?

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত॥ (ঈষৎ হাস্য করিয়া) শূন্যমাত্রার নিকটতম মাত্রা ন—ভূতো ন ভবিষ্যতি—কোন জন্মে তাহা হয়নো নাই হইবেও না—বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় তাহা একান্ত পক্ষেই অসম্ভব।

তবেই হইতেছে যে, দোলকপিণ্ডটা তাহার গতিপথের চরম প্রান্তস্থান হইতে কেমন করিয়া ক্রম বর্দ্ধমান বেগে পুনরাবর্ত্তন করিবে কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরই সাধ্য নাই যে তাহার একটি যুক্তিমূলক সম্ভবপরতা তিনি আমাকে দেখাইতে পারেন; তাহা যখন পারেন না তখন তিনি প্রলয়ের গতিশূন্য অবস্থা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে কেমন করিয়া সৃষ্টিপথে পুনরাবর্ত্তন করিবে তাহা বুঝিতে না পারা তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। বুঝিতে পারেন না তিনি দুয়ের কোনটাই,—দোলকপিণ্ডটা গতিহীন স্থির অবস্থা হইতে গতিমান অবস্থায় কেমন করিয়া উপনীত হয় তাহাও বুঝিতে পারেন না, আর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ের গতিহীন অবস্থা হইতে সৃষ্টির গতিমান অবস্থায় কেমন করিয়া উপনীত হয় তাহাও বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে পারুন বা না পারুন চক্ষে দেখেন তো? চর্ম্মচক্ষে এটা ত দেখেন যে দোলক-পিণ্ডটা গতিহীন অবস্থা হইতে গতিমান অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, তেমনি আবার বিজ্ঞান-চক্ষে এটাও ত দেখেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতীব সূক্ষ্ম ছিন্নবিচ্ছিন্ন নভুল (nebulous)* অবস্থা হইতে সৌরাদি

* আমার এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে neb এবং নভস্ শব্দের গোড়ার ধাতু একই। পুরাণাদিতে নভস্ শব্দের স্থানে (প্রথমা বিভক্তিতে নভঃ, দ্বিতীয়া বিভক্তিতে নভং, তৃতীয়া বিভক্তিতে নভেন—এইরূপে) কোনো কোনো স্থলে

জগতের সুসংহত স্থূল অবস্থায় উপনীত হয়। তবেকেন দোলক-পিণ্ডটার ব্যালার বলেন যে নিশ্চয়ই সে তাহার প্রান্ত স্থানীয় গতিহীন অবস্থা হইতে গতিমান অবস্থায় ফিরিয়া আসে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যালায় বলেন যে একবার তাহা প্রলয়ের সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত হইলে আরযে তাহা সৃষ্টির সুসংহত স্থূল অবস্থায় কস্মিনকালেও উপনীত হইতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা মূলেই নাই। ইহাতে এক যাত্রার পৃথক ফল হয় না কি? ইঁহাদের মতো তুখোড় বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা যদি দোলকের

প্রয়োগ করা হইয়াছে। এখানে আমি তাই নভস্ এবং নভ এই দুই শব্দকে একেরই সামিল করিয়া ধরিয়া লইতেছি। তাহা ছাড়া অম্বু শব্দে জল বুঝায়, অম্বর শব্দে আকাশ বুঝায়। সবাই জানে নভ শব্দের অর্থ আকাশ মাত্র—পরন্তু আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে খুব কম লোকেই জানেন যে বেদে অনেকানেক স্থলে নভস্ শব্দ জল অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এটা তাই আমার খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে বহু পুরাতনকালে অম্বু, অম্বর এবং নভ এই তিন শব্দ, নির্ব্বিশেষে, আকাশ এবং জল এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত। আর সেরূপে ব্যবহৃত হওয়া কিছুই বিবিত্র নহে এইজন্য—যেহেতু জলীয় বাষ্প কিনা মেঘ এবং আকাশ এই দুই বস্তুর পরস্পরের সহিত খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। Greek nepheles শব্দ হইতে nebulous শব্দ হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। nepheles শব্দের অর্থ cloud, nebulous শব্দের গোড়ার অর্থ তাই আমার বোধ হয় cloudy—cloudy হইতে misty হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। এ বিষয় আমি এখানে সবিস্তরে আলোচনা করিতে চাহি না এইজন্য—যে হেতু তাহা করিতে গেলে আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া দাঁড়াইবে। আমার বক্তব্য যাহা তাহা আমি সংক্ষেপে বলি—তাহা কেহ বুঝুন বা না বুঝুন তাহাতে বর্ত্তমান প্রবন্ধের ক্ষতিবৃদ্ধির কোন আশঙ্কা নাই। কেহ হয়ত বলিবেন, মানিলাম neb এবং নভ গোড়ায় একই ছিল। কিন্তু নভুল কথাটা আমার কাণে কেমন কেমন ঠেকিতেছে। তাহা যদি বলেন তবে দু'চারি ফোঁটা রাসায়নিক ঔষধ (lotion) প্রয়োগ করিলেই তাঁহার কর্ণদোষ সংশুদ্ধ হইয়া যাইবে। বাত শব্দ হইতে বাতুল শব্দ হইয়াছে, মাতৃ শব্দ হইতে মাতুল শব্দ হইয়াছে, মৃৎ শব্দ হইতে মৃদুল শব্দ হইয়াছে—(মৃদুল কিনা ভিজা মৃত্তিকার মত নরম), আবর্ত্ত শব্দের অর্থ ঘূর্ণা জল, আবৃত্তি শব্দের অর্থ ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই পাঠ আওড়ান। বর্ত্তুল শব্দ (বাঁটুল) নিশ্চয়ই বর্ত্তন শব্দ হইতে হইয়াছে। একটি গোলাকৃতি মৃৎপিণ্ড জোরে নিক্ষিপ্ত হইলে প্রথমে বারি-পথে এবং তাহার পরে ক্ষিতিপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বা গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতে থাকে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া বা গড়াইয়া গড়াইয়া চলার নামই আবর্ত্তমান হওয়া বা বর্ত্তমান হওয়া। অহোরাত্রি যেমন দুই সন্ধ্যার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান হয়, মাস যেমন শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষে ভর করিয়া বর্ত্তমান হয়, বৎসর যেমন উত্তর দক্ষিণ দুই অয়নে ভর করিয়া বর্ত্তমান হয়, দেহ যেমন ডাহিন বাম দুই দুই অঙ্গে ভর করিয়া বর্ত্তিতে থাকে—নিক্ষিপ্ত গোলাকৃতি মৃৎপিণ্ড তেমনি আতিকেন্দ্রিক (centrifugal) এবং আনু-কেন্দ্রিক (centripetal) এই দুই প্রকার শক্তির যুগপৎ কার্য্যকারিতায় আবর্ত্তমান হইতে থাকে অর্থাৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে, থাকে; আবর্ত্তমান বা বর্ত্তমান এই অর্থে তাহা বর্ত্তুল। চক্র শব্দে অনেক সময়ে গৌণ অর্থে বুঝায় দিকচক্র—যতদূরে যাওনা কেন—দিকচক্র তাহা অপেক্ষাও দূরে অব-স্থিতি করে—এইজন্য চক্র শব্দে অনেক সময় বিস্তীর্ণ রাজ্য বুঝায়। বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন (প্রঘূর্ণন) করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় যে অশোক রাজা চক্রবর্ত্তী (চাকা ঘুরানো) শ্রেণীর রাজাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ছিলেন, মনে হয় তাহা এইজন্য—যেহেতু উৎসবে মাতিয়া বৈষ্ণবেরা চক্রাকারে অঙ্গুলি ঘুরাইয়া হরিবোল হরিবোল বলিলে তাহাতে যেমন বুঝায় যে, রাজ্যশুদ্ধ লোক হরি হরি বল—সেইরূপ অশোক রাজার মত একজন রাজচক্রবর্ত্তী যদি চক্রাকারে অঙ্গুলি ঘুরাইয়া বলেন যে সমস্ত রাজ্যময় আমি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার না করিয়া

আলোক ধরিয়া আমাদের দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের অন্ধিসন্ধি প্রদেশগুলি প্রশান্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন তবে বড়ই ভাল হয়; তাহা হইলে উঁহাদের বিজ্ঞান চক্ষু হইতে ইহুদী শাস্ত্রীয় সাপ্তাহিক সৃষ্টির সাতপুরু আবরণ খসিয়া গিয়া কিরূপ যে একটা পরমাদ্ভুদ ব্যাপার চক্ষের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ উদ্ভাসিত হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা সমস্বরে বলেন যে ঐশীশক্তি অঘটন-ঘটনা পটীয়সী। সেই ঐশীশক্তির অমোঘ কার্য্যকারিতায় নিমেষে নিমেষে চক্ষু-উন্মীলনের পর নিমীলন এবং নিমীলনের পর উন্মীলন—মুহুর্মুহু নিঃশ্বাসের পর প্রশ্বাস এবং প্রশ্বাসের পর নিঃশ্বাস—প্রতিদিন প্রতিরাত্রি নিদ্রার পর জাগরণ এবং জাগরণের পর নিদ্রা—কল্পে কল্পে প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর প্রলয় অনবরত চলিতেছে;—কেমন করিয়া যে তাহা সম্ভবে তাহা যিনি জানেন তিনিই জানেন তিনি ছাড়া আর কেহই তাহা জানে না—স্বয়ং বৃহস্পতিও না।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা রীতিমত প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইলাম যে প্রলয়কালীন শক্তিলীন ভৌতিক জগত এবং সেইসঙ্গে তাহার অধিকার্য্য মহাকাশ—কাণে শুনিতে মস্ত একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে রাশীকৃত শূন্যের সমষ্টি, এক কথায় একটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। অতঃপর কাল এবং কালাধীন ঘটনাসকল প্রকৃত পক্ষে কিরূপ পদার্থ তাহা বিধিমতে অনুসন্ধান করিয়া দেখা শ্রেয়ঃ বোধ করিতেছি, আগামী বারে সেই কার্য্যটিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবেক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিছুতেই ক্ষান্ত হইব না—তাহাতে এইরূপ বুঝায় যে দিগ্বিদিক ব্যাপী সমস্ত পৃথিবীময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার না করিয়া ক্ষান্ত হইব না। এইজন্য আমার এইরূপ ধারণা যে রাজ-চক্রবর্ত্তী শব্দের অর্থ চাকা ঘুরাণ রাজাধিরাজ, আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি বলিতেছি যে, বর্ত্তুল শব্দ বর্ত্তন শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অঙ্গ শব্দ অঙ্গুলি শব্দ হইতে উৎপন্ন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে এইজন্য যেহেতু হস্তপদ যেমন মোট শরীরের অঙ্গ—অঙ্গুলি তেমনি হস্তপদের অঙ্গ। পূর্ব্বতম আর্য্যভাষার শব্দ সকলের এইরূপ বিচিত্র লীলা দেখিয়া শুনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে nebulous শব্দকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে নভুল শব্দে যেমন তাহার ঠিক ভাবটি পরিস্ফুটতা লাভ করে, এমন আর কোন শব্দে নহে।

'চতুরঙ্গ' নামক গল্পের ফরাসী অনুবাদের ভূমিকা

(রোমাঁ রোঁলা লিখিত)

ফরাসী দেশের লোক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা জানে তাহা হইতেছে, সেই ঋষিকবির সুগম্ভীর মুখমণ্ডল, রহস্য বেষ্টিত বিস্ময়াকর্ষক দেহশ্রী, তাঁহার শান্ত বাণী, সুসমঞ্জস গতি, প্রশান্ত মহিমায় সমুজ্জ্বল সুন্দর পক্ষ্ম-বিশিষ্ট পিঙ্গলাভ নয়নের জ্যোতিঃ। কেহ দর্শনের জন্য তাঁহার সমীপস্থ হইলে সে ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত না হইয়াও মনে করে যেন সে একটী দেবালয়ে রহিয়াছে এবং শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বশতঃ তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু হইয়া আসে। তাহার পরে যদি সে সেই আত্ম-মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত মুখশ্রী এক পাশ হইতে দেখে, সে অনুভব করে উঁহার রেখানিচয়ের শান্ত সঙ্গীতের নিম্নে একটী নির্জ্জিত বিষাদ, বিভ্রমবর্জ্জিত অন্তর্দৃষ্টি, পুরুষোচিত প্রজ্ঞা—যাহা আত্মাকে অনাকুল রাখিয়া অবিচলিত দৃষ্টিপাতে জীবনের সংগ্রাম শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য করিতেছে; তাহার মনে পড়ে, আলো ও ছায়ায় বোনা তাঁহার সমুন্নত কবিতার কথা;

যেখানে শাশ্বত আত্মা, প্রণয়ী ভগবানের উদ্দেশে রহস্যময় পথিকের মত জগতে জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়, যেখানে বেদের ভাস্বরতা বিদ্যুতের মত প্রকাশ পায়; তাহার আরো মনে হয় পতনোন্মুখ বিজয়-দৃপ্ত সভ্যতা সমূহের উপর রুদ্রের অভিশাপের ন্যায়, জগতের জাতি সমূহের প্রতি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী।

তদীয় পূর্ব্বপুরুষেরা যাগযজ্ঞাদি করিবার সময় যে ভাষা ব্যবহার করিতেন এই ব্রাহ্মণের ভাষাও তদনুরূপ; তবে ইহার বিশেষত্ব এই যে সকলেরই ইহাকে আপন মনে হইতে পারে। ইয়োরোপ যখন ভারতের মহান্ ঋষিগণের কথা ভাবিতে গিয়া তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যের কথাই ভাবে তখন সে বুদ্ধের অধরস্থিত স্মিতহাস্য ও মজ্ঝিমনিকায়ে উল্লিখিত তাহার পরিহাস মিশ্রিত করুণার কথা ভাবিতে ভুলিয়া যায়। বাইবেলে উল্লিখিত ভীষণ ঈশ্বর ছাড়া (আমার মনে হয় তিনি কখনো হাসেন নাই) এশিয়ার আর সকল মহাপুরুষ ও দেবতা পরিহাস জানিতেন। সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থেও ইহা পাওয়া যায়। কেবল আমরাই—ইয়োরোপের অদ্ভুত ভালুকেরাই মনে করি, আমাদের সমস্ত লক্ষণই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, যদিও আমাদের পবিত্র কাহিনী গুলিতে হাস্যরস রহিয়াছে।

বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—একদা একটী ছাগ শিশু ব্রহ্মার নিকট গিয়া নালিশ করিল "ভগবন্ আমি কেন সকল প্রাণীর খাদ্য?" ব্রহ্মা বলিলেন, "বৎস আমি কি করিতে পারি বল, যখন তোমায় প্রতি তাকাই আমারই যে তোমাকে খাইতে ইচ্ছা হয়।"

যখন ব্রহ্মাও তাঁহার প্রাণীদের সঙ্গে রসিকতা করেন, ক্ষুদ্রতর দেবতা ও মহাপুরুষেরাও তাহা করিয়া থাকেন। তাহাদের ধর্ম্মোৎসব গুলি প্রায় সবই এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দে পূর্ণ। ই, এম, ফষ্টার রচিত 'ভারতে গমন' নামক চিত্তাকর্ষক উপন্যাসে কৃষ্ণের জন্মোৎসব বিবৃত হইয়াছে। উহাতে দোলনাস্থিত ভগবানের আনন্দ উৎপাদনের জন্য সঙ্গীত নৃত্য ও শিশুদের ক্রীড়া রহিয়াছে। পদস্থ ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত লোক, এবং চাপল্যহীন ব্যবসায়ীরা খালি-পায়, মালা গলায় ও করতাল হাতে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বর্ণিত স্বামীর শিষ্যদের মত উহাতে যোগ দিয়া উহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। হিমালয়ের দেবতারাও তাহাদের মাস্‌তুত ভাই গ্রীকদেবতাদের মত হাসিতে পারেন। ভারতীয় মহাপুরুষেরা মায়া দ্বারা মুগ্ধ না হইয়া তাহার লীলা আরো ভাল করিয়া উপভোগ করিয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া তাঁহাদের আন্তরিক ভক্তেরাও আশ্চর্য্যান্বিত হন।

মদীয় বন্ধু এণ্ডরুজ, যিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রিয়পাত্রদের একজন এবং যাঁহার নিকট ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্বদেশ, তিনি বলিয়াছেন যে তিনি যখন সর্ব্ব প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন তখন তাহার নিজের মুখশ্রী নিশ্চল করিতে এবং প্রভুজনের ন্যায় গম্ভীরভাবে আলাপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু দিন শেষ না হইতেই গুরুদেব তাহাকে এমন জাদু করিয়াছিলেন যে তাহা স্মরণ করিয়া এখনো তাঁহার হাসি পায়।

ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তি ও কবিজনের মধ্যে কখনো হাস্য সৃজন বা উপভোগ ক্ষমতার অভাব ছিল না। অন্তর্দৃষ্টিবান্ কবিকে লোকে ধ্যানমগ্ন কল্পনা করিলেও তিনি শক্তিমান্ কবি কার্লি স্পিট্‌লারের ন্যায় স্মিতহাস্যের সহিত সুখদুঃখময় জগৎ নাট্যকে দর্শন করেন, এবং সেই শত বিভিন্ন অঙ্কে পূর্ণ নাট্যের উল্লাস ও করুণা কোনটীকেই বাদ দেন না।

রবীন্দ্রনাথ এমন এক বেদনাময় যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহা বিশ্বমানব ও তাঁহার স্বদেশের ভবিষ্যতের পক্ষে প্রয়োজনপূর্ণ। তাঁহার সমসাময়িক যে সব জাতি কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বতীকে উত্তীর্ণ হইতে চাহে তাহাদিগকে আলোক প্রদান করা ও তাহাদের পথের সহায় হওয়ার যে কর্ত্তব্য তাহাই তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এজন্যই কবি সুলভ প্রজ্ঞালোক ও ঋষিসুলভ চারিত্র্য তাঁহার দৃষ্টিতে প্রথম স্থান পাইয়াছে; পর্য্যবেক্ষণের ফল তাহাতে দ্বিতীয় স্থান পাইয়াছে মাত্র। ইয়োরোপের দৃষ্টি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থের

প্রতি অপেক্ষাকৃত কম আকৃষ্ট হইয়াছে। কাব্য ও প্রবন্ধ নিচয়ের একটা বিশ্বজনীন রূপ আছে কিন্তু গল্প ও উপন্যাস সমূহের পর্য্যবেক্ষণের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভারতীয়। অথচ ঠিক এই কারণেই এবং শ্রেণীর গ্রন্থগুলির প্রতি সেই সব লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত যাহারা ইতঃপূর্ব্বে প্রাচ্যভূমির এবং ভারতবর্ষীয় সূর্য্যের বিকীর্ণ অত্যুজ্জ্বল আলোকে মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশ বসুর ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তি এবং মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় পুরুষের স্বজাতীয়গণের সম্বন্ধে আরো কিছু জানিতে চাহেন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'ঘরে-বাইরে' ফরাসীতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা একখানি সুন্দর পুস্তক কিন্তু ইহাতে তাহার পর্য্যবেক্ষণমূলক গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে আছে, কারণ ইহা অত্যন্ত গীতিকাব্য-ভাবাপন্ন এবং তাহার কাব্য নিচয়ের অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

কিন্তু ইহা ছাড়াও কয়েকখানি সামাজিক উপন্যাস আছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজ চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনভাবে এবং অ-তিক্তভাবে ঐ কাজ করিয়াছেন। অন্ধতা চালিত না হইয়া তিনি এক পরিহাস মিশ্রিত করুণার সহিত বাংলার ধনী ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক (বুর্জোয়া) দিগকে আক্রমণ করিয়াছেন।

এই গল্পগুলির কতিপয়ে নারীসমস্যা—বিশেষভাবে ভারতীয় বিধবার শোচনীয় সমস্যা—তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বিধবারা পুনর্বিবাহ করিতে পারে না; তাহাদের নিজের কোন গৃহ নাই, কোন নিজস্ব জিনিষ নাই, এমন কি নিজের উপরও তাহাদের অধিকার নাই। উপস্থিত উপন্যাসে ঐ সমস্ত গৌণবস্তু, কিন্তু 'বন্ধু' নামক গল্পে উহাই মুখ্যবস্তু।

রবীন্দ্রনাথের প্রধান গ্রন্থ ও বৃহত্তম উপন্যাস গোরায় ভারতীয় সমাজের দুই দলকে মুখোমুখি দেখা যায়। এক দিকে রক্ষণশীল, জাতীয়তাভিমানী, প্রাচীনপন্থী গোঁড়ামীরদল, অপরদিকে স্বাধীন-ভাবুক আর ব্রাহ্মসমাজ, যাহারা প্রথম দল অপেক্ষা কিছুমাত্র সহিষ্ণু নহেন। ইহা একটী পূর্ণাঙ্গ চিত্র এবং ইহাতে খুব সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় কারণ এই চিত্র দেখিয়া উভয় পক্ষেই গ্রন্থকারের শত্রু দেখা দিয়াছিল। গ্রন্থের নায়ক যখন ধর্ম্ম ও জাতীয়তা চর্চ্চায় বিশেষভাবে মাতিয়াছিল তখন তিনি কিঞ্চিৎ করুণা মিশ্রিত শাণিত পরিহাস ও এক প্রাকৃত আনন্দের সহিত ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সে দয়ালু এবং উদার ভাবাপন্ন হিন্দু-পরিবারে গৃহীত আইরিশের ছেলে। এই বৃহৎ গ্রন্থখানিতে ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষের একটী সুস্পষ্ট ছবি রহিয়াছে। (বিকাশ এত দ্রুতবেগে চলিয়াছে যে আমাদের বন্ধু পিয়ারসন্ ১৯১৬ সালে ভারত ছাড়িবার পরে পুনর্ব্বার যখন ১৯১৯ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তিনি উহাকে চিনিতে পারেন নাই) তাই ঐ বহি প্রকাশের কথা মনে করিবার পূর্ব্বে প্রকাশক ফরাসীপাঠককে 'চতুরঙ্গ' নামক গল্পটী উপহার দিতেছেন। আমাদের ধারণা তাহাদের নিকট উহা বিদেশীয় মনে হইবে না। ভাবপ্রবণ নৃত্যশীল স্বামী লীলানন্দ ও সতীশ, যিনি ভগবানের জন্য সমস্ত রাস্তা ঘুরিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া পাইবার জন্য পরিশেষে তাঁহার প্রতিও বিমুখ হইয়াছিলেন, এই দুইটী চরিত্র ইউরোপের রাস্তায় পাওয়া যায় না। সাধু, নাস্তিক, ভারতীয় স্বাধীনভাবুক, জগমোহন এবং শ্রীবিলাসকে আমরা চিনিতে পারি এবং শ্রীবিলাস সব সময়েই একটু ত্যাগস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে স্ত্রীচরিত্র ভালই আঁকা হয়। 'বন্ধু' গল্পটীর স্ত্রীচরিত্র প্রবল-অনুরাগপূর্ণ স্নিগ্ধতার একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁহার গ্রন্থে পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরাই অধিকতর অকৃত্রিম মূর্ত্তিতে দেখা দেখা দেয়। ইহার কারণ বোধ হয় মেয়েরা সেই বিশ্বজনীন প্রকৃতির অধিকতর নিকটবর্ত্তী যাহা দেশকালের সামাজিক সংস্কার দ্বারা শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

এই গল্পটী পড়িয়া লোকের একটী অভিজাত বংশীয় ডিকেন্সের কথা মনে হয় অথবা থ্যাকারের বইএর কোন শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের কথা (H. Esmond) কারণ উহাতে রহিয়াছে একটি সর্ব্বব্যাপী দয়া, উৎপতনশীল হাস্য, করুণা ও হাস্যরসের মিশ্রণ এবং সকলের অন্তঃস্থিত বিষাদ। 'বলাকা'র

কবির যাহা নিজস্ব, তাহা হইতেছে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি এক সুগভীর প্রেম যাহাতে সমস্ত গল্পটী পরিস্নাত; আর সেই নীরবতাময় সঙ্গীত গল্পলেখকের তরল গতিচ্ছন্দের প্রভাবে, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে কম্পিত আত্মা নির্ব্বাক হওয়া সত্বেও গীতিময়।

রাজগীরের পথে

২৭শে ডিসেম্বর ১৯২৪, বেলা-১২টার সময়—

আমরা এখন নালন্দা দেখে ফিরছি, সত্যি সেই প্রাচীনকালের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐশ্বর্য্য দেখে মুগ্ধ হলুম। এতদিন বইতে পড়েছিলুম নালন্দার কথা, হুয়েনসাংয়ের বর্ণনার উপর রং ফলিয়ে নালন্দার একটি ছবি কল্পনায় এঁকে নিয়েছিলুম। আজ সেই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হল। এখানে সেই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনে এসে ধন্য হলুম। এখন রেলপথ হওয়াতে এখানে আসা সোজা হয়েছে, কিন্তু সেই হাজার বছর আগে যখন হুয়েনসাং এবং তাঁর সঙ্গী চীনারা এখানে এসেছিলেন আচার্য্য শীলভদ্রের কাছে সংস্কৃত পড়তে, তখন পায়ে চলার পথেই তাঁদের আসতে হয়েছিল। কোথায় সেই সুদূর চীন, আর কোথায় নালন্দা, পূর্ব্বভারতের একটি ছোট্ট গ্রাম, তাঁরা কত কষ্ট সহ্য করে কত পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করে ধর্ম্মের টানে এখানে এসেছিলেন।

এখানে যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাহার মহত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করলাম, আগেকার ছাত্রাবাস কি রকম ছিল ছেলেরা কেমন থাকৃত, তাদের ঘর, সাধনার বিদ্যার ক্ষেত্র দেখে, তাদের পুরাণ ধরণের জীবন যাত্রার একটি ধারণা করতে পারলাম। কত ধরণের মূর্ত্তি বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, কত শিল্পের নিপুণ পরিচয় এখানে রয়েছে। কত শিল্পী, কত ভিক্ষু, কত বিদেশী ছাত্র যে এখানে এসেছিলেন সাধনা করতে। এই নালন্দা মহাভিক্ষু সংঘের মধ্যে কত শিল্পী যে ছিল তা কে বলতে পারে। শিল্পীরা কি করে প্রাণভরে এখানকার মন্দির মঠ সুন্দর করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা সেই শিল্পের মধ্য দিয়ে সত্য ও সুন্দরকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। একটা মঠ ধ্বংস হয়ে গেছে, তার পরে আর একদল ভিক্ষু এসেছে, তারা আবার সেই পুরাণ ধ্বংসের উপর নতুন করে মঠ তৈরী করেছে; তাই একই জায়গায় ৩৪ যুগের ধ্বংসের জিনিষ রয়েছে। যখন এই নানা ভিন্ন ভিন্ন যুগের ধ্বংসের সন্ধান পাওয়া যায়, তখন মন কতটা কৌতুহলী হয়ে ওঠে।

আবার বিধর্ম্মী রাজাদের নির্ম্মম অত্যাচারও মঠ সাদরে বুকে ধরে রয়েছে। কত রাজা এসে এখানকার মঠ পুড়িয়ে দিয়েছে, তার চিহ্ন এখনও মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া যায়। আবার কত রাজা লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন এর পুষ্টির জন্য।

এটী সাধনার এত সুন্দর জায়গা বলেই এখানে শীলভদ্রের মত পণ্ডিত সাধনা করতে পেরেছিলেন। তাই এখান থেকে নতুন নতুন জ্ঞান ও ধর্ম্মের উৎপত্তি হতে পেরেছিল।

এর চারিদিকের দৃশ্যও ভারি মনোরম, দেখলেই হুয়েনসাংয়ের বর্ণনার কথা মনে পড়ে।

রাজগীরের যাবার পথে মনে এইটাই বড় কষ্ট দিচ্ছিল যে প্রাচীন ভারতের বিদ্যাপীঠ আজ প্রাণহীন হয়ে পড়ে রয়েছে। আজকাল যখন আমরা শিক্ষাকে নতুনভাবে গড়তে চাইছি তখন যেন প্রাচীন আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখি।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কার

নানা কারণে আমাদের সমাজ পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের ন্যায় গতিশীল নহে। উহা যে একেবারেই গতিহীন তাহা নয়, তবে অন্যান্য সমাজের তুলনায় উহার গতিশীলতা সন্তোষজনক নহে। আধুনিক উন্নতির দিনে স্বসমাজের এই শিথিলতরগতি যে চিন্তাশীল মানবপ্রেমিক মাত্রকেই পীড়িত করে তাহা বলাই বাহুল্য। সেই হেতু দেখিতে পাই, বাঙালীর বর্ত্তমান সাহিত্যে, সামাজিক রীতি সমূহের কতকাংশের তীব্র সমালোচনা চলিতেছে। উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা সেই সমালোচনার সমালোচনা করিব। আশা করি পাঠক পাঠিকা বর্গ এই শ্রেণীর সাহিত্যিক মত প্রচারের (propagandara) কোন অংশ ত্যাজ্য কোন অংশ গ্রাহ্য তাহা নির্ণয় করার একটি সংকেত ইহাতে পাইবেন।

যাহারা সমাজতত্ত্বের কিছুমাত্র খবর রাখেন তাহারাই জানেন যে প্রত্যেক সামাজিক ঘটনা (phenomenon) কত বহুমুখী ক্রিয়ানিচয়ের ফল। যে কোন একটি ঘটনা আপাতঃ দৃষ্টিতে যতই সরল ও সহজবোধ্য হোক্ না কেন উহার পশ্চাতে এমন সব বিভিন্ন শক্তি কার্য্য করিতেছে যে বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও উহার কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া নিজ শক্তির সীমা সম্বন্ধে সচেতন হয়েন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অধিকাংশ লেখকই সমালোচনা কালে সামাজিক ঘটনাচয়ের উদ্ভব রহস্য যেন একেবারে ভুলিয়া যান। তাঁহাদের লেখায় যতই লিপি কুশলতা এবং আন্যান্য আনন্দদায়ক গুণ থাক্ না কেন, আবেগ বর্জ্জিত ভাবে পড়িলে উহা হইতে মনে হয় যে, সামাজিক সমস্যাগুলি যেন সমাজের অধিনায়ক পদবীস্থ কতিপয় অজ্ঞ বা অসাধু লোকের রক্ষণশীলতার ফল, এবং উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর প্রেম-বিরহময় করুণ উচ্ছাসের দ্বারা সমাজের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করিলেই উহার প্রতিরোধ হইতে পারে। আমরা বলি না যে ঐরূপ করুণ উচ্ছাসের রচনায় একেবারেই কোন সার্থকতা নাই এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে উহা উপভোগ করি না, কিন্তু যখন দেখি গ্রন্থের পর গ্রন্থে এক মৃত সমাজের প্রেতাত্মার প্রতি অহরহ সমাজসংস্কারী বীরদের নিন্দা ও বিদ্রুপবাণ বর্ষিত হইতেছে তখন হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। এস্থলে সমাজ না বলিয়া সমাজের প্রেতাত্মা বলা হইয়াছে এজন্য যে, যে সমাজকে সাধারণতঃ দায়ী করা হয় তাহা ষোল আনা প্রাচীন বা গোঁড়া সমাজ। এই সমাজ যে মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও যে অত্যাচার দেখা যায় তাহার জন্য কোন জীবিত সমাজ শরীর দায়ী নয়—দায়ী সেই প্রাচীন সমাজের ভূত। পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিকগণ তাহাদের আলোচ্য বিষয় বা নিজ নিজ কাব্য উপন্যাসাদির পাত্র-পাত্রীর উপস্থিত সুখদুঃখ লইয়া এতদূর মগ্ন থাকেন যে, তাঁহাদের গয়াপিণ্ড প্রত্যাশী মৃত প্রাচীন সমাজটীর খবর না রাখিয়া তাঁহারা গতানুগতিকভাবে উহার প্রেতাত্মার প্রতি নিন্দা ও বিদ্রুপ বর্ষণ করিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য সমাপন করেন। ফলে কি হয়? যে সমাজের বিরুদ্ধে অত পরিশ্রমে জনমত সৃষ্ট হয়, সেই সমাজের বাস্তবিক অনস্তিত্ব বশতঃ ঐ যুদ্ধ নিষ্ফল হয়। অধিকন্তু সমাজ শরীরের যে রোগকে লক্ষ্য করিয়া ঔষধ দেওয়া হয় সেই রোগ তাহাতে না থাকায় ঔষধের ক্রিয়ায় শরীর বিষাক্ত হয় হয় মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলি বিশদ করিবার জন্য একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য লইব? উহা অতি পুরাতন কন্যাদায় সমস্যা। সমস্যাটী বাংলার সাহিত্যে অনেক করুণ রসাত্মক নাট্য, কাব্য উপন্যাস ও গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু উহার সব গুলিরই প্রতিপাদ্য (১) কন্যার অপরিহার্য্য বিবাহ বয়সের কঠোরতা (২) বরের পিতার অর্থগৃধ্নুতা এবং এই উভয়ের জন্য রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজকেই পুনঃপুনঃ দায়ী করা হইয়াছে। সমাজের এই দায়িত্ব আমরা পরীক্ষা করিব। ইহা সকলেই জানেন ইংরেজাধিকার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সামাজিক অন্যান্য রীতির কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে আর এই পরিবর্ত্তনের বেশীর ভাগই প্রাচীন সমা-

জের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও হইয়াছে; উদাহরণ স্বরূপ সতীদাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনাদি উল্লেখ করা যায়। রাজ বিধি সাহায্যে রামমোহন রায় প্রভৃতি উন্নতিশীল নেতৃগণ যখন সতীদাহ নিষিদ্ধ করিলেন তখন যে গোঁড়া সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংস আশঙ্কায় তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই বংশধরগণ আজ সতীদাহকে বর্ব্বর প্রথা বলিতে কুণ্ঠিত হন না। আর উদারনীতিক শিক্ষানুরাগী মহাশয়গণ যখন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন তখন হইতে ক্রমে ক্রমে স্ত্রীশিক্ষা আমাদের সমাজে কেমন করিয়া নানা উপহাস ও বিড়ম্বনার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহার ইতিহাস সংস্কারাভিলাষী ব্যক্তি-গণের প্রণিধান যোগ্য। উপরের দুই ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে প্রাচীন সমাজের অপরাজেয় রক্ষণশীলতার কাহিনী কত অবাস্তব।

ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে শিক্ষা প্রচারের উপ-যুক্ত অর্থ থাকিলে সমাজকে উদার মতাবলম্বী করিয়া তোলার জন্য অন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। সতীদাহ যে নিবারিত হইতে পারিয়াছিল তাহার পশ্চাতে ছিল তৎকালীন উন্নতিশীল শিক্ষায় বর্দ্ধিত লোকমত। আর ইদানীং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কন্যা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে বাঁধাবাধি নিয়ম তাহা শিক্ষাবিরল স্থানেই বেশীরভাগে রহি-য়াছে। যে সব স্থানের লোক দেশকালোপযোগী শিক্ষায় বেশী অগ্রসর তাঁহারা আর এই মন্বাদি-প্রোক্ত কন্যা বিবা-হের অপরিহার্য্য বয়স সম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধা পোষণ করেন না। কাজেই দেখা যায়, শিক্ষা ও অর্থ এই দুইটী জিনিষ যুগপৎ বা পরস্পরের পরিপূরকভাবে সামাজিক উন্নতির গতি নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু এই দুইটী জিনিষের উৎস কোন খানে? এক দেশের শাসন যন্ত্রে (machinary of state এ) দুই, সচ্ছল জনসমাজে, (solvent people এ)। এদেশের লেখকদের অধিকাংশই ভাবেন না যে আমরা উভয়টী হইতেই বহুদূরে। শুধু লেখকরাই যে এ বিষয়ে দোষী তাহা নয়; রাজা রামমোহন রায়ের পর হইতে যাহারা সমাজ সংস্কার বিষয়ে আকাশস্পর্শী সুরে বক্তৃতা দিয়া আসিতেছেন, তাহাদের অধিকাংশই সামা-জিক সমস্যার রাজনীতি ও অর্থনীতি ঘটিত দিক্‌গুলির প্রতি লক্ষ্য করিতে মোটেই সাহস পান নাই। যেহেতু পাশ্চাত্য শাসন ও সভ্যতার সংঘর্ষে বিধ্বস্ত প্রাচীন সমাজের উপর গালিবর্ষণ করিয়া সংস্কারকের গৌরবলাভ যত সহজ, বৈদে-শিক স্বার্থের কবল হইতে শাসন যন্ত্রকে স্বায়ত্ত করা ও বহু বর্ষব্যাপী অর্থনীতিক সংস্কার দ্বারা দেশের অনন্যসাধারণ দারিদ্র্য দূর করা, এতদুভয়ই তত সহজ বা নিরাপদ নয়। এই কারণেই দেখা যায়, যাহারা সমাজ সংস্কারে চরমপন্থী, তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে নরমপন্থী। যাক্ এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি আমাদের কোন অভিযোগ নাই। কারণ তাঁহারা হয়তঃ নিজেদের কার্য্য প্রণালীতেই বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা দেশ কতকটা উপকৃতও হয়। কিন্তু সাহিত্যিক যখন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে যাইয়া আনুষঙ্গিক ভাবে মতপ্রচারও করেন এবং মতপ্রচারে আংশিক সত্য প্রচার করেন, তখন তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকা অন্যায় মনে হয়। কারণ সংস্কারকের উপদেশ বা তিরস্কার লোকের মনে ততটা রেখাপাত করে না কিন্তু কৃতী সাহিত্যিকগণের সৃষ্ট ভাষা ও রূপের ঐন্দ্রজালিক মোহ অতিক্রম করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন। তাঁহারা সুবিধা বোধে যে সমস্ত ঘটনাকে পটভূমিকায় গৌণস্থলে নির্ব্বাসিত করেন এবং মূল চিত্রে যাহা কখনো কখনো অতিরঞ্জিত করেন তাহাদের ফলে সাধারণ পাঠক নিজ বিচার শক্তিকে স্থির রাখিতে প্রায়ই অক্ষম হন; উদাহরণ স্বরূপ শ্রীযুত শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'অরক্ষণীয়া, গল্পটীর উল্লেখ করা যায়। বিবাহ বয়সের অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে সামাজিক নিয়মের নিষ্ঠুরতা ভাল করিয়া পাঠককে হৃদয়ঙ্গম করাইতে যাইয়া শরৎ বাবু জ্ঞানদাকে দিয়া তাহার পিতৃবিয়োগের দিনে যে দৃশ্য অভিনয় করাইয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক হইলেও পাঠকের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করে। কিন্তু পাঠকবর্গ কি ভাবেন যে সমাজ অপেক্ষা পিতার

দারিদ্র্যই জ্ঞানদার এই দুর্দ্দশার জন্য সমধিক দায়ী? এমন কি সমাজ যদি নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিবাহের চিন্তা তাহার পিতার স্কন্ধে নাও চাপাইত, তবু তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখ অসম্ভব ছিল? বাংলার শতকরা ৯৮ জন কেরাণী যে মৃত্যুকালে তাহার বিধবা ও কন্যাদির জন্য যথেষ্ট সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন না ইহা একটী অবিসংবাদিত সত্য। তাহার উপর ম্যালেরিয়া বসন্তাদি রোগ যাহারা রৌপ্যহীনকে ও রূপহীন, করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না তাহারা ত এই বঙ্গদেশকে যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে লইয়াছে। ধরিয়া লইলাম, সমাজ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছে কিন্তু তাহাতেই কি গোল মিটিল? পিতার মৃত্যুর পর জ্ঞানদা কি করিয়া জীবন ধারণ করিবে? "কেন, সে নিজে উপার্জ্জন করিবে, যদি সমাজ বাধা না দেয়।" কিন্তু সমাজ বাদী হওয়ারও আগে উপার্জ্জনের মত যে শিক্ষা দরকার, তাহা দেওয়ার মত সামর্থ্য সাধারণ দরিদ্র পিতার আছে কিনা তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে কি? ধরিয়া লওয়া গেল তাহার পিতা কষ্টেসৃষ্টে তাহাকে সেই শিক্ষাই বা দিয়া গেলেন কিন্তু তাহারই মত অসংখ্য জ্ঞানদা যদি উপার্জ্জন ক্ষেত্রে ভিড় করে তবে উপার্জ্জনের মাত্রা কমিবার, ও সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম বাড়িবার ভয় নাই কি? ধরিয়া লইলাম এই প্রতিকূল সংগ্রামেও সে জয়যুক্ত হইয়াছে কিন্তু তাহাতেই কি সে সুখী হইল বা জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিল? যাহারা চিন্তা করিয়া কথার উত্তর দেন তাহারা এস্থলে আরও চিন্তিত হইবেন কারণ জ্ঞানদার এখনো বিবাহ হয় নাই। বিবাহের অবশ্য কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি রহিয়াছে তাহার উল্লেখ এখানে করিব না, কেবল এই কথাটীই বলিব যে আদমকে সৃষ্টি করিয়াই ঈশ্বর যখন তাঁহার রবিবাসরীয় বিশ্রাম ভোগ করেন নাই তখন বুঝিতে হইবে পুরুষ ও নারীর জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিতে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের একটা নিশ্চিত প্রয়োজন আছে। অতি অল্প সংখ্যক লোক হয়ত ঐ প্রয়োজন ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন এবং অনেকে হয়ত বিশেষ আদর্শের অনুরোধে বা অন্য কারণে অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়েন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করা দুঃসাধ্য যে পুরুষ ও নারীর দৈনন্দিন জীবনে পরস্পরের নিবিড় সাহচর্য্যে না-থাকা স্বাস্থ্যপ্রদ বা মঙ্গল জনক।

কাজেই অবশ্য কর্ত্তব্য বিবাহ সমস্যার উদ্ভব। শুধু নারীর আর্থিক স্বাধীনতাই কেবল ঐ সমস্যা দূর করিতে পারে না। সর্ব্বাবস্থায়ই, হয় রূপ নয় রূপা বিবাহের বাজারে কন্যার ভাগ্য নির্দ্ধারণ করে। এরূপ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাই বোধ হয় স্বার্থপর মানব সমাজের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। যদি ও মুষ্টিমেয় লোক মাঝে মাঝে রূপ ও রূপা নিরপেক্ষ হইয়া বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয় তাহাদের দৃষ্টান্ত সমাজকে কোনকালে সমগ্ররূপে প্রভাবিত করিবে এমন দুরাশা যেন কাহারও না হয়। তাহাদের কাহিনী কাব্য নাট্য ও উপন্যাসে উপস্থিত হইয়া আমাদের আদর্শাভিমানকে খোরাক যোগাইবে মাত্র তাহার বেশী আর কিছুই নয়।

রূপ অর্থে সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য এই দুইই বোঝায়, এমন কি সময়ে সময়ে দুইই প্রায় অভিন্ন। লোকের যে রূপ প্রিয়তা সমাজের পক্ষে উহার প্রয়োজন আছে। যাহার স্বাস্থ্য নাই তাহার প্রতি যতই ভালবাসা বা সহানুভূতি থাক না, কেহ যদি তাহার সহিত পরিণীত হইয়া সংসারী হয় তবে দুর্ব্বল ও রুগ্ন সন্ততি সৃষ্টি করিয়া সে সমাজের নিকট অপরাধী হয়, আর ধনহীন কেহ যদি বিবাহ করিয়া সন্তানের পালন ও শিক্ষাদান করিতে অসমর্থ হয় তবে তাহারও অপরাধ হয়। কাজেই রোগের জন্যই হোক বা অর্থার্জ্জনেই হোক জ্ঞানদা যদি স্বাস্থ্য হারায় তবে তাহার দুর্দ্দশার অন্ত হইল না। এই গেল কন্যার দিক হইতে সমস্যাটির আলোচনা। বরের দিকে উহার আলোচনায় দেখি যে পূর্ব্বোক্ত আর্থিক কারণেই বরের পিতা পুত্রকে স্বাবলম্বনের শিক্ষা দিতে পারেন নাই অধিকন্তু তিনি অন্য দশজনের মত আর্থিক অভাব লইয়া জীবন সংগ্রামে রত। এই অভাবগ্রস্থ পিতা যে অপরিহার্য্য বিবাহ বয়সের সুবিধা লইয়া কন্যার পিতার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে কন্যা যখন পিতার

সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে পুত্রের সমশ্রেণীস্থ নহে, তখন কন্যার পিতার প্রতি যে জুলুম তাহাকে কতকটা ন্যায় বিচারের বলিয়াও সমর্থন করিতে পারা যায়। অবশ্য কন্যার পিতার অর্থশোষণের বেলায় পুত্রের পিতা এই যুক্তিটীর কথা ভাবেন না; অর্থাভাবই তাহাকে ঐ দুর্নীতিজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। অর্থ পিপাসা যে কখনো কখনো অভাব নিরপেক্ষ হইয়া দেখা দেয় তাহা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কিয়ৎসংখ্যক লোক যে রূপ ও রূপা নিরপেক্ষ হইয়া বিবাহ করে তাহারাই এই অভিযোগের বিরুদ্ধে বিচারের তুলাদণ্ডে সামাজিক দোষ গুণের সমতা সম্পাদন করেন। ইহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। সমাজের অধিকাংশ লোক সম্বন্ধে অর্থনীতি ঘটিত কারণ পূর্ব্ববৎ প্রবল থাকিয়া যায়।

কেবল কন্যাদায় নহে অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে উহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনীতি ও রাজনীতির সহিত জড়িত রহিয়াছে। যে পর্য্যন্ত দেশের লোকশিক্ষক বা সমাজ সংস্কারকগণ এই সত্যটীকে অবহেলা করিয়া কার্য্য করিবেন সে পর্য্যন্ত ফল লাভের কোন আশা নাই। সমাজের দুর্দ্দশার মূলে যে জনসাধারণের বিপুল দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা রহিয়াছে সেই সমূহের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সাহিত্যিক যদি কেবল গতানুগতিকভাবে মৃত প্রাচীন সমাজকেই লক্ষ্য করিয়া দোষারোপ করেন তবে সমাজের ক্ষতি করা হয় মাত্র। মতপ্রচারের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিলে সাহিত্যের রূপ ও রস ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যেখানে মতামত স্বতঃই আসিয়া দেখা দেয় সেখানে সাহিত্যিকের সতর্কতা অবলম্বন করা বোধ হয় সকল পক্ষেই নিরাপদ। নচেৎ সংস্কারের চেষ্টা করিতে গিয়া সমাজকে সংহার করিবারই চেষ্টা হইয়া পড়ে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"

পুরাতন পঞ্জিকা মানিয়া চলিলে পদে পদে ঠকিতে হইবে। গ্রহনক্ষত্র পাঁজির মুখ রক্ষা করিবার জন্য এক পা-ও নড়িবে না। এককালে জাহ্নবী স্রোত যেখানে বহিতেছিল সেখানে আজও বসিয়া থাকিলে অবাস্তব একটা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা রক্ষা করা হয় বটে--কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। শাস্ত্র হয়তো চিরকালের, মানুষের প্রকৃতি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এক রকম; কিন্তু তাহার অর্থকে নূতনযুগের জ্যোতিষ্কের আলোকে নূতন করিয়া দেখিতে হইবে।

শাস্ত্রে আছে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" শাস্ত্রকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। শেলীর মতে যিনি কেউনা-মানা শাস্ত্রকার তিনি ইহাকে নূতন কালের মতন করিয়া সার্থক করিয়াছেন।

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।"

কেন যে চলে তাহা অবিদিত নাই। নূতন-পাতানো গৃহস্থালীর মধ্যে আসিয়া যাঁহারা প্রহরকাল ধরিয়া সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় কাটান এবং পূর্ণিমার চাঁদকে চন্দ্রমণ্ডলের গোলত্ব প্রমাণের উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করেন—তাঁহাদের উপদেশ-কবল হইতে মুক্তি পাইতে বনে যাওয়াও কঠিন নহে। আমার মনে হয় বৃদ্ধকবি বাল্মীকি পিতৃসত্য রক্ষার ছলে নব বিবাহিত দম্পতীকে এই উপদেষ্টাদের কবল হইতে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইয়াছিলেন—যাকে আজকাল ইংরাজিতে বলে Honey moon তবে চৌদ্দ বছর মেয়াদটা কিছু দীর্ঘ হইয়াছিল।

আমরা এই শাস্ত্র বাক্যটির অন্য একটি ব্যাখ্যা দিতে

দুঃসাহস করিতেছি। "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—পঞ্চাশ অর্থে সাধারণতঃ আমরা বুঝি যাহা উনপঞ্চাশকে অতিক্রম করিয়া আছে। উনপঞ্চাশের সহিত বিরোধ করিতে আমরা চাহি না তবে বক্তব্য এই যে অনেক সময় পঞ্চাশ উনপঞ্চাশের আগেও বর্ত্তিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে স্বভাবত পঞ্চাশ একটি সচল পদার্থ কিন্তু তাহাকে আমরা অচল করিয়া তুলিয়াছি। এই খানেই তো বিপদ। নদীর স্রোত সচল—তাহাতে নৌকা ভাসাইয়া দিলে চলিয়া থাকে; কিন্তু সেই স্রোত যখন তীব্র হিমে জমিয়া অচল হইয়া উঠে তাহাতে নৌকা কিছুতেই চলিবে না; পালেও না—হালেও না। যে সব নিয়ম আজ অচল হইয়া উঠিয়া সমাজকে আটকাইয়া রাখিয়াছে তাহারা এক সময়ে এই সচল স্রোতের ন্যায় সমাজের অনুকূল ছিল। তাইতো রাজা বিশ্বামিত্র ঋষি বিশ্বামিত্র হইতে পারিয়াছিলেন; রাজত্ব ও ঋষিত্ব মিলাইয়াই রাজর্ষি জনক; তপোর্ষি গুরু গৌতম হীনজ সত্যকামকে সত্যকুল জাত বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছেন। কিন্তু এখন নিয়মের সেই স্থিতিস্থাপকতা চলিয়া গিয়াছে তাই আজ পঞ্চাশ পাঁচে শূন্যে পর্য্যবসিত।

শাস্ত্রকার পঞ্চাশ অর্থে বার্দ্ধক্য বুঝিয়াছিলেন। এখন এই বার্দ্ধক্য সকলের এক সময়ে উপস্থিত হয়না কারণ ইহা নির্ভর করে "মনের চুল পাকার" উপরে। মনের চুলের পাকতো দেহের-চুলের পাক দেখিয়া ধরে না। এমন লোক তো দেখিয়াছি যাহারা বুড়া হইয়া মরিল তবু "মনের চুলের" একগাছিও তাহাদের পাকিল না। আবার অন্যদলও আছে যাহারা পঞ্চাশ না উৎরাইতেই দাঁড়ে-বসা ময়নাটির মত বৈতরণীর ঘাটের ঠিকানা কপ্‌চাইতে লাগিল। অতএব দেখা যাইতেছে পঞ্চাশ অর্থে বার্দ্ধক্য এবং এই বার্দ্ধক্য একটি সচল অবস্থা। সুতরাং আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে দাঁড়াইল—"বৃদ্ধরা বনে যাইবে।"

কিন্তু ইহার প্রয়োজন কি? পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ Idealist; প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে সে মানুষের ভালো করিবার চেষ্টা করিতেছে; বস্তুত এই অতি ভালোর চাপেই সমাজের যা কিছু দুর্গতি। সবাই যদি Idealist তবে গোল বাধে কোথায়? অধিকাংশ লোকের Ideal বিভিন্ন এবং যে দল শক্তিতে ও সংখ্যায় প্রবল তাহাদের মতই চলিয়া থাকে। এখন, নানা কারণে সমাজে বৃদ্ধরা প্রবল—কাজেই তাঁহারা সমাজকে চালিত করিয়া থাকেন। হয়তো এই শাসনে সুবিধা বেশী তবু ইহা সহ্য করা চলিবে না। সমাজ বিধাতার পরীক্ষাগার—এখানে নানাযুগ ভালোমন্দ নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে আপনাকে প্রকাশ করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। মহাকাল যখন বিভিন্ন উপায়ে সমাজকে নিজের ইচ্ছামত গড়িতে প্রবৃত্ত হন বৃদ্ধেরা তখন আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা নিরঙ্কুশ শাসন প্রণালী পছন্দ করেন; এই শ্রেণীর লোকের মুস্কিল এই যে ইঁহারা মানুষের প্রতি ভালোবাসা হারান না কিন্তু বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন; ইঁহারা মানুষের মঙ্গল চান কিন্তু ভাবেন সব শাসনভার নিজেদের হাতে লইলেই বুঝি সমাজ ভালো চলিবে। অবশেষে তাঁহারা বুঝিতে পারেন তাঁহাদের হাতে যাহা ধরিতে পারে এই পৃথিবী তাহার চেয়ে অনেক বড়। এই খানেই তো গণ্ডগোল। ভালো তাঁহারা করিতে চান কিন্তু ভুলিয়া যান যে সমাজের সব চেয়ে ভালো করা হইবে যদি তাঁহারা "নবযৌবনের দলের" উপর সব ভার ছাড়িয়া দিয়া "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।"

শাস্ত্রকারেরা ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া বানপ্রস্থের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বস্তুত মানুষের জীবনে কোথাও স্থিতি নাই; নানা অবস্থার মধ্য দিয়া তাহার চলিয়া যাইবার মাত্র হুকুম আছে। কিন্তু সে এখন "সিন্ধুবাদের বুড়াটার" মত সমাজের নবীন দলের স্কন্ধে ভর করিয়াছে; সেই বুড়ার দাড়ি এত লম্বা যে নবীন হতভাগ্য লোকটা দাড়ির মাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া তাহাকে নিজের দাড়ি বলিয়া ভুল করিতে সুরু করিয়াছে; কাঁধের ভারটা বহিতে বহিতে প্রায় সেটার কথা ভুলিয়াই গিয়াছে। ছোট বেলা হইতেই সে চাণক্যের শ্লোক মুখস্থ করিতে সুরু করে; শিখিয়া লয়—নখী দন্তী, শৃঙ্গী হইতে কতটা দূরে থাকিতে হইবে। হায় আজকাল ছাপাখানার যুগ—এখন আর প্রক্ষিপ্ত চালাইবার উপায়

নাই—নতুবা চানক্যের শ্লোকের মধ্যে একটি লাইন বসাইয়া দিতাম "বৃদ্ধ লোক হইতে লক্ষ হস্ত দূরে থাকিবে।" ছোট বেলা হইতেই নানারূপ সারগর্ভ উপদেশ পড়িয়া আমরা সাবধানী হইয়া উঠিয়াছি। বিধাতঃ—ভালো হইবার মোহ আমাদের দূর করিয়া দাও—একবার আমরা প্রাণ ভরিয়া ভুল করিতে শিখি। ভোলানাথ তোমার সিদ্ধির প্রার্থনা আমাদের নহে—তুমি আমাদের স্বহস্তে ভুল করিতে শেখাও। একবার সমাজ হইতে বার্দ্ধক্যকে যেন দূর করিতে পারি।

সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই এই সামাজিক আন্দামানের দরকার। যখন সেখান হইতে আর্ত্তরব উঠিবে "সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল সর্ব্বনাশ হইল" তখন আমাদের উত্তর কি? উত্তর দিবার কোনো আবশ্যক নাই। নীরবতাই অনেক সময় সব চেয়ে বড় উত্তর। কিন্তু উত্তর যদি দিতেই হয় তবে বলিব—

নদীর এক কূলে যখন ভাঙন ধরিয়াছে—তখন সুনিশ্চিত অপর কূলে চরা পড়িতে সুরু করিয়াছে; সে কূল আমাদের চোখে না পড়িতে পারে সে চরা এখনো জলের তলায় থাকিতে পারে; কোনো শাস্ত্র-চশমার কূটদৃষ্টি তাহার রহস্য ভেদ না করিতে পারে; তবু তাহা নাই একথা বলিবার উপায় কি? এ কূলে ভাঙন ধরিয়াছে তাহাতো আর মিথ্যা নয়।

এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। তবু আর একটা কথা বলা আবশ্যক। "নব যৌবনের দল" আজ জয়লাভ করিয়া যদি মনে করে তাহারা চিরদিনের—তবেই আর এক বিপত্তির সূত্রপাত্র হইয়া রহিল। মহাকাল কোনো দলকে জয়যুক্ত করেন না তিনি নানা দলের মধ্য দিয়া নিজের যৌবনকে যাচাই করিয়া লন। তাঁহার সেই চিরনবীন উদ্দেশ্যের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পার—ভালো; নতুবা বাধা তুলিয়া তাঁহার সহিত লড়াই না করিয়া নীরবে সামাজিক আন্দামানে সরিয়া পড়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

গান

আজ কি তাহার বারতা পেলরে
কিশলয় ?
ওরা কার কথা কয়
বনময় ?
আকাশে আকাশে দূরে দূরে
সুরে সুরে
কোন্ পথিকের গাহে জয় ?
যেথা চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লিমুখর ঘন বনতলে,
এস কবি, এস, মালা পর,
বাঁশি ধর,
হোক্ গানে গানে বিনিময় ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি

র্সা -র্গা র্গা র্রা। র্সা -া র্সা না I ধনা -া ধা পক্সা। গা -া -া -া I -া -া সা রা।
আ জ্ কি তা হা র্ বা র তা ০ পে ল০ রে ০ ০ ০ ০ ০ কি শ

॥
গা -া -া -া I -া -া সা -রা। সা -পা পা পক্সা I গা -া -া -া। -া -া সা রা I
ল য় ০ ০ ০ ০ ও ০ রে ০ কি শ০ ল য় ০ ০ ০ ০ ও রা

{সা -পা পা -ক্সা। ধপা -ক্সা গা -মা I গা -া -া -া। (-ধা -পা -ক্সা -গরা)} I
কা র্ ক ০ থা ০ ক য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-া -া সা রা I গা -া -া -া। -া -া র্সা র্রা I র্সা -র্গা -া -া। -া -া -র্রা -র্সা II
০ ০ ব ন ম য় ০ ০ ০ ০ ব ন ম য় ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা গা II পা -া পা -া। পক্সা -ধা ধা -া I -া -া পা ধা। ধা -র্সা র্সা -া I
আ কা শে ০ আ ০ কা০ ০ শে ০ ০ ০ দূ রে দূ ০ রে ০

-া -া পা ধা। ধা -র্সা র্সা -া I -া -া -া -া। র্সর্গা -র্গা র্গা র্গা I র্রা -া র্রা র্রা।
০ ০ সু রে সু ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ কো ন্ প থি কে র্ গা হে

র্সা -া র্সা র্সা I না -া না না। ধা -া পা পা I {সা -পা পা -হ্মা। ধপা -হ্মা গা -মা I
জ য় গা হে জ য় গা হে জ য় ও য়া কা র ক ০ থা ০ ক য়

গা -া -া -া। (-ধা -পা -হ্মা -গরা)} I -া -া সা রা I গা -া -া -া। -া -া র্সা র্রা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব ন ম য় ০ ০ ০ ০ ব ন

র্সা -র্গা -া -া। -া -া -র্রা -র্সা II
ম য় ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা ধা II {ধর্সা র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সা র্সা I র্সনা -র্রা র্রর্সা -নর্সা। -া -া -া -া I
যে থা চাঁ পা কো র কে র্ শি খা জ্ব ০ লে ০ ০ ০ ০

পা -ধা না না। না -া না র্সা I র্সধা না র্সা র্সনা। ধপা -া (পা ধা)} I পা গা I
ঝি ল্ লি মু থ র্ ঘ ন ব ন ত ০ লে ০ যে থা এ স

পা -া পা -া। পহ্মা -ধা ধা -া I -া -া পা ধা। ধা -র্সা র্সা -া I -া -া পা ধা।
ক ০ বি ০ এ০ ০ স ০ ০ ০ মা লা প ০ র ০ ০ ০ বাঁ শী

ধা -র্সা র্সা -া। -া -া -া -া। র্সর্গা -া র্গা র্গা I র্রর্গা র্গা র্রা র্রা। র্সা -া র্সা র্সা I
ধ ০ র ০ ০ ০ ০ ০ হো ক্ গা নে গা নে বি নি ম য় গা নে

নর্সা র্সা র্সনা না। ধা -া পা পা I {সা -পা পা -হ্মা I ধপা -হ্মা গা -মা I গা -া -া -া।
গা নে বি নি ম য় ও য়া কা র্ ক ০ থা ০ ক য় রে ০ ০ ০

(-ধা -পা -হ্মা -গরা)} I -া -া -সা রা I গা -া -া -া। -া -া র্সা র্রা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ব ন ম য় ০ ০ ০ ০ ব ন

র্সা -র্গা -া -া। -া -া -র্রা -র্সা II II
ম য় ০ ০ ০ ০ ০ ০

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র

কলিকাতা, ২১।২ ২৫

কল্যাণবরেষু :—

শান্তিনিকেতনে যাহা কিছু দেখিলাম তাহাতে অবাক হইয়াছি। আমার কেমন একটা ধারণা ছিল, কবীন্দ্র ভাবলোকে বাস করেন—তাহাতে আবার ধনীর সন্তান হইয়া ভূমিষ্ঠ, সুতরাং যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার সহিত বাস্তব রাজ্যের বড় সম্পর্ক থাকিবে না। কিন্তু ওখানকার ছেলেরা ও মেয়েরা যেভাবে শিক্ষা পাইতেছে, তাহাতে তাহারা যে ভাবীজীবনে অকর্ম্মণ্য পুতুল হইবে এমন আশঙ্কা নাই। Plain living ও high thinking এর একত্র সমাবেশ হইয়াছে। পুস্তকালয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। যদি Europe বা Americaয় এরূপ সুবিধার পাঠাগার থাকিত তাহা হইলে শত শত জ্ঞান পিপাসু নানাস্থান হইতে আসিয়া তৃষ্ণা মিটাইত। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য hall mark ভিন্ন আর কোন রকম বিদ্যার চর্চ্চা করিতে চায় না। সুরুলের ব্যাপার আমার মনকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছে। চারিধারের দরিদ্র কৃষিদিগের সহিত সংস্পর্শ রাখিয়া যে কার্য্যকলাপ নির্দ্ধারণ হইতেছে ইহা অসাধ্য বিষয়। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ হইতে সন্তোষবাবুকে যে "ধার" করিয়া আনা হইয়াছে তাহাতে সফল ফলিবে আমার মনে হয়—কেননা তিনি একজন hide bound routine worker নন। কিন্তু enthusiast আর কালীমোহনবাবুর বিষয় কি বলিব?

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণ হইতে সুরু করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা এমন কি সুকুমারমতি শিশুগণ পর্য্যন্ত আমাকে যে প্রকার আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। আর বড় কর্ত্তার ত কথাই নাই, একটুখানি ঘা দিলেই অফুরন্ত প্রস্রবণের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। তাঁহার অমৃত নিঃস্যন্দিনী বাণী তাহাতে Kant, Hegel, সাংখ্য, গীতা harmoniously blended—শুনিতে কান জুড়ায়। চলিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। আমি আজ আয়াই রওনা হইতেছি, সেখান হইতে ফিরিয়া Diamond Harbour এর দক্ষিণে ৭।৮ ক্রোশ দূরে যাইতে হইবে। সেই "বড় হাঁড়ী" দিগের অনুষ্ঠিত সভায়—ফিরিয়া আসিয়া কুমিল্লা অভয়াশ্রমে। সেখান হইতে ফিরিবামাত্রই Benares বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত booked in advance এমন টানাছেঁড়ায় পড়িয়া গিয়াছি যে এই জীবন সন্ধ্যায় "Heven of repose", শান্তিনিকেতনে যে মনের সাধে ১০।১৫ দিন কাটাই তাহা ভাগ্যে ঘটিয়ে উঠে না। যাহা হউক কবিবরের এই অদ্ভুত কীর্ত্তি যাহাতে চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়দের শিক্ষা ও দীক্ষার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় তাহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

পুনশ্চ :—

এবার Khulna Dist. Conference আমাদের গ্রামে, এমন কি আমাদের বাড়ীতে আহুত। কিন্তু ২।৪ দিন যাইয়া যে সমস্ত ঠিকঠাক করিব এমন ফুরসৎ পাইয়া উঠিতেছি না।

উৎসের অনুসন্ধান

৩

সোমবার দিন মধ্যাহ্নেই ইস্কুলঘরের সম্মুখে একটা ভিড় জমিয়া গেল—কারণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। বাঙালী রথযাত্রার মেলা দেখিয়াছে—বরযাত্রীর ভিড় দেখিয়াছে—পূজার বাজারের ঠেলাঠেলি দেখিয়াছে—কলি-

তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে স্বরাজ উদ্ধারের ভিড় ঠেলিয়াছে—কিন্তু আবিষ্কারযাত্রার সভা এই প্রথম কিনা। ইস্কুলঘরের সামনেই খান দুই চেয়ার ও টেবিল পাতা—বক্তা ও সভাপতি বসিবেন। চারিদিকে লোক ঠেলাঠেলি করিতে করিতে একেবারে চৌকিগুলির উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এবং সকলেই "চুপ কর গোল করোনা" বলিয়া গোলমাল বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বিক্রমজিত কোথায়? ঘড়িতে ১—৫০ মিঃ। অতএব আমরা বুঝিলাম যে ২টার আগে তিনি কখনই আবির্ভূত হইবেন না—কারণ "Punctuality wins the field," ২টা বাজিল তবু মহাপুরুষদের দেখা নাই—মনকে সান্ত্বনা দিলাম যে মহাপুরুষদের ঘড়ি সাধারণ পড়িতে চলে না। সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় দূরে—সকলের চক্ষু সার্থক করিয়া বিক্রমজিৎ দেখা দিলেন। কি আশ্চর্য! তিনি যে বাহনে চড়িয়া আসিতেছেন প্রাণীতত্ত্ববিদেরা তাহাকে অশ্বজাতির মধ্যেই ফেলেন—কিন্তু সাধারণ লোকে তাহাকে বলে—গাধা। তা বলুক আরোহীর গৌরবে বাহনকে কেহই গাধা বলিতে সাহস করিবে না। কি অভিনব সাজ তাহার পরিচ্ছদ! মাথায় লাল টুপী—বিশালদেহে লাল একটা প্রকাণ্ড জামা বুকের কাছে বোতাম নাগাল পায় নাই তাই কালো একখানা কম্ফাটার দিয়া জড়ানো—পরনে শাদা প্যান্টলুন—পায়ে পাঁচসেরি বুট—হাতে চাবুক। এইরূপ সাজ সজ্জা করিয়া গাধার উপরে জিন কষিয়া বসিয়াছেন। গাধাটী টাটু গাধা কিনা কাজেই দেখিতে কিছু ছোট—জিনে পা ঝুলাইয়া রাখিলে পা মাটিতে ঠেকিয়া তলা দিয়া বাহন আরোহীকে ফেলিয়া চলিয়া যায়—তাই পা-দুখানা গুটাইয়া রাখাতে তাহা কাঁধের কাছে পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। বাঁ হাতে লাগাম—ডান হাতে চাবুক। বেচারা গাধা মাথা নীচু করিয়া সোয়ারের অতি গৌরবে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া চলিতেছে। এমন সময়ে পাড়ার কয়েকটা কুকুর গাধাটার পিছনে আসিয়া ডাকিয়া উঠিল। বাহনটি নিশ্চয়ই সাহসে আরোহীর সমকক্ষ নয় হঠাৎ ভয় পাইয়া সমুখের দুই পায়ে ভর করিয়া লাফ দিয়া উঠিল। লোকজন হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া যাইবার আগেই গাধাটা সোয়ার জিন ফেলিয়া এক দৌড়ে বাড়ীর পথ ধরিল—আর বিক্রমজিৎ তাহার বিশাল শরীর লইয়া পথের ধূলায় চিৎ। সকলে গিয়া তাহাকে তুলিয়া ফেলিল। ইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আহা বড় লেগেছে।" কিন্তু বিক্রম বীরত্ব ব্যঞ্জক মুখে গম্ভীরভাবে বলিল "such falls are natural in an expedition" কিন্তু আমার 'gallant' আমার 'gallant' গেল কোথায়।" ইস্কুলের কয়েকটি ছাত্র 'gallant' কে ধরিতে গেল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি গাধাটার কপালে একখানা কাগজ মারিয়া (পাছে বাহনের অশ্বত্ব সম্বন্ধে কাহারো ভুল হয় তাই) লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল "gallant the horse" কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও ভিড়ের কেহই গাধাকে ঘোড়া বলে নাই। ওদিকে ইস্কুলের ছেলেদের তাড়া খাইয়া গাধাটা প্রাণপণে ছুটিতে ও চীৎকার করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সভা আরম্ভ হইয়া গেল। ইস্কুলের হেড-মাষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বিক্রমজিতকে প্রধান বক্তার আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইস্কুলের ছোট একটি ছেলে দুইজনকে মাল্য চন্দনে শোভিত করিয়া গেল—অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। তাহাতে বিক্রমজিতকে—নূতন কলম্বস বলিয়া অভিবাদন করা হইল—এবং তিনি যে একটা নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে চলিয়াছেন—তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে শুনিলাম। তৎপরে বিক্রমজিত উঠিয়া স্বীয় ওজস্বিনী বাগ্মিতার দ্বারা জনগণকে বিমোহিত করিয়া নিজের আবিষ্কৃত "Punctuality wins the day." "Everything has its use" such falls are natural in an expedition." প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।—উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া সভ্য বৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "বল ভ্রাতৃগণ বল বন্ধুগণ বল পরিচিত অপরিচিত সাহসী ভীরু নবরাজ্য আবিষ্কার গৌরবান্বিত নটবরপুরবাসি মিত্রগণ কেন কেন কেন আমরা আজ এই বিদ্যালয়ের

সম্মুখে অশত্থ বৃক্ষতলে সমবেত হইয়াছি। বল-বল বল বন্ধুগণ।"

ইস্কুলের একটি ফক্কড় ছোকরা ভিড়ের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল "আপনিই বলুন—আমরা তো এখানে শুনতে এসেছি." তখন বিক্রমজিত সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া—আমাদের বিপদের সম্ভাবনা কত বেশী তাহা সম্যক্ ব্যাখা করিয়া দিলেন। "কোথাও পর্ব্বত কোথাও শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যানী, কোথাও ব্যাঘ্র হইতেও ভীষণ বর্ব্বর দস্যু ইহাদের কবল হইতে আর আমরা ফিরিতে পারিব না হয় তো ইহাই তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা ভ্রাতৃবৃন্দ—" এই করুন কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে তিনি এত বিচলিত হইলেন যে আর কথা বলিতে পারিলেন না—অতি অচিরে আমাদের ভয়াবহ মর্ম্মভেদী পরিণাম স্মরণ করিয়া বিক্রমজিত ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—তাহা নিজের দুঃখ স্মরণ করিয়া নয় কিন্তু নটবরপুর যে এমন একটি রত্ন হারাইবে সেই আশঙ্কাতেই। কিন্তু কিয়ৎপরেই আত্ম সংবরণ করিয়া বিক্রমজিত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন "ভয় কি বন্ধু! ভয় কি! ভয় নাই নটবরপুরবাসিগণ তোমাদের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিব আসিব নিশ্চয়। এই যে দুর্গম পথে যাইতেছি কার ভরসায়—এই যে—এই—" বলিয়া তিনি বন্দুকটি বাগাইয়া ধরিলেন। গোটা দুই ছোট ছেলে ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বীরবর বলিয়া চলিলেন "যতক্ষণ এই বন্দুক আমার হাতে আছে কোন ভয় নাই—না পশুর—না দস্যুর।" এইবার বীরবর যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া করুন ভাবে বলিলেন—"কিন্তু অদৃষ্টের লেখা কে বলিতে পারে ফিরিয়া না আসিতেও পারি। যদি না ফিরিয়া আসি-তবে আমার নটবরপুরের বাড়ী এবং বাগানের একটা বন্দবস্ত করিয়া যাওয়াই ভাল।" এই বলিয়া পকেট হইতে একখানা মোহর করা লেফাফা বাহির করিয়া ভিড়ের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন "বন্ধুগণ ইহাই আমার উইল।" জনতা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এতক্ষণে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া কয়েকটি বৃদ্ধ ও রমণী উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়া উঠিল। তাহাদের দেখিয়া ছোট ছেলে মেয়েরা কাঁদিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কান্না একটা মহামারীর মত সভার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে কান্নার আবেগ থামিলে—বিক্রমজিত বলিলেন—"হেডমাষ্টার মহাশয় গ্রামের সরকারী ডাক্তার ও নবীন সরকার মহাশয় আমার উইলের এক্সিকিউটর।" তৎপরে সভাপতি মহাশয় আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ঘর হইতে একখানা নিশান বাহির করিয়া আনিলেন। শাদা জমিনে লাল রঙের তরবারি ও দূরবীণ আঁকা। তিনি যথা সম্ভব গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া সেই পতাকা খানি বিক্রমজিতের হাতে দিয়া বলিলেন—"নটবরপুর আশা করে—আপনি তাহার পতাকার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবেন।" কি তেজগর্ভবাণী। এমনি আর একটি বাণী প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ট্রাফলগারের জলযুদ্ধে উচ্চারিত হইয়াছিল। হেড মাষ্টার মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—আজিকার ঘটনা ও ট্রাফলগারের যুদ্ধ, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ এবং 'ট্রিটি অব্ সালবাইয়ের' পাশেই স্থান পাইবে। আর কি গৌরবময় সেই অদূরবর্ত্তী দিন যেদিন ছাপা ইতিহাসের পুঁথি হইতে নিজের ঘটনা তিনি এই ইস্কুলের ছেলেদের পড়াইবেন। তখন হতভাগ্য ছাত্ররা রণজিৎ সিংহ এবং তাহাদের হেড মাষ্টার মহাশয়ের নাম এক বহিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে।

যাত্রার সময় আসন্ন—সকলে মিলিয়া গাধাটাকে ধরিয়া বিক্রমজিতের নিকটে আনিল। বেচারা গাধা একবার তাহাকে পিঠে লইয়া বুঝিয়াছে উক্ত আরোহীর গুরুত্ব আবিষ্কারের গুরুত্ব অপেক্ষা কিছু বেশী। সুতরাং পুনরায় তাহাকে পিঠে লইতে তাহার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া বসিল। বিশেষতঃ বীরবরে পোষাকের বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিয়া গাধাটা উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া উঠিয়া পা ছুঁড়িয়া দৌড় মারিল। পিছনে পিছনে কয়েকটি লোক তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দৌড়াইল। বিক্রমজিৎ বিরক্ত হইয়া হেডমাষ্টার মশায়ের দিকে এমন ভাবে তাকাইলেন—যে তাহার ভাষায় অনুবাদ দাঁড়ায় এই

রকম। "হায় হতভাগ্য গাধা। নেলশনের ভিক্‌টরি যেমন নেপোলিয়ানের অপূর্ব্ব শকট যেমন—প্রতাপসিংহের চৈতক যেমন—তেমনি ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি তোমার ভাগ্যে ছিল কিন্তু তুমি তাহা স্বেচ্ছায় তোমার পদ দ্বারা (বিশেষভাবে পিছনের পা দু'খানা) প্রত্যাখান করিলে! আমি কি করিব।" বিক্রম কহিলেন "না ও ঘোড়াটায় আর যাবো না।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই কয়েকটি লোক মিনতি পূর্ণ স্বরে বলিল "আহা আহা হতভাগ্য জন্তুকে ঐতিহাসিক গৌরব হইতে বঞ্চিত করিবেন না।" তাহাদের সকলেই যেন ইতিহাসের ছাপা পৃষ্ঠায় মানস দৃষ্টিতে লেখা দেখিতে পাইতেছিল "নটবরপুর, gallant the horse" অনেক কষ্টে gallantকে ধরিয়া আনা হইল। বিক্রমজিত এক লাফে তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিলেন—কাঁধে তাহার ঝুলিতেছে বন্দুক কোমরে দূরবীন ও বিপদের সময় বাজাইবার জন্ম শিঙা, অন্যদিকে ছোরা পিঠে শক্ত করিয়া বাঁধা পতাকা—ডান হাতে চাবুক বাঁ হাতে লাগাম। আরোহীর ওজন আসবাব পত্রের ওজনে মিলিয়া নেহাৎ কম নহে। হায় হতভাগ্য জন্তু তুমি যে ঐতিহাসিক গৌরব লাভ করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে এমন বোধ হয় না। যাহা হউক্ বিক্রমজিৎ টুপি খুলিয়া উপস্থিত জনতার নিকট বিদায় চাহিতেই সকলে সমস্বরে হাকিয়া উঠিল "জয় বীর বিক্রমজিৎকী জয় জয়। জয় নটবরপুরকী জয়।" এই ভীষণ গোলমালে ভয় পাইয়া গাধটা তাড়াতাড়ি হাঁটিতে সুরু করিল—আমরাও পিছনে দুই গরুর গাড়ী মাল বোঝাই করিয়া রওনা হইলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের গ্রাম শালতালমহুয়া গাছের আড়ালে ঢাকা পড়িল। প্রায় আধঘণ্টা পরে যখন ২ মাইল দূর হইতে আমাদের গ্রামের তাকাইলাম তখন দেখিলাম শুধু দেখা যাইতেছে গাছের সারির মাথার উপর দিয়া গ্রামের লৌহ মন্দিরের চূড়াটি।

কবিতা

বসন্তেরি ঢেউ উঠেছে
ফাগুন বায়ে বায়ে
প্রাণের বনে ফুল ফুটেছে
তোমার পায়ে পায়ে।
আকাশ হানে কৃপান তাহার
স্তব্ধ ধরা পানে
তোমার আঁখি খেল্‌ছে আমার
নীরব মুগ্ধ প্রাণে।

শুধু দূরের কালের স্মৃতি এসব ওগো নিঠুর প্রিয়ে
সে যে সুখের দিনের চরণ-ধ্বনি বাজে আমার হিয়ে।

শ্রীজাহাঙ্গীর জীবাজী বকিল।

Wireless of Insects

by

S. R. M. Naidu. F. R. S., M. R. A., etc.

Communication between insects, or so-called "inferior animals" has long been observed with great interest by scientists, and in this article it has been endeavoured to deal this question in a fascinating manner.

Everyone admits that the dogs world is

quite different to ours. One difference is that smell impressions count for much more to the dog than they do to us. The dog builds up many associations which are based on smells, whereas man is to a much greater degree ear or eye minded.

But the difference between our world and the dog's is small when compared with the difference between our world and the insects The senses of insects are so different from ours that we find it difficult to understand them. In studing insects we find ourselves in a strange world, and it is very likely that we put a wrong interpretation on some of the things that we see happening. Let us observe some of the differences.

It has been shewn for some insects that they can perceive light through the general surface of their body, although it is covered all over with a non-living cuticle of chitin, which lies outside the living skin.

The eyeless larvæ of some flies will retreat from blue light and settle down in red light as if they were in darkness. Some blind cave beetles certainly perceive the light of a candle. But there is nothing in higher animals corresponding to this skin sense of light.

Many flat fishes change the colour of their skin very quickly according to the colour of their surroundings, but it is only the eye that the outside colour directly affects. The message travels from the eye to the brain, and to other parts of the nervous system, only reaching the skin indirectly : A blind flat fish does not change colour.

The hearing of a mosquito

Another difference concerns hearing. In a few cases it has been proved that insects can hear, but no naturalist believes that hearing plays a very important role in the ordinary life of insects. It is of most significance in connection with mating, for the sounds made by certain male insects, such as grasshoppers seem to attract, and excite the females.

It has been proved that the hairs on the antenna or feeler of a mosquito vibrate sympathetically when a turning fork is sounded at a certain rate. The maximum quivering was seen when the turning fork's vibrations were 512 per second, and were producing a note approximately the same as that upon which the female mosquito hums. It is believed that the male adjusts his body so that both his antennae are equally affected by the note of the female, and then goes straight ahead, turning neither to the right nor the left. If his two antennae are kept equally stimulated, he is bound to reach his destination. But our general point is simply this, that hearing does not play among insects a part at all comparable to its role among higher animals.

On the other hand, the sense of smell is far more important and often very subtle. It

is often of critical moment, for it is by smell that many insects find their food, and it is by smell that many insects find their mates. The smelling structures often take the form of little pits in the cuticle, each enclosing a sensory cell ; or they may be minute cones projecting on the surface. They are often situated on the antennae but they are not confined to this position.

There are said to be about 17000 olfactory pits on each antenna of a blue-fly, so it is not surprising that the insect finds the decaying meat. When its antennæ have been amputated it does not find the meat.

It must be borne in mind, that in many insects sight is more important than smell, as far as finding food is concerned. Thus in the case of a dragonfly, while disposing of its prey, the large eyes count for most in the capture.

Often there is a very striking difference between the male and the female as regards the number of olfactory structures on the antennæ ; and this is to be interpreted in connection with the fact that the male searches for its mate. The male cockshafer has about 39000 olfactory pits on each feeler ; the female has 35000 but .the disproportion is often much greater, sometimes three to one.

It has repeatedly been proved that a female moth will attract males from a good distance. Now we would like to know how she communicates the news of her presence, and what is here wireless Professor. J. W. Folsom in his admirable text-book on "Entomology" tells us that "under favourable conditions, a freshly emerged female of the Promethens moth, exposed out of doors in the latter part of the afternoon, will attract scores of males."

The female exhales an odour, and this is spread by the breezes. The males come up against the wind ; if they pass the female they turn back and try again until she is spotted, vibrating the antennæ rapidly as they near her. When the male's antennae is amputated it flies about aimlessly.

When a queen is removed from a busy hive the workers get perturbed, and they become panicky. As soon as the queen is replaced, the result is the rapid restoration of law and order. The most striking thing here is the rapidity with which the queen is missed and the rapidity wiqh which the workers are reassured when she returns. Here is the problem how the queen makes the workers aware that she is with them, and some bee-experts would answer that there is a specialised queen odour is distinguished from a worker-odour.

If must be recognised that there are not a few curious sensory structures in the insects world whose significance we have not as yet discovered. They have all the marks of sensory end-organs, but they do not appear to

have to do with touch or taste, sight or hearing or smell. It is highly probable that some of them are sensitivo to changes in temperature, pressure, & moisture. The "poisers" which take place of the hind wings in flies are very probably balancing organs. But our point is that some of these sensory structures whose use is still unknown may have something to do with communications between insects. They may be telephonic "receptors" whose secret we do not know.

When two ants meet, often, they stroke one another's antennæ, and it is highly probable that they are exchanging tidings. There isn't anything very mysterious in this, since the antennæ are much more touchy than our finger tips, and much far sensitive to ordours than our nostrils moreover particles of food, such as sugar are often adherent to the mouth parts.

In some cases there are readily intelligible communications between insects. Here I refer to sounds. There are 4 main ways in which sounds are produced by insects, i. e., by rubbing one hard part against another, as in the case of grasshoppers ; by rapidly vibrating a pair of membranes or drums, in the "shrilling" of the male cicada, by rapidly vibrating the wings, as in house-flies, and by the vibration of a membrane or chitnous projection behind the spiracles or breathing apertures as in buzzing bees or flies—

To sum up, insects may communicate with one another (1) by visual signals, such as we see in the glow-worm and the fire-fly, (2) by sounds, as in grasshoppers, (3) by smell, as in ants and bees, (4 by tonch, as in ants again, and possibly by other sensory receptors.

পুস্তক-পরিচয়

ভারতে জাতীয় আন্দোলন:—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (লাইব্রেরিয়ান, বিশ্বভারতী) প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী, বরদা এজেন্সী কলিকাতা (১৯২৫) আকার ৭⅝″ × ৫¼″; পৃষ্ঠা ১৲+৩.৯ ; দাম ২॥০— কংগ্রেসের পূর্ব্বযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলন কি করিয়া ক্রমবিকাশের নিয়মে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে এই ইতিবৃত্ত যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহাদের জন্ত এতকাল পরে একখানি বই রচিত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত জাতীয় ইতিহাসের উপাদান সমূহকে যেরূপ সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে সাধারণ পাঠক অতি অল্প আয়াসেই পৃথক্ পৃথক্ ঘটনাগুলির কার্য্য কারণ পরম্পরা আবিষ্কার করিয়া ভবিষ্যতের জন্ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হইবেন। ইহা ছাড়াও কৌতূহলী পাঠক বিপ্লবকর্ম্ম, খেলাফত-আন্দোলন ও প্রবাসী ভারতবাসী ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস জানিতে পারিবেন। এই কয়টী কথা ছাড়া অন্ত প্রশংসা করিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। যাঁহারা দেশকে ভালবাসেন বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের সকলেরই এই বইখানি একবার ভাল করিয়া পড়া উচিত। সন্ধানী পাঠকের উপচীয়মান কৌতূহল নিবারণের জন্ত গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে একখানি পূর্ণাঙ্গ প্রমাণপঞ্জী,

(Bibliography) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ছাপা কাগজ বাঁধাই সম্বন্ধে অভিযোগ করিবার মত বিশেষ কিছুই নাই; কেবল কয়েকটী ছাপার ভুল রহিয়াছে যাহার কথা গ্রন্থকার নিবেদনে জানাইয়াছেন। পরিশেষে একটী কথা উল্লেখ করা উচিত যে স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থখানির একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

আশ্রম সংবাদ

পূজনীয় গুরুদেব

পূজনীয় গুরুদেব বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। এখন তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের বাসাতে আছেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বেকার অপেক্ষা কিছু সুস্থ হইয়াছে।

অসমাপ্ত বসন্তোৎসব

বিগত দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে 'সুন্দর' নামে ছোট একটি গীতি-ভূমিকা অভিনয় হইবার কথা ছিল।

স্বয়ং গুরুদেব ছাত্র-ছাত্রীদের ইহার গানগুলি শিখাইয়াছিলেন। আম্রকুঞ্জে অভিনয় স্থলটি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের তত্বাবধানে সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। অভিনয়ের দল ও অভিনয়ের স্থল যখন প্রস্তুত এমন সময় সন্ধ্যাকালে আকাশ মেঘে ভরিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে বান-ডাকানো বৃষ্টিতে অনভিনীত উৎসবের উপরে অকস্মাৎ জল-যবনিকা টানিয়া দিল।

সভা সমিতি

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু-উপলক্ষ্যে আশ্রমে একদিন অনধ্যায় ছিল। এতদুপলক্ষ্যে প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা হয় এবং সন্ধ্যায় একটি সভা হয়। তাহাতে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু, নেপালবাবু ও এণ্ড্রুজ সাহেব জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর জীবনী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বিশ্বভারতীর গবেষণা সমিতির একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগের হিন্দিকবি 'দাতু' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। Mr. Collins suggested Iranian influence on Punjabi Sanskrit সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ভ্রমণ

ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় নেপালবাবু ও ফণীবাবু উত্তর বিভাগের ও পূর্ব্ব বিভাগের কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রীকে লইয়া মুর্শিদাবাদ, পলাশী প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

অধ্যাপক

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আশ্রমের কাজ হইতে ছয় মাসের ছুটি লইয়াছেন।

আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যাপক সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পুনরায় বহুদিন পরে আশ্রমের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া আশ্রমের সকলে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

আব্‌হাওয়া

ইতিমধ্যেই এবার এখানে বেশ গরম পড়িয়াছে। সকাল বেলার ক্লাশ ১০॥০ মধ্যে শেষ—হয় বিকালে তিনটার পূর্ব্বে ক্লাশ বসিতে পারে না। তবে এখনো জলের অনাটন পড়ে নাই।

গ্রীষ্মাবকাশ

আগামী গ্রীষ্মাবকাশ আগামী ১৭ই বৈশাখ বা ২৯শে এপ্রিল হইতে ৯ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়াছে।

স্বাস্থ্য

যদিও খুব গরম ইতিমধ্যেই পড়িয়াছে তবু কোনো বিশেষ অসুখ নাই। আশ্রমের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালোই আছে।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ } বৈশাখ, সন ১৩৩২ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা

২

কালের মূল্য নিরূপন

আকাশ এবং আকাশস্থিত জড়বস্তু-সকলের গোড়া'র বনিয়াদ যে, কিরূপ শূন্যের ব্যাপার তাহা বিগত প্রবন্ধে সাধ্য মতে বিবৃত করিয়া বলিয়াছি; এক্ষণে কাল যে পদার্থটা কিরূপ তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

বর্ত্তমান মুহূর্ত্তই কালের মুখ্য অঙ্গ। বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত কাহাকে বলে তাহা না জানিলে, ভূতমুহূর্ত্ত কাহাকে বলে তাহাও জানিতে পারা সম্ভবে না, ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্ত কাহাকে বলে তাহাও জানিতে পারা সম্ভবে না; সম্ভবে না তাহা এইজন্য—যেহেতু পূর্ব্বে কোনো-না-কোনো সময়ে যাহা **বর্ত্তমান ছিল** তাহারই নাম ভূত, আর পরে কোনো না কোনো সময়ে যাহা **বর্ত্তমান হইবে** তাহারই নাম ভবিষ্যৎ; কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, বর্ত্তমান কাহাকে বলে তাহা না জানিলে, ভূতভবিষ্যৎ কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারা—শিরো নাস্তি শিরঃপীড়ার ন্যায়—একান্ত পক্ষেই অসম্ভব। এই প্রকার বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে কেহ যদি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের খানাতল্লাসি করিতে যা'ন, তবে পা'ন না তিনি ছাই-ও—লাভের মধ্যে কেবল সংশয়ের ঘূর্ণাপাকে পা পিছলিয়া পড়িয়া গিয়া ক্রমাগতই হাবুডুবু খাইতে থাকেন। যেই তিনি একটি মুহূর্ত্তকে বর্ত্তমান ভাবিয়া তাহার চুলের ঝুঁটি মুঠাইতে যা'ন—তাহাকে "এই" বলিবা মাত্রই তাহা "নেই" হইয়া যায়। এইরূপ, আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, আকাশের শূন্য-নির্ব্বিশেষ বিন্দু নিচয়ও যেমন, কালের নিয়ত উড্ডীয়মান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তও তেমনি, দুইই ধরিতে ছুঁতে পাওয়া-যায়-না-গোচের একটা জ্ঞান বহির্ভূত পদার্থ। কিন্তু তা বলিয়া, আট পহুরিয়া ব্যবহার কালে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণ-দীর্ঘ ভূতপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পরম্পরা যোজনা করিয়া সর্ব্বসুদ্ধ ধরিয়া সমস্তটাকে মোটের উপর বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে আমরা ক্ষান্ত থাকি না। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখা'ন অতি চমৎকার। তাঁহারা বলেন—

অ্যাকশো-টা পদ্মপত্র উপর্যুপরি পাতিয়া রাখিয়া একটা তীক্ষ্ণ শলা দ্বারা মোট পত্রগুচ্ছটা'কে আমরা যদি এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া বিঁধিয়া ফেলি, তবে মোট বিঁধন-কালটুকুকে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি, তবেই, সেই পত্র শতকের যে যে টিকে যে যে মুহূর্ত্তে বিদ্ধ করি তাহা একেবারেই আমাদের ধারণার হস্ত এড়াইয়া যায়; এড়াইয়া যাইবারই কথা—যেহেতু মোট মুহূর্ত্তটার তাহা শতাংশের একাংশ বই নহে। তাঁহারা আরো বলেন এই যে, কোনো-একটি বিষয়ের নানাগুণ যখন আমরা নানা ইন্দ্রিয় দ্বারা পরে পরে উপলব্ধি করি, তখন আমাদের মনে হয় যে, সবগুলিই আমরা একমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতেছি; তার সাক্ষী, আমরা যখন একটা শস্কুল (অর্থাৎ পিষ্টক) পাত হইতে তুলিয়া লইয়া ভক্ষণ করিতে থাকি তখন সেই পিষ্টকটাকে প্রথম মুহূর্ত্তে চক্ষে দেখি, দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দন্তে চিবাই, তৃতীয় মুহূর্ত্তে জিহ্বায় আস্বাদন করি, অথচ মনে করি যে, এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই পিষ্টকটার দৃশ্যরূপ, স্পৃশ্য খণ্ডাংশ, এবং আস্বাদ্য রস তিন ইন্দ্রিয় দ্বারা চক্ষু দন্ত এবং জিহ্বা দ্বারা—একই অভিন্ন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে একসঙ্গে উপলব্ধি করিতেছি।

এইরূপ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে যাহাকে আমাদের আটপহুরিয়া ব্যবহার কালে আমরা বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত বলিয়া ধরিয়া লই প্রকৃত পক্ষে তাহা বিভিন্ন মুহূর্ত্ত পরম্পরার সমষ্টি, তা বই তাহা মুলেই ধরিতে ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে আকাশ ও আকাশস্থিত বস্তু সকলের ভিতরের কথা অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িল, সমস্তই শূন্যে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। কালের ভিতর অনুসন্ধান চালাইতে গিয়া এবারেও দেখিলাম অবিকল তাই, ভূত ভবিষ্যতেও কথা দূরে থাক তাহাদের গোড়ার বনিয়াদ যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত, তাহাও কোন জন্মে কেহ দেখেও নাই শোনেও নাই, স্বপ্নেও উপলব্ধি করে নাই। ইহাকেই কথায় বলে ছিল ঢেঁকি হল তুল কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল। এই জাগ্রত জীবন্ত আকাশস্থিত স্থূল পদার্থ সকল এবং কালে প্রবহমান ঘটনা সকল সমস্তই শূন্যে পর্য্যবসিত হইয়া গেল, ভয় নাই—বাল্যকালে উপন্যাসে শুনিয়াছিলাম যে দুইরূপ কাঠির দুই প্রকার গুণ, রূপার কাঠি ছোঁয়াইলে জ্যান্তমানুষ মরিয়া রহে সোনার কাঠি ছোঁয়াইলে মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে। শুষ্ক বিজ্ঞানের রূপার কাঠি ছোঁয়াইলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে কিরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে পাঠকের চক্ষু ফুটাইয়া দিবার জন্য আমরা এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা বলিলাম ইহা আমাদের চরম মন্তব্য কথা নহে। অমৃতময় ব্রহ্মজ্ঞানের সোনার কাঠি ছোঁয়াইলে চেতনাচেতন জগতের মৃত শরীর যে কিরূপ প্রাণ পাইয়া উঠে তাহা প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের চরম উদ্দেশ্য। বারান্তরে আমাদের সেই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ পরম অভিষ্ট কার্য্যের সাধনে সাধ্যানুসারে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুফী ভক্তকবি শাহ আব্দুল লতিফ

ভারতবর্ষের এমন অনেক অজ্ঞাতনামা ভক্তকবি আছেন যাঁহারা লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াও আমাদের দেশের ধর্ম্মের ইতিহাসকে নিজ নিজ সাধনার দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম কোন ইতিহাসে খুজিয়া পাওয়া যাইবে না এবং তাঁহারা হয়ত কোন একটা বিশেষ সম্প্রদায়ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ একটি সুফী সাধক শাহ আব্দুল লতিফের কথা এই প্রবন্ধে আমরা বিবৃত করিব।

সিন্ধুদেশে সুফীধর্ম্ম যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে এইরূপ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনায়ৎ, সাচল, রোহল, দলপৎ, বেদিল, বেকস্, স্বামী, শাহ আব্দুল লতিফ

প্রভৃতি সুফী সাধক তাঁহাদের কাব্য এবং ভক্তি রসে এই ছোট একটি মরু প্রদেশকে চিরদিনের জন্য সরস ও শ্যামল করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সাধকদিগের মধ্যে শাহ আব্দুল লতিফ অন্যতম। তিনি ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদ জিলার অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রামে সয়িদ্‌বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সয়িদেরা হজরৎ মোহম্মদের বংশধর।

অতি শৈশবেই বোঝা গিয়াছিল যে লতিফ অসামান্য প্রতিভাশালী হইবেন। লতিফ যখন সবেমাত্র চারি বৎসরের তখনি তাঁর হাতে খড়ি হয়। মৌলবী আসিয়া বালককে আরবী বর্ণপরিচয় করাইতে গিয়া বিষম বিপদে পড়িয়া গেলেন। লতিফ প্রথমবর্ণ 'আলিফ্' উচ্চারণ করিয়া আর কিছুতেই দ্বিতীয়বর্ণ 'বে' উচ্চারণ করিতে চাহিল না। মৌলবী সাহেব বারবার তাহাকে 'বে' উচ্চারণ করিতে বলিলেন বালক অতি দৃঢ়তার সহিত বারবার বলিল—একমাত্র 'আলিফ' আছে, 'বে' থাকিতেই পারে না। এই অবাধ্য বালকের এইরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া মৌলবী সাহেব শাসনের জন্য তাহাকে তাহার পিতার নিকট ধরিয়া আনিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত বিচক্ষণ পিতা পুত্রের রহস্য বুঝিতে পারিলেন এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, লতিফ, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, একমাত্র আলিফ্ (আল্লা) আছেন, আর কিছুই নাই। মৌলবী সাহেবের কঠিন কবল হইতে শিশুকে মুক্তি দিয়া তিনি নিজেই তাহার শিক্ষার ভার লইলেন। ক্রমেই এই চিন্তাশীল, ভাবুক বালকটি তাহার অসাধারণ ভগবদ্ভক্তি ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিল। পিতা তাহাকে রীতিমত ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন—কিন্তু তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত নিজের ধর্ম্মমতের মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে পারিলেন না।

আব্দুল লতিফ একা একা থাকিতে ভাল বাসিতেন। নিভৃতে বসিয়া মুখে মুখে গান রচনা করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া আপন মনে গাহিতেন। দেশ বিদেশে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার অনেকগুলি ভক্ত শিষ্যও যুটিল। কিন্তু লোকের ভিড় তাঁহার সহ্য হইল না—তিনি কয়েকটি ফকির ও দরবেশের সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রকৃতির পরমাশ্চর্য্য শোভা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি উচ্চ মরু প্রান্তরে ক্ষুদ্র একটি কুটির নির্ম্মান করিয়া বহু দূর দেশাগত শিষ্যবৃন্দকে তাঁহার সাধন-লব্ধ উদার বাণী শুনাইয়া ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁহার জীবনের ইতিহাস ছোট,—কোন ঘটনা বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু এই মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে তাহার প্রীতি ও সেবার ঐক্য সূত্রে বাঁধিয়া গিয়াছেন। শাহ আব্দুল লতিফ দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিলেন। তাঁহার প্রসন্ন মুখশ্রী দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি হিন্দু কি মুসলমান সেকথা কাহারও মনে থাকিত না। তাহার বেশভূষা সাদাসিধা, আহারে বিহারে তিনি পরিমিত, এবং তাঁহার হৃদয়টি দয়া ও আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল।

সুফী সম্প্রদায়কে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীরা সুনজরে দেখিতেন না—এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া গোঁড়া মুসলমানেরা অশ্রদ্ধা করিতেন। অনেক সুফী সাধককে নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য বহু নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। আমাদের এই ভক্তকবির ধর্ম্মমতের একটু বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার জীবনে ইস্‌লাম ও সুফী ধর্ম্মের একটি আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখা গিয়াছিল। তিনি সুফী ধর্ম্মমত যেরূপ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন সেইরূপ ইস্‌লাম আচার বিচার, তপজপ সমস্তই মানিয়া চলিতেন। নিরক্ষর অজ্ঞান জনসাধারণ লোকদিগের মনে পাছে কোন সংশয় উপস্থিত হয় সেইজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে বৃহৎ উদারতা ছিল কিন্তু তাহার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা লেশমাত্র ছিল না। তিনি শাস্ত্রানুমোদিত রোজা রাখিতেন এবং নিয়মিত প্রত্যহ পাঁচবার নওয়াজ পড়িতেন—তথাপি তিনি বলিতেন—"উপাসনাই কর আর উপবাসই কর তাহাতে কিছু আইসে যায় না—প্রিয়কে

পাবার উপায় কিন্তু অন্য।" ধর্ম্ম বিষয়ে মানুষের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য জিনিষটা বহুমূল্য সে কথাটা তিনি বারবার তাঁহার শিষ্যদের স্মরণ করাইয়া দিতেন। তিনি কখনও গুরুগিরি ফলাইতেন না—এবং জোর জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও নিজধর্ম্মমত ভজাইতেন না।

লতিফ কোরাণ নিয়মিতভাবে পাঠ করিতেন কিন্তু অন্ধভাবে কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। সঙ্গীত ও নৃত্যের বিরুদ্ধে কোরাণে যে অনুশাসন আছে তাহা তিনি কখনও স্বীকার করিতে পারেন নাই। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার একটি আশ্চর্য্য দরদ ছিল—কারণ উহা তাঁহার অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিত—এবং গানের ভিতর দিয়া তিনি নিজের সহিত অন্তর্যামির সুর মিলাইয়া লইতেন। তিনি তাঁহার কাব্যে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"আমার অন্তরে ভগবদ্ প্রেমের একটি মঞ্জরী আছে - সঙ্গীত সুধারসে উহাকে সিঞ্চিত না করিয়া লইলে একেবারেই উহা শুকাইয়া যায়। গান ছাড়া আমি থাকিতেই পারি না—গানের সুর আমাকে আমার অন্তরতমের নিকট পৌঁছে দেয়।"

শাহ লতিফের 'রিসালো' নামক কাব্যগ্রন্থ Dr Trumpএর সহায়তায় Leipsic নগরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিব না—তাঁহার গীতি কাব্যের মধ্যে যে একটি ধুয়া আমরা শুনিতে পাই সেটি হচ্ছে—ভগবদ্ প্রেম। তিনি একমাত্র 'আলিফ্' (অর্থাৎ আল্লা) জানিতেন তাহার কাছে 'বে' ছিল না। অন্য অন্য সুফী কবিদিগের সহিত তাঁহার একটু পার্থক্য ছিল। তিনি নরনারীর প্রেমের মধ্য দিয়াই ভগবদ্ প্রেমের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর কাব্যে তত্ত্বালোচনার গন্ধ নাই—মানুষের প্রতিদিনের সুখদুঃখ বিরহ মিলন এবং অতি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া তিনি কবিতা ও গান রচনা করিতেন।

শাহ আব্দুল লতিফ যে সত্য ও সুন্দরের সাধক ছিলেন, আমরা তাঁহার গানে ও কাব্যে, নানা সুর ও ছন্দের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। কালে কালে ও যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষ প্রেমের মিলনক্ষেত্রে মানুষের সহিত মানুষের যোগ স্থাপন করাইতে আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এই সাধকটী একজন। এই পরিচয়টি দিবার জন্যই এই প্রবন্ধটি লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র

পথের স্মৃতি

স্কেচ বুকের পাতা উল্টাতে২ কতগুলো কথা মনে জাগল। পাহাড়ে বেড়াবার একটা দিন আজও স্পষ্ট মনে আছে তারই কথা আজ লিখব। আমরা বদরিনাথের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি। সেদিন সকালবেলা আমরা ১৩ মাইল চড়াই উৎরাই পার হ'য়ে উঠলুম ও পাণ্ডুকেশ্বর চটিতে যখন এসে পৌঁছলুম তখন বেলা ১১টা। আস্তে আস্তে আকাশ মেঘলা হ'তে লাগল এবং একটু পরেই ঝরঝর করে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। চটির দরজা সব খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া ও জলের ছটকা এসে একটু একটু গায় লাগছিল। ক্রমে ক্রমে চটিগুলো লোকে ভর্ত্তি হ'তে লাগল। পাহাড়ে এই বৃষ্টি যে কি কষ্টদায়ক তা অনেকবার বুঝেছিলুম। শীতে সমস্ত শরীর হী-হী ক'রে কাঁপছিল। আমার ও মশোজির উপর ভার ছিল খাবার তৈরি করা। উনুন ধরাতে আর কিছুতেই পারছিলাম না ধুয়োতে নাকে চোখের জল বেরোচ্ছিল এমন সময়ে একটা কাণ্ডিওয়ালা একটি বৃদ্ধাকে এনে কাণ্ডি থেকে নাবাল। বৃদ্ধার সমস্ত শরীর জলে ভিজে গিয়েছিল। নাবাতে গিয়ে লোকটি দেখলে তার মরণকাল উপস্থিত হয়েছে শুইয়ে দিতেই তার হয়ে গেল। সমস্ত ঘরটা হঠাৎ কেমন গুমট ভাব ধারণ করল। কারও মুখে কথা নেই। আমি রুটি করছিলাম

ব্যাপার দেখে আমার হাত বন্ধ হ'য়ে গেল। মশোজি রুটি ভাজছিল সে রেগে বললে এমন ঢের হয়ে থাকে শীগগির হাত চালাও। দরজার সামনে দিয়ে মেঘের দল ছুটে চলেছে। মনটা কেমন একটু উদাস হ'য়ে গেল। বাড়ীর কথা আত্মীয়দের কথা আশ্রমের কথা মনে হ'য়ে বড় কষ্ট হ'তে লাগল। ছোট ছোট কত কি ঘটনা যার কথা কোনদিন ভাববার প্রয়োজন হয়নি সে সময় আমাকে তারা পেয়ে বসল। বাইরে ঝড়ের গর্জ্জনের সঙ্গে অলকানন্দার তুমুল গর্জ্জন মিশে একেবারে কাণ ঝা-ঝা করছিল। বৃদ্ধাকে কয়েকজন লোক তুলে নিয়ে অলকানন্দায় বিসর্জ্জন দিয়ে এল।

আমাদের খাওয়া কোন রকমে সেরে আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি। এমন সময়ে শোভনসিং এসে বল্ল আপনারা যদি এখানে সমস্তদিন থাকেন তবে আমার ঘোড়া মরে যাবে। ঘোড়া থাকবার জায়গা এখানে নেই এই বৃষ্টিতে বাইরে বেচারা এমন করে ভিজতে থাকলে ২ ঘণ্টায় তার প্রাণ বেরুবে। তখনও বেশ ঝড় হচ্ছিল বল্লুম কি করতে হবে? সে বললে সামনের চটিতে চলুন সেখানে ঘোড়ার জায়গা পাওয়া যাবে, আপনাদেরও সুবিধা হ'বে। মাথায় ঝড় নিয়েই আমরা চটি থেকে বেলা প্রায় ৩ টার সময় বেরুলাম ঘোড়ার প্রাণ বাচাতে। রাস্তার উপর দিয়ে জল গড়িয়ে২ পড়েছিল এমন পিছল হয়েছিল যে যদি পা পিছলায় তাহ'লে ভবলীলা যে সাঙ্গ হ'বে এ একেবারে নির্ঘাত সত্যি কথা।

মাথায় আমাদের সোলার টুপি হাতে এক একটা Hill stick। মাঝে মাঝে হাত থেকে stickটা মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল তখন আবার অন্য হাতে লাঠিটা তুলে নিয়ে অবশ হাতটা পকেটে পুরে দিতে লাগলাম। সামনে পেছনে সাদা সাদা মেঘগুলোকে দেখে ভয় হ'তে লাগল। দূর থেকে ভাবছিলাম যে মেঘের রাজত্বে আমরা উঠব তখন না জানি কেমন আনন্দ হ'বে! এখন দেখি মেঘ দেখে বুক দুর দুর করতে থাকে। চলতে২ একটা জায়গায় এসে দেখি একটা Bridge ভাঙ্গা তার উপর শুধু একটা সরু কাঠ রয়েছে লোক যাতায়াতের জন্য। লাফ দিয়ে আমরা পার হয়ে চলে যাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হল তাইত আমাদের তিনটা ঘোড়া কি করে আসবে কাঠের উপর দিয়ে। নীচে একটা ছোট নদী ঠাণ্ডা বরফ গালান জল নিয়ে ছুটে চলেছে। মশোজি তার জলে নেবে দেখলে কতখানি গভীর; দেখলাম ঘোড়াগুলো পার হতে পারবে তবে বড় বেশী স্রোত পড়ে গেলে ভয়ানক হ'বে তাই আমি ও মশোজি রইলুম। একটা বড় পাথর ছাদের মত হয়ে রাস্তার উপরে দাড়িয়ে আছে আমরা তার ভিতর ঢুকে শোভনসিং এর অপেক্ষায় রইলাম। মশোজি বাঁশী ধরল "ঝরঝর বরিষে বারিধারা হায় পথ-বাসি" তখন মনের ঘোর অনেকটা কমেছে বোধ হয় সেই গুমট ঘরটা ছেড়ে খোলা আকাশের তলায় দাড়াতে। শোভনসিং ঘোড়াগুলো নিয়ে দেখাল ঘোড়াগুলির চেহারা দেখে বড় কষ্ট হচ্ছিল সমস্ত শরীর শীতে কাঁপছিল। চোখের কোণ দিয়ে ফোটা২ জল পড়ছিল। শোভনসিং গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লে এ নদীটা পার হতে হবে। ভুটয়া ঘোড়াটাকে প্রথম head করে নিয়ে চলল—জলে পা দিয়েই তার পা তুলে নিল এমন ঠাণ্ডা জল যে কি বলব। তাকে আমরা ধরে নাবালুম শোভনসিং যে কত কাকুতিমিনতি করছিল তার ঘোড়ার কাছে বলাযায় না—এ যেন তার ছেলে—অনেক কষ্টে তিনটা ঘোড়াকে পার করে আমরা আবার এগিয়ে চল্লুম। আমাদের যেতে হবে আরও তিন মাইল এক জায়গায় এসে দেখি রাস্তা ধসে গেছে। বৃষ্টির দরুণ আরও বিপদ হয়েছে উপর থেকে অনবরত পাথর পড়ছে, পার হওয়া ভয়ানক ব্যাপার একটু পিছলালেই একেবারে হাজার২ ফুট নীচে পড়তে হবে। কোন রকমে পার হলুম আবার ঘোড়ার কথা মনে হ'ল এবার আর উপায় নেই। এ রকম রাস্তায় ঘোড়া কখনও আসতে পারবে না। কপালগুণে সেখানে তখন একজন ভদ্রলোক দেখতে পেলুম কিছুদূরে জনকয়েক লোক লাগিয়ে তিনি রাস্তাটা খাড়া করবার চেষ্টা করছেন। তার কাছে যেতেই তিনি বল্লেন যে তাঁর উপর রাস্তা ঠিক করবার ভার

অথচ যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয় না সরকার থেকে সেজন্য তিনি বড় মুস্কিলে পড়েছেন। বল্লেন এ রাস্তা কি করে ঠিক করব বলুন খানিকটা ঠিক করে আনলেই আবার ধসে যায়। তবে তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে বল্লেন যে ঘোড়ার পথ অন্যদিক দিয়ে আছে। উপরে এক রাস্তা আছে তা তিনি আমাদের লোককে দেখিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন তারপর আর খারাপ রাস্তা পাইনি। তখনও বৃষ্টি বেশ হচ্ছিল সমস্ত শরীর একেবারে ভিজে গেছে মাথায় টুপি থাকার দরুণ মাথাটা বেচেছিল। যাক্ কোনক্রমে গন্তব্য স্থানে পৌছে ত একেবারে চক্ষু স্থির। লোকে লোকারণ্য সমস্ত চটিগুলো—একটি লোক বসবার জায়গা নেই একটাতেও—দেখে শুনে আমাদের মাথা ঘুরে গেল। এখন কি করি। চটিগুলোর সামনে দিয়ে বারবার যাতায়াত করতে লাগলাম আর শরীর অবশ হতে লাগল। ভেবেছিলাম এখানে এসে বেশ জায়গা পাব জামা কাপড় বদলে বেশ গরম গরম চাপাটি খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুম দেওয়া যাবে আর কোথায় এখন কুকুরের মত মাথা গুজে থাকবার জায়গাও পাওয়া যাবার জো নেই। বেশ বুঝতে পারলাম আজ সত্য সত্যই adventure সুরু হবে। তখন বৃষ্টি একটু২ করে ধরে আসছিল আর পশ্চিম দিগন্তে সিন্দুরে মেঘের ভিতর সূর্য্য ডুবেছে—হয়ত তখন চারিদিকটা বড় চমৎকার দেখাচ্ছিল কিন্তু কে ভাববে সে কথা! যারা ভিতরে বসে ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হতে লাগল লোকগুলো কত আরামে আছে। বসবার জায়গা ত পেয়েছে আর আমাদের যে সারারাত বাইরে কোথায় দাড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। হয়ত রাত্রিরে বরফ পড়বে তাহ'লে ত আর আশা নেই। শোভনসিং আর দয়ারাম এসে উপস্থিত হল ঘোড়াগুলাকে নিয়ে, বেচারাদের মুখ কালো হয়ে গেল। দোকানওয়ালাদের নিকট অনেক খোসামুদি করা হ'ল যদি তাদের দোকানের ভিতর একটু জায়গা পাওয়া যায় অনেককে টাকার লোভ দেখালাম কিছুই ফল হ'ল না। চারিদিকে অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছিল। আমরা রাস্তারই ধারে একটা পাহাড়ের উপর হতাশ হয়ে বসে পড়লাম আমাদের অবস্থা দেখে যাহ'ক দোকানদারের মন একটু নরম হ'ল দেখতে পেলাম। সে এসে বলল আপনাদের ব্যবস্থা আমি করে দেব আমার সঙ্গে চলুন। একটা সরু রাস্তা দিয়ে আমরা তার সঙ্গে চললুম।

অতি নীচু একটি ঘরের সামনে গিয়ে তালা খুলে বলল এটা একটা গোয়ালঘর তবে গরু নেই দুটা মোষ একদিকে আছে আপনাদের কিছু করবে না। আমাকে আপনারা প্রত্যেকে এক এক টাকা বক্‌সিস দিলেই আমি খুসী হ'ব আর কিছুই চাই না। জানিনা স্বর্গ জিনিষটা কেমন তবে সেই গোয়াল ঘরটা পেয়ে সেদিন মনে হ'ল যেন হাতে হাতে স্বর্গ পেয়েছি। ঘরের ভিতর সবাই হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লাম একধারে কিছু খড়ের আঁটি ছিল তা মেঝেতে ছড়িয়ে আমরা বিছানা করলুম। শোভনসিংকেও সে ঘরটাতে জায়গা দেওয়া হ'ল। ঘোড়ার থাকবার কোন জায়গা পাওয়া গেল না বেচারাদের কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হ'ল আগুন করে তাদের একটু চাঙ্গা করে ছোলা খাইয়ে শোভনসিং আমাদের খাবার জন্য আটা, তরকারী কিছু কাঠ নিয়ে এল। গরম গরম রুটি সেদিন যে পাব আশা করিনি, খেয়েই ঘুম। আমার কম্বলের উপর ভাঙ্গা পাথরের চালা থেকে টস্‌টস্ করে জল পড়ছিল। পিঠের নীচটায় মনে হচ্ছিল যেন Ice bag রেখে দিয়েছে কিন্তু তবুও ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি। এ সব যেন দুঃস্বপ্নের মত মাঝে২ কষ্ট দিচ্ছিল মাত্র। হঠাৎ দুপুর রাত্রির ঘুম ভেঙ্গে গেল ঘরের ভেতরটা একেবারে অন্ধকার খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলুম মনে হ'ল যেন বাইরে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসে দাড়ালাম। সমস্ত আকাশ পরিষ্কার। পরিচিত তারাগুলি মিট২ করে হাসছিল। বরফের পাহাড়গুলো এই অন্ধকার রাত্রিতেও জলছিল আর কালো কালো পাহাড় চারিদিকের আকাশকে ঢেকে ফেলে দৈত্যের মত দাড়িয়ে আছে। মনে

হল যেন মেঘগুলো সব অন্ধকারে পাহাড়ের ভিতর ঢুকে আগল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সকাল হলে আবার বেরুবে। পাশের ঝোপে খস্ করে একটা শব্দ হল, আমিও চট্ করে ঘরে ঢুকে পড়লুম। রাত্রটা কেটে গেল বাইরে এসে সবাই বসলুম। সকালবেলা পাহাড়ের চূড়ায়২ সোণার মুকুট পড়িয়ে দিয়ে ভাস্কর এসে পড়ল আমাদের উপর। সেদিন যেমনভাবে রোদটাকে উপভোগ করেছিলমে এমন বোধ হয় আর কোনদিন করিনি।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কোপাই

আমি তোমায় ভুলতে পারি
অয়ি কোপাই নদী
এমন কথা ভাব্‌তে তুমি পারো
তাই কি জাগে কলধ্বনি
তোমার দুটি কূলে
এমনতরো অশ্রুমৃদু গাঢ় ?
আর জনমে হবই আমি
তোমার বালুতীরে
জামের তরু ব্যাকুল ছায়া মেলি
প্রাচীন কথা স্মরণ করে
তোমার জলে আমি
কয়েকটি ফল দেবই দেব ফেলি।

আমি তোমায় ভুলতে পারি
অয়ি কোপাই নদী
এমন কথা ভাবলে তুমি মনে
তাইকি হেরি পল্লবিত
কিশলয়ের ব্যথা
সবুজ-কথা তোমার বনে বনে !

আর জনমে হবই আমি
কোলের কাছে তব
মৃৎ-গীতিকা তট-বীণার তার
তুলবে তুমি অয়ি কোপাই
তরঙ্গ-অঙ্গুলে
আমার বুকে তরল ঝঙ্কার।

আমি তোমায় ভুলতে পারি
অয়ি কোপাই নদী
এমন কথা ভেবোনা কথ্খনো—
তোমার তীরে আস্‌বো ফিরে
বন-ভোজনে আমি
বিশ্বাসেতে আমার কথা শোনো।
ইস্কুলেরি বালক হয়ে
পুলকভরা দেহে
তোমার জলে করব নাচানাচি
সকল দ্বিধা ঘুচ্‌বে তবে
অসহ্য উৎপাতে
বুঝবে তখন আছিই আমি আছি।

খোয়াই

শূন্য-হৃদয়ের মত রয়েছে পড়িয়া
দিগন্ত ভরিয়া
রক্তিম কাঁকর-ঢালা ধূসর খোয়াই।
যে দিকেতে চাই
শীর্ণ মাঠ ছেয়ে আছে কণ্টক অশেষ ;
পিপাসার দেশ
ফিরে-আসা বসন্তের অলক্ষ্য হাওয়ায়
করে হায় হায়।

বারে বারে নুয়ে নুয়ে পড়ে যবে মন
ফাল্গুনের বন
পর্য্যাপ্ত মুকুল ভারে বিদ্রূপের প্রায়
চক্ষে যবে ভায়
আশাহীন অতি দীর্ঘ বিরহের মত
প্রান্তর সতত
নীরস-কারুণ্যে ভরি দেয় বক্ষ মোর,
কাঁপে চক্ষে লোর।

বন-শূন্য দিগন্তের পরপার পথে
পীতালোক স্রোতে
ডুবে যায় কোকিলের নয়নের ছবি
ধূলি-পান্থ রবি।
একটি তারকা কোলে পা টিপিয়া ধীরে
বনান্তের শিরে
শুভ্র-ঝিনুকের মত উঠে আসে চাঁদ;
তারা-ধরা ফাঁদ।

সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি বনান্তের কোলে
ক্ষণকাল দোলে।
তারপরে কখন যে দিগন্তের গায়
মিশে মুছে যায়।
গগনের রক্ত-পটে তাল তরু রেখা
যায় ক্ষীণ দেখা;
দেখা-না-দেখার মাঝে কাঁপিতে কাঁপিতে
মিলায় চকিতে!

গেরুয়া মাটির ঢেউ বৈরাগ্যের প্রায়
উঠিয়া হেথায়
তরঙ্গিয়া চলে গেছে দূরে হ'তে দূরে
আবর্ত্তিয়া ঘুরে,
ধূসর বালুতে আর নীরস নুড়িতে
ঘুরিতে ঘুরিতে
কাছে হ'তে বাহিরিয়া গেছে কোন্ দূর
উপল-বন্ধুর।

লক্ষ্য-হারা মাঠে এই শ্রান্ত মোর হিয়া
দিব বিছাইয়া—
আকার বিহীন এই প্রান্তরের প্রায়
চিত্ত মোর হায়
আপনি বুঝিতে নারে, আপনি যা বলে;
নিজ অশ্রুজলে
নিজেই ডুবিয়া মরে তল নাহি পাই,
অতল খোয়াই।

উৎসের অনুসন্ধান

৪

প্রথম দিন যে গ্রামে আমাদের তাঁবু পড়িল—তাহার নাম বল্লভপুর। তখন শীতের সন্ধ্যা নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। গ্রামের গাছ গুলির মাথার উপরে একস্তর ধোঁয়া জমিয়া আছে—আকাশের লক্ষ যুগের নিশ্চল শ্রোতারা প্রতিদিনের মত আজও যে যার স্থান জুড়িয়া নীরবে আসীন। আমরা নদীর ধারে ঢালু একটা জায়গায় তাঁবু ফেলিবার জোগাড় করিতেছিলাম—এমন সময় অদূরে ঝাউবনের আড়াল হইতে বীরবর দেখা দিলেন। তিনি আমাদের স্থান নির্ব্বাচনের অজ্ঞতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"তোমরা একি করেছ? ঠিক এমনিতর অবস্থান ছিল কুইবেক নগরের সেই জন্যই ত সেনাপতি উল্ফ্ তা জয় করতে পার্লেন। যদি আজ রাত্রে তাহারা আক্রমণ করে—তবে—।"

'তাহারা' কাহারা? হায় এ প্রশ্নের খোলসা একটা জবাব দেওয়ার কথা কোন দিন তাহার মনে হয় নাই। কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতাম একদল সশস্ত্র সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া বিক্রমজিতের মস্তিষ্কের কুরুক্ষেত্রে কেবলমাত্র হুকুমের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যাহা হোক্—তাঁবু তুলিয়া অন্যত্র ফেলিলাম। স্থান নির্ব্বাচনের তারিফ করিয়া বিক্রম কহিলেন—The Place সামনে নদীর খাড়া পাড়—জল; আক্রমণ করবার সুবিধা হবে না। পিছন থেকেও তাই কারণ পিছনে একটা ইঁটের পাজা আছে। এতক্ষণে তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার প্রিয় অশ্ব 'Gallant'কে নিয়া পড়িলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল 'Gallant' স্বীয় জাতীয় বিশ্রী ডাকটা ভুলিয়া—নব নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চিঁহি চিঁহি স্বরে ডাকে। তাই তিনি সস্নেহে 'Gallant'র মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন" বল Gallant চিঁহি—চিঁহি।" বিক্রম যে ভাবে অশ্বের ডাক অনুকরণ করিতে লাগিলেন—তাহাতে তিনি যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অশ্ব-ভাষার অধ্যাপকের পদ পাইতে পারিতেন। কিন্তু স্বজাতি প্রেমিক 'Gallant' জাতীয় ভাষা ত্যাগ করিতে কিছুতেই রাজি হইল না।

রাত্রে আহার শেষ হইলে সকলে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাহিরে বেশ শীত পড়িয়াছে—ঘাস শিশির পড়িয়া ভিজিয়া গিয়াছে—এমন কি তাঁবুর উপরে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। বাহিরে এত শীত বলিয়াই ভিতরটা মধুরতর মনে হইতেছিল। কিন্তু আরাম করিবার এই কি সময়! ঐতিহাসিক খ্যাতি যে আমাদের মুখ চাহিয়া হিংলা নদীর উৎসে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জয় করিয়া আনিতে হইবে। বিক্রম একটা টর্চ-লাইট জ্বালিয়া একখানা খাতা বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পাতা উল্টাইয়া শেষে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"প্রথম প্রহর আমি—দ্বিতীয় প্রহর—অবিনাশ।" এবং তৎপরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—"প্রত্যেক প্রহরে এক এক জনকে বাহিরে পাহারা দিতে হবে।" এই শীতের রাত্রে পাহারা। অবিনাশ চিররুগ্ন। সে দারুণ গ্রীষ্মে পর্য্যন্ত দেহ-দুর্গকে আলপাকা কম্ফাটার কান-ঢাকা টুপি ফ্লানেল প্রভৃতি দিয়া—আলো বাতাসের পক্ষে দুর্গম করিয়া রাখে। তাহাকে অনেক কষ্টে আমাদের সাথে আনা গিয়াছে—কিন্তু এই পৌষের শীতে তাহাকে পাহারা দিতে হইবে—ইহা তখন কে ভাবিয়াছিল। সে ব্যাপার সঙ্গীন দেখিয়া কম্বল ঘন করিয়া টানিয়া মুড়িশুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। বিক্রম পাহারায় যাইবার পোষাক পরিতে লাগিলেন। মোটা কোটের উপরে ছাগ-চর্ম্মের জামা—কোমরে ছোরা দুরবীন শিঙা, কাঁধে বন্দুক। আমাদের মনে হইতেছিল—কোন্ মন্ত্রবলে রবিন্সন ক্রুসো তাঁবুতে আবির্ভূত হইল। তিনি বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন—"শিঙা বাজিলে সবাই তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাবে—ইহা বিপদের সঙ্কেত।" তিনি বাহিরে যাইতেই বোধ হয় তাঁহার এই অপূর্ব্ব পোষাক দেখিয়া ভয়ে gallent উচ্চৈস্বর ডাকিয়া উঠিল। তাহার স্বরকে পরাজিত করিয়া উচ্চতরে স্বরে বিক্রম বলিতে লাগিলেন "চুপ কর চুপ কর gallant 'তাহারা' জানতে পাবে" তাঁহার কণ্ঠস্বরে বন্ধুর অনুরোধ, সেনাপতির আদেশ ও গুরুর উপদেশ মিশ্রিত হইয়া অভিনব রসের সঞ্চার করিয়াছিল। তাঁবুর ভিতরে আমরা হাসিয়া খুন। লালবিহারী অবিনাশকে বলিল "তুই আমার জায়গায় গিয়ে চুপটি করে' শুয়ে থাক্ তার পরে দেখ্‌বো।" লালবিহারী ছেলেটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট শক্তিমান—অল্পে রাগিয়া যায়—অল্পে খুসী। তাহার শক্তির চরম বিকাশ রন্ধন ও ভোজন ব্যাপারে। আমরা সবে মাত্র শুইয়াছি এমন সময় বাহিরের নিস্তব্ধতাকে উচ্চকিত করিয়া শিঙা বাজিয়া উঠিল। বিপদ বিপদ 'তাহারা' আসিতেছে! সবাই কম্বল ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কেবল লালবিহারী কম্বল আরও টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল! কোথায় কি বিপদ? বিক্রমজিৎ ইসারা করিয়া বলিলেন "চুপ—শব্দ নয়—টুঁ শব্দটি নয়!" অবিনাশের হাতে আলো ছিল।—"আলো নিভাইয়া দাও আলো নিভাইয়া দাও" তাহারা দেখিতে পাইবে! আলো নিভিতে মুহূর্ত্ত দেরী হইল না। দূরে নদীর পরপারে

বন-ঝাউয়ের আড়ালে আলোকশিখা দেখা গিয়াছে! নিশ্চয়ই 'তাহারা' আসিতেছে! যে 'তাহারা' এত দিন বিক্রমের মস্তিষ্কের খুলিটার ভিতর গুড়ি মারিয়া অবসর খুঁজিতেছিল সেই 'তাহারা' আজ আক্রমণের জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "এরা কে?" সংশয়-রহিত স্বরে বিক্রম বলিলেন, "ডাকাত"! দলের মধ্যে উদয় ছোট সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু কি হবে বিক্রমজিত বাবু!" "কোন ভয় নাই"—আশ্বাসবাণী প্রচারিত হইল। বন্দুকটি বাগাইয়া ধরিয়া বিক্রম বলিলেন, "আমি একাই তাদের দেখে নেবো—এই যে আমার চির-নির্ভর বন্দুক!" হায় চির নির্ভর! তবু যদি তুমি মুঙ্গেরী গাদা না হইতে! কিন্তু মুঙ্গেরী গাদার ভরসায় যে আমরা খুব সাহস পাইলাম তাহা নহে! বিক্রমজিতের তেজ তাই বলিয়া কম নয়! হায় এক জিনিষের তেজ যদি আর এক জিনিষে সঞ্চারিত হইতে পারিত তবে বিক্রমের তেজের শতাংশের একাংশে এই মুঙ্গেরী-গাদাকে জর্ম্মাণ কামান করিয়া তুলিতে পারিত। বিক্রম বিচক্ষণ সেনাপতির মত বলিয়া যাইতে লাগিল—"তাহারা আর একটু এগিয়ে যখন জলের ধারে এসে পৌঁছবে তখন" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই দূরবীন দিয়া নজর করিতে লাগিলেন। তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন "নিঃসন্দেহ তাহারা!" আশ্বাস দিয়া বলিলেন "তবু কোন ভয় নাই। নেপোলিয়ান উলমের যুদ্ধে যে চাল চেলেছিলেন তা অবলম্বন করলেই ব্যস্!" আমাদের সরিয়া যাইতে বলিয়া তিনি বন্দুকটাকে সঙীনের মত ধরিয়া বলিলেন "আমি তাদের উপরে এই ভাবে গিয়া পড়ব!" বলিয়া খানিকটা জায়গা মাথা নীচু করিয়া গণ্ডারের মত দৌড়িয়া গিয়া সহসা দুই পা একত্র করিয়া উর্দ্ধে লাফ মারিলেন! বেচারা gallantর জীবনে এত অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই—এই দৃশ্য দেখিয়া ভীষণ ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! একমুহূর্ত্তে আমাদের নিস্তব্ধতার আড়াল ভাঙিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ এইবার 'তাহারা' নিশ্চয়ই আমাদিগের অবস্থান জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু একি পরিবর্ত্তন সেই 'তাহারা' দুর্দ্দান্ত অপরাজেয় 'তাহারা' gallantর স্বর শুনিয়া মশাল ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটিল। পরে জানিতে পারিলাম তাহারা জেলে—রাত্রে মাছ ধরিতে আসিতেছিল! তবে ইহারা বিক্রমের মস্তিষ্ক দুর্গবাসী সেই দুর্দ্দান্ত 'তাহারা' নয়। যখন প্রমাণ হইয়া গেল—ইহারা জেলে তখন সবাই বিক্রমকে তাহার অতি সাবধানতার জন্য দুষিতে লাগিল! কিন্তু বিক্রম জাত-সেনাপতি সে শুধু গম্ভীর স্বরে বলিল "Prevention is better than cure". তা বটে যদি ইহারা—জেলে না হইয়া একদল ডাকাত হইত! কি ভয়াবহ পরিণাম—সকলেই শিহরিয়া উঠিল!

প্রথম প্রহর শেষ হইতেই বিক্রম আসিয়া অবিনাশকে ঠেলা দিয়া বলিল—"Punctuality wins the day." কম্বলের ভিতর হইতে লালবিহারী রাগিয়া উঠিল "চোপরও বলছি নইলে —— ।"

বিক্রম গম্ভীরস্বরে বলিল—'Man proposes, God disposes.' যদিও বাক্যটির অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না—তবু বুঝিলাম লালবিহারীর ভাবটা সুসহ্য নয়। আমরা অনেক করিয়া বিক্রমকে বুঝাইয়া বলিলাম "রাত্রে পাহারায় আর দরকার হবে না—হ'লে আমার উপর ভার রইলো"—ইত্যাদি! বিক্রম রাজি হইয়া পোষাক খুলিয়া শুইবার আয়োজন করিতে লাগিল। সে জামাজোড়া খুলিতেই আমি লক্ষ্য করিলাম তাহার বুকের কাছে মেডেলের মত কি একটা ঝুলানো আছে। সে তাড়াতাড়ি সেটা সামলাইয়া লইল। সবাই শুইয়া পড়িল তাঁবু নিস্তব্ধ—কেবল বিক্রমের নাসিকা গর্জ্জন নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠিতে পড়িতে লাগিল। আর সেই শব্দে মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙিয়া লালবিহারী অস্ফুট ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল।

আমার ঘুম আসিতেছিল না—ভাবিতেছিলাম এই আশ্চর্য্য লোকটার ইতিহাস কি? নটবরপুরের সে বাসিন্দা নয়—সেখানে বছর তিনেক আসিয়াছে। আমার নিঃসন্দেহ মনে হইল—এই লোকটার জীবনে একটা দুঃখের ইতিহাস

আছে। তাহাকে চাপা দিয়া রাখিবার জন্যই তাহার বাহিরের এই বীরত্বের নিস্ফল অভিনয়! সে এই বীরত্বের অভিনয়ে এতখানি মাতিয়া উঠিতে চায় যাহাতে চোখে তাহার দুঃখটা আর না পড়ে! তখন মনে পড়িল সেই হঠাৎ দেখা মেডেলটার কথা—কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল—ওই জিনিষটার সাথে তাহার জীবনের কি একটা যোগ আছে! মনে স্থির করিলাম ক্রমে ক্রমে তোয়াজ করিয়া তাহার জীবনের কাহিনীটুকু শুনিতে হইবে। জানি প্রথমে সে তাহা বলিতে রাজি হইবে না—কিন্তু একবার সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিলে বহুদিন সঞ্চিত এই ব্যথার স্মৃতিটুকু অকাতরে আমাদের মধ্যে বিলাইয়া দিবে! এই রকম কত কি ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

যখন জাগিলাম—তাঁবুর ভিতরে তখন রাত্রি—বাহিরে প্রভাত। তাঁবু হইতে বাহির হইলাম। কি সুন্দর প্রভাত উর্বশীর মত চির-তরুণ! মাঠ ভরিয়া কচি মটর ছোলার ক্ষেতে সারা রাত্রি শিশির পড়িয়া শাদা হইয়া গিয়াছে; নদীর জল হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। গোটা দুই পাখী লাফাইয়া বাঁশবনের ভিতর লুকাইতেছে! মাঠের শেষে কুয়াশায় অন্ধকার। মাঠের মধ্যে চাষারা খেজুর গাছ হইতে রসের হাঁড়ি নামাইতেছে। একদল সাঁওতাল অদূরে রাত্রি কাটাইয়াছিল তাহারা পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িবার আয়োজন করিতেছে! আজিকার প্রভাতের এই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার মনের মধ্যে কি তরুণ দুটি চোখ লইয়া সৃষ্টির আদি দম্পতি জাগিয়া উঠিল!

কিন্তু একি আশ্চর্য্য! এত ভোরে বিমল কেন ভেজা ঘাসের উপর শেওড়াগাছের তলায় পা মেলিয়া বসিয়া? বুঝিলাম তাহার কাব্য চর্চ্চা চলিয়াছে! হায় মুগ্ধ কবি তোমরা চোখ মেলিয়া জগৎটা দেখ না তাই রক্ষা। নইলে যদি জানিতে রাত্রে যাহাদের নাম উচ্চারণ করিতে নাই তাহাদের প্রিয় গাছের তলায় তুমি গিয়া বসিয়াছ—তবে যে এতক্ষণ একলাফে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে! বিমল কবি। সে এক গাদা কাগজ গোটা দুই পেন্সিল ও একখানা ছুরি লইয়া সশস্ত্রে কবিতা লিখিতে বসিয়াছে! আনাড়ি শিকারীরা যেমন প্রাতে গুলি বারুদ লইয়া বাহির হয় এবং সন্ধ্যায় রিক্ত হাতে নিঃস্ব-গুলি হইয়া ফিরিয়া আসে তেমনি অবস্থা হইয়াছিল বিমলের। একাধিক তীক্ষ্ণ পেন্সিল ও কাগজ লইয়া সে কবিতা লিখিতে বসে—কিন্তু যখন ফিরিয়া আসে তখন তাহার পেন্সিল ভোঁতা ও কাগজ শত চিহ্ন লাঞ্ছিত। ভাব আসে আসে—আবার লুকায়। যখনি সে পেন্সিল বাগাইয়া প্রায় ভাবটাকে ধরে ধরে অমনি কোথায় কি—সব লুক্কায়িত! ওগো কৌতুকময়ী—তোমার ভক্তের সঙ্গে এ কী ছলনা! তোমার জন্য যে তোমার ভক্তের সব গিয়াছে। সে ত তোমারই জন্য ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই পাশ করিতে পারিত। কিন্তু দেশের একজন বড় কবি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন নাই। পাছে উক্ত পরীক্ষায় পাশ হইলে কবিত্ব খ্যাতিতে বাধা পড়ে তাই সে ইচ্ছা করিয়া পরীক্ষা ফেল করিয়াছে। তবু নিঠুরা কাব্য লক্ষ্মী তোমার দয়া হয় না। সে জানিত একদিন তাহার ছন্দের জালে বাণীর মানস সরোবরের কলকণ্ঠ হাঁসগুলি ধরা পড়িয়া কাব্যে মুখরিত হইয়া উঠিবে—তখন বিমলের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এবং যে সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক আজকাল—তাহার লেখা ফিরাইয়া দেয় তাহারা পরাজিত রাজন্যগণের মত বিজয়ীবিমলের পদতলে গিয়া পড়িবে। তাহার দিক্‌বিজয়ী রঘুর কথা মনে পড়িতে লাগিল।

বিমল যে একদিন বিখ্যাত হইবে তাহা সে নিশ্চয় জানিত এবং সে যে একজন উদীয়মান কবি সে বিষয়ে তাহার বা অপরের কাহারো কোন সন্দেহ ছিল না। সে যে-সমস্ত কবিতা লিখিত সেগুলি তাহার বন্ধু বান্ধবদের দিয়া আভাসে বলিয়া দিত এগুলি কাছে রাখিয়া দাও—তাহা হইলে আর পরে আমার এক লাইন হাতের লেখার জন্য ছুটাছুটি করিতে হইবে না। সে নিজেদের বন্ধুদের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত গৌরব বোধ করিত—কারণ তাহার বন্ধু হওয়াতে অমরতার ক্ষেত্রে যে তাহাদের বন্দোবস্ত অতিশয় পাকা হইয়া গিয়াছে।

এদিকে লালবিহারী উঠিয়াই মহা উৎসাহে রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল। বিক্রম বিচক্ষণ সেনাপতির ন্যায় কখনো দূরবীন দিয়া দূরে চাহিয়া দেখেন, কখনো কম্পাস লইয়া দিক্ নির্ণয় করেন—কখনো থার্মিমেটারে তাপ পরীক্ষা করিয়া কাগজে টুকিয়া রাখেন। আমাদের চারিদিকে গ্রামের ছেলে বুড়ো একদল দর্শক জুটিয়া গেল। আমাদের পরিচয় লইয়া তাহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। কাহারো মতে আমরা শিকারী—কাহারো মতে বাজিকর—আবার কেহ বা সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল আমরা কোম্পানীর লোক। আমাদের রন্ধন শেষ হইল। গ্রামের লোকেরাও যে যার ঘরে গেল কেবল একটি লোক নড়িল না। তাহার নাম মহেন্দ্র সে এতক্ষণ রন্ধনের যোগাড় দিতেছিল। লালবিহারী তাহার সঙ্গে চুক্তি করিয়াছিল এই সাহায্যের পরিবর্ত্তে সে খাইতে পাইবে। মহেন্দ্র খাইতে বসিবার আগে আয় আয় আয় বলিয়া ডাক দিল। অমনি কোন অজ্ঞাত ঝোপঝাপের আড়াল হইতে ৪।৫টি ছেলে মানচিত্রের নদীর মত শিরা বাহির করা ডাগর ডাগর পেট লইয়া প্রায় ক্ষুদ্র মার্বেলের মত গড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত। পিতৃ-অধিকারে তাহারাও আমাদের অন্নের অধিকারী। লালবিহারী তাহাদের দেখিয়া চটিয়া আগুন—ধনঞ্জয়ের অবস্থা করিতেছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিক্রমজিৎ করুণকণ্ঠে তাহাদের খাইতে দিবার অনুরোধ করিলেন। এই রূঢ় শিকারপ্রিয় পুরুষটির মধ্যে এত কোমলতা আছে, না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। তাহার কণ্ঠস্বর ও চোখের দৃষ্টি মায়ের মত স্নেহার্দ্র হইয়া আসিল। আমার সেই মেডেলের কথা কেন জানি মনে হইল। ঠিক্ করিলাম দিনেই তাহার ইতিহাস শুনিবার ভূমিকাটুকু করিয়া রাখিতে হইবে এবং রাত্রে সকলে মিলিয়া তাহা শুনিব। আজ এক মুহূর্ত্তে তাহার যে পরিচয়টুকু পাইলাম তাহা এতদিনে পাই নাই। মানুষের যথার্থ পরিচয় এমনি এক একটি অতি বিরল মুহূর্ত্তে পাওয়া যায়। ইহাই শুভ দৃষ্টি। এই একটিমাত্র বেদনার বিদ্যুৎ-ঝলকে বিক্রমের যেটুকু দেখিলাম তাহাতে আমার ধারণা দৃঢ় হইল যে তাহার জীবনের কাহিনীটুকু করুণাময়।

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। আমাদের গো-গাড়ীর একজন গাড়োয়ানের নাম ছানারাম। তাহার দাদার নাম ছিল মাখন। তাই নাকি তাহার মা তাকে আদর করিয়া ডাকিত ছানা! সে গাড়ীতে উঠিয়া মহা মুস্কিলে পড়িল—একহাতে তার হুঁকাকল্কে অপর হাত দিয়া শক্ত করিয়া গাড়ী চাপিয়া ধরিয়াছে; এখন গাড়ী চালায় কেমন করিয়া। আমাদের বিচিত্র সাজ দেখিয়া গরু ভয়ে রাস্তা ছাড়িয়া এদিক্ ওদিক্ যায়—এবং ততোধিক ভয়ে ছানারাম আমাদের তিরস্কার করে। সে হুঁকোও ছাড়িবে না গাড়ীও ছাড়িবে না দুই হাত বন্ধ! আমাদের মধ্যে একজন উঠিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল—তখন ছানারাম একটু আশ্বস্ত হইয়া হুঁকায় মনোনিবেশ করিল।

সচল ও অচল

ছোট বেলায় পণ্ডিতের কাছে পড়িয়াছি যাহারা সচল তাহারাই প্রাণী, আর যাহারা অচল তাহারাই জড়। সে সময় বুদ্ধির তেমন তীক্ষ্ণতা ছিল না, নহিলে পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিতাম—চলে এরূপ অনেক জিনিষেরই ত দেখি প্রাণ নাই আবার চলে না অথচ প্রাণের পরিচয় দেয় এমন সৃষ্টিও জগতে ঢের আছে। আজ বুঝিয়াছি অচলের মধ্যে প্রাণের পরিচয় পাওয়া এবং সচলের মধ্যে জড়ত্বের পরিমাপ করা এ দুইটাই সমান শক্ত ব্যাপার। অচলের মধ্যে প্রাণের বিকাশ যে সম্ভবপর, তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞান উদ্ভিদ-রাজ্যে আমাদের দেখাইয়াছে, কিন্তু সচলের আবরণে জীব-জগতে কতখানি জড়ত্ব যে জড়াইয়া আছে, জগতে আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার কোন প্রমাণ আমাদের দেখাইতে পারে নাই।

আমরা কি স্থিতির ডাঙায় পাকা ইমারত তুলিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য আসিয়াছি? জগতে আর সকলই চলিতেছে কেবল আমরাই চলা বন্ধ করিয়াছি। তাহাতে যে আমাদের গৌরব নাই তাহা বলিতে পারি না। কেননা স্রোতে ভাসিয়া চলিতে হইলে ডাঙার অচল খুঁটিগুলির উপরেই ত বেশি দৃষ্টি রাখিতে হয়। নহিলে এগোইলাম কি পিছাইলাম তাহা ঠাহর হয় না। সুতরাং জগৎসংসারের সকলেরই লক্ষ্যস্থল হইয়া আজ আমরা স্থাণুর মত বসিয়া আছি ইহা কি আমাদের কম গৌরবের কথা! আমরা নিজেরা চলি না বটে কিন্তু জগতে কে কতদূর এগোইল কি পিছাইয়া পড়িল তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব আমরা দিয়া থাকি। কোন্ সভ্যতার ধারা কোথায় গিয়া শুকাইল, কিরূপ প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়া আজও বহিতেছে এ সম্বন্ধে আমরা পুস্তকে স্বাধীন গবেষণা করিয়া থাকি এবং জগতের লোকে অবাক হইয়া স্বীকার করে যে, আমাদের মত এরূপ নিরপেক্ষ বিচারক সচরাচর কোথাও মেলে না।

আমরা অচল হইয়া বসিয়া আছি বলিয়াই চারিদিকের আঘাত কেবলি আমাদের ঘা দিতেছে। স্রোতের ঢেউ যখন চলে তখন তাহাদের গতিবেগ আছে বলিয়াই তাহারা পরস্পরকে আঘাত করে না। যত আঘাত গিয়া পড়ে সেই তীরভূমিরই উপর। গতির এ প্রচণ্ড শক্তি রোধ করার ক্ষমতা ত ডাঙার নাই, সে নিয়ত ক্ষয় হইতে থাকে। তাই আজ দেখিতেছি আমাদের মধ্যেও ভাঙন ধরিয়াছে। সেই ভাঙনের তলায় কোথাও হয়তো গোপন সৃষ্টির কাজ চলিতেছে কিন্তু সেটা দৃষ্টির অগোচরে। আমরা যতই কেন চীৎকার করি না কেন, যতই হা-হুতাশ করি না কেন সে ভাঙন কিছুতেই রোধ করিতে পারিব না। আজ যদি সত্যসত্যই আমরা বাঁচিতে চাহি তবে আমাদেরও সমান তালে পা ফেলিয়া সংসারে সমান চালে চলিতে হইবে। নহিলে এই অক্ষয় ক্ষয়ের হাত হইতে কিছুতেই মুক্তি নাই।

এই চলার ধর্ম্মই যৌবনের ধর্ম্ম। নিত্য নূতন নূতন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া কোন্ এক সুদূর অলক্ষ্যের দিকে চলাই নবীনতার লক্ষণ। গাছ আপনাকে বর্ত্তমানের সমস্ত পরিবর্ত্তনের হাতে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমানও তাহাকে ফাঁকি দেয় নাই। তাহাকে সে বড় করিয়া তোলার ভার লইয়াছে। তরুণ অঙ্কুরটির মধ্যে রাতারাতি বনস্পতি হইয়া উঠিবার কোনরকম ব্যস্ততা, কোন-রকম প্রয়াস আমরা দেখি না—অথচ অপরদিকে বিশ্বপ্রকৃতি অহরহ তাহার জীবনের যে-খাদ্য যোগাইতেছে তাহাকে সে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেছে, তাহাতে কোনরকমেই সে শৈথিল্য প্রকাশ করে নাই। আমাদের মধ্যে তেমনি সহজে পূর্ণতা লাভ করিবার দুরাশা অনেকদিনই লোপ পাইয়াছে। এই সহজ পূর্ণতালাভে মানুষই আজ মানুষের সব চেয়ে শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে তাহার সমস্ত বিজ্ঞতা পক্কতা, সমস্ত বৈষয়িকতা ও সাবধানতা লইয়া যাহা সোজা তাহাকে আরো বাঁকাইয়া তুলিয়াছে, যাহা নিতান্তই লঘু তাহাকে গুরুর আসনে বসাইয়া তাহার গৌরব অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যেটি যেমন তাহাকে ঠিক্ তেমনি চোখে দেখিতে শিখিবার উপর আর মানুষের বিশ্বাস নাই। চোখের অপেক্ষা চশ্‌মার আদর ও মাহাত্ম্য এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহাতে মানুষ ক্রমশ স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি হারাইতে বসিয়াছে তাহার খেয়াল তাহাদের নাই। যেদিন এই নকল ঠুলি আমাদের চোখ হইতে খসিয়া পড়িবে সেদিন আমাদের দশা কি হইবে!

চশ্‌মার যে কোন উপযোগিতাই নাই এমন কথা আমি বলি না। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, চশ্‌মা যাঁহারা পরেন বুঝিতে হইবে যে চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি তাঁহারা হারাইয়াছেন। আরো এক কথা এই, চশ্‌মার জোরে যে তাঁহারা বেশি কিছু দেখিতে পান তাহা নহে। কেননা চশ্‌মা মানুষের সৃষ্টি আর চক্ষু বিধাতার দান।

হে বিধাতঃ, আমরা সত্যকে খালি চোখেই যেন দেখিতে শিখি। তাহাকে দেখিবার জন্য কোন শাস্ত্ররূপ চশ্‌মা কিম্বা কোন 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকা'র যেন প্রয়োজন না হয়। আমরা যে জিনিষটাকে সোজা দেখিতেছি তাহাকে তেমনি ভাবেই

যেন গ্রহণ করিতে পারি। তাহার ছায়া অক্ষিগোলকে উল্টাভাবে পড়িতেছে, কি কাৎভাবে পড়িতেছে, কি কি ভাবে পড়িতেছে এ সব লইয়া যেন মিথ্যা মাথা না ঘামাইয়া মরি। হয়তো উল্টাভাবেই পড়িতেছে কিন্তু তাহার মধ্যে আমরা যে রূপটি দেখিতেছি তাহাই যেন আমাদের নিকট সত্য হইয়া উঠে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত।

Mica and its uses

by

S. R. M. Naidu.

M.E., S.M.I.E.E., F.R.S., A.SC., M.R.A., M.S.P.,

Mica is an anhydrous silicate of calcium and aluminium, and crystallises in a laminated mass, easily split along its axis ; it has been subdivided down to 3/10000 inch in thickness. Deposits of this material are found in various parts of the world. The occurrences of pockets in which mica is found cannot be predicted by the geological formation of the locality. In India the best quality mica is found and it has been furnishing the bulk of the worlds' supply for centuries. The principal mine is the Abruker and this is in the interior of the country, remote from civilization, and extremely inacessible. Here the deposits are worked now as they were two thousand years ago. The Abruker mine has been sunk about two hundred feet following the pitch of the vein and all the mica and refuse are raised and carried away by natives. Only drills and hammers are employed ; no machinery of any kind is used. The refuse and the mica are placed in baskets, and are passed up from hand to hand by women who stand in a line on a ladder. When the top is reached the baskets are dumped and returned down the ladder in the same way , but by another line of women. The crude mica is first roughly trimmed and then sorted into different grades, according to sizes and qualities. It is then split up, and the size to which it is to be sheared is marked upon it. After shearing, the mica is cleaned, weighed, and packed ready for transport. At the Abruker mine the packages of mica are loaded into carts drawn by bullocks, and carried in this way to sea ports hundreds of miles away ; the bullocks travel at the rate of ten miles a day. There are many kinds of mica, prominent among which are Muscovite, the common potash mica ; paragonite, an analogous soada variety ; biotite, a magnesia mica having a black or dark green colour ; phlogopite, a bronze coloured mica found in crystalline limestone and serpentine rocks ; lepidomelane, a black mica containing much iron ; and lepidolite, the red-rose or lilac lithia mica. Mica has

many uses, its chief perhaps being in the electrical industry. The fact that mica is elastic and fire proof and that its insulating qualities are unaffected by time, has made it peculiarly adapted for use in electrical machinery. It has been used for vibrating plates in the photophone, and for diaphragms in telephone construction, and in hundreds of other electrical machines and instruments. Mica waste has one or two electrical uses. Insulators are made by splitting up the mica into laminae and solidifying these thin sheets at a high temperature and under a heavy pressure. It is claimed that this treatment increases the insulating properties of the mica. Mica replaces glass in positions exposed to much heat, is used in wall paper varnish; it has many other applications.

গান

কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন
দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা নাহি যেতে
খেলা কেন তব যায় ঘুচে।
চকিত চোখের অশ্রুসজল,
বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল,
কোথা সে পথের শেষ,
কোন্ সুদূরের দেশ,
সবাই তোমায় তাই পুছে।
বাঁশরীর ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে
ফুল যবে ফোটে নাই দেখা,
তোমার লগন যায় যে কখন
মালা গেঁথে আমি রই একা!
এস এস এস আঁখি কয় কেঁদে
তৃষিত বক্ষ বলে, রাখি বেঁধে,
যেতে যেতে ওগো প্রিয়
কিছু ফেলে রেখে দিয়ো,
ধরা দিতে যদি নাহি রুচে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি

II পা ধা ণর্রা। র্রর্সা র্সণা ণা I ধা পা পা। পা -ধণা ণধা I পমা গা মা।

কু সু মে কু সু মে চ র ণ চি ণ্ হ দি য়ে যা

-া -া -া I -া -া -া। মা গা মা I গা -মা -পা। -ধা -ণা -র্সা I র্সধা -র্সা র্সণা।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ও শে ষে দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা

ধা ধা না I না -া না। র্সা -নর্সা -র্রর্সা I -নর্সা -া -া। -া -া -পা I পা ধা ণা।

খি ও হে চ ন্ চ ল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বে লা না

-ধর্রা র্রর্সা ণধা I পর্সা ণা ধা। পা মা গা I রগা -া গা। মা -া -পা I পা -া -র্সা।

০ যে তে খে লা কে ন ত ব যা য় ঘু চে ০ ০ আ ০ ০

-া -া -পা II

০ ০ ০

II {র্সা র্গা র্গা। র্গা র্গা র্গর্মা I র্গর্মা -র্পা র্পর্মা। র্গা র্রা র্রর্সা I র্সনা -া না।

চ কি ত চো খে র অ শ্ রু স জ ল বে ০ দ

না -র্সা -র্রর্সা I -নর্সা -া -া। -া না র্সা I র্সনা নর্রা র্রর্সা। ণা ধা পা} I মা গা গা।

না ০ ০ য় ০ ০ ০ তু মি ছুঁ য়ে ছুঁ য়ে চ ল কো থা সে

গা গা রগা I মা -া -া। -া -া -া I সা -গা গা। গা গা -রগা I মা -া -া।

প থে র শে ষ্ ০ ০ ০ ০ কো ন্ সু দূ রে র্ দে শ্ ০

-া -া -া I মগা গা -মা। পা ধা -ণা I ণপা -র্সা র্সণা। ধা ধা না I না -া না।

০ ০ ০ স বা ই তো মা য় তা ই পু ছে ও হে চ ন্ চ

র্সা -নর্সা -রর্সা I -নর্সা -া -া। -া -া -পা I পা ধা ণা। -ধর্রা র্সা ণধা I পর্সা ণা ধা।

ল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বে লা না ০ যে তে খে লা কে

পা মা গা I রগা -া গা। মা -া -পা I পা -া -র্সা। -া -া -পা II

ন ত ব যা য় ঘু চে ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০

II সা রা গা। -া গা গা I গরা গা মা। পা মা গা I মা -ধা ধা। ধা ধা ধা I
বাঁ শ রী র্ ডা কে কুঁ ড়ি ধ রে শা খে ফু ল্ য বে ফো টে

পধা -া -া। ণা -া -র্সর্রা I র্সণা -া -া। -া -া -া I না না না। না না -পা I
না ই ॰ দে ॰ ॰ খা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ তো মা র ল গ ন্

না -া র্সা। র্সনা র্রর্সা -া I না নর্রা র্রর্সা। ণা ধা পা। মগা -া -া। মা -া -পধা I
যা য় যে ক থ ন্ মা লা গেঁ থে আ মি রই ॰ ॰ এ ॰ ॰

পমা -া -া। -া -া -া I { র্সা র্গা র্গা। র্গা র্গা র্মা I র্গা র্পা র্মা। -র্গা র্গর্রা র্সা I
কা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ এ স এ স এ স আঁ খি ক ম কেঁ দে

র্সনা না না। না -া -ধনা I র্সা -া -া। -া -া -া I র্সনা র্সা র্সনা। র্রা র্সা ণা } I
তৃ ষি ত ব ॰ ॰ ক্ষ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ব লে রা খি বেঁ ধে

ধা পা মা। গা গা মা I গা মা -া। -া -া -া I সা গা গা। গা গা গরা I
যে তে যে তে ও গো প্রি য় ॰ ॰ ॰ ॰ কি ছু ফে লে রে খে

গা মা -া। -া -া -া I মগা মা পা। ধা ণা র্সা I র্সধা -র্সা ণা। ণধা ধা না I
দি ও ॰ ॰ ॰ ॰ ধ রা দি তে য দি না ই রু চে ও হে

না -া না। র্সা -নর্সা -র্রর্সা I -নর্সা -া -া। -া -া -পা I পা ধা ণা। -ধর্সা র্সা ণধা I
চ ন্ চ ল ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ বে লা না ॰ যে তে

পর্সা ণা ধা। পা মা গা I রগা -া গা। মা -া -পা I পা -া -র্সা। -া -া -পা II II
খে লা কে ন ত ব যা য় ঘু চে ॰ ॰ আ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

নববর্ষ

আমরা এই সংসার চক্রের মধ্যে যখন ঘুরি, তখন বিশ্ব-ব্যাপারের একটা অংশ মাত্র হয়ে আপনার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু মানুষের একটি বিশিষ্টতা আছে, সে একদিকে যেমন জ্ঞানের বিষয় অন্যদিকে তেমনি জ্ঞাতা, তাই সে আপনাকে তথ্যরাশির মধ্যে হারিয়ে ফেলে না, সত্যের মধ্যে উদ্ধার করে নিতে পারে।

এবার অসুস্থ শরীর নিয়ে মৃত্যুর পশ্চিম কূলে বসে ম্লান প্রাণের আলোকে অভ্যস্ত জীবন যাত্রা থেকে দূরে আপনাকে ও বিশ্বকে দেখবার অবকাশ পেয়েছিলুম। কলিকাতায় যেখানে ছিলুম সেখানে সহরের পাথরে-বাঁধানো শুষ্কতা ছিল না, চারদিক গাছ পালায় ছিল শ্যামল। সেখানে এবার অনেকদিন পরে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন স্পষ্ট করে দেখ্‌তে পেলুম। হঠাৎ গাছপালার তন্দ্রা ছুটে গেল, বিশ্বযজ্ঞের নিমন্ত্রণ তাদের কাছে এসে পৌঁছল, সাজসজ্জার সাড়া পড়ে গেল; কিকে সবুজে গাঢ় সবুজে, নীলে লালে সোনালীতে প্রত্যেকে নিজের বিশেষত্ব নিয়ে আনন্দিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে এল; দেখে আমার মন পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল। কোথা থেকে এ ডাক এল; যার সাড়া সমস্ত পৃথিবীর বুক থেকে উঠ্‌ছে! আকাশের কোন্ গূঢ় অলক্ষ্য চঞ্চলতা দক্ষিণ হাওয়াকে ব্যাকুল করে তুলেছে। তরুলতার প্রাণশক্তি রূপের লীলায় দিকে দিকে বিচিত্র হয়ে উঠল। প্রত্যেক গাছ আপনার স্বরূপকে পরিস্ফুট করে তুল্‌চে। প্রাণ যেখানে আপন বিশেষত্বের ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানে তার অকৃপণ দাক্ষিণ্য, সেইখানে সে বিশ্বকে উদারভাবে আহ্বান করে। একধারে অশথ, তারি পাশে শিরীষ, তারি পাশে কাঞ্চন—তারা সকলেই রূপে স্বতন্ত্র অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণতাতেই তাদের পরস্পরের ভাবের মিল। আকাশ-বীণার একই আলোকের সুরে তাদের নিজ নিজ বিভিন্ন রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে। অরণ্যব্যাপী প্রাণের আনন্দ-সঙ্গীতে তাদের অবিরোধ মিলন। প্রত্যেক গাছ আপনার বিশেষ আতিথ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আপন আত্মীয়তা জানাচ্ছিল। তা না হলে গাছ দেখে আমার মনে কোনোভাব আস্‌ত না। যখনই সে নিজেকে পূর্ণ করলে, তখনই সে আমাকেও আহ্বান কর্‌লে—তার আপনার পূর্ণতা আমারও পূর্ণতাকে উদ্বোধিত করলে।

বসন্তে এই পূর্ণরূপকে যেমন বাইরে থেকে দেখলুম, তেমনি আমাদের এই বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানটিকে তখন দূর থেকে দেখ্‌বার একটি অবকাশ হয়েছিল। চঞ্চল বর্ত্তমানের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমাদের দৌড়ে চল্‌তে হয় তখন অতি-প্রত্যক্ষের নিকট ধাক্কায় নিখিল সত্যকে সমগ্র করে দেখবার সুযোগ পাইনে। তখন নিজের দৃষ্টির অসম্পূর্ণতাকে সত্যের প্রতি আরোপ করে' তাকেই অসম্পূর্ণ বলে জানি। কিন্তু যখন ঘটনা ও তথ্যের ভিতর একেবারে তলিয়ে ডুবে না থাকি, তখন সমাপ্তির সঙ্গে অসমাপ্তি, গোচরের সঙ্গে অগোচর এক হয়ে সত্যের বিশ্বরূপকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

কোনও মানুষ নিজের মধ্যে পূর্ণ নয়। সকলের সঙ্গে যোগের সত্যতাতেই সে সত্য। অহঙ্কার মানুষকে এই সত্য থেকে বঞ্চিত করে। ব্যক্তিগত মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিকে আমরা রিপু বলে' বিপদ বলেই জানি—সমষ্টির মধ্যে তাকেই আমরা অনেক সময় ভাল বলেই মনে করি। সব মানুষের মধ্যে সব জাতির মধ্যেই এই মোহটি আছে—কিন্তু সে-মোহ অতিক্রম করবার কিছু না কিছু চেষ্টাও সর্ব্বত্র দেখা দিয়েচে। যে জাতিরা সঙ্ঘবদ্ধ তারা কেবলি স্বার্থ ও অহঙ্কারকে প্রকাশ করচে এ কথা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নয়, মানুষের মহত্তম সত্যকেও তারা কিছু না কিছু প্রকাশ করচে। যদিও ভূরি পরিমাণে বাধাও রয়েছে। এই বাধাকেই সংহত করে দেখা এবং দেখানো সহজ। তার অনেক সাক্ষী আছে, তারা অনেক প্রমাণ দিতে পারে যে, মানুষের প্রকৃতি ক্ষুদ্র, সে স্বার্থপর, সে পশুরও অধম। কিন্তু তবু মানুষের মধ্যে এই "না"-এর দিকটাই কি সব? দেখিনি কি মানুষ পরের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েচে। শত্রুকেও

ক্ষমা করতে হবে—এত বড় উল্টা কথাও যে বলেচে, মানুষ তাকে মেনেচে, তাকে প্রণাম করেচে। এই যে তার ধর্ম্ম অর্থাৎ তার প্রকৃতির মধ্যে এইটিই যে চরম সত্য, মানুষ তা স্বীকার করেছে। অর্থাৎ বল্‌চে বৃহত্তের মধ্যে গভীরের মধ্যে এই সত্যই বড় হয়ে আছে। বৃহৎ দৃষ্টিতে পৃথিবী যে কমলালেবুর মতই গোল এই সত্যকে হিমালয় পর্ব্বতের প্রত্যক্ষ উচ্চতাও যেমন অপ্রমাণ করতে পারে না—তেম্‌নি মৈত্রীই যে, মানুষের সবচেয়ে বড় সত্য মহা মহা যুদ্ধ বিগ্রহ সুনিশ্চিত স্বার্থের উৎপীড়নেও তার চূড়ান্ত প্রতিবাদ করতে পারেনা।

বসন্তের বাতাসে কোথাও পাতা ঝরে কোথাও পাতা বেরয়, কোথাও বা কুঁড়ি, কোথাও বা ফুল দেখা দেয়। মানবপ্রীতির বসন্তের হাওয়া নিত্য বইচে, তবু সব গাছে কিশলয় জাগেনি বলে তাকে অবিশ্বাস করব কেন! একটা গাছে যখন নতুন পাতা ফুটে ওঠে তখন তাকে ত বসন্তের প্রামাণ্য সাক্ষী বলে ধরি,—মানুষের মধ্যে দেখি রঙের আভাস দেখা দিয়েচে, সব জায়গায় সমান নাই বা হল তাতে যায় আসে না। সত্যের সেই বসন্তের আহ্বান আজ এসেচে মানব সমাজে। মানুষ যানবাহনের নানা সুযোগ পেয়ে পরস্পরের অত্যন্ত কাছে এসেছে। এই ঘটনাটি সফল হবার চেষ্টা নিশ্চয়ই সকল বিরোধের মধ্যেও ভিতরে ভিতরে কাজ করচে, কেননা সেইটেই যে মানুষের ধর্ম্ম। দুটি একটি নবজীবনের কিশলয় এখানে ওখানে ফুটে ফুটে উঠ্‌চে, উপলব্ধি জাগ্‌ছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের ব্যাঘাতই পাপ, এই কথাটাকে বিশ্বাস করে না, এমন বড় বড় পালোয়ান পৃথিবীতে আছে। তারা আপন আপন অস্ত্র শানাচ্ছে, তাদের বিপুল আয়োজন প্রভূত শক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারাই ক্ষণকালের, তারাই ক্ষুদ্রসীমার; বৃহৎ বাস্তবের মধ্যে, সমস্ত কালের মধ্যে তাদের স্থান নেই। অপর পক্ষে নাই রইল সৈন্য সামন্ত, নাই রইল অর্থ সামর্থ্য, তাদের দিকে বৃহৎ রয়েছেন ব্রহ্ম রয়েছেন—নিত্যকালের মধ্যে তাদের দেখ, তারা সার্থক হয়েই আছে।

মানুষের ক্ষুদ্রতা দ্বেষহিংসা অধর্ম্মই বড়, পশুত্বই তার ধর্ম্ম এই কথাই বলে' যারা সংসারে চলেছে তাদের দোষ দিতে পারি না, তাদের কথার জবাব দিতে পারি না। মানুষ মানুষকে যেমন করে মেরেছে তেমন পশুও মারেনি। তবুও সত্য এই যে মানুষ মানুষ, পশু নয়। মানুষের মধ্যে বড় যাঁরা তাঁদের মধ্য দিয়ে তার বাণী ধ্বনিত হয়েছে, অতীত কালে তাঁরা যা বলেছেন অনাগত কালেও সেই বাণী অম্লান।

আমরা সত্যের দিকেই দাঁড়াব। সয়তান যতই বড় হোক্, তার কুটিল হাস্যের শক্তি যতই থাক্, তাকে শ্রদ্ধা করব না। আশা করি এই সংকল্পই আমরা বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে পারচি। কেউ কেউ বল্‌বেন ঐ সব বিশ্ব প্রভৃতি কথাগুলো অস্পষ্ট ভাবের বাষ্প; ওর আয়তন আছে, রূপ নেই; আয়তনের দ্বারা ভাব বড় হয় না, বড় ভাব যখন নির্দ্দিষ্ট রূপ পায় তখনই তার মূল্য। আমি কবিও সেই কথাই বলি, সেই হল আমাদের সাধনা।

এখানেও যে-সব কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়েছে, তাকে কি—রূপকার যেমন করে পাথর কেটে কেটে মূর্ত্তি গড়ে—আমরা তেমনি করেই গড়িনি। দিনে দিনে এ যে আকারে পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে। অনেকে "বিশ্ব" শব্দ শুনলেই হাসে। যতক্ষণ তার অর্থ কেবলমাত্র শব্দের মধ্যে বাঁধা থাকে ততক্ষণ তা হাস্যকর হতেও পারে। কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বের ভাবটি কেবলমাত্র শব্দ নীহারিকা সৃষ্টি করে' ত নেই। নিকটের অশিক্ষিত গ্রামবাসীরাও আজ এর চারদিকে এসে একত্র হতে পারছে, আবার দূর মহাদেশের শিক্ষিত পুরবাসীরাও। তাদের হৃদয় যে আমরা পেয়েছি সেত শুধু কথার দ্বারা হয়নি, ভাব কর্ম্মরূপ নিয়েছে বলেই তা দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হবার দিকে চলেছে। মানুষ কোনো না কোনো আকারে তাকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চে বলেই তার চারিদিকে এসে জুট্‌চে। আপন বাহ্য দেহের কণ্ঠেই তাদের অন্তরের বাণী বেজে উঠ্‌ল—নইলে শূন্য হাওয়ার হাহাকার কি কোনো মানুষকে নাম ধরে' ডাক্‌তে পারে? এ ডাক যাদের নিজে শোন্‌বার শ্রদ্ধা বা

অবকাশ নেই তারাই মনে করে যে, এ ডাক কোথাও বুঝি ভাষা পেল না, কোনোখানেই বুঝি পৌঁছতে পারল না। কিন্তু সত্যের ডাক সম্বন্ধেই একথা খাটে যে নিকটের অনাদরে বর্তমানের অবজ্ঞায় তার ব্যর্থতা নেই, কারণ, কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বীঃ।

বিশ্বভারতীর তিনটি পরিচয় আছে। একটি হচ্ছে এর দেহটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের। আশ্রমে ছোট বড় যারা-কেউ এসেছে তাদের ত্যাগের দ্বারা ভোগের দ্বারা, তাদের বাধার দ্বারা আনুকূল্যের দ্বারা তাদের বাসনার দ্বারা কর্মের দ্বারা এর শরীর-প্রকৃতি বিশেষভাবে গড়ে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পরিচয়, এর মনঃপ্রকৃতি ভারতের। বেদের থেকে এ আপনার মন্ত্র গ্রহণ করেছে—সেই মন্ত্রটি হচ্ছে "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং"—সত্যকে এ সেইখানেই সন্ধান করে যেখানে বিশ্ব এক নীড়রূপে প্রকাশ পায়। এর তৃতীয় পরিচয়,—এর সম্বন্ধটি বিশ্বের। এর যা বিশেষত্ব তা বিশ্বকে স্বীকার করবার জন্যে, গ্রহণ করবার জন্যে। এর যদি নিজের কোনো বিশেষরূপ না থাকত তাহলে বিশ্বের সঙ্গে এর যোগের কথা নিতান্তই ফাঁকা কথা হত। এর দেহকে গড়ে তোলবার জন্যে আমাদের প্রয়াস, এর মনকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্য আমাদের সাধনা। এর লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের অহৈতুক আত্মীয়তার যে ঐক্য তাকেই বিশ্বাসের দ্বারা বাক্যের দ্বারা ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে ঘোষণা করা। বিশ্বভারতীর এই রূপটি ও এই বাণীটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্চে বলেই এখানকার গ্রামবাসীরা এত সহজে আমাদের কাছে আস্তে পাচ্চে, সহজে বুঝ্তে পারচে বেড়া-তোলা স্বাতন্ত্র্যকে আমরা জানিনে। সেই জন্যেই দূর দেশ থেকে যে-সব অতিথি এখানে এসেছেন তাঁরা এখানে অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের স্বাদ পেয়েছেন। এই যে সার্থকতা এটা আমাদের কারো ঘর-গড়া জিনিষ নয়। ভিতরের থেকে এ আপনাকে আপনি পূর্ণ করে তুলেচে, সেই জন্যেই এ আমাদের নিজেদেরও বিস্ময়ের বিষয়। আমাদের সঙ্কল্পের সমস্ত কৃত্রিমতাকে পাশ কাটিয়ে এ আপনার পথ আপনি প্রস্তুত করেচে। আমরা এ'কে তৈরি করিনি, আমরা এর দ্বারা তৈরি হয়ে উঠ্চি। দেশ বিদেশে একান্ত অনাস্থা ও বিরুদ্ধতার দিনেও সত্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা রেখেছিলুম এইটুকু আমাদের পুণ্য; সেই পুণ্যফলের একটু আশা রাখি। যে-সত্যের আমরা পুজা করেছি আমাদের মন্দিরে তাঁর প্রতিষ্ঠা স্পষ্ট দেখে যেতে পারব এইমাত্র আমাদের কামনা।

যখন তিনি অনতিব্যক্ত ছিলেন তখন কখনো তাঁকে বিশ্বাস করেছি কখনো বা মনে সন্দেহও জন্মেছে; ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়েছে, মানুষ নিষ্ঠুর, মানুষ স্বার্থপর এইটেই বুঝি মানুষের শেষ কথা। অদৃশ্য দক্ষিণ হাওয়া যেমন প্রথমে কোথা থেকে অরণ্যে একটি অশ্রুত বাণী নিয়ে আসে তার পরে সেই বাণী নিগূঢ় শক্তিতে পুষ্পে পল্লবে চারিদিকে বিচিত্ররূপে মূর্তিমতী হয়ে উঠে, যা কিছু ছিল সুপ্তির আচ্ছাদনে, অলক্ষ্য সোনার কাঠির স্পর্শে তাই যেমন প্রকাশিত হয়ে পড়ে; আমরা তেমনি যেন দেখ্তে পাই সত্যের বাণীর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেওয়া হয়েচে;—যা ছিল স্বপ্নের মধ্যে অবরুদ্ধ তাই জাগরণের মধ্যে উদ্ঘাটিত হ'ল; বলতে যেন পারি আমরা স্পষ্ট করে দেখেছি, জেনেছি; চারদিকে অশ্রদ্ধার ঢেউ ওঠে ত উঠুক কিন্তু তারি মাঝখানে একটি বিকশিত পদ্মের উপরে দেবতা আসন গ্রহণ করেচেন এইটেই যেন আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

ভাববিলাসিতা বলে একটা রিপু আছে জানি; সেই রিপুতে যাদের পেয়ে বসে তারা সত্যকে নেশার জিনিষ করে তুলে তাতেই অহরহ মগ্ন থাক্তে চায়। বাইরে থেকে মনে হয় যেন তারা ভক্ত কিন্তু ফুলের ভিতরকার কীট যেমন ফুলের ভক্ত তারাও তেমনি। তারা আপনার ভোগের দ্বারা সত্যকে বিকৃত করে। সত্যে যার অশ্রদ্ধা সেও সত্যের তেমন শত্রু নয় সত্যে যার মত্ততা সে যেমন।

কেউ কেউ এমন কথা বলে থাকেন, যে, ভাব ভোগ করবার জন্যে এখানে আমরা একটা নেশার আড্ডা করেছি। অর্থাৎ এখানে সত্যকে রূপ দেবার সাধনা আমাদের নেই, সত্যকে ছুঁইয়ে রস নেবার বাসনাই প্রবল। দূরের থেকে যাঁরা

অশ্রদ্ধাভরে এই অপবাদ দেন তাঁরা অশ্রদ্ধাভরে দূরেই থেকে যান, সুতরাং যে রূপটিকে আমরা দেখ্‌তে পেলুম সে-রূপ তাঁদের দেখাতে পারলুম না। ক্ষতি নেই, কারণ, নমস্কারের সঙ্গে যাকে দেখা উচিত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকে দেখায় অপরাধ আছে। সত্যের সৃষ্টিক্ষেত্র আমরা প্রস্তুত করছি, ভাবের কুহক-লোক নয়, এ কথা দেশসুদ্ধ সকলে অস্বীকার করলেও আমরা বঞ্চিত হব না।

আজকের দিনে, নববর্ষের আরম্ভের দিনে সেই-রূপটি দেখ, যে-রূপ নানা আঘাতে অভাবে অপমানে, আমাদের নানা ত্রুটিতেও বড় হয়ে উঠ্‌ছে। এ'কে শুধু বাহিরের বস্তু বলে' দেখো না', এ'কে অন্তর্নিহিত সত্যের প্রকাশ বলে' দেখ। আমি একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের এই লাইব্রেরী। এ ত ধনীর টাকায় হঠাৎ-তৈরী করা আড়ম্বরের জিনিষ নয়। এ যে বিশ্বভারতীর অঙ্গ হয়ে ধীরে ধীরে অভাবনীয় রূপে বেড়ে উঠেছে। আমাদের কাছে বিশ্বভারতীর সাধনা যত সত্য হয়েছে, লাইব্রেরীও সেই সত্যের জোরেই তত পূর্ণ হয়ে উঠেছে; এমন একটি ভাবের দ্বারা এ পুষ্ট যে, অর্থের অভাবও এ'কে দরিদ্র করতে পারেনি। বনস্পতির মত এ আপনার রস আপনিই আকর্ষণ করে নিয়েছে, বাইরে থেকে জল সেচন করতে হয়নি।

আমি দূরে সরে' গিয়েছিলুম বলেই আমাদের কাজের এই রূপটি আমার কাছে উজ্জ্বল হয়েছিল। ছোট খাটো খুঁটি নাটি তখন চোখে পড়ে নি। এর যা তুচ্ছ সেগুলোকে মানুষ ধ্রুব করে রাখ্‌ব ভেবে, পাথরের পর পাথর গাঁথে, তার মধ্য দিয়ে অশ্বত্থ গাছ ওঠে। বিশ্বসত্যের মধ্যে যাকে পাই, মৃত্যু তাকে পুনঃপুনঃ প্রাণের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনে; নিয়ম লুপ্ত হতে পারে, বাইরের সব ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু তার বিনাশ নেই। আমাদের সংস্কার এম্‌নি জড়পূজক যে, সে মনে করে বাইরের কঠিন উপকরণ দিয়ে সত্যকে সে রক্ষা করবে। কিন্তু প্রাণ যে সুকুমার, কাঁচা; তার মত ধ্রুব কে! সে মরাকে অবজ্ঞা করে। জড়তা যত ধ্রুবত্বের ভঙ্গী করুক না, সে লোপের দিকেই চলেছে। প্রাণকে বিশ্বাস করব। প্রাণবান সত্য চিরপরিবর্ত্তন-শীল, জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়ে তার আবির্ভাব হয়। সত্যের সেই চির-প্রবহমান অমৃতরূপের ধারা দেখি কোথাও প্রবাহিত হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না, তবুও সে মরুকে একটু একটু করে জয় করেছে। সেই শ্যামলতার বিজয়ীরূপকে রেখে দিতে পারি যেন আমাদের মধ্যে, সংস্কারের আচ্ছাদন সরে যায় যেন, দৃষ্টির উপর থেকে কুহক যেন কেটে যায়, চিত্তের উপর আবরণ যেন না থাকে। সত্যকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে তার জন্যে আমাদের ত্যাগ যেন সহজ হয়, আমাদের পূজা যেন আমাদের অন্তরের মধ্যেই সার্থকতার ফল দান করে। আমাদের বাণী সেবা কর্ম্ম ত্যাগ এই মহৎ সত্যের উপযুক্ত হোক, বিশ্ববিধাতার কাছে এই আমরা আশীর্ব্বাদ চাই।

বর্ষশেষ

কাল শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে প্রবল ঝড় উঠেছিল। এই সূত্রে আবার আর একদিনের কথা মনে পড়ে গেল। ১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্ত্তে একটা প্রচণ্ড ঝড় দেখেছি। তখন আমি পদ্মাতীরে বিষয় কর্ম্ম ও সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত ছিলুম। এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা' কিছু পুরাতন ও জীর্ণ, তা'র আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনি ভাবে, চির-নবীন-যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্য। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থাম্‌ল, বল্‌লুম, অভ্যস্ত কর্ম্ম নিয়ে এই যে এতদিন কাটালুম এতে ত চিত্ত প্রসন্ন হল না। যে-আশ্রম জীর্ণ হয়ে যায় তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়; ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার

ভিৎকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝ্লুম বেরিয়ে আস্তে হবে।

একদিন তাই নদীতীরের সেই ছায়া-সুশীতল আবাস পিছনে ফেলে আমাকে বড় বিশ্বক্ষেত্রে আস্তে হল, আমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। আহ্বানটা যে কিসের, কোন্‌দিকে এর গতি তখনো তা ভাল করে বুঝ্‌তে পারি নি; পথে বেরিয়ে পড়েচি, গম্যস্থানের কথা স্থিরভাবে বিচার করা হল না। পাঁচ সাত ছেলে নিয়ে গাছতলায় আসন করে আমার সাধ্যমত পড়াতে বসে গেলুম—মনে হল এমনি করে একটি কর্ম্মধারার নিয়ত আঘাতে জীবনের স্বার্থবেষ্টন ধীরে ধীরে ক্ষয় পেয়ে আস্‌বে। এম্‌নি করে পাথরের সঙ্কীর্ণ গুহা থেকে ছোট ঝরণা বেরিয়ে এল, তখন সে আপনার নদীরূপ কল্পনাও করেনি। এই যে আমার নিষ্ক্রমণ, এর পরে আমার আর ফেরবার পথ রইল না—সংসারে আমার গৃহের দ্বার একে একে বন্ধ হতে লাগ্‌ল, মৃত্যুক্ষতি প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সংসার আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। বিশ্বের মধ্যে জীবনের নূতন পর্ব্ব সুরু হল।

কালকের দিনে যে ঝড় তাকে সেদিনকার বর্ষশেষের ঝড়েরই পুনরাবৃত্তি বলে গ্রহণ করেছিলুম। কাল ঝড়ের অবসানমাত্রেই পশ্চিম দিগন্ত থেকে হঠাৎ উজ্জ্বল একটি রশ্মিরেখা আশ্রমের প্রান্তরকে এক মুহূর্ত্তের স্পর্শে উদ্ভাসিত করে দিল। সুন্দরের রুদ্রবেশ সহসা খসে পড়ল, তিনি ক্ষণ কালের জন্য সন্ধ্যাকাশে দাঁড়িয়ে আমাদের রুদ্ধদ্বারে আলোকের আঘাত করলেন,—বল্‌লেন "আমি এসেছি, আমাকে গ্রহণ কর"। আকাশে যেন বেদমন্ত্র বেজে উঠ্‌ল "আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি"। যিনি সত্য তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। ঝড়ের শেষে বাণী এল তিনি যেন সেই আনন্দরূপেই আমাদের জীবনে আমাদের কর্ম্মে প্রকাশ পান। যে সব আবর্জ্জনা আমাদের আপনার মধ্যে জমা হয়ে উঠে সেই প্রকাশকে আবৃত করে, প্রলয় এসে তাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিক্‌। বর্ষশেষের সায়াহ্নে যে-অবসানের সুর বেজে উঠেছে তার মর্ম্ম কথাটাত এই।

অবসান ত শূন্যতা বলে আপনার পরিচয় দিতে আসে নি। জীর্ণকে সে সরিয়ে দিতে চায়, পূর্ণের নবীনরূপ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করবার জন্য; মৃত্যুর আচ্ছাদন ছিন্ন করে দেয়, সত্যের অমৃতরূপকে তার অসীম সিংহাসনে দেখিয়ে দেবার জন্য। কালকের ঝড় প্রথমে ধুলো উড়িয়ে অন্ধকার করে দিলে, শুকনো পাতায় দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল—কিন্তু এই খানেই ত থাম্‌ল না,—সোনার সিংহদ্বার খুলে গেল, দেখা দিল একটি নির্ম্মল আলোকের ছটা। সেই ত জানিয়ে গেল বর্ষ-শেষের আহ্বান, অবসানের পরপারের কথা। সে বলে গেল আনন্দরূপকে আপন জীবনের মধ্যে কর্ম্মের মধ্যে যদি প্রকাশমান করতে চাও তবে তার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। এই জায়গা করে দিতে পারে বৈরাগ্যে। একবার সব ধুলো ঝেঁটিয়ে দিতে হবে, শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিতে হবে; সব জঞ্জাল সব জঙ্গল পুড়িয়ে দেওয়া চাই। একবার বর্ষ অবসানে বৈরাগ্যের ঝড় আসুক তার পরে নববর্ষের আনন্দ আলোক নির্ম্মল হয়ে দেখা দেবে।

উপনিষদে আনন্দরূপের এই প্রকাশকে তিন দিক থেকে দেখেছেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে, লোকালয়ে, আত্মায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে তিনি শান্তং লোকালয়ে শিবং আত্মায় অদ্বৈতং। এই তিন ভাবের মধ্যেই দেখতে পাই সংযম, যাকে বলেচি বৈরাগ্য। বিশ্বপ্রকৃতিতে নানা শক্তির যে-আন্দোলন চলচে তাতে আকাশ ব্যাপ্ত করে প্রলয়ের সংঘাত আনচে না তো। সকল প্রকার গতির মধ্যে শান্তিকেই দেখ্‌চি। তার কারণ পরস্পরের মধ্যে পরিমাণ রক্ষা হচ্চে। যে-খানেই অসামঞ্জস্য এসে পড়ে সেখানেই দরবারে নাম কাটা যায়।

বিশ্বসম্বন্ধের মধ্যে অসংযমই হচ্চে রিপু, এতেই বিনাশ এসে পড়ে। সম্বন্ধের মধ্যে যেখানে শান্তি সেইখানেই আনন্দরূপের প্রকাশ, সুন্দরের আবির্ভাব। লোকালয়েও তাই মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের সামঞ্জস্যকেই বলি কল্যাণ—তার ত্রুটি যেখানে সেইখানেই কুৎসিত, সেইখানেই দুঃখ, আনন্দরূপ সেইখানেই প্রকাশে বাধা পায়। সেইখানেই বারেবারে বিপ্লবের ঝড় এসে পড়ে। আত্মার মধ্যে অদ্বৈত বোধ পরাস্ত হয় কোথায়? কোথায় অন্যের সঙ্গে মিলনের দ্বারা আপনার

সত্যকে উপলব্ধি করতে তার বিঘ্ন ঘটে? যেখানে অহঙ্কার উদ্ধত হয়ে থাকে, যেখানে লুব্ধ স্বার্থপরতা অসংযত। আত্মার মধ্যে সত্যের আনন্দরূপ প্রকাশ পায় সেখানেই যেখানে ত্যাগের দ্বারা প্রেম আপনাকে সার্থক করে। যেখানে বৈরাগ্য অনুরাগের আসন পেতে দেয়।

প্রকৃতি: সঙ্গে যোগরক্ষাকে আমাদের আশ্রমে আমরা কখনই অবজ্ঞা করিনি। আমাদের গানে আমাদের উৎসবে নানা উপলক্ষ্যেই আমরা বিশ্বের হৃদয়বাসী সুন্দরকে অভ্যর্থনা করে থাকি। কিন্তু এই কথা বারবার আমাদের মনে রাখা দরকার যে অন্তরের মধ্যে কেবলমাত্র রসভোগের দ্বারা সুন্দরের উপলব্ধি নয়—সেবার দ্বারা সাধনার দ্বারা সুন্দরকে উদ্বোধিত করে তুলতে হয়। যেখানে অজ্ঞান, আলস্য, ঔদাসীন্য সেখানে কুৎসিত। মরুর আবরণ ভেদ করে শ্যামলকে উদ্ধার করতে হয়। তাতে বুদ্ধি চাই, জ্ঞান চাই বীর্য্য চাই। এখানকার গাছপালা পশু পাখীর সঙ্গে আমাদের সাধনার সম্বন্ধ নানা কর্ম্মের দ্বারা সার্থক করে তুলতে হবে। আমরা জ্ঞানময় কর্ম্মের যোগে সুন্দরের সত্যকে যথার্থভাবে জানি, আমরা প্রীতিময় সেবার দ্বারা সত্যের সৌন্দর্য্যকে যথার্থভাবে ভোগ করি। দুর্ব্বল-যে সে কখন সুন্দরকে পায় না। আমাদের শ্রীহীন সুখহীন প্রাণহীন গ্রামগুলিতে গেলে কি এইটেই আমরা বুঝতে পারিনে? সেখানে যা কিছু অসুন্দর, অপূর্ণ, তা নিয়ে কার সঙ্গে আমাদের লড়াই, নিজের সাধনাহীন কর্ম্মহীন চিত্তের জড়ত্বের সঙ্গেই কি নয়?:

তাহলেই বোঝা যায় দেশের বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আনন্দরূপের প্রতিষ্ঠা করতে যদি চাই, সেখানে যিনি শান্তং তাঁকে যদি উপলব্ধি করতে যদি চাই তাহলে যিনি শিবং লোকালয়ের মধ্যে তাঁর আসন নির্ম্মাণ করতে হবে। দুইয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগ। এই জন্যেই আমাদের দেশে যে-বিশ্বশক্তিকে আমরা শ্রী বলি তার মধ্যে সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ এক হয়ে আছে। আনন্দের যে শক্তি বাহিরের প্রকৃতিতে শান্তিরূপে শোভারূপে, সেই একই শক্তি লোকালয়ে শিবরূপে। অর্থাৎ সে শক্তি হচ্চে সংযম, সে শক্তি, সম্বন্ধের সামঞ্জস্য। সে শক্তি ত্যাগের শক্তি। ত্যাগের মানেই হচ্চে, নিজেকেই একান্ত করে' তোলার মধ্যে যে সর্ব্বনেশে ক্ষতি সেই ক্ষতির কারণকে দূর করা। সেই ক্ষতি হচ্চে সত্যের ক্ষতি। যেখানে সত্যের ক্ষতি সেইখানে অমঙ্গল, সেইখানে বিনাশ। যে-সমাজে মানুষ আপনাকেই বেশি করে দেখে, পরস্পরের সেবায় সহায়তায় ত্যাগ করতে জানে না সে-সমাজে মানবধর্ম্মের অনাদর বশতই যত দুঃখ গ্লানি অপমান, যত দুর্ব্বলতা অসৌন্দর্য্য জমা হয়ে ওঠে। ত্যাগের দ্বারা সত্যের সাধনা করলে তবেই সত্যের আনন্দরূপ প্রকাশ পায়, কি বাহিরের প্রকৃতিতে কি লোকালয়ে। আনন্দরূপের সেই প্রকাশই হচ্চে শান্তি, সেই প্রকাশই হচ্চে কল্যাণ। এখানে আমাদের আশ্রমে লোক-সেবার সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েচে। দিনে দিনে ত্যাগের এই সাধনায় সেবার অভ্যাসে তোমাদের অন্তরের মধ্যে বল লাভ করুক। ভালো করে ভেবে দেখ আমাদের দুর্গতিগ্রস্ত দেশের সমস্যাটা কি? যে-সত্য আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পান, এদেশে তারই প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েচে। সেই অপ্রকাশের দুঃখ বাহিরের চারদিকেই কিন্তু তার বাধা আমাদের অন্তরের মধ্যে। আমরা কল্যাণের শক্তিকে অন্তরে পাইনে বলেই শান্তকে শিবকে বাহিরে পাইনে। তাই কেবলি আমাদের পরাভব, আমাদের অপমান, আমাদের বিনাশ।

এই সেবার এই ত্যাগের শক্তিকে আমরা অন্তরের মধ্যে সত্য করব কি উপায়ে? অদ্বৈত বোধের দ্বারা। শান্তং শিবং অদ্বৈতং, আনন্দরূপের এই তিন ভাবের প্রকাশের মধ্যে নিবিড় মিল আছে। যে-সংযমের মধ্যে শান্তি, যে-সামঞ্জস্যের মধ্যে মঙ্গল তার মূল কোথায়? অদ্বৈতের মধ্যে। এক আছেন অনেকের মধ্যে এই কথাটাই সত্য বলে সংযম সত্য সামঞ্জস্য সত্য। এই জন্যেই সংযমে শান্তি, ত্যাগে কল্যাণ। এই জন্যেই অত্যাচারে বিপ্লব, অহমিকায় বিনাশ। এই অদ্বৈতবোধের গণ্ডি যেখানেই আমরা প্রবল করে খাড়া করি সেই খানেই পাপ লুকিয়ে থাকবার আশ্রয় পায়; তার

পরে সেই পাপ আজ হোক কাল হোক্ শান্তিকে কল্যাণকে এই বেড়ার বাহিরে নির্ব্বাসিত করে দেয়।

আমাদের অন্তরে অদ্বৈতের বাধা প্রেমের বাধাই সব চেয়ে কঠিন। অহঙ্কারের মূল আমাদের স্বভাবের অদৃশ্য ভূগর্ভের মধ্যে—যেমন তা গভীর তেমনি তা বহুবিস্তৃত। আমরা তাকে কোনো কারণেই কোনো বর্ত্তমান সুবিধার দোহাই মেনে স্বীকার করতে পারব না।

এখানে আমরা সেই অদ্বৈতের দ্বার কি খুলে দিই নি? সুদূর বিদেশ থেকে অতিথি এখানে সমাগত হয়েছেন, তাঁরা এখানে প্রীতি পেয়েছেন, প্রীতি দিয়েছেন। আমরা এদেশে আজন্ম ভেদবুদ্ধির চর্চ্চা করেছি, আচার ব্যবহারের প্রভেদ নিয়ে মানুষকে অবজ্ঞা করেছি, এই চির অভ্যাস আমাদের কঠিন অন্তরায় হয়ে রয়েছে কিন্তু আমাদের আশ্রমে সেই ভেদের প্রাচীর কিছু কিছু বিদীর্ণ করতে পেরেছি।

আজ বর্ষশেষের দিনে নিজের মনকে একবার ভালো করে বলিয়ে নিই, আমরা আনন্দ স্বরূপকে অন্তরে বাহিরে লোকালয়ে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মধ্যে স্বীকার করেছি। সত্যকে স্বীকার করবার যে মহৎ দায়িত্ব সে যেন আমরা পালন করতে পারি। দেশের লোক আমাদের সাধনায় যদি বিশ্বাস না করেন নম্র হয়ে তাঁদের ভর্ৎসনা স্বীকার করে নেব কিন্তু আমাদের ব্যবহারে আমাদের ব্রতের অগৌরব যেন না ঘটে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্রম সংবাদ

বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। দুইদিনই গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর অনেক সভ্য যাঁহারা পরিষদ উপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন তাহারাও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। নববর্ষের দিন মন্দিরের পর আম্রকুঞ্জে আশ্রমবাসী সকলের জন্য এবং সমাগত অতিথিগণের জন্য জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

বর্ষশেষের দিন রাত্রে উত্তরায়ণে গুরুদেবের বাড়ীতে "সুন্দর" নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় করা হয়। সবশুদ্ধ তেরটি গান অভিনয় করিয়া গাওয়া হইয়াছিল। তার মধ্যে ১১টি গানই সম্পূর্ণ নূতন ছিল। আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রীগণ অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীগণ আল্পনা দ্বারা এবং নানা প্রকার রঙ্গীন কাপড় ও ফুল দ্বারা অভিনয় স্থলটি অতিসুন্দর ভাবে সাজাইয়া ছিলেন। এই অভিনয়টি গত দোলপূর্ণিমায় করিবার কথা ছিল এবং সেই অনুসারে দোলপূর্ণিমার দিন আম্রকুঞ্জে সাজান হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শেষ মুহূর্ত্তে ঝড়ে ও বৃষ্টিতে সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া ঐ দিন অভিনয় স্থগিত ছিল। পরে বর্ষশেষের দিন উহা অভিনীত হয়। অভিনয় এবং গান বেশ ভাল হইয়াছিল।

বিহার ও উড়িষ্যার Co-operative Societyর ২ জন কর্ম্মী শ্রীযুক্ত এ, রহমান এবং এন, কে, রায় মহোদয় "Salvation of India through Co-operation" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন।

গত ১২ই এপ্রিল বিশ্বভারতী পরিষদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর জনৈক কর্ম্মী ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে আমাদের দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

গত ১২ই এপ্রিল বিশ্বভারতীর পল্লীসেবা বিভাগের পক্ষ হইতে বীরভূম জেলার কতকগুলি স্কুলের এবং গ্রামের ব্রতীবালকগণকে (Scouts) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। প্রায় দুইশত বালক সমবেত হইয়াছিল। ঐদিন অপরাহ্ণে তাহারা নানাপ্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ মুহূর্ত্তে প্রবল ঝড়ে সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সমস্ত খেলা ঐদিন শেষ না হওয়াতে পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত খেলা শেষ করিয়া পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পূজনীয় গুরুদেব পুরস্কার বিতরণ করেন।*

গুরুদেবের স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে। তিনি বর্ত্তমানে কিছুদিন এইখানে থাকিবেন। তাঁহার জন্মোৎসব করার আয়োজন হইতেছে। এই বৎসরে তাঁহার ৬৫ বৎসর পূর্ণ হইবে।

---

* ইহার বিস্তৃত বিবরণ পল্লীসেবা বিভাগের মুখপত্র "ভূমিলক্ষ্মী" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে বাহির হইবে।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩৩২ সাল। { ৫ম সংখ্যা

শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র
চিরঞ্জীবেষু

জনম দিবস আজি তোমার।
ধর উপহার বড় দাদার॥
বিশ্বভারতী ভারত প্রাণা
নানা দেশে ধরি মুরতি নানা,
প্রকাশিলা লীলা অতি অপূর্ব্ব।
কবি যবে দিলা গীতঅনজলি
বলিলা জননী স্নেহ রসে গলি
"কত আমি বিদেশে ঘুর্‌ব!
"এসেছিস্ তুই শুভ মুহূরতে
নিয়ে চল্ মোরে পুণ্য ভারতে,
শান্তি-সদন সেই আমার।

নেপথ্যে ॥ বহুকালের প্রাচীন বৃদ্ধ ॥
সেই বালকটি সেদিনকার
পঞ্চষষ্টি হইল পার,
কাণ্ড একি চমৎকার !
পঠদ্দশার নাবালক বৃদ্ধ ॥ চমৎকার না চমৎকার !!
শুভকামী দ্বিজ ॥ নবারুণ-রথীকে নিয়ে রবি দীপতিমান্
বর্ষে বর্ষে এম্‌নি দিনে করিবে যবে ধেয়ান
তৎসবিতৃ দেবতার বরণীয় ভর্গ
শান্তিনিকেতন হবে পৃথিবীতে স্বর্গ ॥
সত্যজ্যোতি বিনা হায় আঁধার পৃথিবী ।
আঁধারের আলো রবি হো'ক চিরজীবি ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিতৈষণা

আমার একজন অসামান্য উদারচরিত ভারতহিতৈষী খ্রীষ্টান বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি সেন্ট পৌলের নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র উপদেশ জো শো করিয়া বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলাম। কথাগুলি খুব সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or tinkling cymbal.

2. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries, and knowledge: and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

3. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity; it profiteth me nothing.

১। আমি যদি মানুষের অথবা দেবতাদের ভাষায় কথা বলি, কিন্তু আমাতে যদি হিতৈষণা না থাকে, তাহা হইলে আমার মুখের কথা হইবে কাঁসর ঘণ্টার অর্থশূন্য ঠুং‌ঠাংধ্বনি বা করতালের গগণভেদি ঝঙ্কার ধ্বনির ন্যায় ফাঁকা আওয়াজ বই আর কিছুই না।

২। যদিও আমি ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষদিগের ন্যায় বাকসিদ্ধ হই, আর সেইগুণে যদি এরূপ হয় যে জ্ঞানের যত কিছু নিগুঢ়তত্ত্ব আছে সমস্তই আমার নখদর্পনে; যদি আমার বিশ্বাসের বল এত অধিক হয় যে তাহার নিকটে পর্ব্বত সমান বাধাও বাধা বলিয়া প্রতীয়মান না হয়—কিন্তু তাহার মধ্যে যদি হিতৈষণা না থাকে—তাহা হইলে আমি কিছুই না।

৩। দীন দরিদ্রদিগের অভাব মোচনের জন্য যদিও আমি আমার সমস্ত সম্পতি উৎসর্গ করিয়া দিই, এমন কি দেহকে পর্য্যন্ত পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলি, কিন্তু আমাতে যদি হিতৈষণা না থাকে তাহা হইলে আমার তাহাতে কোনই লভ্য নাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের মূল্য নিরূপণ

বিগত প্রবন্ধে বলিয়াছি শুষ্ক বিজ্ঞান রূপার কাটি অমৃতময় ব্রহ্মজ্ঞান সোনার কাটি। ব্রহ্মজ্ঞানের মূল মন্ত্র হচ্ছে ওঁকার এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় সৎচিদানন্দ ব্রহ্ম। সৎচিদানন্দ শব্দের গোড়াতেই রহিয়াছে সৎ, সৎ কি? না ধ্রুব সত্য। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্যের উপরে দাঁড়াইয়া আছে একথা আমাদের মন কিছুতেই সায় দিতে পারে না। সমস্তেরই মূলে জাগ্রত জীবন্ত বাস্তবিক সত্তা দেদীপ্যমান রহিয়াছে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ধ্রুব সত্য। আর সেই ধ্রুব বাস্তবিক সত্তাই আমাদের দেশীয় শাস্ত্রে সৎ শব্দের বাচ্য।

জিজ্ঞাসু॥ তুমি বলিতেছ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলস্থিত বাস্তবিক সত্ত' সর্ব্ববাদী সম্মত কিন্তু এ কথা আমার মনঃপূত হইতেছে না, আমি সেদিনকার জীব বই নই, দুদিন পরেই চলিয়া যাইব। এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জগতই আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে তখন আমার নিকট আমিও যেমন নাই জগতও তেমনি নাই, ইহার মধ্যে আমারই বা অস্তিত্ব কিসে বাস্তবিক এবং জগতেরই বা অস্তিত্ব কিসে বাস্তবিক তাহাতো দেখিতে পাইতেছি না। এরূপ অবস্থায় আমার মতো ক্ষুদ্র জীবদিগের মুখে একথা কিরূপে শোভা পাইতে পারে যে আমার বাস্তবিক সত্তা আছে বা জগতের বাস্তবিক সত্তা আছে। উত্তর॥ সতের সঙ্গে চিৎ অবিচ্ছেদ্যরূপে সংলগ্ন রহিয়াছে। তুমি এই যে সব কথা বলিলে কিসের জোরে বলিলে? অবশ্য চিতের জোরে, জ্ঞানের জোরে। পশুপক্ষীদের জ্ঞান নাই তাহারা জগতের অস্থায়ীত্ব দেখে না, কোন কিছুরই দোষ অনুসন্ধান করে না, দিব্য সুখে আছে। অতএব আমার নিকট দুঃখ না জানাইয়া তোমার জ্ঞানের নিকটে গিয়া বিনীতভাবে বল কেন তুমি আমাদিগকে এরূপ নৈরাশ্যে ডুবাইয়া দিতেছ? তুমি না আসিলেই ভাল হইত, তাহা হইলে পশুপক্ষীদের ন্যায় দিব্য নির্ভাবনাচিত্তে সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। অতএব আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও। সূর্য্যকে তেমনি তুমি বলিতে পার যে তুমি উদয় হইলেই আমরা যত প্রকার কাঁটাবন, কুৎসিত কদর্য্য আবর্জ্জনা রাশি যেখানে সেখানে দেখিতে পাই, অতএব তুমি যদি উদয় না হও তবে আর ও সকল আমাদিগকে দেখিতে হয় না আমরা দিব্য মনের সুখে কালযাপন করিতে পারি। মনে কর তোমার প্রার্থনা অনুসারে সূর্য্য এক সপ্তাহের মত জগৎ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তখন তিনদিন যাইতে না যাইতেই তুমি কাঁদুনি গীত গাহিতে থাকিবে এইরূপ; আমি দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি নাই, সূর্য্য যেমন কাঁটাবন দেখাইত তেমনি পুষ্পবনও দেখাইত, যেমন কুপথ দেখাইত, তেমনি সুপথও দেখাইত, যেমন কুৎসিত সামগ্রী দেখাইত তেমনি সুন্দর সামগ্রীও দেখাইত আর আমি সেই সুযোগে কাঁটাবন ছাড়িয়া পুষ্পবনে যাইতাম, কুপথ ছাড়িয়া সুপথে যাইতাম ইত্যাদি। এখন কেবল অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছি, কোথাও কোন আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই। অতএব তোমার জানা উচিত যে, যে কোন বস্তুই হোক্ না কেন—সূর্য্যই হোক্ আর চন্দ্রই হোক্—জ্ঞানই হো'ক আর ভাবই হোক্ তার সৎব্যবহার করিলেই সুফল ফলে অপব্যবহার করিলেই কুফল ফলে। আমাদিগকে পথ দেখাইয়া কুলোকদিগের আড্ডায় উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া কার্য্যে আমরা যদি সূর্য্যালোককে খাটাই তাহা হইলে তাহাতে আমরা একরূপ ফল পাইব এবং যদি সাধু সজ্জনদিগের সন্নিধানে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া কার্য্যে খাটাই তবে তাহাতে আর একরূপ ফল পাইব। জ্ঞানকেও তেমনি যদি আমরা ভাল কার্য্যে খাটাই তবে ভাল ফল পাইব কুকার্য্যে খাটাই তবে কুফল পাইব। অতএব বর্ত্তমান স্থলে জ্ঞানকে কিরূপ কার্য্যে খাটান সর্ব্বাপেক্ষা সুফলপ্রদ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্।

আমরা যদি কেবল জ্ঞানের দোষানুসন্ধান কার্য্যে জ্ঞানকে

খাটাই ; আমাদের মর্ম্মাগত অভিপ্রায় যদি এই হয় যে জ্ঞানকে তাহার দোষের জন্য তিরস্কার পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিলে যাহা আমাদের ইচ্ছা হয় তাহাই করিবার যো পাইব, আমাদিগকে ধমক ধামক দিবার মত অথবা আমাদের শ্রবণ কটু কোন কথা বলপূর্ব্বক আমাদিগকে শোনাইয়া দিবার মত উপরওয়ালা কেহই থাকিবে না এরূপ করিলে, যে ডালে আমরা বসিয়া আছি সেই ডালের মূলোচ্ছেদ করিয়া আপনারাই আপনাদের অধঃপতনের পথ প্রস্তুত করিব। সুতরাং জ্ঞানের এরূপ অপব্যবহার করা কোন অংশেই কোন জ্ঞানবান জীবের পক্ষে শুভদায়ক নহে। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা জ্ঞানকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা বলি শোন :—

জ্ঞানকে প্রণিপাত দ্বারা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা, সেবা দ্বারা জানিয়া লও, তত্ত্বদর্শীগণ তোমাদিগকে তাহার উপদেশ দিবেন।

(গীতা চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোক)

তাহা হইলে তুমি আর এ প্রকার মোহপ্রাপ্ত হইবে না, আর তাহার ফল হইবে এই যে তুমি সমস্ত জীবকে আপনাতে দেখিবে ও সেই সঙ্গে আমাতে দেখিবে।

(গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক)

তুমি যদি অধম পাপীও হও তাহা হইলেও তুমি জ্ঞানতরীকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পাপ হইতে তরিয়া যাইবে।

(গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৬ শ্লোক)

রাশি রাশি ইন্ধন কাষ্ঠকে যেমন অগ্নি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।

(গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক)

জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি কালে আপনাতে সেই জ্ঞান লাভ করেন।

(গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৮ শ্লোক)

গীতা শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান বিষয়ক যে কয়েকটি শ্লোক আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আর একটি শ্লোক আছে এই :—"দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়। সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।" যজ্ঞের সহিত দ্রব্যের যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা কাহারো জানিতে বাকী নাই—কিন্তু জ্ঞানের সহিত যজ্ঞের যে সেরূপ কোন সম্বন্ধ আছে বা থাকিতে পারে এটা একটা নূতন ধরণের কথা। যজ্ঞাগ্নিতে কেবল ঘৃত ঢালা হয় ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, আর যুক্তিতেও তাহা খাপ খায় এইজন্য—যেহেতু অগ্নি ও ঘৃত দুইই একজাতীয় পদার্থ—দুইই ভৌতিক পদার্থ। পক্ষান্তরে, জ্ঞান তো আর ভৌতিক পদার্থ নহে—জ্ঞানের ন্যায় অমন একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক পদার্থকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে—এ বিষয়ের মীমাংসা যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্যন্ত শ্লোকটির নিগূঢ় অর্থের মধ্যে কাহারো দন্তস্ফুট হইতে পারা সুকঠিন। উহার মীমাংসা আমি করি এইরূপঃ শাস্ত্রে বলে যে, জীবের বিজ্ঞানময়কোষে (অর্থাৎ মস্তিষ্কে) যেমন জীবের বুদ্ধি নিয়ত জাগিতেছে—প্রকৃতির শীর্ষস্থানে, সেইরূপ সমস্ত জীব-জগতের পৃথক পৃথক বুদ্ধিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক মহতীবুদ্ধি নিয়ত জাগিতেছে। বুদ্ধি যদিচ নিজ-গুণে আধ্যাত্মিক পদার্থ নহে, কিন্তু তাহা সচ্চিদানন্দ আত্মার সংস্পর্শগুণে প্রকারান্তরে আধ্যাত্মিক পদার্থেরই সামিল;—এইজন্য বুদ্ধিকে বলা যাইতে পারে প্রকৃতির আধ্যাত্মিক অবয়ব। বুদ্ধি প্রকৃতির মস্তকস্বরূপ এবং পৃথিবী প্রকৃতির পদদ্বয় স্বরূপ। যেখানে যতকিছু দ্রব্য আছে সমস্তই বুদ্ধি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে, এবং ঐ দুই ল্যাজা-মুড়ার মধ্যে সভুক্ত রহিয়াছে। এখন দেখা যাক্—যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে তাহা কতদূর যায়। ইন্ধন কাষ্ঠে পার্থিব পরমাণু বেশীর ভাগ রহিয়াছে—ঘৃতে জলীয় পরমাণু বেশীর ভাগ রহিয়াছে; অগ্নি দ্বারা এই ঘৃত ও কাষ্ঠ বাষ্পীভূত হইয়া ক্রমশ কত যে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে পরিণত হইতে থাকে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন ; এমন কি পরিশেষে উহার এক একটি পরমাণু এরূপ মাত্রাতীত সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে যে, তাহাকে সূচের আগা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী

সূক্ষ্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ কাষ্ঠ ঘৃতাদি পদার্থগুলি মহাশূন্য আকাশে বিলীন হইয়াই কি থামিয়া থাকে? না তাহার আরও কোন সূক্ষ্মতর পরিণাম আছে? অবশ্যই আছে! কী যে সে পরিণাম তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই কাষ্ঠের মধ্যে, এই ঘৃতের মধ্যে, এই অগ্নির মধ্যে, এই বায়ুর মধ্যে, এই আকাশের মধ্যে, এই জলের মধ্যে—যে একটি চেতন পদার্থ জাগিতেছে তাহা এমন একটি অক্ষয় পদার্থ যাহা সৃষ্টির গোড়ায় ছিল মধ্যেও রহিয়াছে এবং পরেও থাকিবে—যাহা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তিনেরই সঙ্গে অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান থাকিয়া তিনকেই যথাবৎ প্রকারে নিয়মিত করিতেছে। কাষ্ঠ ঘৃতাদি স্থূল দ্রব্য সকল যজ্ঞাগ্নি সংযোগে যখন স্থূল হইতে সূক্ষ্মে পরিণত হইতে থাকে, তাহা বিনা চেতনে হয়ও না হইতে পারেও না। আমরা যদি বলি কাষ্ঠ ঘৃতাদি যজ্ঞীয় পদার্থ অগ্নি সংযোগে আকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়াই থামিয়া থাকে, তবে, সে কথাটা অর্দ্ধসত্য ইহার বাকি অংশটি পূরণ করিয়া দিলে আমরা একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সত্যে অতি সহজে উপনীত হইতে পারি। জড়বাদী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন না কেন আকাশই যে দ্রব্যাদির চরমগতি এ কথায় আমরা ভুলি না। সমস্ত বহির্জ্জগতের একটি পরিপাটি মানচিত্র আমাদের হাতের কাছে রহিয়াছে। যোজন যোজন বিস্তৃতি গিরি নদী সমুদ্র যেমন মানচিত্রে অতীব অল্প স্থানের মধ্যে সংকুচিত করিয়া প্রদর্শিত হয়—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মোট বৃত্তান্তটি তেমনি আমাদের এই ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে সংকুচিত করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে—যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা তাহা দেখিতে পান। আমাদের শরীরের অস্থি মাংস বৃহৎ পৃথিবীর সংকুচিত প্রতিলিপি, আমাদের শরীরের লোহিতরক্ত বৃহৎ লবণাম্বুধির সংকুচিত প্রতিলিপি; আমাদের শরীরের জঠরানল, ভূগর্ভস্থ বৃহৎ অনলের সংকুচিত প্রতিলিপি, আমাদের শরীরের প্রাণাদি বায়ু বাহিরের বৃহৎ বায়ুর সংকুচিত প্রতিলিপি, আমাদের শরীরের অন্তরাকাশ বৃহৎ বহিরাকাশের সংকুচিত প্রতিলিপি। একদিকে এ যেমন দেখা গেল—আর একদিকে তেমনি আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের শরীরের ভিতরকার অন্নময় যজ্ঞ বাহিরের দ্রব্যময় যজ্ঞের সংকুচিত প্রতিলিপি। ঘৃত মিশ্রিত কাষ্ঠ যেমন যজ্ঞাগ্নি সংযোগে পরিশেষে শূন্য আকাশে পর্য্যবসিত হয়, রস রক্ত মিশ্রিত অন্ন তেমনি জঠরাগ্নি সংযোগে পরিশেষে আমাদের অন্তরাকাশে পরিণত হয়—এবং সেইখানে থামিয়া না থাকিয়া,—এই অন্নময় যজ্ঞের সূক্ষ্মীভূত অন্ন যেমন ইন্দ্রিয় মনে উত্থিত হয়, এবং সেখান হইতে মস্তিষ্ক বাহিয়া উঠিয়া বুদ্ধির মূলে রস সঞ্চার করে, বাহিরের দ্রব্যময় যজ্ঞের সূক্ষ্মীভূত ঘৃতাদি উপকরণ সকলও সেইরূপ, শূন্য আকাশে থামিয়া না থাকিয়া প্রকৃতির শীর্ষস্থানীয় মহতী বুদ্ধিতে বিলীন হয়। এই যে মহতী বুদ্ধি—ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা যাইতে পারে—সকল সূর্য্যের আদিসূর্য্য, উপনিষদের ভাষায় বলা যাইতে পারে পরমাত্মার হিরণ্ময়কোষ যথা:—"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তৎশুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্ তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ। "হিরণ্ময় কোষে বিরজ ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন—তিনি শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি যাঁহাকে আত্মবিৎ জ্ঞানীজনেরা জানেন। যজ্ঞাগ্নি সংযোগে ঘৃতকাষ্ঠের সারাংশকে যেমন ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থান করাইয়া পার্থিব বিষয়ভোগকে স্বর্গীয় দেবভোগে পরিণত করা হয়—ঋষিগণ, সেইরূপ তাঁহাদের মনকে ভূলোক হইতে ভুবর্লোকে এবং ভুবর্লোক হইতে স্বর্গলোকের হিরণ্ময়কোষে উত্থান করাইয়া—গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বলোকের মূলাধার জগৎ প্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি এবং জ্যোতি ধ্যান করিতেন, আর, সেই সঙ্গে তাঁহার নিকট বুদ্ধি প্রার্থনা করিতেন। ইহারই নাম জ্ঞানময় যজ্ঞ। সেই গোড়ার জ্ঞান হইতে টাটকাটাটকা যেরূপ বুদ্ধি অবতীর্ণ হয় তাহা যে কিরূপ অমূল্য সামগ্রী তাহা পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যেমন জানিতেন—এমন আর কেহই না। শিশু যেমন মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য দুগ্ধে তৃপ্তি লাভ করে না—তাঁহারা, সেইরূপ, জগৎ প্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তির প্রসাদে অনুপম জ্ঞানামৃত সে যাহা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা ছাড়া অপর কোন প্রকার জ্ঞানে তৃপ্তি মানিতেন না। শাস্ত্রে এইজন্যই

গায়ত্রীকে বলা হইয়াছে বেদমাতা। সূর্য্যের সূর্য্য জ্যোতির জ্যোতি পরমআত্মার বরণীয় শক্তি যেমন জগমাতা; গায়ত্রী যাহার আর এক নাম সাবিত্রী তেমনি বেদমাতা। আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র গায়ত্রীর স্তন্য দুগ্ধে লালিত পালিত হইয়াছে এবং গায়ত্রী ধ্যানই যে বিশিষ্ট রূপে গীতা শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানযজ্ঞ যদি বলা যায় তবে সে কথা যে কত সত্য তাহা আগামীবারে বিবৃত করিয়া দেখান হইবে। এ যাত্রার মত এইখানেই পালা সাঙ্গ করা হইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

রাঁচির "শান্তিধাম"-মন্দিরের অন্যতম সাধক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গত ২০শে ফাল্গুন সন্ধ্যা ৬টায় দিব্যধাম প্রস্থান করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব ঠাকুর-বাড়িতে আরতির পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন; তার মধ্যে "শান্তিধামে"র সত্য-জ্যোতি দুটি শিখা নিভিল। এ পঞ্চ-প্রদীপের সব চেয়ে উজ্জ্বল রবি এবং সব চেয়ে সরল দ্বিজ "শান্তিনিকেতনে"র মন্দিরে ধ্রুব দীপ্তি দিতেছেন এবং চিরদিন দিন—এই প্রার্থনা; আর সব চেয়ে মধুর ছিলেন জ্যোতি তা অন্য লোক আলোকিত করিতে চলিয়া গেলেন। রাত্রিশেষের স্থির স্নিগ্ধ মধুর একটি পাণ্ডুর দীপ্তি দিতে দিতে শুকতারাটির মতো প্রায় ৭৬ বৎসর অন্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জ্যোতি ব্রহ্ম-জ্যোতিতে মিশাইয়া গেল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে তপঃপরায়ণ সত্যেন্দ্রনাথ যেদিন সত্য লোকে চলিয়া গেলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাকে একখানা চিঠিতে লিখিয়াছিলেন :—

"শান্তিধামে"র সত্য-প্রদীপ নিভে গেল। আমি এখন একলা—একেবারেই একলা। তিনি শুধুই আমার বড় ভাই ছিলেন না, তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। কতকাল ধরে আমরা দু ভাই এক সঙ্গে কাটিয়েচি। তাঁর ঘরের দরজা দিয়ে যখন যাই তখন মনে হয়, "খাঁচার দরজা খোলা, পাখী উড়ে গেছে। ঠিক্ বলেচ, এবার আমার পালা। "শান্তিনিকেতনে" তার পর। "নাভিনন্দেত জীবিতং নাভিনন্দেত মরণং, কালনেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা।" এখন এই আমার জীবন-মন্ত্র।"

এই চিঠিখানির এইটুকু এখানে উদ্ধৃত করিবার কারণ আছে। তাঁহার এই "জীবনমন্ত্র" তিনি যে এই সময় হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন তা' নয়, তাঁহার মধ্যজীবন হইতেই তিনি এই মন্ত্রের সাধনা ভিতরে ভিতরে করিয়া আসিতেছিলেন, শুধু শেষ জীবনের এই সতেরো বৎসর রাঁচিতে আসিয়া "শান্তিধামে" সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, অনেক সময়ই একাকী একটি অশিক্ষিত পার্শ্বচর লইয়া বিজন মোরাবাদীর পাহাড়ের গায় দীর্ঘকাল কাটানো যে কি ব্যাপার তাহা এক বিজন দ্বীপের নির্ব্বাসিত ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। নির্ব্বাসিত এ নিঃসঙ্গ জীবন গ্রহণ করে পরেচ্ছায় আর ইনি গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বেচ্ছায়। ইহাই প্রব্রজ্যা।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে চারিটি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পালন-কথা চলিয়া আসিতেছে। "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—এই প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম শুধু তিনিই পালন করিতে সক্ষম যিনি বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য যৌবনে গার্হস্থ্যাদি যথাযথ সযত্নে পালন করিয়া আসিয়াছেন। আমের গাছে প্রথমে ধরে মঞ্জরী; মঞ্জরী হইতে হয় মুকুল, মুকুল হয় কাঁচা-আম, তার পর ফলে পাকা-আম। সেই পাকা-আম দেব-ভোগ্য। কিন্তু এই এতগুলি অবস্থা ডিঙাইয়া একেবারেই পাকা-আমের অস্তিত্ব যাদুকরী বিদ্যার জানা থাকিলেও আমাদের অর্থকরী স্কুল কলেজের বিদ্যার জানা নাই আর অজকাল আমাদের এই প্রকারের বিদ্যার মধ্যে মানুষের এই চতুরাশ্রমের যথার্থ অবস্থার সঙ্গে আদৌ কোনো পরিচয় নাই

বলিয়াই আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রব্রজ্যা দেখিয়া আশ্চর্য্য হই—তিনি কি প্রকারে এমনিতর একলাটি এই শৈলাবাসে কাটাইতেন!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিতেন, "চতুরাশ্রম চতুরের জন্য।" যিনি চতুর ব্যক্তি একমাত্র তিনিই কল্যাণকে জানিয়া জীবনটিকে চারিভাগে ভাগ করিয়া সম্ভোগ করিতে সমর্থ। এই বসুন্ধরা সত্যই একমাত্র চতুরেরই উপভোগ্য।

যাই হোক এই প্রবন্ধের স্বল্পায়তনে শুধুই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রব্রজ্যার জীবনই আলোচ্য। তাঁহার তৎপূর্ব্ব জীবন কথা "জীবন স্মৃতি"তে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রব্রজ্যা জীবন যথাযথ বুঝিতে গেলে পূর্ব্ব জীবনটাও জানা থাকা চাই। সেইজন্যই আনুষঙ্গিকরূপে সে জীবন কথা যতটুকু যা আসিয়া ছোটে আলোচনা করা যাইবে।

এখন তাঁহার এই পূর্ব্ব উদ্ধৃত চিঠিখানিতে আমরা দেখিতে পাই লিখিতেছেন:—জীবনকে ইচ্ছা করিবে না, মরণকেও ইচ্ছা করিবে না, যখন যখন যেমন যেমন যাহা যাহা আসিয়া জোটে তাহাই বরণ করিয়া লইবে। এই গ্রহণ সামর্থ্য ইহাই প্রব্রজ্যার বীর্য্য। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য পালনকালে এই প্রকারের যেমন যেমন গ্রহণ বিধিকে মাথা পাতিয়া লইলে যে কি হয়, আজকালকার স্কুল কলেজের ব্রহ্মচারিদের দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। আর গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনকালে যৌবনে এই যেমন যেমন গ্রহণ মানিয়া চলিলে কি হয়, অদৃষ্টবাদী কেরাণীদরে দেখিলে বুঝা যাইবে। যেমন যেমন গ্রহণ বিধি অতঃপর শুধু প্রব্রজ্যাশ্রয়ীর পক্ষেই শ্রেয়ঃ।

যেমন যেমনকে গ্রহণ করিতে পারা সন্তোষ সাপেক্ষ। কিন্তু যিনি পূর্ব্ব জীবনে সংযম অভ্যাস করিয়াছেন তিনিই সন্তোষ অধিকারী। ব্রহ্মচারী সন্তুষ্ট কিনা জানি না কিন্তু তিনি সংযমী; আর গৃহস্থও যে সন্তুষ্ট নন্ তা' বুঝিতে পারি কারণ গার্হস্থ্যই মানুষের জীবনের শেষ আশ্রম বা অবস্থা নয়, কিন্তু তিনিও সংযমী নতুবা গৃহস্থের পক্ষে একদিন সব ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ সম্ভব হইত না। সংযম ফুল অবস্থা। কারণ দেখিতে পাই অনুশাসনে রহিয়াছে,

"সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।"

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচীর গিরিশিখরস্থ "শান্তিধামে" শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যের উপাসক শিল্পী ও সাধক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট এই শৈলবাসটি বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। আমি পুরী থাকিতে তিনি আমায় চিঠিতে লেখেন "এই তোমার প্রথম সমুদ্র দর্শন? পর্ব্বত ও সমুদ্র, এই দুইটি ভগবানের বিরাট্ মূর্ত্তি! হিমালয়ে কখনো গিয়াছ কি? যদি কখনো দার্জ্জিলিং যাও, দেখিবে সেও অনন্তের আর এক মূর্ত্তি একটি চঞ্চল—আর একটি অচল; একটি অসীম কর্ম্ম" আর একটি "অনন্ত ধ্যান" একটি ইওরোপের প্রতিরূপ—আর একটি ভারতের প্রতিরূপ" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই রাঁচীর এই নির্জ্জন শৈলবাসে তিনি এমন একলাটি দিনযাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

আমি কিছুকাল তাহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি এই "শান্তিধামে," সেইজনাই প্রব্রজ্যা জীবন যে কি বস্তু আমি জানি। প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত, এক এক সময় সাদা-প্রাণ কালো-অঙ্গ নৃত্য-পরায়ণ ওঁরাও এই নির্জন পথে বিচরণ করিতে দেখিয়া মনে হইত আমার এই নিঃসঙ্গ মনটাকে ইহাদেরি সঙ্গে নাচিয়া একবার সঙ্গ-সুখ দিয়া লই, নতুবা আর পারি না। আমি এই প্রকারে যখন ছট্‌ফট্ করিতাম, দেখিতাম তখন এই বৃদ্ধ তাপস নিজের কুঠুরীটিতে বসিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে ধ্যান কিম্বা পাঠ নিরত! আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "আপনার কি ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্চে না?" তিনি স্নিগ্ধ হাসিয়া বলিতেন, "শান্তি জিনিসটাই হচ্চে হয় ফাঁকা, শূন্য, একান্তই নিরর্থক কিম্বা সব পরিপূর্ণ-করা অখণ্ড ভরাট ধীর স্থির গভীর-গম্ভীর একার্থকও যার কাছে যেমন ঠেকে।" আশ্চর্য্য এই শান্তরস!

কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, বার্দ্ধক্যে জরাভারগ্রস্ত হইয়া বৃদ্ধ এই গিরিকোটরে একলাটি বসিয়া ধুঁকিতেন, নির্জীব অসাড় আড়ষ্ট হইয়া প্রাণহীন মৃত্যুর নামান্তর শান্তি

উপভোগ করিতেন। এই বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে সাহিত্য সঙ্গীত, চিত্র এবং অধ্যাত্ম সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী গল্প সাহিত্যের অনুবাদ এবং অন্যান্য অনুবাদ এই চৈত্র-বৈশাখের মাসিক ইত্যাদিতে বাহির হইয়াছে। এই সেদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নিয়মিত এক বৎসরাধিক কাল খাটিয়া লোকমান্য টিলক কৃত "গীতা রহস্যে"র মূল মারাঠী হইতে অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। লোকমান্য নিজে তাঁহাকে এই বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান্, কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকমান্য অনুবাদ কার্য্য শেষ হইতে দেখিয়া যাইতে পারেন্ নাই। এই সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন যেমন লোকমান্যের জেলবাসকালে শুধু স্মৃতি সাহায্যে লিখিত এক অতুলনীয় কীর্ত্তি, তেমনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও এই বয়সে অনুবাদ করা এক সহিষ্ণুতা সহায়ে পরম অধ্যবসায় সাহিত্য-প্রীতি। এত গেল শুধু সাহিত্যের কথা। তারপর শিল্প-চর্চ্চা। সকালে ১০টার পর বৃদ্ধ অতিথি সমাগমে ঘরে কিম্বা খাতা-পেন্সিল বগলে রিক্সয় চাপিয়া বাহিরে চলিয়াছেন বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির মনুষ্যের ছবি আঁকিতে। তাঁহার এই ছবি-আঁকার সঙ্গে কয়েকটি কথাই মনে হইল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (born-artist) জন্ম-শিল্পী ;—অসাধারণ সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বোধ ও ললিতকলার প্রতি একটা প্রাণের টান্ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শিশুকালে একদিন বৈশাখ-সন্ধ্যায় বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের মাঝে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের বর্ণ বিন্যাস-কৌশল দেখিয়া এতটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে অনেক রাত্রি পরে চাকরদের লণ্ঠন লইয়া খুঁজিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীর ছাদ হইতে ডাকিয়া ধরিয়া আনিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্ত সে সৌন্দর্য্য যে কি সুধা বর্ষণ করিয়াছিল, তিনি যতক্ষণ দেখিয়াছিলেন অশ্রুর ধারায় নয়ন গণ্ড বক্ষ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, দেহে কম্প ও স্বেদ হইতেছিল। সৌন্দর্য্য দর্শনে "আহা" "বাহা" করিতে কিম্বা দৃষ্টিতে অবহিত চিত্ত হইতে অনেককে দেখিয়াছি কিন্তু এই প্রকারের ভাবে গদগদ চিত্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জনের কথা এবং স্বেদকম্প আদি সাত্ত্বিক বিকার ভাব উপস্থিত হইবার কথা পুঁথিতেই পড়িয়াছি। ইহাই সৌন্দর্য্যের উপাসনা।

সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহার এই প্রকারের ভাব উপস্থিত হওয়ার কথা আমি তাঁহার নিজের মুখ হইতেই শুনিয়াছি। তান-মান-লয় সহকারে ভাববিশিষ্ট সঙ্গীত শুনিয়া অশ্রু বিগলিত হইতে আমি নিজেই তাঁহাকে দেখিয়াছি। এক দিন প্রাতে আমাকে সাহিত্যের পাঠ দিয়া বেহালা বাজাইয়া নানা বিষয়ক সঙ্গীত করিতে করিতে তিনি এতটা ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেন্ যে মনে হইত, এই সময় এই বৃদ্ধকে অপর কেহ এই ভাবে দেখিলে উন্মাদ স্থির করিবে। এ আর বেশি দিনের কথা নয়—এইত তিন বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কি উৎসাহ, কি অসাধারণ অনুরাগ, কি নিবিষ্টচিত্ত তন্ময়তা যে সেই সময় দেখিয়াছি তাঁহার চোখে মুখে সারা অঙ্গে, এখনো সে সব স্মরণ হইলে বিস্মিত হই! স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া যাইতেন ;—প্রেমের গান চলিতেছে, আমাকেই তাঁহার প্রেমাস্পদ ভাবিয়া আমার চিবুক, চুল কিম্বা অঙ্গ-স্পর্শ করিয়া তাঁহার যে কি এক সুখানুভব হইত তাহা আমিও সে স্পর্শে বুঝিতাম্। অধ্যাত্ম-সঙ্গীত শেষে অনেক-ক্ষণ উভয়েই স্থির নিবিষ্টচিত্তে উপাসনা-কালের ন্যায় বসিয়া থাকিতাম্। ভাব ছুটিলে তবে অন্য কথা কিম্বা কার্য্য। ছবি আঁকিতেছেন, দেখিতাম্, তা'তেই তিনি এতটা তন্ময় যে তখন অন্য চিন্তা কথা কি কার্য্য একেবারেই ভুলিয়া যাইতেন। আর তিনি যে ছবি আঁকিতেন তাহা শুধুই একটা মানুষের বাহিরাকৃতির ছাপ্ নয়, তিনি যেন কিসের সাহায্যে তার মনটাকে শুদ্ধ জানিয়া লইয়া তার ভিতরকার ভাবটিকে মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শে পেন্সিলের রেখায় আলো ছায়ায় মূর্ত্ত করিয়া দিতেন্। এমন একটি finishing touch থাকিত সেই অঙ্কনটিতে যা অপর কাহারো অননু-করণীয়। এই সম্বন্ধে বিলাত হইতে লেখা তাঁ'র কাছে বিখ্যাত শিল্পাচার্য্য Mr. Rothenstein এর চিঠির কিয়দংশ তুলিয়া দিই ;—

11 Oak Hill Park, Prognel
Hampstead.
Sept. 14—12.

My dear sir,

Let me thank your for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article of your brother they are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensetiveness of line & sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. Your drawings of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel Rossetti, and of the admirable drawings by the great French artist, Preis de Chavaanes. Indeed the books have been and still are a source of great delight to me, and all to whom I have shown them have had similar feelings regarding them, etc. Beleive me to be most faithfully yours William Rathenstein."

আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধুই যে মানুষের প্রতিকৃতি আঁকিতেই নিপুণ ছিলেন তা নয়, রবীন্দ্রনাথের কত গানের ভাবটুকু লইয়া যে কল্পনার ছবি আঁকিয়াছেন্ তা' একেবারেই আশ্চর্য্য! কবিতা পড়িয়া পাঠকের মনে যে একটি অস্পষ্ট আলোছায়ার ছায়া-ছবির সৃজন চলে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তুলিকাপাতে মন থেকে সেই ছায়াছবিকে বাহিরে রেখায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই সমস্ত কাব্য-ছবি কাব্যগ্রন্থে স্থান পাইলে পাঠকদের কাব্য বুঝিতে সুবিধা হইবে।

তারপর সুরের রাজ্যে ইঁহার গুণপনার সাক্ষ্য দিতে এখনো রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের অনেক গান বিদ্যমান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বেহাগ, ছায়ানট, খাম্বাজ, হাম্বীর প্রভৃতি গম্ভীর রাগরাগিণীগুলি অনায়াসে নৃত্যের তাল তুলিয়া অঙ্গুলিঘাতে পিয়ানোতে যে নতুন সুর সৃষ্টি কলা প্রকাশ করিতেন, কবি অক্ষয়কুমার এবং রবীন্দ্রনাথ তাহাই ভাষায় তখন গান আকারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত স্বরলিপি এখন সহজ বলিয়া সকলে সেই সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি কবির গানগুলি ঘরে ব'সিয়াই শিখিতে পারিতেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গুণপনা যে কোন্ বিষয়ে প্রকাশ পায় নাই জানি না সঙ্গীত, চিত্র, নাট্য, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সর্ব্ববিদিত। এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি এ সকল বিষয়ের চর্চ্চা হইতে বিরত হন্ নাই। ইনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকাশে যে কতটা সাহায্য ইনি করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ সে কথা তাঁর স্বরচিত "জীবনস্মৃতি"তে বার বার করিয়া বলিয়াছেন। একটা কথা যাহা কোনো স্মৃতি গ্রন্থে দেখি না, অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়াছি, তিনিই রবীন্দ্রনাথকে জোর করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া একটা সভায় কিছু বলাইয়া মুখের আড় ভাঙান্, (ইতিপূর্ব্বে কবি বড়ই লাজুক্ ছিলেন, কিছুতেই সভায় একটা কথা পর্য্যন্ত কহিতে সন্ত্রস্ত হইতেন) এই প্রকারে তাঁহাকে দিয়া বলাইয়া বলাইয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাকে বক্তা করিয়া তোলেন। এ সমস্ত অন্যান্য কথা স্মৃতিগ্রন্থদ্বয়ে যথেষ্ট আছে। সে সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আমি শুধু ইহাই বলিতে চাই, তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও এই বয়সে "শান্তিধামে" নির্জ্জন যে শান্তি উপভোগ করিতেছিলেন তাহা নির্জীব, জীবন-রস শূন্য মৃত্যুর নামান্তর শান্তি কিম্বা শূন্যতা ছিল না। ইহাই শান্তির অখণ্ড পরিপূর্ণ-রস, যে শান্তি তিনি ভোগ করিতেন্।

আর এই বয়সেও তাঁহার সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্য চর্চ্চার বিরতি ছিল না, তেমন হৃদয়-চর্চ্চাও শুকাইয়া

যায় নাই। নিরক্ষর দরিদ্র আশপাশের গ্রামের কোল-ওঁরাও মুণ্ডা স্ত্রীপুরুষদের রোগে পুস্তক পড়িয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন। দেখিয়াছি কাহারো অসুখ করিলে তাহারা ইঁহার কাছে এক ফোঁটা জল-ঔষধের জন্য ছুটিয়া আসিত। তিনিও সমস্ত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানিয়া লইয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন; কেমন থাকে জানিবার জন্য, না আসিলে, লোক-মুখে সংবাদ জানিতে চেষ্টা করিতেন। কতজনকে কত সময় অর্থ সাহায্যও করিতেন।

বেলা ১০টার পর দুপুর বেলা একবার গ্রাম, নগর, বাজার প্রদক্ষিণে বাহির হইতেন। ইহাও তাঁ'র একটী দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে তাঁহার বহিঃসংসার কিম্বা বিশ্বের সঙ্গে খবরাখবর লেন্‌দেনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তাই নয়। তিনি নিয়মিত বেলা ৩টায় আহারের পর খবরের কাগজ পাঠ করিতেন, এবং সন্ধ্যার পর দেশের এবং বিদেশের অবস্থা সম্বন্ধে নিজে নিজে মনে মনে কিম্বা অপর কেহ আসিলে তাঁহার সহিত পর্য্যালোচনা করিতেন। পূজনীয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জীবিতকালে অধিকাংশ সময়ই এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতেন। তখন সন্ধ্যার আসর দুভায়ে নানা বিষয়ক আলোচনায় ভারি জমিয়া উঠিত। আবার কথনো কথনো পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বন্ধু বিশ্বমিত্র Andrews সাহেব সমভিব্যাহারে আসিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নির্জ্জন-বাসকাল আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। তখন এই তিন ভাই, একবন্ধু মিলিয়া সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি নানাবিষয়ের আলোচনায় "শান্তিধামের" মধ্যে আনন্দ আরো জমাইয়া তুলিতেন।

এইখানে আমি পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একখানা চিঠি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে লেখা তুলিয়া দিই; তাহাতে বুঝা যাইবে অসাক্ষাতেও ইঁহাদের ভায়ে ভায়ে কেমন একটি প্রীতি ও নানা বিষয় সম্বন্ধনীয় আলোচনা চিঠিতে পত্রে চলিত। এই চিঠির ঠিকানাটি দুই ভাইকে সম্বোধন করিয়া লেখা—"শ্রীমৎ সত্যজ্যোতিশ্চিরঞ্জীবয়ঃ" চিঠীট এই।

ওঁ

শান্তিনিকেতন,
৩রা বৈশাখ, ১৩২৯

ভাই জ্যোতি!

রবি দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন Andrews সাহেবকে। তাহার Key note হচ্চে World wide Co-operation এবার এযে দুটী পত্র লিখিয়াছেন রবি—ইহার উপরে কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না; তা শুধু না—আমি তাহার প্রতি কথায় সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সায় দিতেছি। তাহা দেখ্‌লে তুমি খুব খুসী হবে যে রবির কথা আমার গভীর অন্তরাত্মার কথা—* * * * * *

তোমার স্নেহের বাঁধা বড় দাদা

পুনঃ—Politics এর লোহার শিকলি কেটে উড়ে পালাবামাত্র আমি পদ্মের মৃণাল সূত্রে বাঁধা পড়িয়া গেলাম্। তাহা এবম্বিধঃ—উষ্ণ হোমধূম বিহারী পরম হংসের প্রতি—সুশীতল মানস সরোবরের পদ্মবন বিহারী নরম হংস দ্বিজরাজের হাসিরাশি হাসিমাথা অনুরোধ বচন!

বিবুধে করিলে সমালোচনা,
সারথক হয় পুঁথি রচনা॥
যে কার্য্যে হয় স্বপরহিত,
বেলাবেলি তাহা করা বিহিত॥
"শুভের শীঘ্র" ব্রহ্মবাণী।
"বিলম্বে হয় কার্য্য হানি॥
হোমধূম ভোজী তুমি খেচর মরাল।
ভুঞ্জয়ে কেচর দ্বিজ পদ্মের মৃণাল॥
তুমি যে, আমি কে, চর; ভেদমাত্র এই।
নীরক্ষীর বিভাজক মোরা উভয়েই।
পয়ঃ পয়োধিগামী যেমতি মোরা উভে।
দোঁহে ভাগী তেমতি দোঁহার শুভাশুভে॥

আবার সুশিষ্য তুমি
পরমহংসের।
বলা বৃথা! এ যাহা বলিনু
—এই ঢের!
ইতি পরমহংসের গুরু নরম হংস দ্বিজরাজ"

এই চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করিবার আরো একটি কারণ আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংসার পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেও আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সহিত তাঁহার তখন কিরূপ সম্বন্ধ ছিল ইহাতে সুস্পষ্ট হইবে এবং ইঁহাদের ভায়ে ভায়ে সম্প্রীতিটি কত গভীর ও স্নেহময় ছিল তাহাও জানা যাইবে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রব্রজ্যা বা বানপ্রস্থ গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে দুটি কথা মনে হইতেছে। যৌবনে গৃহধর্ম্ম পালন জন্য বিবাহ করিয়া যৌবনে শেষের পূর্ব্বেই তিনি বিপত্নীক হন্। এবং যে বয়সে তিনি বিপত্নীক হন্ সে বয়স পর্য্যন্ত অনেকে বিবাহও করেন্ না, এই জন্য তিনি আত্মীয় বন্ধুবান্ধব দ্বারা বারবার অনুরুদ্ধ হইলেও আর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন্ নাই। কেন করেন্ নাই, এ কথা একদিন আমি ধৃষ্টতা সহকারে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম,—এতটাই নিঃসঙ্কোচের অবস্থা লইয়া তাঁহার সহিত মিশিবার অধিকার তিনি দিয়াছিলেন, "তাঁকে ভালবাসি"—একটি ছোট্ট কথা; এবং এ কথাটি বলিতেই তাঁর কষ্ট হইতেছে বুঝিয়া, এই উত্তরটুকুর পর আমি আর অন্য কিছু এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। আমি তাঁহার প্রীতির পরিমাণ বুঝিয়াছিলাম, আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ-পরিচয়ে এবং অপরের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের সম্প্রীতি সহানুভূতি পরিপূর্ণ ব্যবহারে, এমন কি "শান্তিধামে"র যত পক্ষী এবং হরিণ, খরগোস প্রভৃতি পশুদের প্রতি তাঁহার সেই যত্ন পূর্ণ সেবা দেখিয়া। অপরের দুঃখ দেখিয়া কতদিন তাঁহার চক্ষে অশ্রু-কণা দেখিয়াছি।

তিনি যেন পত্নীর মৃত্যু বিধাতার বিধান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে এই প্রবন্ধের প্রথমোদ্ধৃত তাঁহার চিঠি হইতে সেই তাঁহার জীবনমন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কি কথায় মনে হইতেছে না, কিন্তু আমায় একদিন বলিতেছিলেন, "দ্য খো—আমার দাঁতগুলি সব গেছে। মেজদাদা তাই একদিন আমায় বল্‌ছিলেন ভাজাগজা আদি খাবার জন্যে এবং অনেক বস্তুর পূর্ণ রসাস্বাদ কর্‌বার জন্যে কৃত্রিম দাঁত বাঁধিয়ে নিতে। আমি কিন্তু এটা অন্যায় মনে করি। ঐ সব জিনিসগুলি খাব না বলেই দাঁত গেছে, আর আমি তাদের প্রতি লোভ পরবশ হয়ে কৃত্রিম দাঁত লাগাবো?" কথা ক'টি এমন সময় এম্‌নি ভাবে তিনি বলিয়াছিলেন যে ঐ ক'টি কথা থেকেই আমি তাঁ'র সম্পূর্ণ জীবনযাত্রা ব্যাপারটির অন্তর্নিহিত যে একটি সঙ্গত এবং গভীর অমোঘ বিধান মানিয়া চলিবার অভ্যাস আছে বুঝিয়া লইলাম্ এবং শ্রদ্ধায় বারম্বার পুলকিত হইলাম্।

তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কে আর একটি কথা যাহা আমার মনে হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিপত্নীক হইবার পর হইতেই এই সংসারকে ব্রহ্মের সংসার করিয়া দেখিবার সৌভাগ্য, অধিকার এবং শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিপত্নীক হইবার পরও বহুকাল তিনি ভাইদের পরিবার সংসারভুক্ত হইয়া বাস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানও করিয়াছেন কিন্তু এ সমস্তকেই তিনি জানিতেন, কিছুই আমার নহে। পরের পুত্রের উপর পুত্র বলিয়া যে স্নেহ ও তদনুরূপ যে দাবী, এ দু'ইই আলাদা জিনিস। তাঁহাদের স্নেহ তিনি করিতেন, যেমন বহুকালের দাসদাসী প্রভু পুত্র কন্যাদের উপর স্নেহশাসন চালায় "আমার" বলিয়া দাবী করিয়া নহে। বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়াছেন কিন্তু তিনি জানিতেন, জীবিতকাল পর্য্যন্ত খোরাকপোষাক বাবদ একটা মাসিক বরাদ্দ করা allowance মাত্রে তাঁহার অধিকার আছে এই সম্পত্তি, হইতে, তদতিরিক্ত কিছুই নহে। সম্পত্তিতে তাঁহার কোনো স্বত্বাধিকার ছিল না। "আমি" "আমার" জ্ঞান ভগবান্ তাঁহার ভিতর হইতে এই রকম সর্ব্বপ্রকারেই নিশ্চিত

করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া জমীদার সমান অংশ ভোগ উপসত্ত্বের জন্য তাঁহার পুত্র কলত্রাদির জন্য তিনিও পাইতেন। এ ত্যাগকে যেন আমরা আজ তাঁহার ভ্রাতৃ-প্রীতির পরিচয় আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত চিঠিদ্বয় পাইয়াছি। আর শুধু ভাইদের নয় তিনি সকলকে তাঁহার স্নেহ মধুর স্বভাব এবং ব্যবহারে আপন করিয়া লইয়া এ সংসারে প্রকৃত ব্রহ্মবিহার করিয়া গিয়াছেন।

নিত্য নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনাটি তাঁহার করা চাই-ই। এই পাহাড়ের উপর একটি মন্দির, একটি গুহা, একটি লতা মণ্ডপ, একটি বৃক্ষমূলের উপবেশন বেদিকা প্রভৃতি তিনি এ শৈলাবাসে লোক দেখাইবার জন্য করেন নাই। প্রতি প্রাতে এ তপ্তকাঞ্চনকায়, ভদ্রবেশ, শুভ্রকেশ, ঋজু দীর্ঘ ঋষি ব্রহ্মণ বেদ উপনিষদ্ হইতে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ওঁ নাদে কান্তার প্রান্তে শৈলদেশকে পরিপূরিত করিতেন, ধূপধুনা গুগ্‌গুলের সুবাসে, এবং শঙ্খ ঘ া কাঁসরের শব্দে দিগ্বগুল ধ্বনিত করিয়া তুলিতেন আর আপনার তপঃশক্তিতে এ "শান্তিধাম"কে সত্যই পুণ্য ব্রহ্মধামে পরিণত করিয়াছেন। এ তীর্থস্থান এক বৃদ্ধ ঋষির তপশ্চর্য্যার পূত প্রভাবে এখানকার আকাশ বাতাস চির স্নিগ্ধ শুচি স্পর্শে আকুলিত। "ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মরস পান" যে স্থানে হয় তাহাই পুণ্য তীর্থস্থান। যে কেহ আসিয়া এ "শান্তিধামে"র পুণ্য তপস্যা-প্রভাব উপলব্ধি করিয়া যাইতে পারেন আর সে জন্যই মন্দিরে যাইবার পথে ফটক দ্বারে প্রস্তরফলকে লিখিয়া এ মন্দির সর্ব্বসাধারণের ইষ্টোপাসনার জন্য বলিয়া গিয়াছেন। ফটকের উপরে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি আঁকিয়া সকলকে এ জন্য আহ্বান করিতেছে।

তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার তপঃ প্রভাব এবং চরিত্র প্রভাব এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বিভব রাখিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই রাঁচীর এই এক প্রান্ত সীমায় শৈলস্থিত "শান্তিধাম" আজ তীর্থধামে পরিণত হইয়াছে। যিনিই রাঁচী আসেন একবার মোরাবাদী পাহাড় এবং পাহাড়ের শিরোদেশের মন্দির না দেখিয়া যান্ না। কিন্তু মানুষ কি শুধুই এখানে ইঁট্ কাঠ প্রস্তর এবং প্রস্তরে প্রস্তুত এক মন্দিরের উচ্চতা দেখিতেই আসেন? আসিয়া একটি ধ্যান গম্ভীর নির্জনতা এবং যাইবার কালে হৃদয়ে এক শান্তি সম্প্রতিষ্ঠ প্রীতি লইয়া ফিরিয়াছেন, একথা আমি অনেকের মুখেই শুনিয়াছি।

"শান্তিধামে"র সাধনা লইয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম্, এবার মহিমা গাহিয়া শেষ করিলাম্।

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

সিংহলের পত্র

স্নেহাস্পদেষু—

বেশ প্রশস্ত একখানা কোঠা, বড় বড় জানলা দেওয়া একধারে আমার শোয়ার খাট, আর পড়াশুনা করার টেবিল চেয়ার। আর একধারে কম্বল পাতা আছে কম্বলের এক-ধারে রংয়ের বাক্স, রং গুলবার ঘষা-কাঁচ, ছোট ছোট চীনা বাটী, কাগজপত্তর প্রভৃতি সাজান রয়েছে। এই আমার ছবি আঁকবার ষ্টুডিও। আশ্রমে একখানা ছবি আঁক-ছিলাম, এক মেয়ে বড়ীর বাঁধান আঙিনায় বসে পুতুল গড়ছে। সেটা এখানে শেষ করেছি। পথিক চলেছে, পিছনে বেলাভূমি, কূল ছাড়তে হবে, এবার বন্দরের কাল হল শেষ।

মাঝে মাঝে এখানকার ছাত্র ডানিয়েল আমার কাছে আসছে, বেশ ছেলেটি। ছেলেদের মধ্যে কেবল ডানিয়েলই আমার প্রবাসের সঙ্গী হয়েছে। আমার আসার পর থেকেই কাজে লেগেছে, interest নিচ্ছে, ধৈর্য্য আছে। Modern Reviewতে স্কুলের ছবি দেখেছে, তারই কতকগুলি

সংগ্রহ করে রেখেছে। এর নাম শুনে একে কেউ অন্য দেশী মনে করোনা। এ সিংহলী বৌদ্ধ এদেশের নামের মধ্যে পর্ত্তুগীজ ঢুকেছে যেমন-পেরো, ফারনাণ্ডো, ডি সিলভা। সিংহলীরা কি করে নিজেদের নাম পর্য্যন্ত খুইয়ে বসল, তা ঐতিহাসিকেরা দেখ্‌বে। পৈত্রিক নাম বদলিয়ে দেশী নতুন নাম রাখার একটা রেওয়াজ হয়েছে।

গৌরমোহন, রমেশচন্দ্র, বিনোদিনী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী প্রভৃতি বাঙ্গালী নামের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গালীকে দেখ্‌তে পাই। নামের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে, একটা মোহ আছে। ঔপন্যাসিক, গল্প লেখক কবি এসব নামের মধ্য দিয়ে বাংলার শাশ্বত রূপটিক প্রকটিত করেছেন। জানিনা, অধুনাতম সিংহলে ঔপন্যাসিক বা কবি আছেন কিনা, কি করে বিদেশী নামের মধ্যে দেশী রূপ দেন, ভাবতে পারি না; যাক্‌।

এখানকার চালচলতি কাপড়চোপর কথাবার্ত্তা ইউরোপের প্রভাবগ্রস্থ। বেশ অনুভব করা যায় ভারতবর্ষের বাইরে এসেছি। এখানকার লোকেরাও তা বেশ স্মরণ করিয়ে দেয়; তারা সিংহলকে যেন ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, যদিও সকলে বাঙ্গালী রাজকুমার বিজয়সিংহের বংশধর বলে গৌরব অনুভব করে।

রোজই ভোরে উঠে আমরাই ঘরের কাছে একটা কোকিলের কুহু কুহু শুন্‌তে পাই; অমনি আমার মানসপটে বহুদূরের শীতল ছায়াপূর্ণ বাংলার পল্লী জীবনের একটি শান্তির ছবি ভেসে উঠে। কলম্বের নাগরিক উত্তেজনা মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এখানে আমি মান্দ্রাজ রামেশ্বরের পথে এসেছি। মান্দ্রাজে ২।৩ দিন থেকে গিয়েছি। আশ্রমের পুরাতন ছাত্র দেবপদা এখানে মায়লাপুরে আছেন, তোমরা বোধ হয় জান না তিনি গৌরদার সহপাঠী। এখন তিনি একজন ভাস্কর আট বছর পরে তার সঙ্গে দেখা হল। মান্দ্রাজের নিকটে এডেয়ারে বেড়াতে গিয়াছিলাম এডেয়ারের কাছেই গুপ্তি নামক স্থানে থিওসফিকাল সোসাইটির পরিব্রহ্ম বিদ্যালয় আছে। এখান থেকে ছেলেরা মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেছে। কলাভবনের পুরাতন আর্টিষ্ট অৰ্দ্ধেন্দুবাবু এখানে চিত্রের অধ্যাপক হয়েছেন। বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা বাইরে যতই ছড়িয়ে পড়ে, ততই ভাল, বিশ্বভারতীর পরিধি ততই বিস্তৃত হবে, এবং গ্রেটার বিশ্বভারতী সৃষ্টি করবে।

অৰ্দ্ধেন্দুবাবু সিল্কের উপর গোটাকয়েক নতুন এঁকেছেন, এবং কাকিমোনো করে বাঁধিয়েছেন, বেশ হয়েছে। অৰ্দ্ধেন্দুবাবু প্রথম এসে একটু তোমসিক হয়ে পড়েছিলেন, ক্রমশ সেরে উঠচেন। এডেয়ারে থিওসফিকাল হলে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেখলাম; সকলের শাদা কাপড় পাঞ্জাবী, শাদা চাদর, বেশ দেখাচ্ছিল। তারা গান গাইল দক্ষিণ ভারতের সুর, পরে কোরাসে জনগণ মন অধিনায়ক গাইল; ভাল লাগল। এই গানে ঐক্যের বাণী আছে বলে, জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে।

কাজিন সাহেবের (Mr. James H. Cousins) সঙ্গে আলাপ হল। ভারতীয় চিত্রকলা প্রচারের জন্য তিনি খুব করছেন। এজন্য আর্টিষ্টরা তার কাছে কৃতজ্ঞ আছে। Philosophy of aesthetics নামে নতুন বই লিখেছেন। ছাপা প্রায় হয়ে গেছে। শীগগিরই কিছু ছবি নিয়ে ইউরোপ যাবেন। ইউরোপের নানাস্থানে ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী করবেন, এবং বক্তৃতা দেবেন।

রাত্রে এগনোর ষ্টেশন থেকে সিলোন বোটমেলে মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করলাম। মিটার গজের গাড়ী ছোট ছোট। সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ আগের থেকে রিজার্ভ করে রেখেছিলাম কাজেই পথটা যেন আরামেই কেটেছে। দক্ষিণ ভারতের মন্দির সকল বিখ্যাত। আমাদের গাড়ী দক্ষিণ ভারতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে পথে অনেক মন্দির পড়ে। দক্ষিণী স্থাপত্যের একটা বিশেষত্ব এই যে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য পাশাপাশি চলেছে; ভাস্কর্য্যই প্রবল বেশী মনে হয়। মন্দিরের বিরাট গোপুরম সকল ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের পরিচয় দেয়, এবং স্তম্ভ ও মন্দির গাত্রের খোদিত মূর্ত্তি সকল ভাস্কর্য্যের পরিচয় দেয়। মোগল স্থাপত্যে খাঁটি স্থাপত্য দেখি তাতে ভাস্কর্য্য

নেই। তার সৌন্দর্য্য from এবং সরল ও চক্ররেখার সামঞ্জস্যের মধ্যে। simplicityতে এর আনন্দ। দক্ষিণী স্থাপত্যে formএর কোন বিশেষত্ব নাই, এর বিশেষত্ব detailsএ। Complexityতে এর আনন্দ। যেখানে মন্দিরের খুঁটিনাটি কাজ খুব উঁচুদরের নয় সেখানে মন্দির থেকে তেমন আনন্দ পাই না। যে সমস্ত মন্দিরে আর্ট decadent হয়ে এসেছে, সে মন্দিরের ভূষণ স্তূপ চক্ষুকে পীড়া দেয়। উড়িষ্যার স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্য্য জড়িত থাক্‌লেও তার fromএর বিশেষত্ব আছে; যেমন পুরী ভুবনেশ্বর কোনারকের মন্দির।

দক্ষিণে ষ্টেশনে ভাল খাবার কিছু পাওয়া যায় না। আঙুর কিনেছিলাম; সস্তা ছয় আনায় এক সের পাওয়া যায়। এক ষ্টেশনে দেখি, প্লেটফর্ম্মের রেলিং ধরে কতকগুলি বানর বসে আছে। বাংলা দেশের লাল বানরের জাত একটা একটা করে আঙুর ছুড়ে দিতে লাগলাম। অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি একটা বানর পিছনের দরজা দিয়ে আমার কামরার মধ্যে ঢুকেছে। এবার একেবারে হাতে আঙুর দিলাম। বেশ ভাব হয়ে গেল, পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লাম। ভ্রুক্ষেপ নেই, ভয়ডর নেই। অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে নিশ্চিন্ত মনে আঙুর খেয়ে যাচ্ছে, একেবারে তুরীয় ভাব। একটা লোক বানরটাকে ভয় দেখিয়ে গেল। বানর তায় এক লাফে চম্পট দিল। কত ডাকলাম এক গোছা আঙুর দেখালাম, আর এল না। লোকটা আচ্ছা বেরসিক। আমার পয়সায় কেনা আঙুর আমার কামরায় বসে খাচ্ছিল, তোমার তাতে কিহে বাপু?

ষ্টেশনে ষ্টেশনে লাল পাগড়ির উকিঝুকি দেখা যাচ্ছিল পুরাতন উপকথায় ছিল হাঁউমাঁউ কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ; বিংশ শতাব্দীর উপকথা হচ্চে, হাঁউমাঁউ কাঁউ বাঙ্গালীর গন্ধ পাঁউ।

দুপুরে মাদুরা ষ্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে। দক্ষিণে মাদুরার মন্দিরই সব চাইতে বড়। এখানে তীর্থযাত্রীদের ভাল থাকার বন্দবস্ত আছে। মাজামাছত্রম ষ্টেশনের কাজেই; অল্প ভাড়াতেই রুম পাওয়া যায়। মাদুরার ইতিহাস আছে। এখানে পাণ্ড্য চোল নায়েক প্রভৃতি রাজাদের রাজধানী ছিল। এখানকার রাজারা সিংহলে পর্য্যন্ত গিয়ে যুদ্ধ করেছেন।

মাদুরায় সুতার মিল আছে। বাংলা দেশে অনেক যায়গায় মাদুরার সুতা তাঁতে ব্যবহার করে। এখানে তাঁতী আছে সিল্ক এবং সুতার কাপড় দুইই হয়। কাপড় এবং সিল্ক ষ্টেসনে ফেরি করতে আনে। পাড়ের কাজের জন্য এ সব বিখ্যাত। এক সময় মাদুরার ছোপান কাপড়ের খুব কাটতি ছিল। কিন্তু কেমিকাল রং বের হওয়াতে ছোপান ব্যবসা পড়ে গিয়েছে।

মান্দ্রাজের কাছাকাছি কিছু অনুর্ব্বর দক্ষিণে যতই এগুতে থাকি দুই দিকে শস্য শ্যামল প্রান্তর চোখে পড়তে থাকে। যেখানে সেখানে জঙ্গলের মত তাল গাছ জন্মাচ্চে। নারকেলও দেখা যায় প্রচুর।

গোটা তিনেকের সময় মণ্ডপমে গাড়ী যায়, ডাক্তারের সার্টিফিকেট এখান থেকে নিতে লাগে। সার্টিফকেট না পেলে সিংহলে ঢোকা যায় না।

মণ্ডপম ছাড়ালেই লাইনের দুই দিকে সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত সমুদ্র চোখে পড়ে, দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত শরীরকে সমুদ্রের হাওয়া জুড়িয়ে দেয়। হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থ রামেশ্বর একটা দ্বীপের ভিতর। এখান থেকেই বীর হনুমান লঙ্কায় উল্লম্ফন দিয়েছিলেন। বেশ অনেকটা যায়গা পোলের উপর দিয়ে পার হতে হয়। সমুদ্রের ভিতর পাথর রয়েছে, তার উপরে পোল তৈরী। নীল সমুদ্রের জল কালো পাথরের উপর আছড়ে পড়ছে, আর রূপালী জল কণা বিচ্ছুরিত হচ্চে। একটা শাদা লাইফ বোট পারে বাঁধা আছে, ঘন নারকেল গাছের সারি তার উপরে ঝুঁকে পড়েছে। দুটা পুরাতন স্লুপ জলের উপর স্থির দাঁড়িয়ে আছে। এক ঝাঁক শাদা পাখী জল প্রায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে এঁকে বেঁকে উড়ে গেল, অপ্সরীদের নৃত্যচঞ্চল চরণ রেখা এঁকে গেল।

তালাইমানায় পারায়ে জাহাজে উঠলাম। উপর তলায়

ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, নীচের তলায় থার্ড ক্লাস। ছোট জাহাজ, গোয়ালন্দের জাহাজ থেকেও ছোট। এপার থেকে ওপারে যায়, কেবল ঘণ্টা দুই সময় লাগে। জাহাজ ছাড়ল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখছি, ভারতের সীমা রেখা দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। চারদিকে জল থই থই করছে, মন অননুভূত আনন্দে ভরে উঠেছে। জাহাজ একটু একটু দুলছে। মেম সাহেবেরা এতেই কাহিল হয়ে পড়েছেন। টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে ইজি চেয়ারে পড়ে আছেন। আমি ঠিক আছি যদিও মাথা কিছু ঘুরছিল। সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত হল, রঙের খেলা তেমন জমল না; ঘোলাটে আকাশে সূর্য্য ডুবে গেল।

কাষ্টম অফিসার সবাইর জিনিষ দেখে নেয়, শুল্ক উপযোগী কোনো জিনিষ কেউ নিয়ে যায় কিনা। সাহেবদের বেলায় তাদের জিনিষ পত্র দেখার দরকার হয় না। তারা কেবল একখানা কাগজে সই করে দেন যে তাদের সঙ্গে তেমন কোনো জিনিষ নাই।

কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের বেলায় বাক্স পোটলা পুঁটলি খুলে দেখাতে হয়। কারণ তারা গাঁজা আফিঙ নিয়ে যেতে পারে।

সন্ধ্যার দিকে সিংহলের কূলে ঘোরান আলো দেখা গেল।

জেটিতে জাহাজ লাগল। গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। আকাশে চাঁদ উঠেছে। একটা বড় জলাশয়, তারই উপর আলো ঝিক্‌মিক্ করছে; এদিকে ওদিকে ঝোপ জঙ্গল। এই হচ্ছে "সিংহল দ্বীপ সিন্দুর টিপ তাম্বুলবন কেশ।" যাক্ এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। রাত্রে অনুরাধাপুর দিয়ে গাড়ী যাবে। কিন্তু তখন ঘুমে অচেতন থাকব। অনুরাধাপুর প্রাচীন সিংহলের শ্মশান।

১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। ভোর হয়েছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় চলেছে কুয়াস ছড়ান পাহাড়। এক গ্রীষ্মের বন্ধে শিলং বেড়াতে গিয়েছিলাম। তারই স্মৃতি মনে উদয় হল। কোনো যায়গায় দেখচি ঢালু পাহাড়ের গায়ে নারকেল গাছের বাগান। বড় বড় নারকেল গাছের সার সোজা চলে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট মানুষ (গাছের তুলনায়) তার ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মেয়েদের লুঙ্গির মত কাপড় পরা, গায়ে টাইট জ্যাকেট। পুরুষদেরও লুঙ্গি পরা গায়ে কোর্ট বা সার্ট, মাথায় কচ্ছপের খোলার হিপসীর। লম্বা চুল পেছনে ঝুঁটি বাঁধা।

আমার বেশ পরিবর্ত্তন করে নিলাম। হাফ পেণ্ট কোট ষ্টকিং পরা ছিল। এবার একেবারে বাঙ্গালী সাজলাম। ধুতি পাঞ্জাবী আলোয়ান পরে নিলাম। কলম্বো কোর্ট থেকে আমাদের কলেজ কিছু দূরে পড়ে তাই, মরাদানা জংসনে নামলাম। ষ্টেসনে নেমে চারদিকে তাকিয়ে দেখছি কেউ আমাকে নিতে এসেছে কি না; কারণ কলেজের অধ্যক্ষকে তার করেছিলাম ষ্টেশনে লোক পাঠাতে। কিন্তু কেউ আমাকে লক্ষ্য করল না। পরে যখন বল্লাম আমি আনন্দ কলেজের অধ্যাপক, সেখানে যাব, তখন দেখি আমার জন্য মোটর প্রস্তুত। হ্যাট কোট নেকটাই পরে নেই কিনা, তাই কেউ চিনল না হায় রে! দেশী পোষাকে পরিচয় হল না দেশের ভিতর; শেষে কিনা নিজের পরিচয় দিতে হবে ময়ূর পুচ্ছে সেজে এত দুর্গতি!

কলেজ কম্পাউণ্ডে মোটর প্রবেশ করল। তখন ইস্কুল হচ্ছিল। ছেলেদের ইস্কুল এবং বোর্ডিং একযায়গাতেই। সকল বালকের যুগপৎ কৌতুহল দৃষ্ট বাঙ্গালী শিক্ষকের উপরে বোর্ডিয়ের অধ্যক্ষ (বিলাতী বোর্ডিংয়ের কায়দামাফিক এখানে ওয়াডেন বলা হয়)। শ্রীযুক্ত কুলরত্নম্ মহাশয় আমাকে সহাস্য বদনে গ্রহণ করলেন।

এখানে প্রথম ঢুকেই আমি খুবই হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। কোনো মতেই ভাবতে পারি নাই যে দেশী লোকদের দ্বারা পরিচালিত এটা বৌদ্ধ বিদ্যালয়। প্রায় সকল ছেলে এবং অধ্যাপকই হ্যাট কোট নেকটাই পরা। ভারতবর্ষে খৃষ্টিয়ানদের পরিচালিত ইস্কুল দেখে যা মনে হয় তাই মনে হচ্ছিল। এডেয়ারে বালকদের দেখেছিলাম শাদা কাপড় পরা দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে দেখি কি বৈপরীত্য। ছেলেরা এখানে ম্যাট্রিক (লণ্ডন)

পর্য্যন্ত পড়তে পারে। ম্যাট্রিকের পর আর পড়ান হয় না। লণ্ডন ইণ্টারিমিডিয়েট এবং বি এ প্রাইভেট ভাবে দিতে পারে। বিলাতের সিলেবাস অনুসারে চলতে হয় চলে এদের মন বিলাতের দিকে। কথা বলে ইংরাজীতে নিজের মাতৃভাষার উপর তেমন শ্রদ্ধা নেই এখানে (আনন্দ কলেজ। লাইব্রেরীতে সিংহলী-ভাষায় বই নাই। এই শিক্ষায় কি লাভ? না হয় ইংরাজী ইডিয়ম আর উচ্চারণ ভাল করে শেখা গেল কিন্তু ততঃ কিম্? এজন্য এই শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না, হতে পারে না। পরীক্ষা পাশ করায় পরই ব্যশ সব খতম। মাতৃভাষার আদর যে পর্য্যন্ত না করচে, সে পর্য্যন্ত এদের কিছুই হবার আশা নেই। ছেলেদের মধ্যে দেশী গান শুনি না, তানা নানা করে একটা টানও না। মাঝে মাঝে পিয়োনোর টুং টাংয়ের সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ রকমের ইংরাজী গান শুনি। ছোট ছেলেদের এখানে ইংরাজী গান শেখাবার ব্যবস্থা আছে।

দেশীয় ভাষা এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কেউ কেউ ভাবছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্তই। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুলরত্নম্ মহাশয় বিলাত ফেরত; দেশী ধরণে পোষাক পরে থাকেন। এখানকার ইংরাজী শিক্ষিতেরা এ রকম একটা কাজ কল্পনায়ও আনতে পারে না।

এখানকার আর্টের দুর্দ্দশা বলে শেষ করা যায় না। লোকেরা খুব বৌদ্ধ বিষয়ের ছবি কেনে—সব বিশ্রী জার্ম্মাণ ওলিওগ্রাফ। মন্দিরের দেওয়ালে ছবি ও তদ্রূপ। সিগিরিয়া দাম্বুলিয়া পোলানারুয়া প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন চিত্র থেকে কি বিকৃতি। অধ্যক্ষ মহাশয় এই অবস্থায় ভারতীয় চিত্রকলা শেখাবার জন্য কলাভবনকে নিমন্ত্রণ করে খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

সিংহলীদের চেহারা অবিকল বাঙ্গালীদের মধ্যে সময় সময় কিছু দ্রাবিড়ি প্রভাব দেখা যায়। বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক পরিমাণে মঙ্গোলীয় প্রভাব আছে। সিংলীদেরদের গ্রাম্য খেলার মধ্যে বাঙ্গালীদের খেলা আছে যেমন হাড়ু ডুডু (সিংহলী ভাষায় সাগ্‌ডুডু) ধাপসা প্রভৃতি। সিংহলী ভাষারও বাংলা ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে।

এখানে চার জন বাঙ্গালী আছেন, যারা সকলেই উচ্চ-রাজ কর্ম্মচারী। বিক্রমপুরের তেলীরবাগের বৈদ্য বংশীয় দাশগোষ্ঠীর একজন আছেন তিনি এখানকার সেবিটারী ডাক্তার। এদের সকলের সম্বন্ধে আর একবার লিখব।

সিংহল সম্বন্ধে এখনো কিছু জানি না ওপর থেকে যা দেখলাম তাই লিখলাম। এপ্রিল মাসের ছুটীতে (একমাস ছুটী পাওয়া যাবে) অনুরাধাপুর পোলানারুয়া প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে যাব। তখন তোমাদের অনেক কথা লিখতে পারবো।

একজন ইংরাজ ভ্রমণকারী প্রাচীন সিংহল সম্বন্ধে তার বিখ্যাত বইতে লিখিয়াছেন "মিশরের কীর্ত্তি যেমন প্রাচীন কালের একটা বড় সভ্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় অনুরাধাপুরের ভগ্নপ্রাসাদ এই মন্দির সকল ও তেমনি প্রাচীন সিংহলের ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়ে দেয়। সিংহলের সভ্যতা মিশরের থেকে ছোট ছিল না।" কিন্তু এ সম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। খুব লোকই এ সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। মহাবংশে যখন প্রাচীন সিংহলের কথা পড়ি, মন যেন আর এক রাজ্যে চলে যায়। এমন বিপুল ঐশ্বর্য্য বুঝি কেবল আরব্য উপন্যাসেই সম্ভব।

এখানকার লোকরা আমাকে খাতির করেছে। সববাইর সঙ্গে এখনো মিশ্‌তে পারি নাই। ছোট ছোট ছেলেরা—তোমাদের শিশু বিভাগের মত, আমার কাছে আস্‌ছে, ছবি দেখাচ্চি, খুব খুসি হচ্চে। বৌদ্ধভিক্ষু পিয় দশসি কল্‌কাতায় ছিলেন, কিছু বাংলা জানেন, আমার কাছে গুরুদেবের বই পড়ছেন সিংহলী ভাষায় নাকি অনুবাদ করবেন। আমি তার কাছে সিংহলী পড়ি আজ তবে এ পর্য্যন্ত।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

রেল-ষ্টেশন

নির্জ্জন রেলওয়ে ষ্টেশনের মত এমন লক্ষ্মীছাড়া বুঝি আর কিছু নাই। ক্ষণকালের জন্য তার হাঁক ডাক—ক্ষণকালের জন্য তার লোক জন—তার পরে সব অন্ধকার নীরব আর নির্জ্জন। যাত্রী যাহারা নামে ষ্টেশনবাবুকে টিকিট খানা দিয়া, হাতের পুঁটুলিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া গায়ের কাপড় ভালো করিয়া টানিয়া নিয়া—কাঁচা পথ ধরিয়া অন্ধকার গ্রামের উদ্দেশ্যে তাহারা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়। তখন ষ্টেশনে যে লোক আছে তা আর মনেই হয় না। কেবল সিগনালের লাল নীল আলোগুলি উদ্গ্রীব কণ্ঠে-তমোলীন দিগন্তের পরপারে উঁকি মারিয়া থাকে। শূন্য প্ল্যাটফরম শীতে কন্‌কন করিতে থাকে; সেখানকার কেরোসিনের আলো দুইটা নিভিয়া যায়; মালের বড়বড় বস্তাগুলি হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া থাকে; ষ্টেশনের ঘরের মধ্যে বড় টেবিলটার পাশে বসিয়া ঘুম ও মশা তাড়াইতে তাড়াইতে ষ্টেশনের-বাবুটি মোটা একখানা খাতায় হিসাব করিতে থাকেন। জামাদার সাহেব ঘরের এক কোনায় হাত লণ্ঠনটি কমাইয়া দিয়া সরকারী প্রকাণ্ড খাতা খানা খুলিয়া ফেলিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়ে। যাত্রীদের নিকট হইতে আদায়ী পান, কিছু তরকারী বা একটা মাছ প্রভাতের প্রতীক্ষায় টেবিলটির নীচে পড়িয়া থাকে। দেয়ালের প্রকাণ্ড ঘড়িটা টিক্‌টিক শব্দে প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিকে গনিয়া বাজাইয়া লয়। বাচাল পাগল ঘড়িটা পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ির আভাস পাইতেই ঠনং ঠনং শব্দে চমকিয়া উঠিতে থাকে। ষ্টেশনের বাবুটি শীতের মধ্যে আর উঠিতে চান না; একবার, দুইবার, তিনবার; আর না উঠিলে চলে না, অবাক্তস্বরে পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশনের বাবুটিকে বকিতে বকিতে কথা কহিবার যন্ত্রের নিকটে মুখ লইয়া ঘুমের ঘোরে একই কথা বারবার বলিতে থাকেন। যাত্রী-ঘরের কোনটিতে জন কয়েক যাত্রী কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ অন্যের অগোচরে জাগিয়া উঠিয়া তামাকটুকু সাজিয়া লইতেই আর সকলে নিতান্তই সহজসংস্কার বশত সহসা জাগিয়া উঠিয়া তামাকের ভাগ আদায় করিয়া লয়।

ভিতরে যখন এই রকম বাহিরে তখন শীতের চাঁদ বনের আড়াল ছাড়িয়া উঠি উঠি করিয়া সহসা এক সময় আকাশের ধারে দেখা দেয়। তাহার খানিকটা আলো পড়ে বনের মাথার উপরে আর বাকিটা পাট পচা পুকুরটার ছোট খাটো ঢেউ গুলির উপর পড়িয়া ভাঙিয়া চুরিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে আর সেই ঝাপসা আলোতে টেলিগ্রাফের তারের গোছা স্থানে স্থানে ঝক্‌ঝক করিয়া উঠে। এমনি করিয়া শিশিরে আর শীতল বাতাসে—তারায় আর চাঁদে—কচিৎ-ডাকা পাখীর ডাকে আর প্রহর গোনা শিয়ালের শব্দে—সমস্ত আকাশ ভরিয়া দিয়া সমগ্র পৃথিবীর বুকের উপরে সচেতন অন্ধকারের স্রোত ঢালিয়া দিয়া—ধীরে ধীরে চলিতেছে কি-না চলিতেছে ভাবে শীতের রাত্রিটি অস্তাচলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

আধ ঘুমন্ত ষ্টেশনবাবুটির চক্ষের অজ্ঞাতে কখন্ অন্ধকারের ডালিমটি ফাটিয়া গিয়া পূর্ব্বাকাশে রাঙা ফলের সরস বীচি গুলিয়া ঝরিয়া পড়িতে থাকে। ষ্টেশনের পাশের পুকুরটি হইতে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির মত বাষ্পের একটি ক্ষীণ আবরণ জড়াইয়া উঠে। ক্রমে গ্রামের দিক হইতে দু একখানা গাড়ী পাল্কী দু একজন লোক আসিতে থাকে। গাড়ীর আরোহীরা চোখ মুছিতে মুছিতে নামিয়া ষ্টেশনে আসিয়া হাঁকা হাঁকি জুড়িয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে প্ল্যাটফরম মালে এবং লোকে ভরিয়া উঠে।

গাড়ী আসে কত লোক নামে কিন্তু এই হতভাগ্য ষ্টেশনটি কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারেনা। ইহার কাছেই একটি শিউলি ফুলের গাছ আছে—সে বেচারা সৌরভে এবং সৌন্দর্য্যে কত পথিকের মন কাড়িতে চেষ্টা করে—কেহ তাহা থামিয়াও দেখে না। মাটিতে পড়া ফুলগুলি গরু এবং মহিষে খাইয়া যায়। আমি একা এই প্ল্যাটফরমে বসিয়াই

আছি। অদূরে আম-কাঠালের বাগানের ভিতর হইতে গ্রামের জীবন যাত্রার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয় একটা লোক কুড়ুল দিয়া কাট কাটিতেছে তাহারই শব্দ; গ্রামের ঘাটে বাসন মাজিবার ঠুং ঠাং আওয়াজ; কি একটা পাখী সারা দুপুর ধরিয়া এক ঘেঁয়ে একটা শব্দ করিয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছে। কিয়দ্দূরে একটি হিন্দুস্থানী পরিবার বাস করে। স্বামী ষ্টেশনে কাজ করে; স্ত্রীটি কষিয়া বাসন মাজিয়া পিতলকে সোনা তৈরী করিতে চেষ্টা করিতেছে; ছেলেটি একটা গোলাকার কাঠে দড়ি বাঁধিয়া টানিতেছে ইহাই তাহার বাষ্প যান।

আমি একা প্ল্যাটফরমে বসিয়া। কেন যেন আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল—এই ষ্টেশনটির সহিত চারি পাশের কাহারো যোগ নাই সে একাকী নিঃসঙ্গ, লক্ষীছাড়া। চারি পাশে গ্রামে গ্রামে কত হাসি কত কান্না কত আনা-গোনা লোকজনের—আর এ কেবল নিরাসক্ত ভাবে দিবা-রাত্রি খেয়া পারাপার করিতেছে। কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না—না ওই শিউলি গাছটির দিকে; কেহ তাহার কথা মনেও ভাবেনা—না এই নিঃসঙ্গ লক্ষীছাড়ার কথা। এই গ্রামগুলি কত নিকটে তবু যেন কতই দূর; এই তো কত লোক আসে যায়—তবু যেন কতই পর। লোক-জনের জীবন যাত্রার মাধ্যাকর্ষণের টান যেন এখান হইতে ছিড়িয়া গিয়াছে; মনে হইতে লাগিল মানুষের হইতে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ফিরিবার কোনই উপায় বুঝি নাই।

হঠাৎ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। রেল ষ্টেশনে বসিয়া বিচ্ছেদের আশঙ্কা। এক মুহূর্ত্তে বুকের ভার হাল্কা হইয়া গেল। চারিদিকের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ যোগ নাই বটে কিন্তু সমস্ত দেশের হৃদয়ের সহিত ইহার যোগ যে লৌহ-অমোঘ আর বিদ্যুৎদ্রুত। দিবাস্বপ্ন ভাঙিয়া উঠিয়া পড়িলাম দক্ষিণের একখানা টিকিট কিনিলাম। গাড়ী আসিলেই চড়িব—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাতা আঃ কলিকাতা।

উৎসের অনুসন্ধান

৫

পথ পথ সম্মুখে আমাদের লীলায়িত অনন্ত পথ। মানুষ চিরপথিক। যখন সে বাড়ী ঘর তৈয়ারী করিতে শিখে নাই গ্রাম নগর বসাইতে জানিত না তখন তাহার আশ্রয় ছিল—একমাত্র পথ। এই অচল তরঙ্গায়িত স্রোত না জানি বিশ্বের কোন কেন্দ্রাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিবে ইহার প্রতি ধূলিকনা প্রচণ্ড বেগে কালের পক্ষ বেগের ঝাপটে ছুটিয়া চলিয়াছে। পথিকেরও সেই দশা—রাত্রিতে তাহার বৃক্ষতল আশ্রয়ের জন্য আছে বটে কিন্তু প্রভাতেই তাহার সম্মুখে আবার সেই পথ। আমরাও একদিনের পথিক—অনন্ত প্রবহমান পথিকের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিতে একদিনও সাহায্য করিলাম কি গৌরব! মানুষের আদিম নিবাস পথে তাই সে সংসারের শত কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে ফাঁক পাইলেই ছুটিয়া আসে পথের বুকে।

শীতের আতপ্ত রৌদ্র মাঠ হইতে মাঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—পথের পাশে শিরীষশালের ছায়ায় সাঁওতালদের ছোটখাট গ্রাম—গাঁদাফুলের বাগানের মধ্যে তক্‌তক্ করিতেছে। উঠানে ধান স্তূপ করা—সাঁওতালরা পাথরের উপর ধান পিটিয়া চাউল তৈরী করিতেছে। গ্রামের কুকুরগুলা আমাদের দেখিয়া ডাকিয়া উঠিতেই সাঁওতালরা আমাদের লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইতেছে। মাঠে ধান কাটা হইয়া গিয়াছে শূন্য মাঠের পথে ধূলা উড়াইয়া শেষ গাড়ী ধান গ্রামের দিকে চলিয়াছে।

আমাদের দল চলিয়াছে পথের ধূলা উড়াইয়া—পথিককে উত্যক্ত করিয়া—গ্রামবাসিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া—শীতের রৌদ্রে। পাশে চলিয়াছে হিংলানদী দুইতীরে বাশ ঝাউয়ের বন হিল্লোলিত; নদীগর্ভে ঈষৎ জলরেখা ও প্রচুর বালিশয্যা

রৌদ্রে প্রতিবিম্বময়। নদীটি খুব বড় নয় বিশেষত তাহার জলের অধিকাংশই অন্তঃসলিলা; কিন্তু আমাদের চোখে ইহার প্রতিপত্তি কি বিশাল! ইহারই কোন গুপ্ত দুর্গম উৎসে ঐতিহাসিক খ্যাতি গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে কেবল আমাদেরই অপেক্ষায়—তাহাকে গিয়া টানিয়া বাহির করিলেই হয়। বিক্রমজিৎ বার বার নদীর জল মাপিতেছে ও অদম্য উৎসাহে বলিতেছে ক্রমেই যত উজানে যাইবে জল ততই বাড়িবে। উজানে নদীর জল বাড়িবে! কিছুই আশ্চর্য্য নয়—কারণ ইহার উৎস যে হিমালয়ে সেখানে ছাগ চর্ম্মের জামা ব্যতীত গেলেই হিমে জমিয়া যাইতে হইবে—বিশেষত এযে ঐতিহাসিক নদী।

ছানারাম যখন যখন দেখিল যে তাহাকে গাড়ী চালাইতে হইতেছে না তখন সে অগত্যা গাড়ীতে শুইয়া পড়িল কিন্তু হাতের হুঁকাটি ছাড়িল না। অনভ্যস্ত রেলের যাত্রী যেমন টিকিট খানিকে অতি সাবধানে কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া রাখে ও বারে বারে হাতড়াইয়া দেখে ঠিক আছে কি না এবং গাড়ীতে ভারিক্কি কেহ উঠিলেই তাহাকে টিকিট দেখাইতে উদ্যত হয়—তেমনি একান্তভাবে সে হুঁকাটিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। গাড়ী পথ হইতে একটু এদিক্ ও যাইতেই সজোরে আমাদের বকিয়া উঠিতেছিল কারণ দোষটা সম্পূর্ণ নাকি আমাদেরই তাহার গরুতো নির্দ্দোষ।

বেলা পড়িয়া আসিল বাতাস শীতল হইয়া উঠিল দূরে আমবনের আড়ালে সূর্য্য নামিয়া পড়িতেই অন্ধকার বনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মাঠে মাঠে ছড়াইয়া পড়িল। আজ আমরা এক আমবনে আশ্রয় লইলাম। পলাশীর যুদ্ধে এক আমবন প্রসিদ্ধ হইয়াছিল আজ প্রসিদ্ধি লাভ করিল আর একটা।

তাঁবু পড়িল—রান্নার আয়োজনে লালবিহারী মাতিয়া উঠিল। অবিনাশ রোগা কাজেই কুঁড়ে সে সকলের চোখ এড়াইয়া তাঁবুর ভিতরে গিয়া আরাম করিবার চেষ্টায় ছিল। তাহাকে রান্নার কাঠ কুড়াইতে যাইবার আদেশ হইল। বিক্রমের আদেশ অমান্য করা চলে কিন্তু লালবিহারীর আদেশ—বিশেষ রন্ধন বিষয়ে—অসম্ভব! বেচারী অবিনাশ উপায়ান্তর না দেখিয়া মৃদুপদে টাটু ঘোড়াটির মত তীব্র শীতের বাতাসে নদী পার হইয়া অন্ধকারে কাঠ কুড়াইতে চলিল।

কবিবর বিমল নির্জ্জন নদীতীরে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত ক্ষীণ স্রোতের দিকে তাকাইয়া ছিল। পরীক্ষাগৃহে অপটু ছাত্র যেমন আড়চোখে একান্ত দৃষ্টিতে পাশের ছেলেটির খাতা হইতে সার সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে তাহার ভাব অনেকটা সেই রকম। প্রকৃতি দেবী তাঁহার একটি ভাব কনাও তাহাকে স্বেচ্ছায় দিবেন না তাই সে গোপনে প্রকৃতির চোখ এড়াইয়া দুই একটা কবিত্ব জনক ভাব সংগ্রহের জন্যই নদীর জলের দিকে তাকাইয়া আছে। "ওহে কবি জলের ধারেই যখন আছ তখন আর একটু নিকটে গিয়ে এক কলসী জল আনো—তোমার জল আনিবার পালা।" কবির জল আনিবার পালা! অনেকদিন পরে আজ কবির হৃদয়-বড়শীতে বুঝি একটা কাব্য পুঁটি টোপ গিলিয়াছিল—অমনি আম্রকুঞ্জ প্রতিধ্বনিত করিয়া লালবিহারীর আদেশ প্রচারিত হইল—তোমার জল আনিবার পালা। কিন্তু সে আদেশ অগ্রাহ্য করিবার শক্তি কবির ছিল না—কারণ খাদ্যের ভার যে লালবিহারীর উপর। লাল বিহারীটা gross materialistic সে কাহাকেও কাজ হইতে রেহাই দেয় না। অগত্যা কবি উঠিয়া কলসী লইল, ঘাটে নামিল, জল তুলিল। কিন্তু "Time & tide এবং কবিত্বময় ভাব কাহারো জন্য অপেক্ষা করেনা তাই কবিকে রিক্ত হাতেই ঘরে ফিরিতে হইল। অন্যদিকে বিক্রমজিত তাঁহার প্রিয় অশ্ব gallantকে জাতীয় ডাকটা ভুলিতে অনুরোধ করিতেছিল কিন্তু স্বদেশ প্রেমিক 'gallant' কিছুতেই রাজি হইবে না।

অদূরে তাঁবুর নিকটে মৃদু আগুন জ্বালাইয়া—আমাদের সব চেয়ে ভালো কম্বলখানা মুড়িয়া দিয়া ছানারাম বড় আরামে চোখ বুজিয়া ধূমপান করিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া শশাঙ্ককে বলিল 'বাবু একটু জল আনো'—এবং সংক্ষেপে তাহার

উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিল—'খাবো'। শশাঙ্ক এই পরোপকারের লোভটুকু না ছাড়িতে পারিয়া এক ঘটি জল আনিল। ছানারাম আদেশ ও অনুরোধের মাঝামাঝি স্বরে বলিল—'শীতের জল বড় ঠাণ্ডা'—খেলে অসুখ করবে আমার আবার হাঁপের ব্যারাম আছে—বুঝতেই পারছ একটু গরম করে আন কারণ—কারণ আর দর্শাইতে হইল না শশাঙ্ক তাহার আদেশ করিবার আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া আগেই সরিয়া পড়িল। এই জন্যই বোধ করি ইংরাজিতে বলে "There are some men who are born to order" আমাদের ছানারাম নিঃসন্দেহ তাদেরি মধ্যে একজন।

রাত্রে আহারের পর সবাই আরামে তাঁবুর ভিতরে গিয়া বসিলাম। এইবার বিক্রম গল্প আরম্ভ করিবে। তাহাকে আজ সারাদিন তোয়াজ করিয়া রাজি করিয়াছি। প্রথমে অনুরোধ করিতে অস্বীকার করে কিন্তু শেষে সহৃদয়তার শীতল হাওয়ায় তাহার বহুদিন সঞ্চিত রুদ্ধ বাষ্পরাশি অশ্রুতে গলিয়া পড়িল। আমি তাহার চোখে জল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম না—কারণ তাহার চোখে জল না দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। গল্প জমিলেই ঘুমের ব্যাঘাত করিবে ভাবিয়া অবিনাশ প্রোটেষ্ট স্বরূপ মৃদুমন্দ কাশি আরম্ভ করিল। কিন্তু লালবিহারীর এক দাবড়ে থামিল বটে কিন্তু তাহার কাশির রুদ্ধ আবেগ থাকিয়া থাকিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। বিক্রম ধীরে ধীরে গল্প আরম্ভ করিল।

বাতায়নিকা

জাল-বোনা এই জীবনখানার
বাতায়নের পারে
তোমার বাসা হায়
লোহায় গড়া গরাদগুলো
তোমায় রাখে ধরে
মৌন পাহারায়।
সূর্য্য যবে প্রথম উঠে
আশার লালে লাল
পায়রা-রঙা নভে
তখন তব পাই যে সাড়া
গানের দিতে তাল
কিঙ্কিনী-উৎসবে।

দুপুর বেলা খোঁজে যখন
লেবুর কচি ফুল
পাতার ছায়া ক্ষীণ
তখন তুমি স্বপন দেখ
চিত্ত-নীলিমায়
নয়ন দুটি লীন।
সন্ধ্যাবেলা সূর্য্য যবে
অস্তাচল পারে
ক্লান্ততর হয়
দিক্‌বালাটির কর্ণে যেন
রৌদ্রে ম্রিয়মান
করুণ-কুবলয়।

তখনো তুমি রয়েছ বসে'
চক্ষে জাগে ওই
বাতায়নের পারে
স্বচ্ছ শশী দিগন্তরে
চরণ টিপে টিপে
আধেক উঁকি মারে

ঝরিয়া পড়ে আঁধার ধীরে
কুলায় তৃষাতুর
হাঁসের পাখা হ'তে
তারার দলে ছুটিয়া এসে
ঝাঁপায়ে পড়ে সবে
মন্দাকিনী স্রোতে।

তখনো কেন রয়েছ বসে
অমন ক'রে একা
বাতায়নের বালা
হয়েছে দেখ অনেক দূরে
সপ্ত-ঋষি দেশে
ধ্রুবতারাটি জ্বালা।
বাহিরে তুমি আসিতে নার
বলনা মোরে খুলে
কিসের বাধা তব
আমিও নারি ভিতরে যেতে
আয়স-বাধা ভাঙা
আয়াস-অভিনব।

জীবনখানা রয়েছে পড়ে
কাঠিন বড় লাগে
কঠিন যেন শিলা
ইহারি মাঝে ফুটাতে হবে
মূর্ত্তি মরমের
কে হেন কাজ দিলা ?
দুঃখে সুখে বাটালি ধরে'
দিবস নিশীথে
আঘাত করি হায়
তারার মত পাথর-কুচি
এদিক ওদিকে
ছড়িয়ে পড়ে যায়।

কি ছবি হেথা উঠিবে ফুটি
একদা অবশেষে
কেউ কি তাহা জানে
কখনো তারি অভাস পাই
ছায়ার চেয়ে ছায়া
তোমারি মাঝখানে।
বুকের তব পরশ পেয়ে
তপ্ত হয়ে ওঠে
গরাদ লোহা-গড়া
সকল ছেড়ে পাথরে শেষে
বাতায়নের বালা
দেবে কি তুমি ধরা ?

বন-তুলসীর গন্ধে উদাস পারুল-ডাঙার মাঠে।

বন-তুলসীর গন্ধে উদাস পারুল-ডাঙার মাঠে
কারা আসে আর কারা চলে যায়
রাখাল ছেলেরা ছায়াতে ঘুমায়
ধূসর খোয়াই কাতর তৃষায়
দিবস নিশায় ফাটে
বন-তুলসীর গন্ধে উদাস পারুল-ডাঙার মাঠে
চোর কাঁটা ঢাকা বাকা পথ বেয়ে
একটানা সুরে এক গান গেয়ে
তাজা ঘাস মাথে সাঁওতাল মেয়ে
চলে সহরের হাটে,

বন তুলসীর গন্ধে উদাস পারুল-ডাঙার মাঠে
শঙ্খ ধবল মেঘের ভেলায়
শঙ্খ চিলেরা পক্ষ মিলায়
উড়িতে উড়িতে ছুঁয়ে চলে যায়
আকাশের চৌকাঠে।
বন-তুলসীর গন্ধে উদাস পারুল-ডাঙার মাঠে
তালতরুশাখে বাতাস বাঁধিয়া
মনে হয় যেন উঠিছে কাঁদিয়া
উদাস পথিক ওঠে চমকিয়া
আসে যারা সেই বাটে।
বন-তুলসীর গন্ধে উদাস পারুল-ডাঙার মাঠে
মৌন রাতির অশ্রু-সাধনা
ঘাসে ঘাসে যত শিশিরের কণা
মুহূর্ত্তে সব হয়ে যায় সোনা
প্রভাত আলোর ছাটে।
বন-তুলসীর গন্ধে উদাস পারুল-ডাঙার মাঠে
ভালবাসা সেথা চিরপাখাহীন
স্বাধীনতা সেথা শিকলবিহীন
ক্লান্তি সেথায় স্নানে সুনবীন
স্বর্ণ উষার ঘাটে।

আশ্রম সংবাদ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আশ্রমবাসিগণ সকলেই সন্তপ্ত হইয়াছেন। এই দুঃখ তাঁহার শোকতপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমগ্র দেশ অনুভব করিয়াছে; তবু ইহার গভীরতা এত অধিক যে আজও দেশের হৃদয়কে তরঙ্গমুখর করিয়া রাখিয়াছে। ভোগে যিনি অপরিমেয়, কর্ম্মে যিনি অপরাজেয়, ত্যাগে যিনি সর্ব্বস্ব-হীন—সেই মানুষের আবির্ভাবে সমস্ত দেশ অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তাঁহার তিরোভাবের আপাত দুঃখকে অতিক্রম করিয়া বিশালতার একটি অপূর্ব্ব গৌরবে সমস্ত দেশ ইতিহাসের রাজপথে আর এক পা অগ্রসর হইয়া গেল।

দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের মৃত্যুতে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে একদিবস অনধ্যায় ছিল।

তাঁহার জীবনী আলোচনার নিমিত্ত কলাভবনে একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চৈনিকঅধ্যাপক লিম মহাশয়, শ্রীযুক্ত কালিমোহন ঘোষ, ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়গণ দেশবন্ধুর নানামুখী কর্ম্মজীবন ও বিস্ময়কর ত্যাগ মাহাত্ম্যের পর্য্যালোচনা করেন।

ছুটির পরে

গ্রীষ্মাবকাশের পর আশ্রমের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে যে সব ছাত্র এবার বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন—তাঁহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ছুটির পরে পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগে অনেকগুলি নূতন ছাত্র ও ছাত্রী আসিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ বীণকার শ্রীযুক্ত সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী পুনরায় আশ্রমে আসিয়াছেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে অনেকবার এখানে আসিয়া বীণা বাজাইয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছেন। ইনি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় বীণা বাজাইয়া থাকেন। পূজনীয় আচার্য্যদেব ইহাঁর বীণা-বাদন শুনিতে খুব ভাল বাসেন।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত যদুকিশোর ভট্টাচার্য্য সমবায় বিভাগের ভার লইয়া সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন।

বিদেশ-যাত্রা

পূজনীয় আচার্য্য দেব ছুটির পরে আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। তিনি আগামী ১লা আগষ্ট ইটালী যাত্রা করিবেন। শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় সস্ত্রীক তাঁহার সহিত যাইবেন।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক শ্রীশশধর সিংহ London School of Economics এ অর্থনীতি পড়িবার জন্যই শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ } আষাঢ়, সন ১৩৩২ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিদায় কালে ইতালীয়ার প্রতি

মিলান
২৪ জানুয়ারী ১৯২৫

কহিলাম, ওগো রাণী,
অনেক প্রেমিক চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
খুলে দাও দ্বার ক্ষণেক কেবল গান গেয়ে চলে যাই।
দাঁড়ালে আসিয়া তব বাতায়ন পরে,
ঘোমটা আড়ালে কহিলে সুধীর স্বরে :—
"এখন শীতের দিন
কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার কানন কুসুম-হীন॥"

কহিলাম, ওগো রাণী,
পুর্ব্বসাগর পার হ'তে আমি এনেছি বাঁশরীখানি।
উতারো ঘোমটা তব
বারেক তোমার কালো নয়নের আলো খানি দেখি ল'ব।
কহিলে "আমারে হয়নি রঙীন সাজ,
হে অধীর কবি, ফিরে তুমি যাও আজ।
মধুর ফাগুন মাসে
কুসুম আসনে বসিব যখন ডেকে লব মোর পাশে॥"

কহিলাম, ওগো রাণী,
সফল হয়েছে যাত্রা আমার, শুনেছি আশার বাণী।
বসন্ত সমীরণে
তব আহ্বান-মন্ত্র ফুটিবে কুসুমে আমার বনে।
মধুপ-মুখর গন্ধ-মাতাল দিনে
তব জানালার পথ খানি ল'ব চিনে,
আসিবে সে সুসময়
আজিকে কেবল ফিরে যেতে যেতে গাহিব তোমার জয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষীয় বিবাহ

ভারতবর্ষীয় বিবাহ সম্বন্ধে কিছু লেখবার জন্যে য়ুরোপ থেকে আমার কাছে অনুরোধ এসেছে। সেই কারণেই প্রথমেই আমার চোখে পড়্‌ছে য়ুরোপীয় বিবাহের সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রভেদ। সে প্রভেদ কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানের নয়, আন্তরিক অভিপ্রায়ের।

বিবাহ জিনিষটা সভ্যসমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা। এই দুই অভিপ্রায়ের মধ্যে বিরোধ বেশি অথবা মিল বেশি তাই নিয়েই ভিন্ন ভিন্ন বিবাহের মধ্যে চেহারা ও ভাবের প্রধান পার্থক্য ঘটে। কেন না জীব-প্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতি এই দ্বৈরাজ্যের শাসনে মানুষ চালিত। যেখানে সমাজ এই জীবপ্রকৃতির পেয়াদাগুলোকে অত্যন্ত বেশি অমান্য ক'রে চল্‌তে চায় সেখানেই ধর্ম্মবিধি, শাসনবিধি, আত্মপীড়নবিধি, বিচিত্র ও কঠিন হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে। বিশেষত এই দ্বৈরাজ্যে প্রকৃতির হাতেই রসদ, ধনভাণ্ডারের মালিক সেই; এইজন্যে তার অত্যন্ত বিরুদ্ধে যেতে হ'লে মানুষকে অষ্টপ্রহর আটঘাট বেঁধে উঠে প'ড়ে লাগ্‌তে হয়। এমন অবস্থায় প্রকৃতির চলাচলের গোপন পথগুলোতে মানুষ নানা সতর্ক পাহারা রেখেও কিছুতে যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না। কেন না প্রকৃতির হাতে কেবল যে সিঁধকাটি আছে তা নয়, সে ঘুষ দেবার নানা উপায় জানে।

যে দেশে সমাজ বহুব্যাপক সম্বন্ধজালে জটিল, সেদেশে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে নানাদিক থেকে দাবিয়ে রাখ্‌তে হয়। জীবনধারণের জন্যে যেখানে মানুষকে সর্ব্বদা দূরে দূরান্তরে যেতে বাধ্য করে, সেখানে সমাজ-বন্ধন বহুবিস্তীর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না, সেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দাবী-স্বীকার সমাজবিধির অন্তর্গত হয় না, তা স্বেচ্ছাধীন হ'য়ে থাকে। আমাদের দেশে আমরা ছোটোখাটো সকল প্রকার আনুকূল্যেই কৃতজ্ঞতা-স্বীকারের কোনো বাক্য ব্যবহার করিনে, এই নিয়ে য়ুরোপীয়েরা আলোচনা ক'রে থাকে। অনেক তাড়াতাড়ি স্থির ক'রে বসে যে আমাদের স্বভাবেই কৃতজ্ঞতার উপসর্গ নেই। কিন্তু আসল কথা এই যে আমাদের সমাজের প্রকৃতি এমন যে, এখানে সাহায্য পাওয়ার দায়িত্বের চেয়ে সাহায্য করার দায়িত্ব বড়। যিনি বিদ্যালাভ করেছেন, বিদ্যাদানের দায়িত্ব তাঁরই, বিদ্যার্থীর প্রতি তা অনুগ্রহ নয়। অকিঞ্চন আগন্তুকের প্রতি যথাসাধ্য আতিথ্য করায় গৃহকর্ত্তারই সার্থকতা। জাতকর্ম্ম থেকে আরম্ভ ক'রে অন্ত্যেষ্টিসৎকার পর্য্যন্ত যে সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ঘরের মধ্যে বাহিরের অধিকার স্বীকার করাকে আমরা ধর্ম্মের নিদেশ ব'লে জানি, সেই সকল ক্রিয়াকর্ম্মে আমন্ত্রিতদের কাছেই গৃহস্থ আপন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য ব'লে গণ্য করে।

ভারতে আর্য্যেরা প্রথমে ছিলেন বনচারী, তারপরে ক্রমে হলেন পল্লীবাসী, পুরবাসী। প্রথমে ধেনু ছিল তাঁদের ধন, পশুচারণ ছিল তাঁদের জীবিকা। অবশেষে আর্য্যা-বর্ত্তের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চ থেকে ঘন অরণ্যের যবনিকা ক্রমে ক্রমে উঠে গেল। তার নদীলালিত প্রশস্ত সমভূমির উপরে কুল-পতি-শাসিত গোষ্ঠীগুলি রূপান্তরিত হ'য়ে নরপতি-শাসিত রাজ্য আকারে চাক বেঁধে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বনের জায়গায় দেখা দিল শস্যক্ষেত্র। তখন বৃহৎ জনসঙ্ঘের জীবিকার জন্যে কৃষিই প্রধান অবলম্বন হ'য়ে উঠ্‌ল। বৈদিক লড়াইয়ের মূল ছিল ধেনুহরণ, রামায়ণিক লড়াইয়ের মূল হচ্ছে সীতাহরণ, অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রের প্রতি উপদ্রব। রাম-চন্দ্র-যে কৃষিধর্ম্মরক্ষক বীরত্বের প্রতিরূপক (symbol) তা তাঁর লোকবিখ্যাত নবদুর্ব্বাদলের মত শ্যামবর্ণের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

এ'র মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এক কালে যে-কাহিনী ছিল কৃষিরক্ষা ও কৃষিপ্রচারের জয়গান পরবর্ত্তী কালে সেই রামায়ণকাহিনীই বিশেষভাবে গৃহধর্ম্ম-

নীতির মহিমাকীর্ত্তনরূপেই বিকাশ পেয়েছে। কেননা কৃষিজীবিকা মানুষকে মাটীর সঙ্গে বেঁধে রাখে। এই উপায়ে বহুলোকের সমবায়ে যে-অন্ন উৎপন্ন হয় বহুলোক সমবেত হ'য়ে সেই অন্ন ভোগ করতে পারে। অন্ন সংগ্রহ যখন অনিশ্চিত হয় না, অন্নই যখন মানুষকে একজায়গায় একত্র ক'রে স্থিতিদান করে, তখন মানুষের মধ্যে সেইসকল হৃদয়বৃত্তি অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে যাতে ব্যবহার-বিধিতে অন্যের জন্যে ত্যাগস্বীকার সহজ হ'তে পারে।

রামায়ণের সেই আদিম কালের ভারত-ইতিহাসে আমরা তিন পক্ষ দেখ্‌তে পাই। এক হচ্ছে আর্য্য, আর এক হচ্ছে বানর ও রাক্ষস। বানরেরা বর্ব্বরজাতীয়; রাক্ষসেরা সুশিক্ষিত ও প্রবল। একদিন এঁদের মধ্যে পরস্পর বিরোধই ছিল প্রধান ব্যাপার, তখন সেই নিরন্তর যুদ্ধের অবস্থায় ভারতে সর্ব্বজাতীয় সমাজবন্ধন সম্ভবপর হয়নি। তারপরে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে যখন লোকালয়গুলি ব্যাপক হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, তখন যুদ্ধের চেয়ে শান্তির প্রয়োজন ও গৌরবই বড় হ'য়ে দেখা দিল। তখন মানুষের পরস্পর শান্তিমূলক যোগের সত্যই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ল। তাই রামায়ণে আর্য্যদের সঙ্গে বানর ও রাক্ষসের সম্বন্ধ বিস্তারই হচ্ছে প্রধান কীর্ত্তনীয় বিষয়।

শান্তিনীতির যে-বীরত্ব সে ত্যাগের বীরত্ব, তাতে নিবৃত্তির জয়। যে-দেশে সেই ত্যাগ ও নিবৃত্তির চর্চ্চা হ'য়ে থাকে, সেখানে সমাজের মূল উপাদান ব্যক্তি নয়, গৃহ; এবং সে গৃহ প্রশস্ত। তাই দেখ্‌তে পাই, রামায়ণ যখন ক্রমে ক্রমে মহাকাব্যরূপে অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন তার প্রধান বিষয় হ'ল গৃহধর্ম্মনীতির গৌরবঘোষণা। পিতা পুত্র, ভাই ভাই, স্বামী স্ত্রী, রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ রক্ষার জন্য যে একনিষ্ঠ আত্মত্যাগশীল চরিত্রবলের প্রয়োজন, রামায়ণে তারই মহিমাকীর্ত্তন করা হয়েছে।

তাতে আর একটী নীতির প্রশংসা আছে, সে হচ্ছে যাকে বলে সত্যরক্ষা। যে-সমাজ বিপুল ও বিচিত্র, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসরক্ষার প্রতিই তার একান্ত নির্ভর। আমাদের পুরাণে ইতিহাসে নানা কাহিনী নানা উপদেশে এই নীতি মানুষের মনে দৃঢ় ক'রে মুদ্রিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে; এতদূর পর্য্যন্ত গেছে যে, প্রতিশ্রুতিবাক্য যদি অন্যায়ে যদি অধর্ম্মে নিয়ে যায় তবে তাও পালনীয়, এ কথা মানতেও ভারতবর্ষ কুণ্ঠিত হয়নি।

অন্যকে আক্রমণের উদ্দেশে নয়, কিন্তু পরস্পরকে রক্ষণ ও পালনের উদ্দেশে যেখানেই বহু লোক সমবেত হয় সেখানে স্বভাবতই পরার্থপর ধর্ম্মনীতির উদ্ভব হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ গোড়ায় যেটা প্রয়োজনের পথ-অনুসরণে আসে, ক্রমে তার লক্ষ্যটা স্বার্থকে অতিক্রম ক'রে পরমার্থ দেখ্‌তে পায়। নিজেকে খর্ব্ব করা ত্যাগ করাই ক্রমে চরমধর্ম্মরূপে প্রকাশ পেতে থাকে। আমাদের দেশে তাই একদিন, প্রধানতঃ বাসসুখের জন্য নয়, বিষয়ভোগের জন্যে নয়, ধর্ম্মসাধনের জন্যেই অর্থাৎ মুক্তিপথের সোপানরূপেই গৃহস্থাশ্রম সম্মান পেয়েছিল। নিজের স্ত্রীপুত্রের প্রতি আত্মীয়ভাব স্বাভাবিক ব'লেই সেটার চর্চ্চার দ্বারা স্বার্থবন্ধন শিথিল না হ'য়ে বরং দৃঢ় হ'তেই দেখা যায়, কিন্তু যে-গৃহে দূরসম্পর্কীয়েরাও বাসের অধিকার পায়, যেখানে পরপ্রায়ের সঙ্গেও আপন সঞ্চয় ভাগ ক'রে চালাতে হয়, যেখানে রক্তের টানের দাবীর সঙ্গে নামমাত্র সম্পর্কের দাবীকে অভেদ ক'রে না মান্‌লে লজ্জা ও নিন্দা, সেখানে আত্মীয়ের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতিকে ছাড়িয়েও কল্যাণের ইচ্ছা ব'লে একটী বিশেষ হৃদয়বৃত্তির উদ্ভব হ'তে থাকে। সেটা ক্রমে এমন প্রবল হয় যে, নিজের প্রবৃত্তির ও রুচির প্রবর্ত্তনায় গৃহধর্ম্মের বিরুদ্ধাচার অত্যন্ত আত্মগ্লানি ও লোকনিন্দার বিষয় হ'য়ে ওঠে। সেইজন্যে একথা ভারতবর্ষ কোনোদিন বলে নি যে, আপন গৃহ আপন প্রভুত্বের স্থান, আপন দুর্গ। সেখানে পদে পদে নানা উপলক্ষ্যে অন্যের অধিকার স্বীকার করতে গিয়ে অর্থের ও সময়ের ক্ষতি হ'লেও কল্যাণের হিসাবে তার হিসাব চলে, স্বার্থের হিসাবে নয়।

ব্যক্তিবিশেষের সুখ-সুবিধার ভিত্তিতেই যদি গৃহের পত্তন হয়, তাহলে গার্হস্থ্যস্বীকার মানুষের আপন ইচ্ছার

উপরেই নির্ভর করে। সে যদি বলে গৃহসুখ চাইনে, স্বাতন্ত্র্যেই আমি সুখ পাই, তাহ'লে তা নিয়ে আপত্তি করবার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু হিন্দুভারতে যেহেতু গার্হস্থ্যই সমাজের আবশ্যক উপাদান, এই জন্যে সেখানে বিবাহ সম্বন্ধে প্রায় জবরদস্তি চলে। সে যেন য়ুরোপীয় যুদ্ধসঙ্কটের আশঙ্কায় সর্ব্বজনীন কন্‌স্ক্রিপ্‌শ্যন্ নীতির মত। গৃহে যে-ব্রাহ্মণ বাস করে অথচ অবিবাহিত, তাকে যে-ব্যক্তি দান করে বা তার দান গ্রহণ করে, ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সে নরকে যায়। অত্রি বলেন, যে-ব্যক্তি বিবাহ না ক'রে গৃহস্থভাবে থাকে, তার অন্ন অভক্ষ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রকার গৃহস্থাশ্রমকে বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করেছেন ; এই গাছের যেমন স্কন্ধ শাখা পল্লব, তেমনি সমাজের সকল অঙ্গই গৃহের প্রাণে প্রাণবান্। শাস্ত্রকার বলছেন, রাজা গৃহস্থাশ্রমীকে যেন সম্মান করেন। যে-মানুষ ঘর বানিয়ে যথেচ্ছা বাস করে, শাস্ত্রমতে সেই যে গৃহী তা নয়।

"গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তো ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী।

ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম্ম পরিবর্জ্জিত :॥"

এখানে কর্ম্ম অর্থে স্বার্থসাধন বোঝায় না, এ হচ্ছে লোক-যাত্রা, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন।

"তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে,

অস্মিন্নেব প্রযুঞ্জানো হ্যস্মিন্নেব প্রলীয়তে।"

দক্ষসংহিতা।

এই সংসারের সঙ্গেই আমাদের যোগ, এই সংসারেই আমাদের লয়, অতএব যখন যা কর্ত্তব্য তখনই তাই করা চাই, সুবিধা হিসাবে কালের বিধান করবে না।

বস্তুত গৃহস্থধর্ম্মপালনকে শাস্ত্রে তপস্যা ব'লেই গণ্য করেন।

বসিষ্ঠ বলেন :—

"গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ

চতুর্ণামাশ্রমাণাস্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে॥"

দেবতার যাজন ও কর্ত্তব্য উপলক্ষে কৃচ্ছ্রসাধন গৃহস্থেরা ক'রে থাকেন, অতএব চার আশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।

গৃহ যে-সমাজে ব্যক্তিবিশেষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের একান্ত আশ্রয়, সেখানে গৃহস্থের বিষয়সম্পত্তিও একান্ত ব্যক্তিগত হয়। কেন না সম্পত্তিই গৃহতন্ত্রের ভিত্তি। এই সম্পত্তি যদি ব্যক্তিগত মানুষেরই ভোগের উপায়রূপে গণ্য হয়, তাহলে এই সম্পত্তিতে সাধারণে আনন্দ পায় না, তা তাদের ঈর্ষ্যারই কারণ হ'য়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এই সম্পত্তি অর্জ্জনে সমাজধর্ম্মের কোনো নৈতিক বাধা থাকে না, প্রতিযোগিতায় বিষ কেবল তীব্র হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে। প্রাচীন ভারতে যে-সম্প্রদায়ের জীবনের লক্ষ্য ছিল জীবিকা সঞ্চয়ের সীমা-বিহিত প্রয়োজন অতিক্রম ক'রে ধনেরই অনুরাগে ধন অর্জ্জন করা, সমাজে তাদের সম্মান কিছুমাত্র ছিল না। এমন কি, আজকের দিনেও সেই বণিকজাতির স্পৃষ্ট জল অশুচি। পাশ্চাত্য সমাজে আজকাল একদল সম্পত্তিকে বিপত্তি জ্ঞান ক'রে, জোর ক'রে তাকে ঝাড় মূলে উপ্‌ড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। কেন না সেখানে বিশ্বমানুষের সঙ্গে বিশেষ মানুষের বিরোধের একটা প্রবল শক্তিই হচ্ছে এই দায়িত্ববিহীন সম্পত্তির শক্তি। সেখানকার পলিটিক্‌স্‌ও এ পর্য্যন্ত এই বিরোধে সম্পত্তিবানের পক্ষে সহায়তা ক'রে এসেছে।

মানুষের অনেক খাদ্য আজ আছে যা গোড়ায় ছিল তিতো, এমন কি বিষাক্ত। মানুষ তাকে ত্যাগ না ক'রে দীর্ঘকাল ভালোরকম চাষের দ্বারা তাকে উপাদেয় স্বাস্থ্যকর ক'রে তুলেছে। ভারতবর্ষ সম্পত্তিকে অস্বীকার করে নি গৃহকে ধর্ম্মক্ষেত্র ব'লে স্বীকার করার দ্বারাই তার বিষ শোধন করে দিলে। বহুশতাব্দী ধ'রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাহায্যেই ভারতবর্ষে সমাজধর্ম্ম টিঁকেছে ; ভারতবর্ষের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গলই এই সম্পত্তির দ্বারাই বাহিত। ধনীর যথেচ্ছাকৃত বদান্যতার উপর সমাজ যখন নির্ভর করে, তখন তাতে দোষ ঘটায়। কারণ, অবিচারে দান গ্রহণ একটা দুর্গতি কিন্তু ভারত-বর্ষে গৃহীর দ্বারা লোকহিত সাধন তার বদান্যতা নয়, সে তার বৈধ কর্ত্তব্য, তাতে তার নিজেরই সার্থকতা। এই

দায়িত্ব কেবল যে ধনীর তা নয়, সাধ্যানুসারে সকল গৃহীরই। শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াকর্ম্মে আপামরসাধারণ সকলকেই সমাজকে নানা রকম টেক্সো দিতে হয়। মনু বলেছেন, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতসকল ও অতিথিরা গৃহীর উপর আশা স্থাপন করে, জ্ঞানী গৃহস্থ সেই বুঝেই কাজ করবেন। এমনি ক'রে বারে বারে নানা আকারেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, বিশ্বজনের যথাবিহিত দাবীরক্ষা করাই গৃহধর্ম্মের লক্ষ্য। সেই জন্যেই মনুর মতে যারা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, তারা এই আশ্রমের অনুষ্ঠান করতে পারে না। প্রবৃত্তির উপরে যার প্রভুত্ব নেই গৃহাশ্রমের সে অযোগ্য।

ভারতবর্ষের বিবাহের তত্ত্ব জানতে হলে ভারতবর্ষের গৃহমূলক সমাজের তত্ত্ব ঠিকমত জানা চাই। তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে, এমন সমাজে বিবাহে নিজের ইচ্ছার পথে চল্‌তে চাইলে বিপদ ঘটে; এখানে বিবাহের বাঁধ বাঁধা থাক্‌লে সমাজের বাঁধ টেঁকে। হিন্দুবিবাহ ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও প্রবৃত্তির স্বাতন্ত্র্যকে খাতির করে না, ভয় করে। কোনো য়ুরোপীয় এই মনোভাবকে যদি বুঝ্‌তে চায়, তবে গত যুদ্ধকালের অবস্থা চিন্তা ক'রে দেখুক। সাধারণত য়ুরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহের বাধা নেই। কিন্তু যুদ্ধের সময় যখন একটিমাত্র উদ্দেশ্যের কাছে মানুষের আর-সমস্ত অভিপ্রায় ছোটো হ'য়ে গেল, তখন শত্রুজাতির মধ্যে বিবাহ অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। এমন কি, পূর্ব্ব হতেই যারা বিবাহে বদ্ধ ছিল তাদের মধ্যে কঠোর-ভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে সমাজের সঙ্কোচ রইল না। এ'র কারণ, য়ুরোপে যুদ্ধরত জাতিদের মধ্যে তৎকালে সমবায়ের ভাব নিবিড় হওয়াতে, কেবল বিবাহ নয়, আহার ব্যবহার সম্বন্ধেও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা সকলকে সমভাবে সঙ্কুচিত হ'য়ে চল্‌তে হয়েছিল। তখন পরস্পরের আচরণের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রায় লোপ পেয়ে গেল। য়ুরোপীয় দেশের সেই অবস্থা অনেকটা পরিমাণে আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় অর্থাৎ এখানে সমস্ত সমাজের একটা সম্মিলিত অভিপ্রায় অত্যন্ত নিবিড়; তাই পালন করাকেই যদি ধর্ম্ম ব'লে স্বীকার করতে হয়, তবে ব্যক্তিগত মানুষের স্বভাবদত্ত প্রবৃত্তিগুলিকে পদে পদেই সম্বরণ করা চাই। ভারতবর্ষে মানবসভ্যতাকে বিশুদ্ধ রাখবার সমস্যার এই ভাবেই সমাধান হওয়াতে সকলের কাছেই এখানকার সমাজ নানাদিক থেকেই, বিশেষত বিবাহ সম্বন্ধে, ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের খর্ব্বতা কঠোরভাবে দাবী করেছে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা রয়ে গেল। কারণ এই সমাজ ভারতবর্ষে একমাত্র সমাজ নয়—নানা প্রকারের ভিন্ন আচার ব্যবহারের দ্বারা এই সমাজ চারিদিকে বেষ্টিত। তাদের আক্রমণ থেকে নিজের সত্তাকে রক্ষা করবার জন্যে এ'কে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়েছে। এইজন্যে এ সমাজ সর্ব্বদাই গড়ের মধ্যে বাস করে। এইজন্যে আত্মপরের ভেদ ও বিরোধ সম্বন্ধে এ-সমাজ এত অতিমাত্রায় সসঙ্কোচ-ভাবে সচেতন। অন্য কোনো সভ্যদেশে হিন্দুসমাজের মতো অবস্থা কোনো সমাজের নেই। এই জন্যে সে সকল সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এতদূর খর্ব্বতা ঘটেনি। আমাদের সমাজে এই খর্ব্বতা খাওয়া-ছোঁওয়া প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে—সকলের চেয়ে বেশি বিবাহে,—কারণ বিবাহ গৃহবন্ধনের মূলে, এবং গৃহই আমাদের সমাজের মূলভূত। যাই হোক, আমাদের সমাজকে ঠিকমত বিচার করতে হ'লে বোঝা চাই যে, এ সমাজে যুদ্ধের অবস্থার বিরাম নেই, এবং এই অবস্থা বহুযুগ হ'তে চলে আস্‌ছে। এই যুদ্ধের দুর্গ হচ্ছে গৃহ, এই যুদ্ধের যোদ্ধা হচ্ছে গৃহী।

ভারতবর্ষে সমাজের এই অভিব্যক্তি একদিনেই হয় নি। তাকে অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পরিণামের ভিতর দিয়ে যে'তে হয়েছে। পূর্ব্ব ইতিহাসের সেই সকল পরিশিষ্ট অনেকদিন পর্য্যন্ত নূতন কালেও সজীব ছিল। সেই জন্যে গান্ধর্ব্ব রাক্ষস আসুর পৈশাচ বিবাহকেও মনু তাঁর সমাজবিধির মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সকল বিবাহে সামাজিক ইচ্ছা নয়, ব্যক্তিগত মানুষের ইচ্ছাই প্রবল। কন্যাকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া আসুর

বিবাহ, তাকে বলপূর্ব্বক হরণ করা রাক্ষস বিবাহ। সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়া পৈশাচ বিবাহ। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইগুলোকে অগত্যা স্বীকার ক'রেও নিন্দা করা হয়েছে। কেন না অর্থবল বা বাহুবল, বা রিপুর বল স্বভাবতই উদ্ধত, তা' পরের বিধি মান্‌তে চায় না।

গান্ধর্ব্ব-বিবাহও নিন্দিত, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত এ'র স্থান ভারতবর্ষীয় সমাজে প্রশস্ত ছিল, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে সাহিত্যে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থিতিশীল সমাজের স্থিতিধর্ম্ম সেই সমাজের সকল শ্রেণীর পক্ষেই সমান প্রবল হ'তে পারে না। স্বভাবতই ক্ষাত্রধর্ম্মে নিবৃত্তির চর্চ্চাকে একান্ত ক'রে তোলা সহজ নয়। যে-ক্ষত্রিয় নব নব ক্ষেত্রে আপন চঞ্চল শক্তির সাধনা করতে ছোটে, তাকে স্থাবর গার্হস্থ্যনীতির জটিল জালে একান্ত বেঁধে রাখা অসম্ভব। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সমুদ্রপারে যেতে নিষেধ, তার কারণই এই। সমাজকে অচল বিধিতে বাঁধবার জন্যেই সমাজের মানুষকেও সে অচল ক'রে রাখ্‌তে চেয়েছে। কারণ, যে চলাতে মনকে চঞ্চল করতে পারে, যাতে আমাদের চিন্তার, বিশ্বাসের ও ব্যবহারের অভ্যাস কিছুমাত্র ন'ড়ে যায় তাতে আমাদের সমাজের একেবারে ভিতে গিয়ে ঘা মারে। শুধু সমুদ্রযাত্রা নয়, ম্লেচ্ছ দেশে বাসও নিষিদ্ধ ও সমাজে দণ্ডনীয় ছিল। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে দেখ্‌তে পাই, বলশেভিক মতকে স্বদেশের মন থেকে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার জন্যে নানাপ্রকার বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ জিনিষটা সমুদ্রযাত্রা নিষেধের সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ এখনকার কালে যে-নীতিকে রাষ্ট্রস্থিতির প্রতিকূল ব'লে গণ্য করা হয় তার সম্পর্ক তিরস্কৃত রাখবার অভিপ্রায়ে কঠিন শাসন চল্‌ছে। এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মতের বা আচরণের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হচ্ছে না। আমাদের দেশে রাজনিষিদ্ধ সাহিত্য এই শ্রেণীর। আজকের দিনে ফ্যাসিজম নামে যে একটি পীড়নশক্তি পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রবল হ'য়ে উঠেছে, সে হচ্ছে আমাদের সমাজপ্রচলিত নিষেধ-নীতির প্রতিরূপ। ব্রাহ্মণের পন্থা নেবার স্পর্দ্ধা শূদ্র যদি করত তবে একদা ভারতে নিষ্ঠুরভাবে তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। পাশ্চাত্য দেশে ফ্যাসিজম্, কু ক্লুক্স্-ক্যানিজম্, লিঞ্চিং প্রভৃতি নানাপ্রকার নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্যবিধিতে সেই মনোবৃত্তিরই আদর্শ দেখ্‌তে পাই। সমাজে সকল লোকেরই মনোভাব ও আচরণ কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে অবিকল একই রকম হ'লে তাতে ব্যক্তিগত মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্র বিকাশের বাধা দিতে পারে কিন্তু সমাজের স্থিরত্বপক্ষে সেটা যে অনুকূল তাতে সন্দেহ নেই। যে সমাজে চলিষ্ণুতাকে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে না সে সমাজে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, রুচি ও বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যকে কঠোরভাবে দমন করা হয় না। যে-সমাজ গাছের মতো নয় মন্দিরের মতো, অবৃদ্ধিশীল স্থাবরতাই যার সম্পদ, তার একখানি ইটও নড়্‌তে দিলে সেটা ক্ষতি।

কিন্তু এই নিশ্চলতার কঠোর বন্ধনে সমাজের সব মানুষকে সমভাবে বেঁধে রাখা যায় না; সেটা মানবধর্ম্মের বিরোধী, প্রাণধর্ম্মের প্রতিকূল। সেইজন্যে কোনো দেশে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণশক্তি সবল থাকে ততক্ষণ প্রাণের চঞ্চলতা নিশ্চল নিষেধগুলিকে নিয়ত আঘাত না ক'রে থাক্‌তে পারে না। এ দেশে ক্ষত্রিয়েরা যখন যথার্থভাবেই ক্ষত্রিয় ছিলেন তখন নিত্যনৈমিত্তিক নীতিপালনের অভ্যাসে তাঁদের শক্ত ক'রে বেঁধে রাখা সম্ভব ছিল না। তাই তখনকার কালে ভারতইতিহাসে ধর্ম্মবিপ্লব সমাজবিপ্লব যা-কিছু ঘটেছে তা ক্ষত্রিয়দের দ্বারা। এ-কথা মনে রাখ্‌তে হবে, বুদ্ধ ছিলেন ক্ষত্রিয়, মহাবীর ছিলেন ক্ষত্রিয়, কৃষ্ণ যে-যদুবংশের লোক ছিলেন সে-বংশের রীতিনীতি একেবারেই সাধুশাস্ত্রসম্মত ছিল না। সমস্ত মহাভারত পড়্‌লে বারেবারেই এ কথা মনে আসে যে, সেই প্রাচীনকালে সমাজের পাকা বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা যতই থাক্ তাকে নানা-প্রকারে লঙ্ঘন না করেছে এমন বিখ্যাত বংশ একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। একদিন অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে যখন ভারতে ক্ষত্রিয়ের অভিভব হ'য়ে ব্রাহ্মণই সমাজে প্রায় একেশ্বরতা লাভ করেছে, তখন সমাজবন্ধন এমন কঠিন

দৃঢ় হ'য়ে উঠতে পেরেছে। প্রাচীনকালে ভারতে স্থিতিশীল সমাজের ক্ষেত্রের মাঝখান দিয়েই গতিশীল প্রাণের ধারা প্রবাহিত হবার একান্ত বাধা ঘটে নি। এই জন্যে তখন নানা উপলক্ষ্যেই ধর্ম্মশাস্ত্রকে বল্‌তে হয়েছে, "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"।

মনু বলেছেন, বরকন্যার পরস্পর ইচ্ছাসংযোগে বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। কিন্তু তাকে কামসম্ভব ব'লে তিনি একটু খোঁটা দিয়েছেন। কামনার দীপ্ত মশাল যে-বিবাহে পথ দেখায়, সে-বিবাহের মুখ্য লক্ষ্য সমাজবিধি-রক্ষা নয়, প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। এমন কি, অপেক্ষাকৃত শিথিলবন্ধন য়ুরোপীয় সমাজেও নরনারীর দ্বন্দ্ব-সংঘটনে কামনার বেগে মানুষকে পদে পদে যে অসামাজিক সঙ্কটে নিয়ে যায় তা সকলের জানা আছে। কিন্তু সেখানকার সমাজ অনেকটা চলিষ্ণু ব'লেই এ-রকম সঙ্কট সমাজের পক্ষে আমাদের দেশের মতো একেবারে সাংঘাতিক হয় না। আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্ম বিবাই শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য। এই বিবাহের রীতি অনুসারে কন্যাকে বর প্রার্থনা করবে না, অযাচক বরকে কন্যাদান করতে হবে। বর যে কন্যাকে নিজে প্রার্থনা করে তার সামাজিক উপযোগিতাকে সে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারে না। অতএব বিবাহ অনুষ্ঠানকে সামাজিক হিসাবে যদি বিশুদ্ধ রাখ্‌তে হয়, তবে বর-কন্যার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সতর্কভাবে বাঁচিয়ে চল্‌তেই হবে। য়ুরোপে রাজকুলে বিবাহে যেরকম কঠিন ও সঙ্কীর্ণ নিয়ম আমাদের সমাজে সর্ব্বত্রই তাই।

ভারতবর্ষে বিবাহরীতির মূলে যে মনোভাবটি আছে কোনো য়ুরোপীয় যদি তা স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে চান তাহলে পাশ্চাত্যে আজকাল সৌজাত্য নিয়ে (Eugenics) যে আলোচনা চলছে সেইটে বিচার করে দেখ্‌লে সুবিধা হ'তে পারে। বিজ্ঞান ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে যথেষ্ট আমল দিতে চায় না। বিবাহে সুসন্তান হ'বে এই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে কামনা-প্রবর্ত্তিত পথকে নিষ্ঠুরভাবে বাধা না দিলে চলে না। বিজ্ঞান বলে, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যেখানে কোনো বংশসঞ্চারী দৈহিক রোগ বা মানসিক বিকার আছে সেখানে রাজদণ্ডের বা সমাজশাসনের সাহায্যে বিবাহকে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। একথা স্বীকার করলেই বিবাহকে ভাবাবেগের টান থেকে সরিয়ে এনে বুদ্ধির এলেকায় দাঁড় করাতে হয়। কেন না ভাবাবেগকে এ'র মধ্যে স্থান দিতে গেলেই সমস্যা কঠিন হ'য়ে ওঠে। ফলাফল বিচার করতে সে চায় না; বিচারকের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ সর্ব্বদাই অনিবার্য্য ভারতবর্ষ নির্ম্মম-ভাবেই তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

য়ুরোপীয় সমাজের মূলপ্রকৃতি রাষ্ট্রিক, আর্থিক; তার আকার আয়তন ও প্রভাব যতই বৃহৎ ও প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে ততই তার প্রয়োজনের কাছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়ে চল্‌তে হবে। তার নানা লক্ষণ সেখানে দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশে সমাজের মূলপ্রকৃতি সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ শ্রেণীবিশেষের আচারধারাকে রক্ষা করার দ্বারা তার ধর্ম্মকে (culture) বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাতন্ত্র। এই ব্যবস্থার প্রয়োজন একদা অত্যন্ত বলবান হওয়াতে তার কাছে ব্যক্তিগত বিচার ও ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যকে এ দেশে অত্যন্ত খর্ব্ব করা হয়েছে। আমাদের দেশের সমাজনীতি ও বিবাহরীতি আলোচনা করবার সময় আমাদের দেশের এই সামাজিক সমস্যার কথা বাহিরের লোকের চিন্তা ক'রে দেখা দরকার।

পূর্ব্বেই বলেছি, ক্ষত্রিয়েরা বিবাহে কড়া নিয়মের শাসন তেমন ক'রে মানেন নি। কিন্তু সেই না-মানাটা সমস্ত সমাজের আদর্শকে-যে পীড়া দিত, তা কালিদাসের কাব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। সমাজনীতি রক্ষার উদ্দেশে ভারতবর্ষের বিবাহ যে-সৌজাত্যের প্রতি লক্ষ্য করত, তার সম্বন্ধে কবির বিশেষ বেদনা ছিল সন্দেহ নেই। অথচ বিশ্বের লীলাময়ী প্রাণ-প্রকৃতির মাঝখানে নরনারীর স্বাভাবিক প্রেমচাঞ্চল্যের সৌন্দর্য্য-বিকাশও কবির চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। কালিদাসের প্রায় সকল বড় কাব্যেরই মধ্যে এই দ্বন্দ্ব। ভরতবংশের জন্ম ভারত ইতিহাসের একটা প্রধান ঘটনা, অথচ এই বংশের আদিতে প্রবৃত্তির

আকর্ষণে স্ত্রীপুরুষের যে-আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল কবি তাঁর নাটকে তার বৃত্তান্তকে সৌন্দর্য্যদৃষ্টিতে স্বীকার ক'রেও অবশেষে কল্যাণদৃষ্টিতে শোধন ক'রে নিয়েছিলেন। তপোবনে অরণ্যের সহজশোভার মধ্যে শকুন্তলা সেখানকার তরুলতার সঙ্গে সঙ্গেই নবযৌবনে দেহে মনে হিল্লোলিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। সেখানে প্রকৃতির ইঙ্গিত সব জায়গাতেই, সমাজশাসন তখনো তার তর্জ্জনী তোলবার অবকাশ পায় নি। এই অবস্থায় দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার যে-মিলন ঘটেছিল, সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ঘট্‌তে পায় নি। কবি বললেন সেই কারণে এ'র মধ্যে একটা অভিশাপ র'য়ে গেল। সে হচ্ছে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আত্ম-বিস্মৃতির প্রতি অভিশাপ। শকুন্তলা আতিথ্যধর্ম্ম পালন করতে ভুলে গেলেন; তার কারণ, প্রকৃতি যখন আপন উদ্দেশ্য সাধনে লাগে তখন সমাজের উদ্দেশ্যকে খাটো ক'রে দেয়। এইখানে বাধ্‌ল জৈব ধর্ম্মের সঙ্গে মানবধর্ম্মের বিরোধ। রাজসভায় শকুন্তলার প্রেমের উপর অপমানের বজ্র এসে পড়্‌ল; তার যে বাঁচবার পথ ছিল না।

সপ্তমাঙ্কে যে-তপোবনে রাজার সঙ্গে তপস্বী কন্থার স্বামী মিলন ঘট্‌ল, সেখানে প্রকৃতির প্রাণলীলাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে কবি তপস্যার কঠোর মূর্ত্তিকেই সর্ব্বত্র প্রকাশ করলেন। সেখানে মহর্ষি তখন পতিব্রতধর্ম্ম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত। শকুন্তলা সেখানে ব্রতধারিণী জননী মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নরনারীর মিলনের দুই বিরুদ্ধ মূর্ত্তিকে কবি এই নাটকে উজ্জ্বল ক'রে দেখিয়েছেন। ভরতজন্মের ভূমিকাটিকে তিনি তপস্যার অগ্নিদাহনে শুচি ক'রে দিয়ে বলেচেন প্রেমের এইত চরিতার্থতা। কেন না জৈব প্রকৃতি যখন প্রেমের সারথ্য নেয় তখন সে যে প্রবৃত্তির জোয়ালে তাকে বাঁধে। কিন্তু ধর্ম্ম যখন তার চালক হয়, তখন সে-প্রেম মুক্তরূপে প্রকাশ পায়। নিবৃত্তিশান্ত আত্মত্যাগরত প্রেমের সেই অচঞ্চল মুক্ত স্বরূপই পরমসুন্দর। কবি এই কথাটিকে শাস্ত্র উপদেশের আকারে ব্যাখ্যা করেন নি, তিনি সুন্দরের সংযত গম্ভীর কঠোর নির্ম্মল মূর্ত্তিটিকে মোহ আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে তাঁর নাটকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

মাতৃত্বের যে অংশ শরীরগত এবং সন্তানপালনের সঙ্গে জড়িত, মোটের উপরে সেটা ইতর প্রাণীদের সঙ্গে অভিন্ন। সেটা সাধারণ জীবসৃষ্টির পর্য্যায়ভুক্ত, তাতে মানুষের সৃষ্টি-শক্তির স্বকর্তৃত্ব নেই, তাতে প্রকৃতির দূত প্রবৃত্তিরই শাসন। কিন্তু মাতা যখন ভাবী কুমারের জন্যে তপস্যা করেন, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করে' শরীরের ক্রিয়ার উপর মন ও আত্মার কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন তখনই সেটা যথার্থ তাঁর সৃষ্টিশক্তির অধীন হয়। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে অনেক সময়ে দেখা যায় মেয়েরা মাতৃত্বের মধ্যে হীনতা অনুভব করে, অর্থাৎ মেয়েদের উপর প্রকৃতির জবরদস্তিকে তারা অপমানকর বলেই জানে। কিন্তু এই অপমান থেকে রক্ষা পাবার উপায় মাতৃত্বকে পরিহার করে নয়, মাতৃত্বকে আপন কল্যাণ অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গত করে তাকে আত্ম-শক্তির দ্বারা নিয়মিত করা। প্রচীন ভারতে সুসন্তান লাভের সেইরূপ একটি সাধনা ছিল, তা যথেচ্ছাকৃত ব্যাপার ছিল না। সেই সাধনা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নিয়মসঙ্গত কি না সে প্রশ্ন বিশেষভাবে জিজ্ঞাস্য নয়,—কিন্তু এই আত্মসংযত মানসিক সাধনার দ্বারাই মানবমাতা আপন মর্য্যাদা লাভ করেন এইটেই বড় কথা। কালিদাসের কয়টি কাব্যের মধ্যে সেই মর্য্যাদার গৌরব বর্ণিত দেখি।

তাঁর কুমারসম্ভবেও এই একই কথা। সে কাব্যে কবি নরনারীর চিরকালীন প্রেমের পবিত্র দৈবস্বরূপ দেখিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই যে, যখন দৈত্য জয়ী হয়, দেবতার পরাভব ঘটে, তখন নরনারীর প্রেম তপস্যারূপে স্বর্গকে উদ্ধার করে। সংসারে পাপবিজয়ী কুমারের জন্মই দেবতাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার। সেই কুমারকে আন্‌তে গেলে কামনার উদ্দাম বেগকে নিরস্ত ক'রে দিয়ে নিবৃত্তিপূত সাধনাকে আশ্রয় করতে হবে। সিদ্ধির সেই কঠোররূপই যথার্থ সুন্দর; শিব রূপবান নন্ ব'লে যখন উমার কাছে তাঁর নিন্দা করা হয়েছিল তখন

উমা এই ভাবেই তার উত্তর দিয়েছিলেন। মোহের সৌন্দর্য্যকে বসন্তপুষ্পাভরণে আস্‌তে হয় কিন্তু মুক্তির সৌন্দর্য্য নিরাভরণ।

যাই হোক্, কালিদাসের রঘুবংশই হোক্, কুমারসম্ভবই হোক্ আর ভরতজন্মের আখ্যানমূলক অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকই হোক্, তিনের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধে ভারতীয় কবির মনের কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। বিবাহকে তিনি তপস্যা বলেছেন;—এই তপস্যার পন্থা কিম্বা এ'র লক্ষ্য আত্মসুখভোগ নয়। এ'র পন্থা হচ্ছে কামনাদমন এবং এ'র লক্ষ্য হচ্ছে কুমারসম্ভব, যে-কুমার সমস্ত কু, সমস্ত মন্দকে মারবে, স্বর্গরাজ্যকে ব্যাঘাতশূন্য ক'রে দেবে।

কালিদাসের এই তিন কাব্যেরই ভিতরকার বেদনা দে'খে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর সময়ে ক্ষত্রিয় রাজারা বিবাহে সংযত আর্য্য আদর্শ লঙ্ঘন ক'রে কামনার অনুসরণে সমাজে অপজনন (Degeneracy) ঘটাচ্ছিলেন। এই সর্ব্বনেশে ব্যাঘাতকে দূর করবার জন্যে শিবের জ্ঞাননেত্রের ক্রোধাগ্নির প্রয়োজন হয়েছিল। নইলে সমাজকে দৈত্য-রাজকতা থেকে বাঁচাবার উপায় ছিল না। তাই কবি বিবাহকে কন্দর্পের শাসন থেকে উদ্ধার ক'রে শিবের তপোবনে আহ্বান ক'রে আন্‌তে চেয়েছিলেন।

যাই হোক্, কবির এই কাব্যগুলি থেকে ভারতীয় বিবাহের যথার্থ আদর্শ যেমন বোঝা যায় এমন কোনো ধর্ম্ম-শাস্ত্র থেকে নয়। এ'তে তিনি প্রবৃত্তির আকর্ষণের সঙ্গে ধর্ম্মের দাবীর সংগ্রাম দেখিয়েছেন। প্রকৃতির প্রাণলীলার মধ্যে যে-সৌন্দর্য্য আছে, তাকে তিনি একটুও খাটো করেন নি, কিন্তু মানুষের তপস্যার মহিমাকে তার উপরেও জয়ী ক'রে প্রকাশ করেছেন। কেন না, মানুষকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে হবে, সেই মুক্তির শরীরীরূপ হচ্ছে কুমার—কুমারই মুক্তিসংগ্রামের বিজয়ী বীর; সমাজকে পাপ থেকে, পরাভব থেকে সে রক্ষা করে।

এইখানে প্রশ্ন ওঠে, বিবাহ থেকে ইচ্ছাকে যদি সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করা হয়, তা হলে দাম্পত্যের মধ্যে প্রেমের স্থান হয় কি ক'রে? এ দেশের সঙ্গে যাদের যথার্থ পরিচয় নেই এবং যাদের বিবাহপ্রথা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরূপ তারা গোড়াতেই ধ'রে নেয় যে, আমাদের বিবাহ প্রেমহীন। কিন্তু সেই ধারণা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা আমরা প্রত্যক্ষ জানি। খাঁটি প্রেম নরনারীর স্বেচ্ছাসম্মত বিবাহেও-যে সুলভ নয়, তার অনেক প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া যায়। বিবাহকে যদি মান্‌তে হয়, তবে একথাও স্বীকার কর্‌তে হবে যে, মানুষ এমন কোনো ব্যবস্থাই কর্‌তে পারে না, যা'তে বিবাহের পূর্ব্বে যা স্থির করা যায়, স্ত্রীপুরুষের সুদীর্ঘ বিবাহিত কালে তা' অক্ষুণ্ণ সত্য হ'য়ে টি'ক্‌তে পারে। এই জন্যেই বাইরের দিক থেকে এত লোকলজ্জা, এত আইনের শাসন। অথচ যে-সম্বন্ধ পরস্পর প্রেমের উপরেই সত্য, যখনই তাকে বাহিরের বাঁধনে জোর ক'রে বাঁধা যায়, তা অত্যন্ত অশুচি হয়, তার মত দুঃখ অপমান মানুষের পক্ষে আর কিছুই নেই। সন্তানের দায়িত্ব চিন্তা ক'রে মানুষ এ সমস্তই স্বীকার করে কিন্তু আজো কোনো সমাজই বল্‌তে পারে নি যে বিবাহ-সমস্যার নির্দ্দোষ সমাধান সে করেছে। সর্ব্বত্রই অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে, তারপরে আকস্মিক সুযোগ দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে হয় তলায় তলানো, নয় ঘাটে পৌঁছনো হ'য়ে থাকে।

এই সমস্যার সমাধান চিন্তা করতে গিয়ে ভারতবর্ষ বলেছে বিবাহের গোড়াতেই ইচ্ছার বেগকে স্বীকার না করাই নিরাপদ। কেননা ইচ্ছা কল্যাণ বিচার কর্‌তে অসমর্থ। তা হ'তে পারে, কিন্তু যে-ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই সেটা যে প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সৈনিক। যখন সে অস্ত্র উদ্যত করে তখন তাকে ঠেকাবে কে? ভারত বলেছে, যে-ইচ্ছা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব ঘটায় তার একটা বিশেষ বয়স আছে। অতএব যদি বিবাহকে সমাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুমত করাই শ্রেয় হয়, তবে সেই বয়সের পূর্ব্বেই বিবাহ চুকিয়ে দেওয়া ভালো। ভারতে অল্প বয়সে বিবাহের মূল কারণই হচ্ছে এই।

মনে আছে কোনো একজন কৃষিতত্ত্বজ্ঞের কাছে

যখন আক্ষেপ ক'রে বলেছিলুম, যে আমাদের দেশে সাধারণ গোচারণ ভূমি প্রত্যহ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসাতেই গো-জাতির অবনতি হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন, মাঠে স্বেচ্ছা-চারণের দ্বারাই গোরু উপযুক্ত খাদ্য পায়, এটা কল্পনা করা ভুল। প্রয়োজনমত বিশেষ খাদ্য চাষ ক'রে সেইটে গোরুকে খাওয়ানোই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসঙ্গত। দাম্পত্য-প্রেম সম্বন্ধে সেইভাবেই আমাদের দেশে তর্ক উঠেছিল। আমাদের দেশ বলেছিল স্বেচ্ছা-উদ্গত প্রেমের উপর ভরসা নেই, প্রেমের চাষ করতে হ'বে। তার আয়োজন হ'য়ে থাকে বিবাহের পূর্ব্ব থেকেই। স্বামী ব'লে একটি ভাবকে শিশুকাল হতেই বালিকারা ভক্তি করতে শেখে। নানা কথা কাহিনী ব্রত পূজার ভিতর দিয়ে এই ভক্তিকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে স্বামীকে যখন পায় তখন তাকে তারা ব্যক্তি ব'লে নয় স্বামী ব'লে দেখে। সেই স্বামী অনেকখানিই তাদের নিজেরই মনের জিনিষ, বাইরের জিনিষ নয়। বিচার বুদ্ধি পরিণত হবার পূর্ব্ব হতেই অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপরে এই স্বামীভাব আরোপ ক'রে দিনে দিনে এই পতিগত সংস্কার তাদের দেহমনকে অধিকার ক'রে তোলে। নানা প্রকার সেবা ও ব্যবহারের দ্বারা এই সংস্কার কেবলি প্রবল হ'তে থাকে।

আমাদের সমাজে সতী স্ত্রীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও একটা সংস্কারের প্রচলন আছে। স্ত্রীর প্রতি সাধ্বী গৃহিণীভাবে একটি ভক্তিভাবের চর্চ্চা আমাদের দেশে দেখা যায়। অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের প্রেম ব'লে যে একটি স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আছে তা'কে অতিক্রম ক'রে দাম্পত্য-প্রেম নামক একটি সামাজিক হৃদয়বৃত্তিকে সাধনার দ্বারা গ'ড়ে তোলবার বিশেষ চেষ্টা আমাদের দেশে আছে। কিন্তু একথা মানতেই হ'বে যে, মেয়েদের স্বভাব হৃদয়-প্রবণ (Emotional) ব'লে এই দাম্পত্যপ্রেম মেয়েদের পক্ষে যত সহজ হয়েছে, পুরুষের পক্ষে তত সহজ হয় নি। পুরুষের পক্ষে দাম্পত্য একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সমাজের কিঞ্চিৎ অনুমোদন আছে, কিছুমাত্র অনুশাসন নেই। এমন কি, স্ত্রীর বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে এই একনিষ্ঠতা লঙ্ঘনের পক্ষে বিশেষ বিধিরও অভাব দেখিনে। তা ছাড়া অবৈধ লঙ্ঘনকে শাসন করবার সামান্য চেষ্টা মাত্রও দেখা যায় না। বস্তুত একপক্ষে দাবীকে অত্যন্ত বেশি কড়া করার দ্বারাই অন্যপক্ষে শিথিলতাকে সহজ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

অতএব ভারতীয় বিবাহের বিচার করতে হ'লে একথা জানা চাই যে এ-বিবাহে স্ত্রী পুরুষের অধিকারের সাম্য নেই। এখানে অধিকার বলতে আমি বাহ্য অধিকারের কথা বল্‌ছি নে। এই অসাম্যের দ্বারা স্ত্রীলোকের চরিত্রে হীনতা ঘট্‌তে পারত। তা যে ঘটেনি তার কারণ, স্বামী তার পক্ষে আইডিয়া। ব্যক্তির কাছে পাশববলে সে নত হয় না, আইডিয়ার কাছে ধর্ম্মবলে সে আত্মসমর্পণ করে। স্বামী যদি মানুষের মতো হয়, তা হলে স্ত্রীর এই আইডিয়াল প্রেমের শিখা তার চিত্তেও সহজে সঞ্চারিত হয়। আমরা এমন দৃশ্য দেখেছি। এই আইডিয়াল প্রেম হচ্ছে যথার্থ মুক্ত প্রেম। এ প্রেম প্রকৃতির মোহবন্ধনকে উপেক্ষা করে।

একথা মনে রাখা চাই, ভারতসমাজ গৃহকেও চরম ব'লে স্বীকার করে নি। মুক্তির অন্বেষণে একদিন গৃহকে পরিত্যাগ করতে হ'বে, এই ছিল তার উপদেশ। ভারতের উদ্দেশ্য ছিল গৃহকে মুক্তিপথের সোপান ক'রে গড়া। সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে আজও আমাদের দেশে অনেক গৃহী গৃহ ছেড়ে তীর্থে বাস করে। ভারত সভ্যতার মূলে এই একটা স্বতোবিরোধ আছে। একদিকে এ-সভ্যতা গৃহপ্রধান, এবং এই গৃহ মানুষের সঙ্গে আপন সম্বন্ধ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে স্বীকার করে। ভারত আবার আর একদিকে আত্মার মুক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে সকল সম্বন্ধই একে একে ছিন্ন করতে বলে। সম্বন্ধকে স্বীকার করতে বলবার কারণ এই যে, তার মধ্য দিয়ে না গেলে তাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। মানুষের মনে যে সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে তাদের ক্ষয় করতে গেলেও তাদের ব্যবহার করতে হয়। এই ব্যবহারকে নিবৃত্তির দ্বারা নিয়মিত ক'রে তবে

প্রকৃতির বন্ধনগুলিকে একদিন কাটানো সম্ভবপর হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এই তফাৎ। প্রকৃতির শাসন সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম গোড়া থেকেই একেবারে নৈরাজ্যপন্থী anarchist।

ভারতসমাজের মুস্কিল এই যে, চারিদিক থেকে অতি যত্নে রক্ষিত না হ'লে এ সমাজ বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে। কারণ এসমাজ বিচারকে শ্রদ্ধা করতে সাহস করে নি; আচারকেই একান্তভাবে অবলম্বন করেছে; প্রধানত এ'র বন্ধন আভ্যন্তরিক স্নায়ু শিরার নয়, বাহ্যিক জোড়াতাড়ার। এই জন্যেই নড়াচড়ার সম্বন্ধে এ'র এত বেশি সতর্কতা। বাহিরের বন্ধনের গ্রন্থি পাছে বাহিরের একটুমাত্র আঘাতে খু'লে যায় এইজন্যেই বাহিরকে সে এত বেশি ভয় করে। এই সতর্কতা আর তো খাটে না। সমুদ্রের এ পারের লোককে ওপারে যেতে আটকানো যায় কিন্তু ওপারের লোক যখন এপারে এসে পড়ে তখন কি করা যাবে? নূতন শিক্ষা নূতন মত, নূতন অভ্যাস বাঁধ ভাঙা বন্যার মত ভারতের উপর আছড়ে পড়েছে। যে-সব বিশ্বাস ছিল তার সমাজের স্তম্ভ, সে-সব বিশ্বাসে প্রতিদিনই ছোট-বড় ছিদ্র দেখা দিচ্ছে। মত বিশ্বাসের এই পরিবর্ত্তন হ'ল ভিতরকার কথা, কিন্তু বাইরের দিকের প্রবল আক্রমণটা আর্থিক। অন্নস্বচ্ছলতা না থাকলে বহুলসম্বন্ধ-বিশিষ্ট সমাজের নিয়ম কখনই পালিত হ'তে পারে না। পর-সমাজের মত-বিশ্বাসের স্রোত যেমন নিয়তই আমাদের চিত্তের উপর এ'সে পড়েছে, আমাদের অন্নের স্রোতও তেমনি নানা শাখায় পর-দেশের দিকে ছুটেছে। এখন এদেশের মানুষ খুব কড়াকড় ক'রেই ব্যক্তিগত স্বার্থের বিচার করতে বাধ্য হল। প্রত্যেক গৃহের সামাজিক পরিধি দিনে দিনে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসছে। তাই একদিন এ সমাজে যেসকল মনোভাবচর্চ্চার বিচিত্র অবকাশ ছিল, এখন তা না থাকাতে সে সকল মনোভাব নির্জ্জীব প্রায়। অথচ সমাজের কাঠামো এখনো সম্পূর্ণ বদলে যে'তে পারে নি। সেই জন্যে আজকাল আমরা সমাজের সমস্ত বাধাকেই বহন করছি, অথচ লক্ষ্যকে স্বীকার করতে পারছি নে। এই কারণে এই প্রভূতবাধাগ্রস্ত সমাজে মানুষের পরাভবের আর অন্ত নেই। আমাদের পরিবারবন্ধন সকলের চেয়ে সাংঘাতিক বন্ধন হ'য়ে উঠেছে। তার বহু বিচিত্র জটিল জালে মানুষকে বিশ্বক্ষেত্র থেকে সে নিরস্ত ক'রে জড়িয়ে রেখেছে। আমরা যতই বেশি পারিবারিক হয়ে উঠছি ততই বিশ্বব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছি। কেন না, আজকালকার দিনে যারা নিছক ঘরের ছেলে, তারা কেবলি হ'টে যাবে। আমরা একদিন ঘর ছাড়ব ব'লেই ঘর ফেঁদেছিলুম। আজ আমরা আর সমস্তই ছেড়েছি কেবল ঘরখানাই আছে। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় যারা, তারা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্যেই শক্তি সঞ্চয় করে, অবশেষে তাদের শক্তিই তাদের স্বাতন্ত্র্যের ঘাড়ে চেপে বসে। আমাদের দেশে তাই ঘটেছে, আমরা মুক্তির প্রেমে বন্ধনকে মেনেছিলুন, আজ বন্ধনের প্রেমে মুক্তিকে খুইয়ে বসেছি।

যে নদী গভীর সেই নদীই নৌবাহ্য (navigable) তার গভীরতাই তাকে উত্তীর্ণ হ'বার আনুকূল্য করে। কিন্তু পার হ'বার সব ব্যবস্থা যদি রহিত হয়, তাহ'লে এই গভীরতাই দুস্তর হ'য়ে ওঠে। গৃহকে যখন পার হ'য়ে যাবার কথা ছিল তখন গার্হস্থ্যের উদার গভীরতাই আনুকূল্য করত কিন্তু আজ যখন পারের খেয়া বন্ধ তখন এই গভীরতা মানুষকে গ্রাস করছে, তাকে ত্রাণ করছে না। তার আশা আকাঙ্ক্ষা শক্তিকে নিজের তলায় তলিয়ে দিচ্ছে। এককালে ভারতের তপস্বী ছিল গৃহী, কারণ গৃহ তখন মুক্তিপথের চরম বাধা ছিল না, আজকালকার দিনে ভারতে কোনো বড় তপস্যা গ্রহণ করতে গেলে গৃহত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই, কারণ গৃহ একটা গর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। আজ ভারতের দুর্গতির প্রধান কারণ তার গৃহধর্ম্মের গভীরতা। অর্থাৎ গৃহের সেই প্রবল ও বিচিত্র দাবী যাতে মানুষের সকল শক্তিকে আশাকে তলার দিকেই নিয়ে যায় ঘাটের দিকে না। এই গার্হস্থ্যের আবর্ত্তে প্রতিদিন ভারতের বড় বড় নৌকাডুবি চলছে, এই আমাদের সকলের চেয়ে দুঃসহ ট্রাজেডি। উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য ক'রে তোলার মানেই হচ্ছে ছোটোকে বড়

ক'রে তোলা। পথকে আলয় করে যে, তার মত দরিদ্র আর নেই। বিশ্বকেই স্বীকার করবার অনুশীলনক্ষেত্র ছিল যখন গৃহ, তখন গৃহের দাবী মানুষকে ছোটো করে নি। আজ হিন্দুসমাজে সেই দাবী নিজের দিকেই অত্যন্ত বড় হ'য়ে উঠেছে ব'লে মানুষকে অত্যন্ত ছোটো করছে। আমাদের যে-ত্যাগ বিশ্ববিধাতার প্রাপ্য প্রতিমুহূর্ত্তে সেই ত্যাগ গৃহের উপদেবতা চুরি করছে; এই চুরি স্বীকার ক'রে যারা স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে অভ্যস্ত হয়েছে বিশ্বসমাজে তাদের স্থান দাসশালায়। আজ ভারতবাসী বিশ্বসমাজের পরিত্যক্ত; গৃহগুহার অচল অন্ধকারে সেই অকিঞ্চনের নির্ব্বাসন। এইখানে আপন প্রদীপ জ্বে'লে, আপন দেবতার বেদী প্রতিষ্ঠা ক'রে বরঞ্চ নারী আপন মহিমা রক্ষা করতেও পারে, কিন্তু পুরুষ এখানে বন্দী, এখানে তার নিরন্তর আত্মবিস্মৃতি! পুরুষের আত্মবিস্মৃতির সেই অপরিসীম অবসাদে সমস্ত ভারতবর্ষ আজ ভারগ্রস্ত।

এতদিন ভারতীয় সমাজের-যে আধারের উপরে তার বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই আধারের বিকৃতি হওয়াতে বিবাহের মূলগত ভাবসকল ও তার ব্যবহার সকল কিছুর সঙ্গে ঠিকমত খাপ খাচ্ছে না। সত্যযুগের জন্যে একদল আক্ষেপ করছে, সে আক্ষেপের ডাকে সত্যযুগ সাড়া দিচ্ছে না। এখন সময় এসেছে নূতন ক'রে বিচার করবার, বিজ্ঞানকে সহায় করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার মিল ক'রে ভাববার।

নরনারীর মধ্যে প্রকৃতি যে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখেছেন, সেই বিচ্ছেদের আকাশে একটি প্রবল শক্তি সর্ব্বদা বিচিত্র আকর্ষণলীলায় প্রবৃত্ত। এ শক্তি সংহার করে, সৃষ্টিও করে। এই শক্তি পর্দ্দার আড়াল থেকে আমাদের চিত্তবৃত্তির উপর উদ্বোধন মন্ত্র চালায়। এ'র প্রবল ক্রিয়া থেকে সমাজকে যদি বঞ্চিত করি, তাহ'লে সমাজকে নিরাপদ করা হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তেমনি নিঃসম্পদও করা হয়। পুরুষের চিত্তের উপর স্ত্রীলোকের যে প্রভাব তাকে আমাদের দেশে শক্তি বলে। অর্থাৎ তার অভাব ঘট্‌লে সমাজে সৃষ্টি ক্রিয়ার নির্জ্জীবতা ঘটে। মানুষ এ অবস্থায় নিস্তেজের মত গতানুগতিক হ'য়ে চলে। তখন সে নম্র অক্রিয় চিত্তবৃত্তির অধিকারী হ'তে পারে কিন্তু তার সক্রিয় গুণগুলোকে সে হারিয়ে বসে। আমাদের দেশে বিবাহের যে-ব্যবস্থা ওসাধারণত নরনারীদের সম্বন্ধ যেভাবে নিয়মিত তা'তে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর-মধ্যগত শক্তিক্রিয়ার অবকাশকে একেবারে বিলুপ্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে। কারণ আমাদের সমাজ সক্রিয় শক্তিকেই ভয় করেছে। অচল স্থিতিকে সে চেয়েছিল, তাই অক্রিয়গুণের চর্চ্চাতেই এতদিন সে প্রবৃত্ত ছিল। আজ হঠাৎ জেগে উঠে দেখে বাইরের আঘাতের কাছ থেকে আত্মরক্ষার শক্তিকে সে হারিয়ে বসেছে। এতটুকু ভাববারও তার সামর্থ্য নেই, যে, দুর্ব্বলতা তার আপন সমাজেরই মধ্যে, বাইরের কোনো আকস্মিক কারণের মধ্যে নয়।

সকল সমাজই নানা কারণে প্রকৃতির ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য। মানুষের সভ্যতা সেই লড়াইয়ে-জেতা ধন। আমাদের সমাজে এই লড়াই অত্যন্ত একান্ত হয়েছিল। তাই আমাদের সমাজে পথ যত, বেড়া তার চেয়ে অনেক বেশী। তার সঙ্গত কারণ ছিল না তা বলি নে। কিন্তু সেই কৈফিয়তে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পায় না। যে-বেড়া কেবলি পথ বন্ধ ক'রে বাহিরকে ঠেকায়, সে বেড়া মানুষের নিজেকেও ঠেকায়।

বোধ হচ্ছে যেন সম্প্রতি যে-যুগ এসেছে, এই যুগে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ নিরন্তর লড়াই ক'রে জয়ী হবার দুরাশা ত্যাগ করবার কথা ভাব্‌ছে। এখন তার সঙ্কল্প এই যে, সে সন্ধি ক'রে শান্তি পাবে। নইলে কোনোমতেই লড়াইয়ের অন্ত থাক্‌বে না। এই সন্ধি স্থাপনের ভার বিজ্ঞানের উপর। সকল সমাজেই বিবাহপ্রথা সেইকালের, যখন জীবনের পার্লামেন্টে মানুষ নিরন্তর প্রকৃতির opposition bench অধিকার ক'রে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করবার চেষ্টা কর্‌ত। প্রকৃতি পদে পদেই তার শোধ তু'লে আসছে। প্রাকৃত ধর্ম্মের সঙ্গে মানব ধর্ম্মের সন্তোষজনক রফা এ পর্য্যন্ত

হয় নি। সেই কারণে বিবাহ প্রভৃতি আত্মীয়তম অনুষ্ঠানে অন্তরের ত্রুটী বাহিরের বন্ধন দিয়ে সারবার যতই বেশি চেষ্টা চল্‌ছে, অন্তরের সত্যকে ততই অপমানিত ক'রে মানুষের সকলের চেয়ে বড় সম্বন্ধকে দুর্গতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।

মানব-সংসারে দুই সৃষ্টিধারা গঙ্গাযমুনার মতো মিল্‌ছে, এক হচ্ছে প্রাকৃতিক মানুষের সন্তানসৃষ্টি, আর হচ্ছে, সামাজিক মানুষের সভ্যতাসৃষ্টি। একটা প্রাণের জগৎ, আরেকটা মনের জগৎ। এই দুই সৃষ্টির মধ্যেই স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই যোগ আছে, কারণ সৃষ্টিমাত্রেই দ্বৈতের লীলা। কিন্তু এই যোগের স্বভাব দুই সৃষ্টিতে ভিন্ন রকমের।

সন্তান সৃষ্টিতে পুরুষের দায়িত্ব গৌণ অথচ অপরিহার্য্য। নারীর অপেক্ষাকৃত অক্রিয় বীজকে পুরুষের সক্রিয় বীজ প্রাণ-চঞ্চল ক'রে দেওয়ার পর থেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের সুদীর্ঘভার নারীর, কঠিন দুঃখস্বীকার তারই।

জীবজননে পুরুষের প্রয়োজন লঘুতর ব'লেই কীট-পতঙ্গ-রাজ্যে অনেক স্থলেই স্ত্রীকীট অনাবশ্যক পুরুষকীটকে সংহার করে। পশুরাজ্যেও পুরুষ-পশুর স্বভাবে যে ঈর্ষাপরায়ণ হিংস্রতা আছে তাতে পুরুষ-পশুর সংখ্যা হ্রাস ক'রে রাখে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে জীবপ্রকৃতির দিক থেকে সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের প্রয়োজন স্ত্রীলোকের চেয়ে সামান্যতর।

মানুষের মধ্যে মনঃপ্রকৃতি বড় হ'য়ে দেখা দিল। তখন সংসারে পুরুষ আপন যথার্থ গৌরব পাবার অবকাশ পেলে। যে-প্রাণপ্রকৃতি এতকাল স্ত্রীকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে, তারই দায়িত্ব বন্ধনে স্ত্রী যখন বাঁধা থেকে আপন কাজে জড়িয়ে রইল তখন বন্ধনমুক্ত পুরুষ মনঃপ্রকৃতির উত্তেজনায় মানস-সৃষ্টির বিচিত্র অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'তে পার্‌ল। পুরুষ আপন আবশ্যকতা প্রবলভাবে সৃষ্টি করতে লাগ্‌ল।

গোড়ায় এই সৃষ্টি যখন অত্যন্ত বেশি প্রাধান্য লাভ করলে তখন সভ্যতার প্রথম দিকের অধ্যায়ে নারী অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক ব'লেই গণ্য হয়েছিল। তাই নয়, নারী এই সৃষ্টিতে অনেক পরিমাণে বাধাস্বরূপ। কারণ যে-সংসার নারীর, সে-সংসার পুরুষের অন্বেষণশীল মনকে বেঁধে রাখ্‌তে চায়। সভ্যতাসৃষ্টিকার্য্যে নারীর এই স্বল্প-প্রয়োজনীয়তার অগৌরব আজও লেগে আছে। সেইজন্য আজ বিদ্রোহিণীর দল প্রাণপ্রকৃতির দায়িত্ব লাঘব ক'রে সমাজ-সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের সমকক্ষতা দাবী করছে।

কিন্তু বাহিরের দিক থেকে কৃত্রিম চেষ্টার অবকাশ সৃষ্টি করলেই অবকাশ পাওয়া যায় না। নারীর প্রকৃতির মধ্যে যে-হৃদয় বৃত্তির প্রবলতা আছে তাকে বাহির থেকে তাড়া দিয়ে বিদায় করা যায় না। সেই হৃদয়বৃত্তিগুলি স্বভাবতই চলবার দিকে প্রমুখ নয়, আঁকড়াবার দিকেই তার ঝোঁক। এইজন্যে স্থিতির মধ্যে যে-সম্পদ, নারী তারই সাধনা করলে সার্থকতা লাভ করে। গতিবান অধ্যবসায়ের কাজে যদি সে জোর ক'রে যায় তাহলে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধ্‌বে এবং সেই নিরন্তর দ্বন্দ্বের বিক্ষেপ বহন ক'রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে প্রধান স্থান কখনই পাবে না।

কিন্তু পুরুষ যেমন প্রাণপ্রকৃতির শাসনতন্ত্রে দীর্ঘকাল নিম্নপদে থেকে অবশেষে মনঃপ্রকৃতির রাজ্যে প্রাধান্য পেলে, নিজের অপেক্ষাকৃত নিরাবশ্যকতার লাঞ্ছনা মুছে ফেল্‌তে পারলে, তেমনি সভ্যতার একটি উচ্চস্তর আছে সেখানে নারী আপন অগৌরব দূর করবার অধিকারী। তাকে কি নাম দেব হঠাৎ ভেবে পাওয়া শক্ত;—আধ্যাত্মিক শব্দটির ঠিক সংজ্ঞা নিয়ে নানা তর্ক উঠ্‌তে পারে, কিন্তু দায়ে প'ড়ে আপাততঃ ঐ নামটাই গ্রহণ করা যাক্।

হৃদয়বৃত্তির একটি আনুষঙ্গিক উৎপন্ন জিনিষ আছে তাকে মাধুর্য্য বলা যায়। এই মাধুর্য্য আলোর মত, এ একটি শক্তি। এ'কে স্পষ্ট ক'রে ধরা-ছোঁওয়া মাপাজোখা যায় না—কিন্তু এ'রই অমৃত না পেলে মনঃপ্রকৃতির কাজ পূর্ণ সফলতায় পৌঁছয় না। গাছের শিকড় মাটি আশ্রয় ক'রে দাঁড়ায়, মাটির থেকে রস ও খাদ্য সংগ্রহ করে, এ-সব জিনিষের মোটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু সূর্য্যের আলোকটিকে সেই সুনির্দ্দিষ্ট হিসাবের অঙ্কে বাঁধা যায় না, কিন্তু তবু সেই আলো যদি শক্তি সঞ্চার না করে, তবে গাছের সকল উদ্যমই অসাড় হয়।

পুরুষের সৃষ্টিকার্য্যে নারীস্বভাবের এই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য চিরদিনই যোগ দিয়েছে। তা অলক্ষিত কিন্তু অপরিহার্য্য। পুরুষের চিত্তকে নারীর এই প্রাণবান মাধুর্য্য ভিতরে ভিতরে সক্রিয় না করলে তা আপন পূর্ণ ফল ফলাতে পারে না। বীরের বীর্য্য, কর্ম্মীর কর্ম্মোদ্যম, রূপকারের কলাকৃতিত্ব প্রভৃতি সভ্যতার সমস্ত বড় বড় চেষ্টার পিছনে নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্ত্তনা আছে।

নারীর দুইটিরূপ, একটি মাতৃরূপ, অন্যটি প্রেয়সীরূপ। মাতৃরূপে নারীর একটি সাধনা আছে সেকথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই সাধনায় সন্তানের নয়, সুসন্তানের সৃষ্টি, সেই সুসন্তান সংখ্যা পূরণ করে না, মানব সংসারে পাপকে অভাব অপূর্ণতাকে জয় করে। প্রেয়সীরূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষচেষ্টাকে প্রাণবান করে তোলে। যে গুণেরদ্বারা তা সিদ্ধ হয় পূর্ব্বেই বলেছি সে হচ্চে মাধুর্য্য। একথাও বলেছি ভারতবর্ষ এই মাধুর্য্যকে শক্তিই বলে। আনন্দলহরী নামে একটি কাব্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত। তাতে যাঁর স্তব গান আছে তিনি হচ্ছেন বিশ্বের মর্ম্মগত নারীশক্তি, সেই শক্তি আনন্দ দেন। একদিকে বিশ্বকে যেমন আমরা জানি, ব্যবহার করি; অন্যদিকে তেমনি বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অহৈতুক তৃপ্তির যোগ। বিশ্বকে আমরা জানি, তার কারণ বিশ্বে সত্যের আবির্ভাব। বিশ্বে আমাদের তৃপ্তি, তার কারণ বিশ্ব আনন্দের প্রকাশ। ঋষিরা বলেছেন এই বিশ্বব্যাপী আনন্দেরই নানা মাত্রা জীব সকল নানা উপলক্ষ্যে ভোগ করে। "কোহ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ," কারো প্রাণচেষ্টার উৎসাহমাত্র থাকত না যদি আকাশ পূর্ণ করে' এই আনন্দ না থাকতেন। ইংরাজ কবি শেলি Intellectual Beauty নাম দিয়ে তাঁর কবিতায় যাঁর স্তব করেছেন তাঁর সঙ্গে এই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের ঐক্য দেখি। বিশ্বগত আনন্দকে আনন্দলহরীর কবি নারীভাবে দেখেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে মানবসমাজে এই আনন্দশক্তির বিশেষ প্রকাশ নারীপ্রকৃতিতে। এই প্রকাশকে আমরা বলি মাধুর্য্য। মাধুর্য্য বলতে কেউ যেন লালিত্য না বোঝেন। তার সঙ্গে ধৈর্য্যত্যাগসংযমযুক্ত চারিত্রবল, সহজ বুদ্ধি, সহজ নৈপুণ্য, চিন্তায় ব্যবহারে ভাবে ও ভঙ্গীতে শ্রী, প্রভৃতি নানা গুণের মিশোল আছে, কিন্তু এর গূঢ় কেন্দ্রস্থলে আছে আনন্দ যা আলোর মত স্বভাবতই আপনাকে নিয়ত বিকীর্ণ করে, দান করে।

প্রেয়সীরূপিনী নারীর এই আনন্দশক্তিকে পুরুষ লোভের দ্বারা আপন ব্যক্তিগত ভোগের পথেই আজপর্য্যন্ত বহুল পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করেছে, বিকৃত করেছে, তাকে বিষয় সম্পত্তির মত নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বদ্ধ করেছে। তাতে নারীও নিজের অন্তরে যথার্থ শক্তির পূর্ণ গৌরব উপলব্ধি করতে বাধা পায়। সামান্য সীমার মধ্যে মনোরঞ্জনের লীলায় পদে পদে তার ব্যক্তিস্বরূপের মর্য্যাদা হানি ঘটেছে। তাই মানবসমাজের বৃহৎক্ষেত্রে নারী আপন প্রকৃত আসন পায় নি বলেই আজ সে আত্মমর্য্যাদার প্রয়াসে পৌরুষলাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত। অন্তঃপুরের প্রাচীর থেকে বাইরে চলে আসার দ্বারায় নারীর মুক্তি নয়। তার মুক্তি এমন একটি সমাজে যেখানে তার নারীশক্তি, তার আনন্দশক্তি আপন উচ্চতম প্রশস্ততম অধিকার সর্ব্বত্র লাভ করতে পারে। পুরুষ যেমন আপন ব্যক্তিগত ব্যবসায় অতিক্রম করেও বিশ্বক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করবার অবকাশ পেয়েছে, তেমনি যখন গৃহস্থালীর বাইরেও সমাজসৃষ্টি-কার্য্যে নারী আপন বিশেষ শক্তির ব্যবহারে বাধা না পাবে তখন মানবসংসারে স্ত্রীপুরুষের যথার্থ যোগ হতে পারবে। পুরাকাল হতে আজ পর্য্যন্ত যে বিবাহ প্রথা চলে আসচে তাতে স্ত্রীপুরুষের সেই পূর্ণ যোগ বাধাগ্রস্ত; আর সেইজন্যেই পুরুষ সমাজে নারীশক্তির প্রভূত অপব্যয় ও বিকার; সেই-জন্যেই পুরুষ নারীকে বাঁধতে গিয়ে তার দ্বারা নিজেরই দৃঢ়তম বন্ধন সৃষ্টি করেছে। বিবাহ এখনো সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নারীকে বন্দী করে রাখবার পিঞ্জর। তার পাহারাওয়ালার পুরুষ-প্রভুত্বের তকমা পরা। তাই সকল সমাজেই নারী আপন প্রকৃতির পরিপূর্ণতার দ্বারা সমাজকে

যে-ঐশ্বর্য্য দিতে পারত তা দিতে পারচে না, আর এই অভাবের দৈন্যভার সকল সমাজই বহন করে চলেছে।

এই মাধুর্য্যের শক্তি সভ্যতার অপেক্ষাকৃত বর্ব্বর অবস্থায় অনতিগোচর ও গৌণভাবে আপন কাজ করে। তখন যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি দুরন্ত ভাঙাগড়ার যুগে এই শক্তির ক্রিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। কিন্তু মানবসভ্যতা যখন আধ্যাত্মিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, অর্থাৎ যখন মানুষের পরস্পর বিচ্ছেদের চেয়ে পরস্পর যোগই মূল্যবান ব'লে স্বীকৃত হবার সময় আসে তখন নারীর মাধুর্য্যশক্তি গৌণভাবে নয় মুখ্যভাবে আপন কাজ করবার অবকাশ পায়। তখন পুরুষের জ্ঞানের সঙ্গে নারীর ভাবের সমান যোগে তবে সংসার টিঁকতে পারে। তখন উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যদ্বারা উভয়েই সভ্যতাসৃষ্টির এক মহাগৌরবের সমান অংশী হ'তে পারে। তখন সেই পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে উচ্চনীচতা সৃষ্টি করে না।

আজও মানুষের মধ্যে সভ্যতায় সেই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে ঠিকমতে স্বীকার করা যায় নি। এই জন্যে, বিবাহে আজও স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ সত্য হয় নি। আজও এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছু না কিছু বিরোধ ও কোনো না-কোনো পক্ষের অবমাননা আছে। তাই আজও বিবাহে গায়ের জোর আপন জায়গা ছাড়্‌তে চাচ্ছে না, স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা সন্দেহ নিত্য আন্দোলিত। এইজন্যেই মানুষের সব চেয়ে বড় দুঃখদুর্গতি বড় অপমান ও গ্লানি নর নারীর এই বিবাহ সম্বন্ধেই। কিন্তু যাঁরা মানবসমাজে আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস করেন তাঁরা বিবাহ সম্বন্ধকে সামাজিক পাশব বলের অত্যাচার থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে সমাজে প্রেমের শক্তিকে সত্যভাবে বিকীর্ণ করবার উপায় অন্বেষণ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। বিবাহ অনুষ্ঠানে এখনো সমস্ত প্রথায় অভ্যাসে ও আইনে আমরা বর্ব্বর যুগে আছি ব'লেই বিবাহ আজও নরনারীর মিলনকে পূর্ণ কল্যাণরূপে প্রকাশ না ক'রে তাকে আবৃত ক'রে রেখেছে। সেই জন্যেই আমাদের দেশে কামিনী-কাঞ্চনকে দ্বন্দ্বসমাসের সূত্রে গেঁথে নারীকে ইতর ভাষায় অপমান করতে পুরুষ কুণ্ঠিত হয় না। কেননা পুরুষ এখানে এখনো মনে করে যে সেই হ'ল মানুষ, তারই মুক্তি মানুষের একমাত্র লক্ষ্য, নারীকে সে কাঞ্চনের মত নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে স্বীকার করতেও পারে ত্যাগ করতেও পারে। ত্যাগ করার দ্বারা সে যে আত্মহত্যা করে তা সে জানেই না। তা ছাড়া নারীর মাধুর্য্য বিলাসসামগ্রী নয়, তা যে মানুষের সকল সাধনাতেই পরম সম্পদ একথা বোঝবার মতো সময় তার আজও হ'ল না,—আমাদের সর্ব্বব্যাপী শক্তিহীনতার সে একটা প্রধান কারণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উৎসের অনুসন্ধান

৬

আমার নাম রামনিধি হাজরা; বাড়ী খুলনা জেলায়। ছয় বৎসর বয়সেই তাই গ্রামের জমিদারের বিধবা পত্নী অন্নদাকামিনী আমাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। গরীবের কুটির হইতে জমিদারের প্রসাদে আসিয়া ফাপরে পড়িলাম। আদর-যত্নের অভাব হইল না বটে কিন্তু তাহাতে মাতৃহৃদয়ের স্পর্শ ছিল না! এক কথায় অন্নদাকামিনী আমাকে ভাল বাসিতেন না—এবং তিনি বোধ হয় জগতে এক অর্থ ও কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই ভাল বাসতেন না। কিন্তু তবু যে কেন তিনি কেন আমাকে যাচিয়া পুত্রত্বে বরণ করিলেন তাহার একটু ইতিহাস আছে! অন্নদাকামিনীর স্বামী মৃত্যুকালে যে উইল রাখিয়া যান—তাহাতে দুইটি সর্ত্ত ছিল। প্রথম—অন্নদাকামিনী ইচ্ছা করিলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন—কিন্তু পোষ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে বিষয় সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতে বাধ্য। দ্বিতীয়—তিনি পোষ্য গ্রহণে অসম্মত হইলে—একটা নির্দ্দিষ্ট মাসহারা মাত্র পাইবেন—এবং বিষয় সম্পত্তি তাঁহার স্বামীর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের হস্তগত

হইবে। উইল পড়িয়া অন্নদাকামিনী উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। কিন্তু সব সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন তাঁহার পুরাতন দেওয়ানজী। তিনি মনীবকে যুক্তি দিলেন যে তাড়াতাড়ি একটা পোষ্য লওয়া উচিত। নহিলে বিষয় সম্পত্তি অজ্ঞাত কুলশীল কোন ব্যক্তির হাতে না জানি গিয়া পড়িবে। পোষ্য লইলে সম্পত্তি আপাতত তাঁহার হাতেই থাকিবে—তারপরে ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা সুব্যবস্থা করা যাইবে। অন্নদাকামিনী কুল পাইলেন। তিনি আমাকে পোষ্য গ্রহণ করিলেন—কিন্তু আমি সেখানে আসিয়া কূল পাইলাম না। অন্নদাকামিনী আমাকে দুই চোখে দেখিতে পারিতেন না—আমার লালন-পালনের ভার পড়িল বুড়া কেষ্ট খানসামার উপর। সে আমাকে স্নান করাইত খাওয়াইত বেড়াইতে লইয়া যাইত রাত্রে তাহার কাছেই শয়ন করিতাম। কদাচিৎ কখনো অন্নদাকামিনীর সহিত দেখা হইত। তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে অগ্নি-দৃষ্টিতে দগ্ধ করিয়া প্রস্থান করিতেন। এক একদিন গভীর রাত্রে ঘরের প্রদীপ নিভিয়া গেলে ঘুমের ঘোরে বিছানায় হাতড়াইয়া দেখিয়াছি—মা আছে কি না। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে কোথায় আমি! যে স্নেহ কোমল নীড় হইতে আমাকে ছিন্ন করিয়া আনা হইয়াছে—না জানি আজ তাহা কেমন আছে। সেই গভীর রাত্রে বিছানায় জাগিয়া ভাবিতাম এখন সেই পুরাতন কুটিরে দীপ জ্বলিতেছে—দরজার ফাঁক দিয়া তাহার আলো তুলসী গাছের উপর। মা বিছানায় শুইয়া জাগিয়া কি ঘুমাইয়া। জাগিয়া থাকিলে কি একবারও আমার কথা ভাবিতেছে। এক একদিন মাকে দেখিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইত। একবার কেষ্ট খানসামাকে দিয়া মাকে একদিনের জন্যও আনাইবার প্রস্তাব অন্নদাকামিনীর নিকট করিয়াছিলাম। অন্নদাকামিনী রাশভারি লোক—একটিমাত্র নেতিবাচক উত্তরে আমার স্নেহতৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়কে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার ভয় পাছে আমার অপর পক্ষের কেহ আসিয়া সন্তানের অধিকার সম্পত্তির উপর দৃঢ়তর করিয়া তোলে।

আমার সময় সেই অতি বৃহৎ অতি শূন্য জমিদারের প্রাসাদে কাটিতে লাগিল। আমি কেষ্টর কৃপায় মাঝে মাঝে ঘুড়ি ও লাটাই পাইতাম। তাহা উড়াইয়া আমার দিন কাটিত। চকমিলান বাড়ীর এক ছাদ হইতে অন্য ছাদে চলিয়া যাইতাম। সারাদিন আমার ছাদের উপরেই কাটিত। মাঝে মাঝে ছায়ার মত মনে পড়ে সেই জমিদারের বৃহৎ কাচারীর টিনের ঘরখানি! একপাশে ফরাস পাতিয়া দেওয়ানজী ও আমলারা হাতবাক্স লম্বা লম্বা হিসাবের খাতা লইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছে। দু'টা খানসমা তাহাদের তামাক যোগাইতে পারিতেছে না। ঘরভরা প্রজা—খাজনা দিতে আসিয়াছে। জমিদারের কাছারীতে সবাই ভদ্র হইয়া আসিয়াছে কাপড়খানা অনেক কষ্টে হাঁটুর নীচে নামিয়াছে—ছেড়া চাঁদরখানার ভাল দিক্‌টা উপরে রাখিয়া গলার দুইপাশে ঝোলানো। মেঝেতে বিছানা মাদুরের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে গল্প-করিতেছে! নূতন কেহ ঘরে প্রবেশ করিলেই প্রথমে দেওয়ানজীও আমলাদিগকে সেলাম করিয়া পরে নিজেদের মধ্যে যথারীতি আলাপ আপ্যায়িত করিতেছে এইসব দৃশ্য ছাদের উপর ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে নজরে পড়িত এক একদিন আমি অকারণে কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম—অমি চারিদিক্ হইতে প্রজারা তাহাদের ভাবী মনীবকে সেলাম করিত। কিন্তু দেখিতাম ইহা দেওয়ানজীর সহ্য হয় না। তিনি কেষ্টাকে ডাকিয়া আমাকে সরাইয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিতেন! তাঁহারা যথাসম্ভব আমাকে প্রজাদের নিকট হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন যাহাতে আমি তাহাদের প্রিয় না হইয়া উঠি। আমার স্নেহ পিপাসু হৃদয় এই সব সহৃদয় প্রজাদের কাছে স্বভাবতই ছুটিত। কিন্তু বাধা—দুর্গ প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য।

আমার বয়স বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমাকে গ্রামের এণ্ট্রান্স ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল ইহাই হইল আমার সর্ব্বনাশের মূল। ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেই ত চক্রবৃদ্ধি সুদের নিয়মে বিদ্যা বছরে বছরে বাড়িয়া যায় না! ছাত্র ও অভিভাবক দুই তরফেরই চেষ্টা চাই। ছাত্রের মনোযোগ ও নিষ্ঠা প্রায়ই স্বাভাবিক সুতরাং অভাব হয় না কিন্তু

অভিভাবকের অর্থের দেখা পাওয়া ভার। মাঝে মাঝে ইস্কুল হইতে আমার বহির, মাহিনার তলব আসিত। অন্নদাকামিনী মনে মনে আমার উপর চটিতেন এবং দেওয়ান-জীর নিকটে প্রাচীন গুরুগৃহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন অবশ্য তাহা শিক্ষার জন্য নহে বেতন দিতে হইত না বলিয়া।

ইস্কুলে পড়া আমি ভাল পারিতাম—কিন্তু সন্ধ্যা বেলায় দেওয়ানজীর নিকটে পড়া দিবার সময় আমি কোনদিন কৃতকার্য্য হই নাই। তাহার একমাত্র কারণ—পুঁথির বিদ্যায় ও দেওয়ানজীর অধীত বিদ্যায় তফাৎ আগাগোড়া! রেড়ির তেলের আলোর নিকটে বসিয়া দেওয়ানজী আমার পড়া লইতেন। গালের মশা মারিতে গিয়া চটাস করিয়া চড় খাইতেন মশা উড়িয়া যাইত। তাঁহার সব রাগটা পড়িত আমার উপর! মাষ্টারের মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন—ছাত্রের পক্ষে সুবিচার পাওয়া কঠিন। তিনি ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিতেন বি, উ, টি কি হয়? আমার পক্ষ হইতে উত্তর হইত বি, উ, টি বাট্! বেশ বলিয়া দেওয়ানজী কৃতকার্য্যতার তারিফটুকু আত্মসাৎ করিয়া বলিতেন এইবার বল পি, উ, টি, কি হয়? আমার পক্ষের উত্তর হইত পি, উ, টি, পুট্! এক মুহূর্ত্তে দেওয়ানজী ঘুম ভাঙিয়া গিয়া বাঘের মত লাফাইয়া উঠিতেন —বিউটি-বাট পিউটি-পুট্! কার চোখে ধূলো দেওয়া! জেঠা ছেলে! আমি আর কিছু বুঝি না! প্রজাদের নাড়ি নক্ষত্র ঘেঁটে চুল পাকালাম আর আমার সঙ্গে চালাকি! বিউটি-বাট আর পিউটি-পুট্? হায় পলিতকেশ দেওয়ানজী তোমার যতই অভিজ্ঞতা থাকুক্ না কেন তবু তুমি ব্যাকরণের কিছুই বোঝ না। কিন্তু মুখে আমি কিছু প্রতি-বাদ করিতে পারিতাম না পরন্তু পৃষ্ঠের যে শোচনীয় অবস্থা হইত তাহাতে পি, উ, টি পাট স্বীকার করা ভিন্ন গতিক ছিল না! হায় মা সরস্বতী জমিদারের দেওয়ানের এতই প্রভাব যে সে তোমার ব্যাকরণের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তছনছ করিয়া ফেলে। তুমি নিষ্ঠুরের মত চুপ করিয়া থাকিয়া নির্দ্দোষ ছাত্রের দুর্দ্দশা দেখ। তোমার কমলবন হইতে যে বেতসবন বেশী দূরে অবস্থিত নয়—তাহা বাংলার অধিকাংশ ছাত্রই জানে! তৎপরে দেওয়ানজীর হুকুম হইত রিডিং পড়। ভয়ে বুক কাঁপিয়া উঠিত! পড়িতে আরম্ভ করিতাম —"When George III was king of England" কিন্তু ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত গেলে ত দেওয়ানজীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইত তত্দূর যাইবার আগেই দেওয়ানজী পুনরায় আক্রমণ করিতেন "বলে' গেলেই হ'ল—আমার আর চোখ নাই না! 'the' কোথায়'? প্রথমে জর্জ্জ তার পরে থার্ড! খুসী মত তার মাঝে একটা 'the' যদি তুমি বসিয়ে দিতে পার তবে আমি তোমার পিঠে গোটা কয়েক চড় কেন বসিয়ে দিতে পারব না? যুক্তি অকাট্য সন্দেহ নাই। "যেখানে সেখানে একটা 'the' বসিয়ে দিলেই হল —তার হিসাব নিকাশ নাই!" আবার মাঝে মাঝে সান্ত্বনা লাভ করিতেন "প্রথম প্রথম একটা নূতন কিছু শিখলে ওই রকমই হয়।" আমি বলিতাম উহা নূতনত্বের জন্য নয়— স্বয়ং যদু মাষ্টার বলে' দিয়েছেন—ও কথাটা দেখা যায় না তবু থাকে! দেওয়ানজী হাঁকিয়া উঠিতেন—"যদু মাষ্টারের এত বড় আস্পর্দ্ধা! কাল একবার খাতাটা দেখ্‌তে হবে কত খাজনা বাকী! দেখা যায় না তবু থাকে—যেন স্বয়ং পরব্রহ্ম আর কি।" যদু মাষ্টারের শাস্তিটা আগামী কালের অপেক্ষায় রাখিয়া দিয়া তাহার ছাত্রের শাস্তিটা তৎক্ষণাৎ হইয়া যাইত! এই রকম ভাবে প্রতি সন্ধ্যায় আমার মনের ও দেহের চর্চ্চা দেওয়ানজীর হাতে হইত!

ইস্কুলে আমি ফার্ষ্ট হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া উপহার পাইলাম একখানা রঙীন—চিত্রবিচিত্র করা—'ডন কুইক্সটের' কাহিনী! সেই বইয়ে ডন কুইক্সটের অদ্ভুত বীরত্ব কথা পড়িয়া এবং তাহার অদ্ভুততর ছবি দেখিয়া আমার শিকারী হইবার প্রলোভন হইল! যদি বাড়ীতে শান্তি থাকিত তবে এই আকর্ষণ এত প্রবল হইত না—কিন্তু বাড়ীর কোন বন্ধন ছিল না বলিয়াই বাহিরের টান আমার দিন দিন প্রবলতর হইতে লাগিল। কিন্তু তবু স্বেচ্ছায় এই দুঃখের আবাসও ছাড়িতে পারিলাম না। কিছুদিনের মধ্যে

একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে বাড়ী না ছাড়িয়া আর উপায় রহিল না।

আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতের নাম ছিল বাঞ্ছারাম তর্কালঙ্কার—বলা বাহুল্য এই অলঙ্কারটুকু স্বোপার্জ্জিত। পণ্ডিত মহাশয়ের মাথা ভরা টাক কেবল কানের দুই পাশে দুই গোছা শাদা চুল। এই চুল দুই গোছাই তাঁহার প্রধান শত্রু! সারা মাথাই যদি নিশ্চুল হইল তবে ওই দুই গোছা না না থাকিলে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না! কিন্তু পণ্ডিত মশায়ের অদৃষ্ট মন্দ ওই দুই গাছা চুল তাঁহার বার্দ্ধক্যের নিশানের মত ঝুলিয়া আছে! পণ্ডিত মশায় নিজে ব্যাকরণ কতদূর পড়িয়াছিলেন তাহা জানি না কিন্তু আমাদের তিনি শব্দরূপের চৌকাট অতিক্রম করিতে দেন নাই বহুদিন পর যখন উৎসাহে সু ঔ যস্ আরম্ভ করিলাম অমনি পণ্ডিতমশায় ক্লাশের সব চেয়ে ভোঁতা ছেলেটাকে প্রশ্ন করিলেন—বল তো "বিন্দে ভীতঃ টলতি কি হয়!" বিনোদ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ভীতষ্টংতি বলিলেও জবাব দিতে পারিত না! পণ্ডিত মহশয় হাসিতে হাসিতে বলিতেন "ও গোড়ায় ভুলে বসে আছ বাবা! আগে পড়াই গোড়া ভুলে যাও এ রকম করলে কি চলে! আগে গোড়া পত্তন চাই! ভিত না গাঁথা হ'লে কি বাড়ী ওঠে! পড় পড় আবার সন্ধি পড়।" বিনা বাক্য ব্যয়ে পুনরায় সন্ধি আরম্ভ হইল। এমনিভাবে পণ্ডিতমশায় সমস্ত বছর আমাদের শুধু সন্ধিই পড়াইলেন! শব্দরূপ আমাদের কাছে তাহার বিচিত্ররূপ আর প্রকাশ করিল না!

পণ্ডিতমশায়ের সম্বন্ধে কয়েকটা গল্প লইয়া ছেলেদের মধ্যে কানাঘুষা চলিত। একবার হেড মাষ্টারের অনুপস্থিতিতে ইস্কুল ঘরের চাল ছাইবার ভার তাঁহার উপর ছিল। তিনি ঘরামিদের উপদেশ দিয়াছিলেন যে এমন করে' চাল ছাইবি যাতে সূর্য্য দেখা যায়—অথচ জল না পড়ে! এইরূপ আশ্চর্য্য ভাবে চাল ছাওয়া হইয়াছিল বলিয়াই সেবার তাঁহার বহুদিন বঞ্চিত চালে খড় উঠিয়াছিল! আর একটা ছিল তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যা লইয়া। একটি ছেলের দেহের উপর পণ্ডিতমশায়ের যষ্টি চর্চ্চাটা অধিক হওয়াতে তাহার অভিভাবক তাহাকে ইস্কুল হইতে ছাড়াইয়া লয়! পণ্ডিতমশায় আমাদের শিখাইয়া দিবেন "ওরে ছোঁড়াগুলো তার সঙ্গে দেখা হ'লে বলবি "ত্বং অহং কুকুরায় মন্যে।" পণ্ডিতমশাই এক একদিন ক্লাশে আসিয়া ছেলেদের বলিতেন—"আচ্ছা আজ দেখ্‌বো তোর ইংরাজি হবে কি না—বল্‌তো কন্‌জাংসন প্রিপোজিসন্" পণ্ডিতমশাই সবে বোধ হয় ফার্ষ্ট বুক আরম্ভ করিয়াছেন! যে ঘটনার জন্য আমাকে ইস্কুল বাড়ী ছাড়িতে হইল তাহাই এখন বলিব।

সেদিন ডিরেক্টর সাহেব আমাদের ইস্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। অন্যান্য ক্লাশ ঘুরিয়া দেখিয়া আমাদের ক্লাশের দিকে সাহেব আসিতেছেন দেখিয়া পণ্ডিত মশাই সজোরে সংস্কৃত ভাষন আরম্ভ করিলেন! নিতাই আমাদের সর্দ্দার ছিল সে চোখ টীপিয়া একটা ইসারা করিল আমরা বুঝিলাম। সাহেব ক্লাশে প্রবেশ করিতেই আমরা চট্ করিয়া ব্যাকরণ রাখিয়া দিয়া ইংরাজী বই খুলিয়া ফেলিলাম। সাহেব বুঝিলেন ছাত্ররা গভীর মনোযোগের সহিত রাজভাষার চর্চ্চা করিতেছে। দুই একটি ছেলেকে সাহেব প্রশ্ন করিলেন—তাহারা চট্‌পট্ উত্তর দিল। সাহেব পণ্ডিত মশায়ের দিকে ফিরিয়া ইংরাজীতে আলাপ সুরু করিলেন। হায়—কোথায় এখন পণ্ডিত মশায়ের কনজাংসন ও প্রিপোজিসন—বিপদকালে কেহই দেখা দিল না! সাহেব মুখ লাল করিয়া চলিয়া গেলেন! তিনি ইস্কুলের বাহির হইতে না হইতে পণ্ডিতমশাই ব্যাঘ্রবিক্রমে আমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়া হস্তপদের সদ্ব্যবহার করিলেন। এখানেই শেষ হইল না—হেড্‌মাষ্টার মহাশয় প্রত্যেককে ১০৲ টাকা করিয়া জরিমানা করিলেন! এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হইল ব্যাপারখানা কি?

প্রথমেই মনে পড়িল দেওয়ানজী রাত্রে যে বিষাদান্তক নাটক অভিনীত হইবে তাহার সূচনা মুখে চোখে প্রকটিত করিয়া একেবারে দেউড়ীর কাছে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহার সেই টিয়াপাখীর মত নাকটি চারিদিকে বারবার

প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল। তারপরে মনে পড়িল অন্নদাকামিনীর হেয় ব্যবহার। স্নেহের ছদ্মবেশে ঘৃণা দ্বিগুণ অসহ্য! বাড়ীতে আমার একমাত্র যে স্নেহ বন্ধন ছিল সেই কেষ্ট চাকর আর ছিল না—এবং আমার বয়স যতই বাড়িতেছিল দুঃখের শরশয্যা ততই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। এতদিন এই দুঃখের আবাসটুকু ইচ্ছা করিয়াও ছাড়িতে পারি নাই—কিন্তু এই ঘটনা আমার বেদনার পূর্ণ পালে হঠাৎ হাওয়ার মত লাগিয়া ঘাটের শেষ রসিটি ছিন্ন করিয়া দিল। আমি পথে বাহির হইলাম।

ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর দিকে গেলাম না—বাজার পার হইয়া সহরের দিকে চলিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল—পথে লোক চলাচল প্রায় নাই—আমি একাকী কোথায় চলিয়াছি তাহা আমার অদৃষ্টই কেবল জানে। তবু পথে চলিতে চলিতে বারবার বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছি হায়রে মানুষের গৃহের টান। যখন গ্রামের প্রান্তে প্রায় আসিয়াছি তখন অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিতে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম- আম বাগানের মাথার উপর দিয়া শিব মন্দিরের চূড়াটি মাত্র দেখা যাইতেছে। আমাদের দেউড়ীর পেটা ঘড়ির সাত বাজাতে গৃহের শেষ সম্ভাষণ শুনিয়াছিলাম। তারপরে সব নিস্তব্ধ—সব অন্ধকার। কেবল বিরাট রাত্রি ভরিয়া স্মৃতির খদ্যোৎদল নিভিয়াও নিভিতেছে না।

* * * * *

আমাদের তাঁবুর অধিকাংশ শ্রোতা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে অবিনাশ ঘুমাইতে পারে নাই—অথচ আমাদের গল্পে বাধা দিবে এতটুকু সাহসও নাই। কাজেই খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া বাংলা খবরের কাগজের মত যতটা সম্ভব উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া আমাদের গল্পে বাধা দেওয়া ভিন্ন তাহার আর কোন উপায় ছিল না। আজকার মত গল্প এই খানেই শেষ হইল—বিক্রম ঘুমাইয়া পড়িল কিন্তু আমার ঘুম আসিতে বিলম্ব হইতেছিল—ভাবিতেছিলাম—লোকটা কি আশ্চর্য্য ধরণের। আজিকার ঘটনাটুকু শুনিয়া আমার পূর্ব্বের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল যে লোকটার জীবন দুঃখে পূর্ণ এবং বাহিরের বীরত্বের এই অভিনয় সেই করুণ কাহিনীকে আবৃত করিবার একটা উপায় মাত্র।

দময়ন্তী

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার একখানি চাঁদ
নীরব ইঙ্গিতে ভাঙি আঁধারের বাঁধ
উঠিল বনের শিরে। সেই যে বনানী
রহস্য-বিকল এক গাঢ় ছায়া টানি
মিশে গেছে ধীরে ধীরে। তলে তলে তারি
পরিপূর্ণ যৌবনের বেদনা সঞ্চারি
বহিতেছে উস্রীনদী। তরঙ্গে তাহার
শত খণ্ডে টুটি গিয়া শশী পূর্ণিমার
দোলে আশা আশঙ্কায়। শিলাতটে দূরে
প্রহত উচ্ছ্রিত বারি একখানি সুরে
ফেটে পড়ে ফেনপুষ্পে। তীরে শ্যামাসনে
করতলে মুখ রাখি আজি অন্য মনে
বসি দময়ন্তী একা। দর্শন পিয়াসী
নয়নের যুগ্মদৃষ্টি ডুবিয়াছে আসি
উস্রীর অগাধ তলে।
কোথা তুমি আজ
অর্দ্ধবস্ত্র অসহায় নল মহারাজ
কোন্ কাননের প্রান্তে? সেদিন নিশীথে
চকিত স্বপন টুটি অমঙ্গল ভীতে
জাগিয়া উঠিয়া দেখে চারিদিকে চাহি
নিয়ড়ে অদূরে দূরে কোনো খানে নাহি
প্রিয় চিহ্নলেশ মাত্র। সেই হ'তে নারী
দিকে দিকে দেশে দেশে ফিরেছে সঞ্চারি'
অঞ্চলে নয়ন মুছি।

যেথা দূর বনে
অচপল পলাশের বিদ্যুৎ বরণে
রঞ্জিত মেঘের তল। যেথা সানুমান্
পর্ব্বতের পাদদেশে কুসুমের বান্
ছুলে উঠে লোধ্রগিরিকুরুবক ফুলে
পরাগ-কুহেলিময়। সেথা হ'তে যেথা
লতাগুল্মগূঢ় বনে আঁধারের ব্যথা
নাশেনা আলোকে কভু। পল্লব অন্তরে
রচিয়াছে রাত্রি এক চির দিন তরে
ফুলে আলোকিত মৃদু। সদা সব ঠাঁই
হেরিয়াছে প্রিয় চিহ্ন নাই নাই নাই।

দেবপতি ত্যাগ করি যে জন একদা
বুঝেছিল মানবের অন্তরের ব্যথা
বরেছিল বরমাল্যে স্বর্গে অবহেলি
মৃত্যুর পুত্তলী এক। সেই মাল্য ফেলি
দিয়াছে প্রণয়ীযুগ রাত্রি অবসানে—
ফেলে দিয়ে যেতে হবে সেই মত জানে
এই জীবনের মালা। তবু বিদ্রোহিনী
দেবেরে উপেক্ষা করি লইয়াছে কিনি
দুদিনের বৃন্তে ফোটা একটি জীবন
হৃদয় সর্ব্বস্ব দিয়া।

এই বসুধার
শস্যক্ষেত্র ভরি ভরি উঠে বারম্বার
রৌদ্রবর্ণ সুধাপুঞ্জে। রুদ্র মহাকাল
নিষ্কাশিত করি তার কাটারি করাল
কাটি লয় সবশস্য! মোরা ক্ষুদ্র প্রাণী
উচ্ছিষ্ট সে ক্ষেত্রতলে উঞ্ছবৃত্তি মানি
খুটে মরি শস্যকনা! একাকিনী নারী
স্বর্গের অমৃত লোভ অসঙ্কোচে ছাড়ি
মৃত্তিকার পাত্র হ'তে পিপাসা হরিয়া
দু'দিনের সুধা ধারা অঞ্জলি ভরিয়া
নিতেছে নিয়ত হেথা! স্বর্গের সে সুধা
মিটাইতে নারে মর্ত্ত্য মানবের ক্ষুধা!

মধ্য নিশীথের বায়ে উঠিল মর্ম্মরি
পরপারে বনচ্ছবি। একখানি তরী
নিস্তরঙ্গ নদী পরে ভেসে গেল ধীরে
ছায়ালঘু স্বপ্নবৎ। উস্রীনদী নীরে
ডুবারী তারকা দল গেল তলাইয়া
অপূর্ব্ব রতন আশে। একাকী বহিয়া
সেই ঘন কাননের সমগ্র বেদনা
দময়ন্তী বসে রল। উস্রী কলস্বনা
অস্ফুট রোদন রবে তুলিল জাগায়ে
সেই স্তব্ধ নিশীথের শান্ত শীত বায়ে
অশ্রুময় দুঃখ এক।

ঘেরিয়া ধরণী
চিরদিন মর্ম্মরিত মগ্ন কলধ্বনি
দূর এক সাগরের। তীরে তীরে তার
অন্ধকার গুহা মাঝে অস্ফুট আকার
ভবিষ্যৎ জগতের ছায়ামূর্ত্তি যত
গুমরে আলোর লাগি। সেথায় নিয়ত
শৈবালশ্যামল ছায়ে লক্ষ ভাব কণা
জ্বলে নেভে খদ্যোতের মত। তোলে ফণা
অনন্ত তমিস্রা মাঝে নূতন বাসুকী
নূতন জগৎ বহি হইবারে সুখী
আপনার লক্ষ শীর্ষে। যত ব্যর্থ-ব্যথা
সেই সাগরের তীরে লভিয়া একতা
একটি অখণ্ড রাগে উঠিতেছে বাজি
অতৃপ্ত ধরারে ঘিরি। দুঃখ সুখ রাজি
দিবা রাত্রি লজ্জা ভয় আশঙ্কা ও আশা
উত্তাল উদ্দাম প্রাণে মৌন ভালবাসা
সব সেথা মিশি গিয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
নিয়ত উঠিছে ধ্বনি। সেই সুনিভৃতে

মানস উৎসুক চিত্ত মত্ত মানবের
ছুটিয়াছে তীর্থ পথে। কোথা শান্তি এর!
আছের ধরণী ঘিরি নাইর সাগর
গর্জ্জমান অবিরত। এ পারের চর
যতটুকু ভেঙে পড়ে চলোর্ম্মির ঘায়ে
ও পারেতে ততটুকু দিতেছে ফিরায়ে
কালের করাল করে। ক্বচিৎ টিট্টিভ
চকিত ডাকিয়া গেল। তারকার দীপ
উষার আলোক ঝড়ে নির্ব্বাপিত প্রায়;
চিন্তাসুপ্তি টুটি গিয়া প্রভাতের বায়
চমকিল দময়ন্তী। কেশে গাঁথা তার
বহুদিন বিরচিত বকুলের হার
প্রিয়ের প্রসাদ লাগি। সেই যে বকুল
এ জগতে দরদীর একমাত্র ফুল
শুকায়ে ঝরে যে তবু স্মৃতি সুখখানি
রেখে দেয় সুধাগন্ধে। পূর্ব্ব অরণ্যানী
উষার আভাস পেয়ে উঠিল জাগিয়া
বিহঙ্গ কাকলি গীতে। ছাড়ি শিলাতল
উঠি দময়ন্তী ধীরে—মুছি অশ্রু জল
সন্ধানে চলিল পুন—কোথা সেই আজ
অর্দ্ধবস্ত্র অসহায় নল মহারাজ।

পত্র

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা।

কল্যাণীয়েষু

আজকাল আমি নানা অনাবশ্যক কাজের ভিড়ে যে কিরূপ উৎপীড়িত হইয়া আছি তাহা তোমরা জান না। ইহাতে আমার নিজের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে বিশ্রামত পাইই না। এইজন্য তোমাদের ভাল করিয়া পত্র লেখা আমার পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য হইয়াছে। আমি যে একান্ত মনে তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি তাহা নিশ্চয়ই মনে রাখিয়ো। কারণ তোমরা জীবনে যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিবে তাহাতে আমারই লাভ—তোমাদেরই সর্ব্বপ্রকার সফলতার মধ্যে আমার সাধনা সফল হইবে।

আমাকে আমার দেশের লোকে যদি বিদ্রূপ ব্যঙ্গ ও অপমান করে তবে তাহাতে তোমরা বিচলিত হইয়ো না। আমার প্রতি তোমাদের যদি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তবে এই কথাটি মনে রাখিয়ো এইরূপ নিন্দায় আমার কোনো ক্ষতি হইবে না; সর্ব্বপ্রকার আঘাতের ভিতর দিয়া ঈশ্বর আমার মঙ্গল করিবেন। তোমাদের কাছে আমার এই অনুরোধ যে, আমার সমস্ত নিন্দা তোমরা নিঃশব্দে সহ্য করিয়ো; প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিয়ো না। আমি আমার জীবন-বিধাতার হস্ত হইতে সম্মানও নতশিরে লইয়াছি অপমানও তাঁহারি দান বলিয়া নম্রচিত্তে বহন করিবার চেষ্টা করিব। তোমরাও আমার নিন্দায় বা প্রশংসায় চঞ্চল হইয়ো না। অন্তর্যামী নিন্দার মধ্য দিয়াও পুরস্কার দিয়া থাকেন—বাহিরে যাহা অপমান, অন্তরে তাহাকেই তিনি গৌরবের মুকুট করিয়া গড়িয়া দেন। তুমি লোকের কথায় ক্ষুব্ধ হইয়া আমাকে যে অনুরোধ করিয়াছ তাহা পালন করার সময় আমার নহে। লোক দেখাইবার জন্য কোনো কাজ করিব এমন অবকাশ এবং ইচ্ছা আমার নাই। আমি যে কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যাহাই হউক্ লোকের বৃথা কথায় তোমাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ হইতেছে ইহাতে আমি বেদনা বোধ করিলাম। একথা জানিয়ো সত্য-সাধনার পথ আরামের পথ নহে। এই পথে যদি প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে আঘাত পাইতেও অপমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে—ইহাতে কল্যাণ ছাড়া অনিষ্ট কিছু হইবে না। সত্যের প্রতি তোমাদের নিষ্ঠা দৃঢ়

হউক্ এবং মঙ্গলের পক্ষে তোমাদের জীবন অগ্রসর হউক্ এই আমি আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২০শে মাঘ, ১৩২৬।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র

ওঁ

শান্তিধাম।

কল্যাণীয়েসু

আমি নিজেই অন্ধ—তোমাকে পথ দেখাব কি করিয়া? এইটুকু অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সাধন-পথ পৃথক্। জ্ঞান, শিক্ষা, সংসর্গ, সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে প্রত্যেকের জীবন-গতি স্বতন্ত্র। ক্ষুদ্র মানব সে পথ হঠাৎ বলিয়া দিতে পারে না। ভগবান্ই তাকে নানা অবস্থায় ফেলিয়া তার প্রকৃত গন্তব্য পথ ঠিক্ করিয়া দেন্। তিনিই প্রত্যেকের যোগ্যতা ও অবস্থা অনুসারে আনন্দ দান করেন। ভাল চিন্তা কর, ভাল কাজ কর, ভাল সংসর্গে থাক; নিশ্চয়ই আনন্দ পাইবে, মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। যেমন "ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর" তিনে এক একে তিন তেমনি "সত্য সুন্দর মঙ্গল" তিনে এক, একে তিন। সত্য বুঝিবার চেষ্টা করিবে, সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করিবে, মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। সৎসাহিত্যে সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা হয়, উন্নত হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা হয়, মানসিক শক্তির চর্চ্চা হয়। তাই সাহিত্যের এত গৌরব। মনের বল অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবে। কু অভ্যাস যদি কিছু থাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িবার চেষ্টা করিবে। ইতি ৩রা আশ্বিন ১৩২৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী
জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর

বসন্তের দিনে

আজ
এ গন্ধে ভরা প্রাতে
আমার ললাটে,
বসন্তের অবাধ্য হরষ,
গোপনে রাখিয়া যায়,
তাহার চুম্বন-অতীত স্নিগ্ধতায়
তোমার শীতল অঙ্গুলি-পরশ।
যৌবনের ঝঙ্কারে
মাতাল আলোক-সিন্ধু পারে,
জ্বলিছে দীপ্ত জবাফুল
নাচিছে আমলকি মুকুল।
নিরাশ্রয়,
কম্পিত বৃন্তে মম হৃদয়
দুলে বিশ্বময়
প্রেমের আলো ছায়ার বিচিত্র ভুবনে,
মর্ম্মরিত তরঙ্গিত
অলকের নব পল্লবে লীলায়িত
তোমার
জ্যোৎস্না-ভেজা প্রেমছবির স্মৃতির সমীরণে।

শ্রীজাহাঙ্গীর বকীল

আশ্রম সংবাদ

বিশ্বভারতীর বিদ্যালয় বিভাগের ছাত্ররা যেমন প্রাইভেট ছাত্রভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারে তেমনি ইংরাজী ১৯২৬ সাল হইতে বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের ছাত্রেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ বি, এ পরীক্ষা দিতে পারিবে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষগণ

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়াইবার ব্যবস্থা আছে।

বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, সংস্কৃত, পালি, তিব্বতীয়, ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান, দর্শন, ইতিহাস, গণিত ও বোটানি। সবিশেষ জানিতে যাঁহারা ইচ্ছুক—বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষকে চিঠি লিখিলে তাঁহারা জানিতে পারিবেন।

বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গীতের ছাত্র ও অধ্যাপক শ্রীঅনাদি-কুমার দস্তিদার সম্প্রতি গান শিখাইবার জন্য কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ইনি পাঁচ বৎসর এখানে থাকিয়া আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের বহু গান শিখিয়া ও শিখাইয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের গান নিখুঁত-সুরে শিখিতে চান নিঃসন্দেহ তাঁরা ইঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন।

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে আশ্রমে অনেকগুলি ফুলের বাগান তৈরী হইয়াছে। উত্তরায়ণের ও সুরুল পথের চৌমাথায় ফুলের বাগিচাটি তাঁহার কঠিন পরিশ্রম ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচায়ক। এতৎ ব্যতীত সুরুল পথের উভয়পাশে ও পৌষ উৎসবের মেলা-ক্ষেত্রে অনেকগুলি বনস্পতির চারা দেওয়া হইয়াছে।

আষাঢ় মাসের শেষ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নাই—চাষের অবস্থা বড়ই খারাপ। সম্প্রতি কয়েকদিন হইল বর্ষা নামিয়াছে।

বর্ষা-মঙ্গল

গত ৩রা শ্রাবণ মহা সমারোহে বর্ষা-মঙ্গল সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে কলাভবনটিকে পদ্মে ও পদ্ম পাতায় ধূপে ও আলিপনায় সাজানো হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে আশ্রমবাসিগণ সমবেত হইলে প্রত্যেকের কপালে চন্দন লেপন করা হয় ও প্রত্যেককে একটি পদ্ম ও একখানি গীতি-পুথিকা বর্ষার মাঙ্গলিক প্রতীক স্বরূপ দেওয়া হয়। সভাতে স্বয়ং আচার্য্যদেব উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী বীণা বাদন করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী একটি হিন্দি গান করেন। তারপরে আচার্য্যদেব গানের দলকে লইয়া এতদুপলক্ষ্যে নির্দ্দিষ্ট পনেরোটি গান করেন। ইহার মধ্যে ছয়টি গান আধুনিকতম। ইহার পরে একজন মহিলা আচার্য্যদেবের লিখিত একটি গান গাহিয়া ছিলেন। পণ্ডিতজি এই গানটিতে সুর সংযোগ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-শেষে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া 'শান্তিনিকেতন' গানটি গাহিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

আলোচনা

সম্প্রতি দুইদিন পূজনীয় আচার্য্যদেব আশ্রমের অধ্যাপকগণের সহিত বিশ্বভারতী হইতে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা জন্য ছাত্র-প্রেরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশ্ব-ভারতীর ছাত্রগণেকে আই, এ ও বি, এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছেন। খবরটি নানা রকমে নানা জনের কাছে পৌঁছিয়াছে। আশঙ্কা হইতেছে সত্য ঘটনার চেয়ে গুজব-অংশই সকলকে অধিক আকৃষ্ট করিবে। অনেকে ভয় করিয়াছেন যে বিশ্ব-ভারতী বুঝি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের করদ বিদ্যালয় রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। বস্তুত কোনো-রূপ affiliation হয় নাই—কিম্বা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাহার কোনো নিয়ম ইহার উপরে খাটাইবে না বা বিশ্ব ভারতীর উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনো নিয়মের বাধ্যকতা মানিবে না। বিশ্ব-ভারতীর বিদ্যালয় বিভাগ হইতে যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ছাত্ররা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়—তাহাতে যেমন বিদ্যালয়ের বিশেষত কোনো অংশে খর্ব্ব হয় না—তেমনি স্বাধীন ভাবেই ছাত্ররা আই, এ ও বি, এ পরীক্ষা দিতে পারিবে। সত্য বটে তাহারা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পড়িতে বাধ্য হইবে কিন্তু বিশ্ব-ভারতীর কর্ত্তৃ-পক্ষগণ এমন ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে তাহারা এখানে থাকিয়া পরীক্ষায় পাঠ্য বহির্গত কোনো কোনো বিষয় শিখিতে পারে। বিশ্ব-ভারতীতে বিদ্যা চর্চ্চার যে বিপুল-

আয়োজন করা হইয়াছে—নানা কারণে তাহা কাজে লাগাইতে পারে এমন ছাত্রের খুবই অভাব। এই উপায়ে দ্বারমুক্ত হইলে—বয়স্ক ছাত্ররা আসিলে হয় তো তাহারা এই আয়োজনকে অন্তত কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সার্থক করিতে পারিবে। এইখানকার উদার মাঠের সরল জীবন যাত্রার মধ্যে, প্রকৃতির স্বহস্তের শুশ্রূষার মধ্যে ঋতু পরম্পরায় বৈতালিক—স্নান ও গানের আবহাওয়ার মধ্যে ছাত্ররা সহরের ঘূর্ণীব্যাত্যা হইতে বাড়িয়া উঠিবে—জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিবে—ইহাও কম লাভ নহে।

পরলোকগত অধ্যাপক রুদ্র

দিল্লী সেণ্টফেন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার রুদ্র মহাশয় সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

রুদ্র মহাশয় আশ্রমের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত ছিলেন—তিনি আশ্রমে অনেকবার আসিয়াছেন ও দুই একবার দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেব এক সময়ে সেণ্টফেন্স কলেজের অধ্যাপক ছিলেন অবশেষে এণ্ড্রুজ সাহেব এখানে আসিলে পর অধ্যাপক রুদ্র ও এখানে আসিতেন।

অধ্যাপক মহাশয় খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তিনি স্বধর্ম্মে-বিশ্বাস করিয়াও স্বাভাবিক উদারতা গুণে হিন্দু মুসলমানের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিয়া ছিলেন। আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে জানিনা—কিছু জানি, একবার দিল্লীতে তাঁহার বাড়ীতে অতিথিরূপে থাকিয়া ও আশ্রমে কয়েকবার দেখিয়া বুঝিয়াছি কিরূপে তিনি মহাত্মা গান্ধী এবং আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের মত মহাপুরুষদের বন্ধুরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব করিয়াও নিরুদ্ধত এবং সদা জাগ্রত একটি ব্যক্তিত্বের তিনি মালিক ছিলেন। তিনি এই অসামান্য ব্যক্তিত্বের গুণে কলেজের ছাত্র হইতে মহাত্মাজীর মত ব্যক্তির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। আজ কালকার এই বিদ্বেষ-বিষের দিনে তাঁহার মৃত্যুতে সমূহ ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা অনুভব করিতেছি।

বিশ্ব-ভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুত জাহাঙ্গীর জীবাজী বকিল মহাশয় তাঁহার পুরাতন বাসা ত্যাগ করিয়া সুরুল-পথের ধারের একটি বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছেন।

পূজনীয় আচার্য্যদেবের সহিত শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ইটালি যাইবেন স্থির হইয়াছে।

ভ্রমক্রমে গত মাসে আমরা শ্রীযদুকিশোর ভট্টাচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। ভট্টাচার্য্য স্থলে চক্রবর্ত্তী হইবে।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ কালিপদ রায়ের গত জ্যৈষ্ঠ মাসে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতের কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা অনেকদিন হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি ছাত্ররা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিষয়ে শিক্ষা পাইতেছে। ছুতারি, বয়ন বিদ্যা, সব্জী বাগান, পথ-প্রস্তুতি, ইত্যাদি। ছাত্রীরা রন্ধন বিদ্যা ও সেলাই শিখিতেছেন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

নানা অনিবার্য্য কারণে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল। অনেকেই পত্র লিখিয়া খোঁজ লইয়াছেন—আমাদের পক্ষে সকলের পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এই বিলম্ব-ঘটার জন্য ওজুহাত দেখান বৃথা; আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। আশা করি শ্রাবণ হইতে যথাসময়ে কাগজ পাঠাইতে পারিব।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ } শ্রাবণ, সন ১৩৩২ সাল। { ৭ম সংখ্যা

There is many a slip between the cup and the lip.

হাতে আছে পাত্র-খানা
ঠোঁটে পাবে কূল।
মাঝের পথে বাগড়া নানা
বলে জোহান বুল॥ (John Bull)

বিলম্বে হয় কার্য্য হানি
শাস্ত্রে দেয় বিধি।
শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি
বলে বিদ্যানিধি॥

"অতএব" বলে তরকরতন,
"শুভস্য শীঘ্রং"।
বাজি উঠে ঘড়ি বহু পুরাতন
ঘ্রং ঘ্রং ঘ্রং ঘ্রং॥

শিশুগণ ক্ষান্ত দিয়া পাঠে
বিদ্যালয় ভঙ্গে।
ছুটিয়া চলিল খ্যালা'র মাঠে
সবাই এক সঙ্গে॥

বলিতে বলিতে চলিল ছুটি
করিয়া চীৎকার।
ঘ্রং ঘ্রং ঘ্রং শীঘ্রং
তাদেরে থামান ভার॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ষা-মঙ্গল

১

ধরণী দূরে চেয়ে
কেন আজ আছিস্ জেগে,
যেন কার উত্তরীয়ের
পরশের হরষ লেগে।
আজি কার মিলন গীতি
ধ্বনিছে কানন বীথি,
মুখে চায় কোন্ অতিথি
আষাঢ়ের নবীন মেঘে।
ঘিরেছিস্ মাথার বসন
কদমের কুসুম ডোরে।
সেজেছিস্ নয়ন পাতে
নীলিমার কাজল পরে।
তোমার ঐ বক্ষতলে
নবশ্যাম দুর্ব্বাদলে
আলোকের ঝলক ঝলে
পরাণের পুলক বেগে।

২

গহনরাতে শ্রাবণ ধারা পড়িছে ঝরে
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে?
এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা,
জলের রেখা।
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে।
না হয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে
মনের কথা শয়ন দ্বারে!
না হয় রেখো মালতী-কলি শিথিল কেশে
নীরবে এসে
না হয় রাখী পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে।

৩

আজি ঐ আকাশ পরে সুধায় ভরে
আষাঢ় মেঘের ফাঁক।
আমার হৃদয় মাঝে মধুর বাজে
কি উৎসবের শাঁখ॥
একি হাসির বাঁশির তান?
একি চোখের জলের গান?
পাইনে দিশে কে জানি সে
দিল আমায় ডাক॥
আমায় নিরুদ্দেশের পানে
কেমন করে টানে
এমন করুণ গানে।
ঐ পথের পরে আলো
আমার লাগল চোখে ভালো,
গগন পারে দেখি কারে
সুদূর নির্ব্বাক্॥

৪

যেতে দাও গেল যারা,
তুমি যেয়োনা যেয়োনা
আমার বাদলের গান
হয়নি সারা।
কুটীরে কুটীরে বন্ধ দ্বার,
নিভৃত রজনী অন্ধকার,
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল,
অধীর সমীর তন্দ্রাহারা।
দীপ নিবেছে নিবুক নাকো
আঁধারে তব, পরশ রাখ।

দুইটি দীপাধার আলোকিত; টেবিলের কাগজ পত্রের মধ্যে একটি মূর্ত্তির তিনটি ছায়াপাত।

দেয়ালের উঁচুতে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো বড় একখানি ছবি। অশ্বারোহী মূর্ত্তি—ছুটবার পূর্ব্বে ঘোড়াটির গা ঝাড়া দেওয়া—লেজ সোজা—কান খাড়া—নাক প্রস্ফুরিত—যেন চার পায়ের শক্তি অনুমান করিয়া লইতেছে। শিকারী কুকুরটি ছুটিবার পূর্ব্বে লাফ দিয়াছে—সামনের পাদুটির কে কাহার আগে পড়িবে—পিছনের পা দুটি অনেকটা উঁচুতে।

ঘর গরম করিবার উনুনটিতে টাটকা আগুন গন্‌গন্ করিতেছে। আগুন লাগিয়া ঈষৎ নীল কাঠের টুকরাগুলি—ক্ষীণ পীত হইয়া ক্রমে লাল এবং শাদা হইয়া গৃহদেবীর মৃদু মঙ্গল ভাষনের মত মর্ম্মর শব্দ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। আরামজনক একটি উষ্ণতা গরম কম্বলের মত শরীর আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

এই কক্ষের দিকে, এই বাতায়নের মধ্যে, এই লোকটির মুখে কথা-তৃষার্ত্ত সমস্ত ইউরোপ তাকাইয়া আছে; ইনিই ঔপন্যাসিক স্যর ওয়াল্টার স্কট্।

২

শেলী

পাইন বনের ছায়ায় ঘন, শ্যাওলা ধরা গাছের তলায়, শুকনো ঝরা, শিশির-ভেজা, পাতার চিকন আচ্ছাদনে, ওই যে কবি ওই। রুক্ষ চুলের সোনার ধারা হিল্লোলিত বায়। হায় ঝড়ের মুখে পথ ভোলা দুই বিহঙ্গমের প্রায়! কিম্বা যেন ভোরের তারা—পায়না খুঁজে পথ—আলোর বানে হারিয়ে গেছে যা। মানস-গামী হাঁসের দলে ডাক্‌তে গিয়ে ভুলে, ঠোঁটের থেকে পদ্মকলি হঠাৎ যদি পড়ে, তেমনি তরো নরম বড় ছোট্ট হাতের মুঠি, কোলের উপর অবাক্ শুয়ে তার। মানব মনের বীণার তারের সকলগুলি তার, ইচ্ছা সুখে বাজিয়ে যেতে পারতো যে আঙ্গুল, আজকে তারা ছুটির ছাড়া কর্ম্মহারা রে।

কার কথা কবি ভাবিছ একেলা বনের তলে। দুঃখে কাহারা মরিল! অত্যাচারীর রূঢ় পদতলে, গূঢ়গুহাতলে দর্পিতের! রক্তে কোথায় ভেসে গেল পথ—শিলাসারি তবু অচপল। কোথায় প্রভাত আশার স্নিগ্ধ দুঃখ-ডোবানো জ্যোতি—রক্তসাঁঝের মত্তপাথারে ডুবিয়া মরিল রে! অহঙ্কারীর অসি-আরোরার খল-বিদ্রূপ-হাসি মিলালো কোথায় মেরুর আকাশে নিঃশ্বাস-জমা শীতে। ইচ্ছা করে কি ঘূর্ণী হইয়া ছিঁড়ে ফেল সবার বাধা—উর্ণজালের মত। ইচ্ছা করে কি প্রলয়পিনাক দুইহাতে তুলে ধরি! ইচ্ছা করে কি তট-উচ্ছাসি সিন্ধু ঢেউয়ের মত। ইচ্ছা করে কি মহা ঝটিকার রুদ্র হাতের তলে—মর্ম্মর বাণী অরণ্য বীণা সম, গেয়ে ওঠো গান বক্ষভরি।

তাই গাও কবি তাই। সুরের সোপান গেঁথে দাও ধীরে। সুরের সেতুটি মহা! বল বল কবি কেন চিরদিন রামধনু নাহি গাঁথে—আলোকের সেতু পাগলা-ঝোরার বুকে! কোন্ লক্ষীর কর আরাধনা কোথা কৌতুকময়ী! থনেথনে ছায়া ফেলে ফেলে যায় থনে থনে উদাসীন। দেবে কি সে দেখা আর। একদা কখন্ নব বসন্তদিনে পাতায় পাতায় প্রেম-কানাকানি, উখু খুসু তৃণে তৃণে—আলোকের কূলে বদ্ধ কুঁড়িরা কেবল এসেছে যবে, অন্ধ আবেগে বিস্মিত হ'য়ে ফুকারি উঠিলে কবি—অমর হইল আত্মা আমার, সকল শক্তি মোর তোমার সেবায় তব পদতলে করিনু করিনু দান।

গান

আজিকে এই সকাল বেলাতে
বসে' আছি আমার প্রাণের
স্থরটি মেলাতে ।
আকাশে ঐ অরুণ রাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলো ছায়ার
মায়ার খেলাতে ॥
নীলিমা এই নিলীন হ'ল
আমার চেতনায় ।
সোনার আভা মিলিয়ে গেল
মনের কামনায় ।
লোকান্তরের ওপার হ'তে
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ঐ
মেঘের ভেলাতে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি

II দ্‌া ণ্‌া সা -ঋা । ঋজ্ঞা -ঋা সা -ঋা I ঋমা -া -া -া । -া -া মজ্ঞা ঋা I
আ জি কে ০ এ ০ ই স ০ কা ০ ০ ০ ০ ল্ বে লা

॥
সা -া সঋা ণ্‌া । সা -ঋা জ্ঞা -সা I -া -া -া -া । সা -দা দা -া I দপা -া দা -দপা ।
তে ০ ব ০ সে আ ০ ছি ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ মা র প্রা ০ ণে র ০

পমা -পা পমা -া I -পা -পমা মজ্ঞা রা । মজ্ঞা -া -া -া II
স্থ র্ টি ০ ০ ০ ০ মে লা তে ০ ০ ০

-া -া। -া -া -া -া II { সা -দা দা -া। পা -া পা -র্সা I র্সণা -া দা দপা। মা
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ কা ০ শে ০ ঐ ০ অ ০ রু ণ ০ রা

-পা পমা -া I মা -পা দা দপা। পমা -া -া -া I মা -পা পমা জ্ঞা। মজ্ঞা -রা
০ গে ০ ম ০ ধু র ০ তা ০ ০ ন্ ক ০ রু ণ লা ০

মজ্ঞা -ঋা } I সা -ঋা জ্ঞা -া। জ্ঞা -রা মজ্ঞা -া I -া -া -ঋা -সা। দ্‌ -ণ্‌ ণ্‌ -সা I
গে ০ বা ০ তা স মা ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ লো ০

সা -া সঋা -ণ্‌। সা -ঋা জ্ঞা -া I -া -া ঋা ঋা। সা -া -া -া II
ছা ০ য়া০ র্ মা ০ য়া ০ ০ র্ খে লা তে ০ ০ ০

II সা -দা দা -া। পা -া পা -া I পা -র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সা -দা I দা -া পা -ণা।
নী ০ লি ০ মা ০ এ ই নি ০ লী ন হ ০ ল ০ আ ০ মা র্

ণা -দা দা -া I পা -া -া -া। -দা -া -মা -া I মা -পা পা -ণা। ণা -দা দা -পা I
চে ০ ত ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ সো ০ না র্ আ ০ ভা ০

পমা পা মা -পমা। জ্ঞা -রা মজ্ঞা -া I { সা -ঋা জ্ঞা মা। মজ্ঞা -া ঋা -জ্ঞঋা I
মি লি য়ে ০০ গে ০ ল ০ ম ০ নে র কা ০ ম ০০

সা -া -া (-জ্ঞা। জ্ঞা -রা মজ্ঞা -া) } I -া। -া -া -া -া I দা -া দা -া। ণা -া র্সা -া I
না ০ ০ য়্ আ ০ মা র্ য়্ ০ ০ ০ ০ লো ০ কা ন্ ত ০ রে র্

ঋর্া -া র্সা -া। র্সণা -া র্সা -া I র্সণা -া -র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞঋর্া -া -া -র্জ্ঞঋর্া I ঋর্সা -া -া -া।
ও ০ পা র্ হ ০ তে ০ কে ০ ০ উ দা ০ ০ ০ ০ সী ০ ০ ০

-া -া -া -ঋর্া I ণা -া র্সা -ঋর্া। ঋর্া -া র্সা -া I ণা -দা পা -ণা। পদা -া পা -া I
০ ০ ০ ০ বা ০ যু র্ স্রো ০ তে ০ ভে ০ সে ০ বে ০ ড়া য়্

-া -া -া -া। দা -র্সা র্সা -ণা I ণা -া দা -দপা। মা -পা পমা -া I -মা -পমা মজ্ঞা রা।
০ ০ ০ ০ দি ০ গ ন্ তে ০ ঐ ০০ মে ০ ঘে র্ ০ ০০ ভে লা

মজ্ঞা -া -া -া II II
তে ০ ০ ০

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার।

আলোচনা

শিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ের গড়া কৃত্রিম সামগ্রী করে তুল্‌লে তার অনেকখানিই আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়। এতে জীবনারম্ভের সুদীর্ঘকাল প্রতিদিন মনক্লিষ্ট হয়ে তার স্বাভাবিক শক্তি কত যে নষ্ট হয় আমরা তার হিসাব স্পষ্ট আকারে দেখ্‌তে পাইনে বলেই বুঝতে পারিনে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য এই যে, এখানে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষাকে তাদের অখণ্ড প্রাণপ্রকৃতির ও মনপ্রকৃতির বিচিত্রলীলার অঙ্গরূপেই যেন গ্রহণ করতে পারে।

এই লক্ষ্য যদি যথার্থভাবে আমরা সাধন করি তবে এখানকার ছাত্রছাত্রী এখানকার শিক্ষক ও তাঁদের পরিজনবর্গের পক্ষে এই বিদ্যালয় যথার্থ আশ্রম হয়ে উঠ্‌বে, ইস্কুল হয়ে থাকবেনা।

প্রাচীনকালে একদিন ভারতবর্ষে এই আদর্শই প্রচলিত ছিল এবং আধুনিককালে টোল চতুষ্পাঠীতেও এই আদর্শকেই অনেক পরিমাণে স্বীকার করা হয়।

―――০―――

এই আদর্শকে যদি মানি তবে প্রথম দরকার বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এখানকার শিশুদের আন্তরিক যোগসাধন। লোকালয়ের কৃত্রিম জীবনযাত্রায় এই যোগ বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়।

শান্তিনিকেতন কোনো সহরের মধ্যে না থাকাতে আমাদের এই লক্ষ্য আপনা আপনিই অনেক পরিমাণে সাধিত হচ্চে। তা ছাড়া এখানকার গান ও ঋতু উৎসব প্রভৃতিও এ সম্বন্ধে আমাদের আনুকুল্য করে।

কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যহিক সাধনারও প্রয়োজন আছে। এই সাধনা সফল হয় জ্ঞানে এবং কাজে।

এই আশ্রমে গাছপালা পশুপাখী যা-কিছু আছে ছাত্রেরা তাদের সম্পূর্ণভাবে জান্‌বে এটি খুবই দরকার। এখানে বাস করে অথচ তারা এদের লক্ষ্যগোচরই হয় না এর চেয়ে ক্ষতি আর কিছুই নেই। বাহিরের সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সকলেরই এই যে একটা স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আছে তার দ্বারা আমাদের মনকে আমরা বঞ্চিত করি। আমাদের অধ্যাপনায় পুঁথিগত বিদ্যার পরেই আমাদের একান্ত সতর্কতা, কিন্তু কত বিদ্যা আমাদের চোখের কাছে কানের কাছে হাতের কাছে আমাদের মনোযোগের প্রতি অপেক্ষা ক'রে প্রত্যহই ব্যর্থ হয়ে যাচ্চে। তা'তে করে কেবল-যে একটা দেশ-জোড়া চিত্তদৈন্য ঘট্‌চে তা নয় দেশের প্রতি আমাদের অনুরাগের সম্পূর্ণতাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্চে।

আশ্রমে কত গাছপালা আছে, তাদের কার কত সংখ্যা, তাদের কখন্ প্রথম ফুল ধর্‌ল, ফল ধর্‌ল, পাতা ঝর্‌ল, পাতা উঠ্‌ল, তাদের ডালপালা শিকড় প্রভৃতির আকৃতি ও প্রকৃতি কি রকম, নিজের পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা যাতে ছেলেরা তা জানে তার উৎসাহ দেওয়া ও ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। পশুপাখী এমন কি কীটপতঙ্গ সম্বন্ধেও এই একই কথা।

এই অল্প পরিধির মধ্যে বাহিরের বিশ্বের যা-কিছু জান্‌বার বিষয় আছে তাদের সুপরিচিত করে নেওয়া দুঃসাধ্য নয়। এর মধ্যে শক্ত হবে, যিনি পরিচয় সাধনে সহায়তা করবেন এমন একজন সুদক্ষ উৎসাহী চোখ-কান-খোলা মানুষ পাওয়া।

শিক্ষায় এই যেমন জানার দিক্ তেমনি আবার কাজের দিক্‌ও আছে। আশ্রমের গাছপালা পশুপাখীকে সেবা করাও একটা বড় সাধনা। বিশেষ বিশেষ ছেলে আশ্রমের বিশেষ বিশেষ গাছের ভার নিয়ে তাতে জল দেওয়া, তার গোড়া খুঁড়ে দেওয়া সার দেওয়া প্রভৃতি প্রাত্যহিক কাজের দ্বারা তার প্রতি মমতার চর্চ্চা করে এরও একটা বড় শিক্ষা আছে। তেমনি স্থানে স্থানে কাঠবিড়ালী পাখী প্রভৃতির জন্যে তারা পানীয় ও নিজের খাদ্যের অংশ রেখে দেবার ব্যবস্থা করে দেয় এটাও চাই। এরও বাধা হচ্চে লোকের অভাব।

ছেলেদের উৎসাহকে সর্ব্বদা সজীব করে রাখতে পারে এমন একজন অনুরাগী কর্ম্মশীল লোক পাওয়া চাই। যিনি নিজে উদাসীন তিনি কেবল নিয়মে বাধ্য হয়ে এই সকল কাজে ছাত্রদের আনুকূল্য করতে পারেন না।

আশ্রমের ভিতরে ও বাইরে নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল পথ আছে তার দুইধারে ছেলেমেয়েরা নিজের জন্মদিন বা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে একটি একটি গাছ রোপণ করে সেই গাছ রক্ষার ভার নিজেরা নেবে। সেই গাছের সঙ্গে রোপণকর্ত্তার নামের ফলক সংলগ্ন থাকবে। ছুটির পূর্ব্বে রোপণকর্ত্তারা যদি দুই চার আনা বেতন স্বরূপ দিয়ে যায় তবে সেই কয়মাসের জন্য গাছগুলিকে রক্ষা করবার মালী পাওয়া কঠিন হবে না।

এই যেমন প্রকৃতির সঙ্গে যোগের কথা হল তেমনি লোকালয়ের সঙ্গে যোগও চাই। ভুবনডাঙ্গা গ্রাম ও সাঁওতালপাড়াগুলির সম্যক্ পরিচয় য'তে ছেলেরা পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাদের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের যোগে সেবার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যক। পিয়র্সন যখন ছিলেন তখন এই কাজ যতটা সজীব ছিল এখন ততটা নেই বলে আশঙ্কা করচি।

আশ্রমে ব্রতীবালক সম্প্রদায় গড়া হয়েছে। নিকটবর্ত্তী পাড়ায় ব্রতীসম্প্রদায় স্থাপন ক'রে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চারিদিকের পাড়ার কাজ আমাদের ভালো করে চালাতে হবে। এই ব্রতীকৃত্য শিক্ষা আমাদের অন্য কোন শিক্ষার চেয়ে কম গুরুতর নয়।

আশ্রমের মধ্যে যেখানে কোনো জঙ্গল বা গর্ত্ত ডোবা আছে, যেখানে চলাচলের রাস্তা ভেঙে চুরে গেছে, যেখানেই কোথাও জল জ'মে মশার, ও ময়লা জমে মাছির উৎপত্তির কারণ হয়েছে, সেইখানেই সংস্কার কার্য্যে ব্রতীরা যেন মনোযোগ করে। ছেলেদের শোবার ঘরের মেঝে ও তাদের বিছানাপত্র মাঝে মাঝে কার্ব্বলিক জল প্রভৃতি পূতিনাশক পদার্থ দ্বারা বিশেষ বিশেষ দিনে ভালো করে ধুইয়ে দেওয়াও তাদের কাজ। ছেলেদের বিছানায় ছারপোকা প্রভৃতির উৎপাত যদি ঘটে তাও বিহিত প্রণালীতে দূর করবার ভার তাদের পরে।

যে আদর্শের কথা গোড়ায় বলেছি তাকে রক্ষা করতে হলে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ কেবল শিক্ষাদানের সম্বন্ধ হলে চলবে না, যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধ হওয়া চাই। যখন ছাত্রসংখ্যা অল্প ছিল তখন শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের যোগ যত ঘনিষ্ঠ ছিল এখন ততটা থাকা দুঃসাধ্য। কিন্তু তা হলেও এই আত্মীয় সম্বন্ধকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা চাই।

ছোট ছেলেদের খাওয়ানোর ভার গুরুপল্লীর গৃহিনীদের মধ্যে ভাগ করে দেবার প্রস্তাব এক সময় আমি করেছিলুম। তার অনেক আর্থিক বাধা আছে জানি, সেই বাধা দূর করা সম্ভবপর কিনা সে কথা আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত। গুরুপল্লীর সঙ্গে ছাত্রনিবাসের স্নেহ সেবার সম্বন্ধ নানা উপায়ে নানা উপলক্ষ্যে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের প্রত্যেক ছাত্রনিবাস এক-একটি গুরুপরিবারের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়া যদি অবাধে সম্ভবপর হতে পারত তবে সেইটেই সব চেয়ে ভালো হ'ত।

আর একটি গুরুতর শিক্ষার বিষয় আছে সেটি হচ্চে লোক ব্যবহার। মানুষ সামাজিক জীব এইজন্যে যেমন তার সামাজিক নীতি আছে তেমনি তার সামাজিক রীতিও আছে। সেই রীতি পালনের দ্বারা মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক সুন্দর ও সুসহ হয়।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে অন্তত বাংলা দেশে গ্রাম্যসমাজের রীতিই প্রচলিত ছিল এবং কিছু কিছু পরিমাণে এখনো আছে। অর্থাৎ বাপ দাদা ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে ব্যবহার করবার যোগ্য আমাদের অধিকাংশ কায়দা-কানুন। তা ছাড়া এক জাতের সম্পর্কে আর এক জাতের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত তারও একটা বাঁধা নিয়ম সমাজে

পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল শিক্ষাঘটিত ও অর্থঘটিত পরিবর্তনে গ্রাম্যজীবনের সংস্কারগুলি অনেক নষ্ট এবং অনেক শিথিল হয়ে গেছে। সুতরাং সে সমাজের রীতিও নেই আর সাধারণভাবে পৃথিবীর দূর নিকট সকল মানুষের সঙ্গে আমাদের কি রকম ব্যবহার করা শোভন তারও কোনো রীতি আমাদের অভ্যস্ত হয়নি। এমনতর রীতি রিক্ততার মত কুশ্রী আর কিছুই হতে পারে না। নিজের ব্যবহারে এই রকম রূঢ়তা যে আমাদের নিজের পক্ষেই অপমানজনক তাও আমরা বুঝতে পারিনে।

আমার শরীর যখন সুস্থ ছিল এবং ছাত্রদের সঙ্গে যখন সর্ব্বদা নিকট সংস্রব ছিল তখন তারা যাতে পরস্পরের ও অন্য সকলের প্রতি ভদ্ররীতি রক্ষা করে চলে তার প্রতি বিশেষ সতর্ক ছিলুম।

এখন কেবল যে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেছে তা নয়, অন্য দেশ ও প্রদেশ থেকে ছাত্র আসচে। তা ছাড়া বয়স্ক ছাত্র, যাঁরা অন্যত্র কিছু পরিমাণে শিক্ষা সমাধা ক'রে এখানে যোগ দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যাও প্রতিদিন বেড়ে চলেচে। এঁদের পরস্পরের মধ্যে অন্তরের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠা ত চাইই কিন্তু বাহিরের রীতি সুন্দর হওয়া সর্ব্বাগ্রে দরকার। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্বীকারের প্রথম ও সাধারণ উপায় হচ্চে অভিবাদন ও নমস্কার। এ সম্বন্ধে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে ভদ্র অভ্যাস পাকা করিয়ে দেওয়া চাই।

ছাত্রেরা আপন পরিবারের বাহিরে গুরুজনের পাদগ্রহণ করবে এটা আমি পালনীয় মনে করিনে। কিন্তু নত হয়ে নমস্কার করা তাদের কর্ত্তব্য। আর তাঁরা সম্মুখে এলে উঠে দাঁড়ানো চাই। যেখানে অনেকে সমবেত, সেখানে সকলে মিলে একসঙ্গে নমস্কার করাই শোভন। কোনো সভার অধিবেশনকালে বা ক্লাসে গুরুজনের আগমনে আসন ত্যাগ ক'রে ওঠা সাধারণত অনাবশ্যক। কিন্তু শিক্ষক যখন ক্লাসে প্রবেশ করেন তখন ছাত্রেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করবে; অথবা ক্লাসে বা অন্যত্র যেখানে শিক্ষকেরা কেউ বসে আছেন তাঁদের অভিবাদন না করে ছাত্রেরা আসন গ্রহণ করবেনা। গুরুপত্নীদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। বাহিরের অতিথিরা দর্শকরূপে ক্লাসে উপস্থিত হলে ছাত্রেরা সমবেতভাবে তাঁদের নমস্কার করবে। দিনের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকালে ছাত্রেরা পরস্পরকে নমস্কার করবে। ছাত্রনিবাসে কোনো অতিথি এলে ছাত্রেরা তাঁকে নমস্কার করবে ও তাঁর প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে তার যথোচিত ব্যবস্থা করবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে অতিথিসেবা সম্বন্ধে ছাত্রেরা বিশেষ ভার গ্রহণ করত। এখন তার ত্রুটি হচ্চে বলে আশঙ্কা করি,—আবার তার ভালো ক'রে প্রবর্ত্তন করা দরকার।

ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে যে সব ছাত্র আসে বাঙালী ছাত্রদের জানা উচিত যে তারা বিশেষভাবে তাদেরই অতিথি। সকল বিষয়ে তাদের আনুকূল্য করা বাঙালী ছাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং যাতে সেই সকল অন্য প্রদেশের ছাত্র দলছাড়া হয়ে না পড়ে এটাও তাদের দেখতে হবে।

সকল কাজে সময় পালন করাও এই রীতিপালনেরই অঙ্গ। ক্লাসে, সভায়, উপাসনাগৃহে বা ভোজনশালায় যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়া অন্যদের প্রতি অসম্মান একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

মন্দিরে ক্লাসে বা সভায় অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াও অভদ্রতা। ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে মুসলমানদের আচার ভদ্র আচার। আশ্রমে কোন্ বিশেষ পরিচ্ছদ ছাত্রদের ও শিক্ষকদের সভায় বা মিলন অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য্য তা সকলে পরামর্শ করে স্থির করা ও প্রচলিত করা উচিত।

কিছুকাল পূর্ব্বে ছেলেরা পালা করে পরিবেষণ করত এখন সে নিয়ম আছে কিনা জানিনে, কিন্তু থাকা উচিত।

বাস সম্বন্ধেও ভদ্রতার রীতি আছে। ঘর ও ঘরের আসবাব ও নিজের ব্যবহার্য্য সামগ্রী নোংরা ও কদর্য্য হ'তে দেওয়া অভদ্রোচিত এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর আদর্শ আমাদের আশ্রমে থাকে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

ছাত্রদের নিজের যত্নে ও নৈপুণ্যে ছাত্রনিবাসের চারিদিক

যদি কাঁকর দেওয়া রাস্তায় ও ফুলগাছে মনোরম হতে পারে তবে তার মধ্যেও ছাত্রদের আত্মসম্মান-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভদ্ররীতি পালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া এবং ছাত্রদের সতর্ক রাখা একজন কোনো বিশেষ পরিদর্শকের বিশেষ ও নিত্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। নইলে নিয়ম কোনো কাজেই লাগ্‌বে না। সাধারণভাবে শিক্ষকদের উপর ভার দিলেও সমস্ত ব্যর্থ হবে।

———০———

এখানে ছাত্রদের মধ্যে লৌকিকতার চর্চ্চাও তাদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ।

পালাক্রমে এক একটি ছাত্রনিবাস তার প্রতিবেশী ছাত্রনিবাসের ছেলেদের সম্মিলনীতে নিমন্ত্রণ করে সঙ্গীত, অভিনয়, খেলা ও সৌজন্য দ্বারা তাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে। নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়া শ্রেয় মনে করিনে।

শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যেও এরকম নিমন্ত্রণ হতে পারে।

———০———

এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বলবার আছে। এখানকার আশ্রমে যে সাধারণ বিদ্যালয়ের মত একটা তৈরি করা জিনিষ এখানে কেবল যে কিছুকালের জন্য ছাত্রেরা বাইরে থেকে এসে প্রবেশ করে এবং কিছুকাল পরে বাইরে চলে যায় এমন ধারণা যেন তাদের কিছুতে না হয়। তারা যেন অনুভব করে যে, তারাও এ'কে গড়ে তুলচে, জানে যে তারা এর প্রাণ। বিদ্যালয়ের নানা প্রকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের নিজের ইচ্ছায় চালনার বহুবিধ উপায় করে দেওয়া কর্ত্তব্য, নানাপ্রকার কাজে তাদেরও সম্মতির স্থান থাকা চাই। এ'তে তাদের সেই আত্মকর্ত্তৃত্বের চর্চ্চা হয় যে কর্ত্তৃত্ব দায়িত্ববোধের দ্বারা পদে পদে নিয়ন্ত্রিত।

———০———

ছাত্রদের শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা অল্প কথায় শেষ করা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে যে কথাটা আমার কাছে সকলের চেয়ে গুরুতর বলে মনে হয় সেইটিমাত্র আমি লিপিবদ্ধ করতে ইচ্ছা করি।

মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে। পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বল লাভ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণত পুঁথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই করে নিয়ে আর সমস্তকে অস্বীকার করি। পাশ্চাত্য সমাজে বিদ্যালয়ের বাহিরেও নানা উপায়ে স্কুল কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব পূরণ করে দেয়। আমাদের দেশে স্কুল কলেজের বাহিরে ছাত্রদের অন্য শিক্ষার ক্ষেত্র নেই বল্লেই হয়। তাই নোট নেওয়া মুখস্থ করা বিদ্যায় তাদের মন যে পরিমাণ বস্তু পায় সে পরিমাণ খাদ্য পায়না।

দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি তার কারণই এই যে শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবী কোনোই আমল পায়না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।

দেহের চর্চ্চা বল্‌তে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চ্চা বল্‌চিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে-সব কাজ করতে পারি সেই সব কাজের চর্চ্চা—সেই চর্চ্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয় তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে।

আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোনো না কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চ্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। যে-সব ছেলেকে আমরা নির্ব্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্তচিত্ত এই দৈহিক কর্ম্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়।

তা ছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যত বড় পণ্ডিতই হোক্ সংসার-ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবত কোনো কোনো অভিভাবকের কাছ থেকে আমরা বাধা পাব কিন্তু সে বাধাকে স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য হবে না।

দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে ভালোরকম মিল করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়। এই কারণেই আমি মনে করি পথচারী বিদ্যালয়ই বিদ্যালয়ের আদর্শ। ইস্কুলের বদ্ধ ঘরে শিক্ষা দিলে আমাদের জীবনলীলার অধিকাংশ উদ্যমই সেই শিক্ষাপ্রণালী থেকে বাদ পড়ে। যেমন খাঁচার শিক্ষায় পাখীকে বুলি শেখানো অসম্ভব হয় না, কিন্তু তাকে উড়তে শেখানো যায় না।

ভ্রমণ করতে করতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। তার কারণ কেবলমাত্র এ নয় যে, ভ্রমণে নানা বিষয় পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা আয়ত্ত হয়, তার কারণ এই যে, নিত্যই নূতনের সংযোগে এবং অন্তর বাহির উভয়ের সম্মিলিত পদক্ষেপে আমাদের জাগরূক চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই উৎসুক হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় ছাত্রেরা শিক্ষার বিষয় যা-কিছু পায় তাকে গ্রহণ করা তার পক্ষে সহজ হয়। প্রাণবান মানুষের পক্ষে এই রকম জঙ্গম শিক্ষা প্রণালীই সম্পূর্ণ ফলদায়ক ক্লাসে বদ্ধ স্থাবর শিক্ষা প্রণালীতে তার দেহে মনে আত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। তাতে দেহ থেকে যায় অনিপুণ, মন থেকে যায় নিরুদ্যোগী। তাতে বাক্য পরিচয়ের অভ্যাস হয় বিষয় পরিচয়ের অভ্যাস হয় না।

অনেককাল থেকে বিশ্বভারতীর যোগে এই রকম পথচারী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প মনে পোষণ করে রেখেছি। দেশের লোকের কাছে আবেদনকে সার্থক করবার শক্তি যদি আমার থাকত আর ভিক্ষায় যদি ক্ষুদ্ না মিলে ধানও মিল্‌ত, তা হলে অনেককাল আগেই এ কাজে প্রবৃত্ত হতুম। মরবার আগে এ কাজ প্রবর্ত্তন করে যাব এমন আশা এখনো ছাড়িনি। কেননা যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

আপাতত দেশ প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর প্রাচীর-ঘেরা সঙ্কীর্ণক্ষেত্রের মধ্যে ছাত্রদের দেহ মনের যতটা চালনা সম্ভব তারই দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নামকরণ

রামের জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণ লেখা হইয়াছিল—বেচারী রাম লিখিত সত্যের একটি কথারও প্রতিবাদ করিবার অবকাশ পান নাই। সীতাদেবীকে ত্যাগ করায় রামের অপরাধ হইয়াছিল—এমন একটা কথা শোনা যায়—কিন্তু সেটা যে রামের অপরাধ—বাল্মীকির নয় তাহা কে বলিল?

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটি ঘটনা ঘটে। আমি নামকরণের কথা ভাবিতেছি। সারা জীবন যে জিনিষটা লইয়া মানুষের ব্যবহার করিতে হয়, যাহা মানুষের সব হইতে আপন, তাহার নির্ণয়তা সম্বন্ধে তাহার একটুও হাত নাই; আমি বলিব ইহাও রামের জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণ লেখার মত—জন্মের পূর্ব্বেই বটে কারণ যখন নামকরণ হয় তখন মানুষের আসল জন্মটাই হয় না—যাহাকে বলি জ্ঞান জন্ম যে হিসাবে প্রত্যেক মানুষই দ্বিজ।

পিতামাতার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় পুত্রের পোষাক পরিচ্ছদে—সেবার পরিচয় পাওয়া যায় পুত্রের দেহের মধ্যে—সুরুচির পরিচয় ফুটিয়া ওঠে তাহার নামকরণের উপলক্ষ্যে। কিন্তু হঠাৎ যখন এক একটা নাম মুগুরের আঘাতের আসিয়া

পড়ে জগদম্বা বা ভোম্বলদাস—তখন ভাবি পিতামাতা এতবড় অন্যায় কি করিয়া পুত্র কন্যার প্রতি করিতে পারেন? ইংরাজীতে আছে "সৌজন্য করিতে খরচ লাগে না"—আমি বলি নামকরণ করিতে খরচ আরো কম। একটু ভাবিয়া, একটু ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, না হয় বাড়ীর পাশের পড়শীকে পুছিয়া—শুধু একটা নাম—শুনিতে একটু মিষ্টি আর কিছু নয়।

আসল কথা ছেলে ছোট থাকিলে তাহাকে যাহা তাহা পরাইয়া রাখা চলে—বয়স বাড়িলে তাহা চলে না; তেমনি ছোটছেলেকে 'গডাঢর' বলিয়া ডাকিলে ক্ষতি নাই—কিন্তু সে যখন বড় হইবে, যখন সৌন্দর্য্যের এবং সুরুচির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িবে—যখন নিজেকে তাহার আর কাহারো অপেক্ষা ছোট বলিয়া মনে হইবে না—তখন গদাধর যদি পিতামাতার অবিচার স্মরণ করিয়া গদা ধরিয়া ওঠে তবে তাহাকে তো দোষ দিতে পারি না।

যাহারা কানাছেলের নাম পদ্মলোচন রাখিলে ঠাট্টা করেন আমি সে দলের নই; একটা ক্ষতি তো হইয়াছেই ছেলেকানা; আবার যদি বাপও কানা হইয়া একটা অদ্ভুত নাম রাখে তবে সে দ্বিগুন ক্ষতি পূরণ করিবে কে? না হয় কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলিলামই। জীবনে প্রতিদিনই কত মিথ্যা কথা বলিতেছি আর এই একটি অর্দ্ধ মিথ্যা যদি একজনকে খুসী করিবার জন্য বলি তবে সত্য মিথ্যার শেষ বিচারক চটিবেন না—আর মানুষে বড় জোর হাসিবে—রাগিবে না।

অধিকাংশ সময়ে মানুষের পরিচয় নামের মধ্য দিয়া—সে হিসাবেও আমরা ঠকিব না। ওফেলিয়া, জুলিয়েট, হেলেন, বিয়াত্রিচে কোথায়? পত্রলেখা, মালবিকা, দময়ন্তী, উমা; উর্ম্মিলা, উর্ব্বশী, মেনকা, মন্দালিকা; অর্পণা, সুরমা, বিভা, ইলা; ইহারা আজ কেবলমাত্র এক একটি নামের ইন্দ্রধনুতে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। জাদুকরের লাঠিখানির মত সুন্দর নাম আমাদের অভিভূত করিয়া রাখে।

ডাকনামটা যাহা খুসী দিতে পারি তাহা আটপৌরে পোষাকের মত। কিন্তু পথে বাহির হইতে হইলে একটা ভাল নাম চাই। বাপ মায়েরা একটু যদি ভাবিয়া ছেলে-মেয়ের নামকরণ করেন তবে দুই এক পুরুষের মধ্যে আমাদের দেশটা আবার প্রাচীনকালের মত নাম-সঙ্গীতে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়া আমাদের সমস্ত জীবনকে, সমস্ত ব্যবহারকে, সমস্ত ঘরকন্নার অতি তুচ্ছ কাজগুলিকে পর্য্যন্ত অপরূপ উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

স্বভাব সঙ্গীত

সংসার জীবন মাঝে বাজে না সঙ্গীত
কোলাহলে পূর্ণ থাকে সকলের চিত।
পিতা মাতা ভাই বোন্ সকলের স্নেহে
আনন্দের ধ্বনি আছে সবাকার গৃহে
হৃদয় সঙ্গীত তাহে নাহি হেরি কভু
ডাকেনা আবেগে তাই তোমারে হে প্রভু।
'স্বভাব সঙ্গীত' আছে মানব হৃদয়ে
সংসারে মজিয়া তাহা যেতেছি ভুলিয়ে
এ ভুল বলিতে বল সাধ্য হয় কার
যে পায় তোমার কৃপা সাধ্য হয় তার।
বাজাতে চাহিনা বীণা ভগ্ন সুর লয়ে
নীরবে থাকিব বসি' তোমারে স্মরিয়ে।

শ্রীমাখনমতী দেবী।

রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের আলোচনা

ঠাকুর্দ্দা

রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকখানি একটি সৌন্দর্য্যপিপাসু মানবহৃদয়ের তীর্থযাত্রার ইতিহাস। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোতে যাহার যাত্রা--দ্বিপ্রহরের প্রখর আলোতে তাহার অবসান। সৌন্দর্য্য বিলাসের পক্ষে উষার অস্পষ্ট আলোর আবশ্যক; সত্য উপলব্ধির জন্য মধ্যাহ্নের তীব্র কিরণ না হইলে চলে না। ইহার উদয়শিখরে সুবর্ণ: অস্তশিখরে স্বয়ং রাজা—এতদুভয়ের মধ্যে রাণীর সৌন্দর্য্য অভিসার।

সকলেই জানেন আলোকের কম্পন অপেক্ষাকৃত কম থাকা কালীন তাহার রঙ লাল—কম্পন বাড়িলেই হয় শাদা, প্রভাতের ও মধ্যাহ্নের আলোতে এইটুকু ছাড়া আর কোনো প্রভেদ নাই। সৌন্দর্য্যের রং বিচিত্র : সত্যের বর্ণ শাদা; সৌন্দর্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সত্যে; তাহা জীবনের এপিঠ ওপিঠ মাত্র; একটা জিনিষেরই বাহিরের প্রকাশকে বলি সৌন্দর্য্য অন্তরের লীলাকে বলি সত্য।

এই নাটকখানি রাণী সুদর্শনার সৌন্দর্য্য সাধনার সুরু দিয়া আরম্ভ ইহার সমাপ্তি রাণীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে। যে রাজাকে রাণী খুঁজিতেছেন তাহা ভগবানের বিশেষ করিয়া সৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তিটিকে। তাই কবি নাটকের Back ground স্বরূপ বাছিয়া লইয়াছেন যে কাল তাহা বসন্তকাল; দেশটি হইতেছে উৎসবময় পুরী; আর পাত্রদের মধ্যে সম্বন্ধ হইতেছে স্বামী স্ত্রীত্ব যাহার পচিয়ের সূত্রপাত প্রধানত সৌন্দর্য্যের বাতায়ন দিয়া; আর যাঁহার সন্ধান চলিতেছে তিনি তো স্বয়ং উৎসব রাজ।

কিন্তু সুদর্শনা রাজাকে চিনিলেন না। ঠাকুরদাদা ও সুরঙ্গমা ব্যতীত কেহ তাঁহাকে চেনে না। ঠাকুরদাদা মূল-গায়েনের মত গোড়া হইতেই পরিপূর্ণ উপলব্ধির সুর ধরিয়া আছেন; তাঁহার বসন্তে একদিকে যেমন ফোটা ফুলের মেলা তেমনি ঝরা ফুল ও শুক্‌নো পাতার খেলা তাঁহার গানে "নাচে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।" তিনি জানেন 'উৎসবরাজ এসেছে আজ বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ অন্তরে তার বৈরাগী গায়—তাইরে নাইরে নাইরে না।' ঠকিবার পাত্র তিনি নন। রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গায়ের চাদর খানির একপিঠে গেরুয়া অন্য পিঠে ফুলের সাজ। বাহিরের গেরুয়া দেখিয়া কতজনে ভুল করে কিন্তু রসিক যে জন হঠাৎ হাওয়ায় আন্দোলিত চাদরখানির অন্য পিঠের পুষ্প শোভা দেখিয়া সে চমকিয়া বলে 'এই যে।' ঠাকুরদাদা তেমনি এক পাত্র।

এই ঠাকুরদাদার চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ স্বকীয় রচনা; বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্ব্বে কখনো ইহাকে ছেলের দল লইয়া গান করিয়া যাইতে দেখি নাই। এই একই ব্যক্তি বেতসিনীর তীরে, শোনপাংশুর দলে, রুগ্ন অমলের দুঃখ শয্যার পার্শ্বে, বসন্ত রায়ের রাজসজ্জার অন্তরালে। এই অদ্ভুত লোকটির প্রধানত জন্ম কবির কল্পনায়—কিন্তু আমার বিশ্বাস তারো আগে সে জন্মিয়াছিল নিকটবর্ত্তী রায়পুর গ্রামের সিংহ পরিবারে শ্রীকণ্ঠ সিংহ নাম নিয়া।

সুদর্শনা ভুল করিলেন। ইহার চেয়ে বনবিহারিণী হিমরাজ কন্যাকা উমা চতুর ছিলেন নিঃসন্দেহ। তিনি শিবকে ভুল করেন নাই। তিনি জানিতেন—"মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং ন কাম বৃত্তির্বচনীয় মীক্ষতে। ৮২॥

উমা শিবকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন; সুদর্শনারও সেই তপস্যা। শিব সুন্দর নহেন, তিনি সব সৌন্দর্য্যের পরিণাম তাই তাঁহার বর্ণ হিমালয়ের তুষারের মত শাদা। সুদর্শনার রাজাও কেবলমাত্র সুন্দর নহেন; সুন্দর বলিলে তাঁহাকে খাটো করা হয়। তাই রাণী রাজার কাছে স্বীকার করিতেছেন "তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।" ১২৭ পৃঃ

সুবর্ণ

ইতি মধ্যে পথে ভিড় জমাইয়া আর একটি লোক

চলিয়াছে—সুবর্ণ। সুবর্ণ অর্থাৎ সুন্দর রং এবং সোনা। সব সোনাই যে সোনা নহে তাহা সেক্সপিয়ার জানিতেন। কিন্তু বেচারা রাণীকে তাহা বুঝিতে দুঃখ পাইতে হইয়াছিল। এই দুঃখের আগুনেই রাণীর তপস্যা।

সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া সত্যের সাধনা করা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যজীবনের ইতিহাস। এই সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীকেই সম্বোধন করিয়া পদ্মাতীরে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরি
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী॥"

সম্প্রতি তিনি যে বসন্তোৎসব লিখিয়াছেন তাহাতে বসন্তের নাম সুন্দর। ভারতীয় আর কোনো কবির নিকট বসন্ত এত বিচিত্র ও অদ্ভুত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। কালিদাসের বসন্ত প্রাণের দূত; সে নীরবে প্রাণের পাত্র বহিয়া মূর্ত্ত-মদনের অনুসরণ করিয়া যোগমগ্ন ধূর্জ্জটির তপোবন প্রান্তে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাঁহারা কেহই ঋতুরাজের আশ্চর্য্য অন্দর মহলে প্রবেশাধিকার পান নাই। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার বর্ণনায় পূর্ব্ব কবিগণকে অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু বসন্তের রহস্য উদ্ঘাটনে তাঁহার জুড়ি নাই। তাঁহার বসন্ত জরাপরাভবসমরে অভিযান করে, তাঁহার বসন্ত অকস্মাৎ একদিন শীতের বাহুবন্ধন্ ছিন্ন করিয়া প্রমাণ করিয়া দেয় পুরাতনের মধ্যে নূতনের বীজ ছিল লুকাইয়া। সেই বসন্তই অন্ধ বাউলের মুখে সংবাদ পাঠায় "মানুষের যুদ্ধ আজো শেষ হয় নাই।" কবির বসন্তের চরম পরিণতি রাজবৈরাগীরূপে। বাহিরে সাজসজ্জা যতই উজ্জ্বল হউক অন্তরে তার বাউলের এক তারার সুর। ভোগী এবং অবশেষে ত্যাগী সেই বসন্ত "উৎসব দিন চুকিয়ে দিয়ে ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায় তাইরে নাইরে নাইরে না।"

এই বসন্তের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবন যাত্রার আদর্শটিকে দেখিতে পাই।

সুদর্শনার যিনি রাজা তিনি এই বসন্ত। তাঁহাকে চেনা কঠিন—শুধু চোখের উপর নির্ভর করিলে ভুল করিবার সম্ভাবনা থাকে। যাহা সম্ভব তাহাই ঘটিল। রাণী সুবর্ণকে রাজা ভাবিলেন। সুবর্ণ সুন্দর বটে কিন্তু তার অন্তরে—ও'ক্ সে কথা আর না ই বলিলাম। ঠাকুর্দ্দা ভুল করেন নাই। তিনি তাঁহাকে সব জায়গায় দেখিতেন—কোনো বিশেষ সীমার মধ্যে নহে। আর ভুল করে নাই অন্ধ বাউল যে তাঁহাকে অনুভব করিত শরীর মন সমস্ত দিয়া।

অন্ধকার কক্ষ

এইবার সুদর্শনার ভুল সংশোধন করিবার পালা। একাকী তিনি অন্ধকার ঘরে: এই অন্ধকার তাঁহার তো আর সহ্য হয় না। এই নাটকখানির একদিকে অন্ধকার গৃহ-চারিণী রাণী: অন্যদিকে বসন্তের উৎসবে উন্মত্ত বহু জনাকীর্ণ নগরী। কবি নাটকটিকে চিত্তাকর্ষক করিতে একটি নাটকীয় দ্বন্দ্বের (Dramatic contrast) সাহায্য লইয়াছেন। নাটকে এই রকম দৃশ্যগত দ্বন্দ্ব রচনা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষত্ব। ডাকঘরে দেখিতে পাই পথ পার্শ্বে রুগ্ন বাতায়নে একাকী বালক অমল: সম্মুখের পথে স্ফীতকায় সংসার তাহার মোড়ল, দইঅলা, পাহারাঅলা, ফকিরই ঠাকুর্দ্দার দল লইয়া ছুটিয়াছে। শারদোৎসবে বেতসিনীতীরচারী বালক উপানন্দ ঋণ শোধে ব্যস্ত: অন্যত্র ছুটির আনন্দে বালকের দল, ঠাকুরদাদা, লক্ষেশ্বর ও সম্রাট বিজয়াদিত্য। রক্তকরবীতেও একই দৃশ্য। রুদ্ধ ধন-ভাণ্ডারের দেয়ালের বহু উর্দ্ধে ছোট্ট একটি বাতায়নের মত এই সুবর্ণ-সন্ধানী যক্ষপুরীর বুকের উপরে রঞ্জনের ভালবাসার কাজলপরা নন্দিনী। এখানেও সেই একই পালা। অন্ধকার ঘরে সুদর্শনা। এই কক্ষটিতে রাজাকে তাঁহার উপলব্ধি করিতে হইবে প্রথমে; তারপরেই না তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিবে বাহিরের আলোকে।

ইহা অদ্ভুত বটে কিন্তু কিছুই নূতন নহে। পৃথিবীতে যেখানে যে কেহ রাজার সাধনা করিয়াছেন—তিনি প্রথমে এই অন্ধকার ঘরটিতেই।

আপনার অভিজ্ঞতার ভিতরে ভগবানকে না পাইলে

কি আর পাওয়া। পড়িয়া তো আছে শাস্ত্রের রাজপথ কিন্তু 'অন্ধকারের স্বামী' চাহন না আমরা সেই মজুর-খাটা সরকারী পথ ধরিয়া তাঁহার মন্দিরে যাই। শাস্ত্রের আলোকে তিনি বিশেষ করিয়া আমাদের নহেন সেখানে তিনি সরকারী, এই অন্ধকার কক্ষে তিনি আমার চেষ্টার দ্বারা, সাধনার দ্বারা প্রেম নিয়ন্ত্রিত সেবার দ্বারা বিশেষ করিয়া ব্যক্তি বিশেষের। প্রভাতের সূর্য্য সকলেরই: প্রত্যেকটি শিশিরের কণা স্বতন্ত্রভাবে যখন তাহার ছায়া নিজের বুকে পায় তখনই তাহার দীর্ঘ রাত্রির অশ্রু-সাধনা স্বর্ণ-কান্তিতে সার্থকতা লাভ করে। রাজা তো দেশের সকলেরই কিন্তু তিনি যদি বিশেষভাবে রাণীর না হন তবে তাঁর বৃথা রাণীত্ব। তাই রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে তুমি আমাকে দেখ্‌তে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হ'য়ে থাকি না কেন?" রাণীর কিন্তু এ সবুর অসহ্য। তিনি একেবারেই রাজাকে হাটের মধ্যে দেখিতে চান। অন্ধকারের সাধনা যাঁহার সম্পূর্ণ হইয়াছে তিনি রাজাকে সব স্থানেই দেখিয়া থাকেন—ভুল তাঁহার হয়না। ঠাকুর্দ্দা এই সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন রাজাকে ভুল করিবার সম্ভাবনা তাঁহার নাই। সুরঙ্গমার পক্ষেও সেই কথা।

মনের মানুষকে মনের মধ্যে পাইবার সাধনা চলিতেছে যুগে যুগে—ভ্রান্ত হইয়া কে কোথায় ঘুরিতেছে। কত কঠোর সাধনার দ্বারা শরীর-মেদমজ্জাকে ইন্ধনের মত জ্বালাইয়া দিয়া তাঁহারই সাধনা। বাউলের মত পথে পথে, পিপাসুর মত টোলে টোলে, কেহবা গঙ্গার জলে কেহবা নৈরঞ্জনার তীরে, মরুভূমির রোদে কেহ, পর্ব্বতের তুষারে বা অপরজন। সিদ্ধি যে কেহ লাভ করুক, সকলকেই বলিতে হইয়াছে "ফিরে এসে আপনদেশে এই যে দেখি—দেখি তারে আপন মনে।" সকলকেই প্রথমে এই অন্ধকারের সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। এই সাধনার ধৈর্য্য রাণীর নাই তবু তাঁহাকে সেই একই মন্ত্র স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যেদিন তাঁহার অন্ধকার ঘরের সাধনা সার্থক হইল সেইদিনই সুপ্রভাতে তিনি পূজার অর্ঘ্য লইয়া পথে বাহির হইতে পারিলেন।

অগ্নি সংযোগ

অন্তঃপুরের উদ্যানে আগুন লাগিয়াছে—রাণীর অন্তরেও তাহার উত্তপ্ত শিখা ছড়াইয়া পড়িল। রাণী মনে মনে বুঝিয়াছেন তাঁহার মালা অপমানিত হইয়াছে—সুবর্ণ ভণ্ডরাজ: মন যাহা বুঝিয়াছে চোখ যে তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। চোখটা তখনো মনের লাগাম টানিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর আবার সাতটা রাজার সাতদিক হইতে টানাটানি; রাণী অপমানে অভিমানে রাজাকে আঘাত করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসিলেন। রাজা এই আঘাতে খুসী হইলেন। রাজা পুরুষ মানুষ, পুরুষের সৌন্দর্য্য শক্তিতে, যেখানে তিনি শক্তির পরিচয় পান নিজের স্বরূপকেই তিনি দেখেন। অন্য ছয়টা রাজা তাঁহার নিকট দণ্ড পাইল কিন্তু পুরস্কার পাইল কাঞ্চীরাজ—যে কাঞ্চী রাজা হারিয়াও হারে নাই বারে বারে বীরের মত রাজাকে আঘাত করিয়াছে। সত্যকে স্বীকার কর কিম্বা আঘাত কর—মাঝামাঝি অন্য কোনো পন্থা নাই।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মত এখানিও ভাব প্রধান নাটক—ঘটনা প্রধান নহে। প্রধানত ইহার মধ্যে যে সংঘর্ষ তাহা ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নহে—নায়ক নায়িকার চিন্তাকে অবলম্বন করিয়া। সংস্কৃত ভাষায় নাটককে দৃশ্য-কাব্য বলে কিন্তু এই জাতীয় নাটকে কাব্যের অনেকটাই অদৃশ্য রহিয়া যায় সবটা সম্পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে দৃষ্টির সহিত কল্পনার সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং এই শ্রেণীর নাটককে কল্প-দৃশ্য কাব্য বলিলে অন্যায় হয় না কিন্তু অদ্ভুত হয়।

একদিকে চোখের টানে অপরদিকে মনের ইঙ্গিতে পড়িয়া সুদর্শনার মনে মুহুর্মুহু যে পট পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা দেখা কঠিন হইলেও দেখা উচিত। রাজাকে তিনি যে আঘাত করিয়াছেন তাহা রাগিয়া নহে; এই অভিমানে যে রাজা কেন তাঁহাকে এই টানাটানি হইতে রক্ষা করিলেন

না। রাণী ভুল করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার মুক্তির উপায় তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। সুবর্ণকে তিনি ভাল বাসিয়াছেন - সুন্দর বলিয়াই। সুন্দরের প্রতি এই আসক্তিতেই তাঁহার রক্ষার বীজ মন্ত্র। তিনি যখনি জানিতে পারিলেন এ সৌন্দর্য্য প্রকৃত নহে—ইহার সহিত সত্যের যোগ নাই তখন বিস্মিত হইয়া বলিলেন "ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মানুষ নেই! এমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এত বড় বঞ্চনা করেছি?" কিন্তু বঞ্চিত যা হইয়াছে তা রাণীর চোখ—হৃদয় নহে। তাই তিনি বলিতেছেন—"রাজা, আমার রাজা! তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ উচিত বিচারই করেচ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না? (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরি বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সভার সমক্ষে ধূলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি বুক চিরে সেটা কি আজ তোমাকে জানিয়ে যেতে পারব না?" এতদিনে রাণীর ভুল ভাঙিল, চোখের উপর বিশ্বাস টুটিল, চোখে যাহা সুন্দর লাগে তাহার চেয়ে গভীরতর সৌন্দর্য্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিল—তাঁহার অন্ধকার ঘরের সাধনা সম্পূর্ণ হইল। এইবার তিনি অন্ধকার ঘরের স্বামীকে আলোকের প্রাসাদে পূজা দিতে পথের ধূলায় বাহির হইলেন।

—— ০ ——

আশ্রম সংবাদ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় বিলেত হইতে Litho ও Book-binding এর কাজ শিখিয়া আসিয়াছেন এবং সম্প্রতি এই দুই রকম crafts এর কাজ তিনিই আশ্রমে শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীমান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্ম্মণ কয়েক মাস বাড়ীতে থাকার পর আবার কলাভবনে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীমান অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আদিয়ারে Guindy School এর চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক হইয়া গিয়াছেন এবং শ্রীমান মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত Ceylon এ Colombo Ananda কলেজে চিত্রাধ্যাপক হইয়া গিয়াছেন।

কলাভবনে ২ জন নতুন ছাত্র আসিয়াছেন। একজন মহারাষ্ট্র হইতে এবং অপরটি বাঙ্গলাদেশের। দুজনেই চিত্রবিদ্যায় অল্পদিনেই যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। শ্রীযুত বামনমোহন শিরোকর ৩ বৎসর আশ্রমে গানের চর্চ্চা করিয়া সম্প্রতি কলাভবনে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতে যেমন পারদর্শী চিত্রেও তেমনি উন্নতি করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। এ বৎসর কলাভবন হইতে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছবি প্রেরিত হইয়াছে। যথা—কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, মান্দ্রাজ, বেঙ্গালোর, আদিয়ার, সিমলা ইত্যাদি। অনেক জায়গাই এখানকার ছবির সমাদর হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ All India Art Exhibition হইতে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীমান রামকিঙ্কর প্রামাণিক সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা সুকুমারী দেবী কলাভবনের মেয়েদের সূচের কাজও decorative design অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেছেন। তিনি আলপনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁহার ছাত্রীরা তাঁহার যত্নে ও শিক্ষায় আলপনা ও সীবন কার্য্যে পাকা হইতেছে। আশ্রমের উৎসবে তাঁহার ও তাঁহার ছাত্রীদের সাহায্যে সমস্ত কাজই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে। তিনি গত বৎসর লাহোরে decoration design এর জন্য ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর চীন জাপান ভ্রমণের দরুণ কলাভবনে অনেক তদ্দেশীয় বড় বড় চিত্রকরের চিত্র আসিয়াছে। জাপানের এখনকার বড় চিত্রকর টাইকান্ সনের একখানা প্রকাণ্ড মাকিমনো কলাভবনে present করিয়াছেন। সামামুরা থানাজানেরও একখানা মাকিমনো পাওয়া গিয়াছে। পূজনীয় গুরুদেবের Peru যাত্রার ফলেও দুখানা বড় বড় তৈলচিত্র পাওয়াগিয়াছে। কলাভবনের Museum এ নানারকমের জিনিষের সংগ্রহ রহিয়াছে। দিন দিনই Museum এ জিনিষ বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের সঙ্গে কলাভবনের ছাত্র-

ছাত্রীরা গৌড় ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা অতি চমৎকার চমৎকার জিনিষের ছাঁচ সংগ্রহ করিয়াছেন। সে সমস্ত জিনিষ কলাভবনের মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমান বিনায়ক মশোজি গরমের ছুটিতে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র কুলদাপ্রসাদের সহিত Cycle এ রাঁচি গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে একা Nagpur এ Cycle এ গিয়াছেন। তাঁহার বৈচিত্রময় ভ্রমণকাহিনী শীঘ্রই শান্তিনিকেতনে বাহির হইবে।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

পূজনীয় আচার্য্যদেবের শরীর বিশেষ অসুস্থ বলিয়া তাঁহার ইউরোপ-যাওয়া বন্ধ হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে মোহন-বাগানের একদল খেলোয়াড় আশ্রমে আসিয়া তিন দিন খেলিয়া গিয়াছেন। প্রথম দিন তাঁহারা আশ্রমকে দুই গোল ও আশ্রম তাঁহাদিগকে এক গোল দেন। দ্বিতীয় দিন তাঁহারা আশ্রমকে এক গোল দেন তৃতীয় দিন উভয় পক্ষের নির্গোল সমান-সমান খেলা হয়।

অন্যান্য বারের মত এবারও সুহৃদ কাপ্ প্রতিযোগিতা মিটিয়া গিয়াছে। চূড়ান্ত খেলায় প্রথম বর্গ ও দ্বিতীয় বর্গ অবতরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্গ প্রতিপক্ষকে তিন গোলে পরাজিত করিয়া কাপটি পাইয়াছেন।

এই প্রতিযোগিতাটি তেরো বছর হইতে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীমান্ সুহৃদকুমার সেন গুপ্ত তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যেই চরিত্রের স্বাভাবিকতায় ও কোমলতায় তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে এমন আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা মৃত-বন্ধুর স্নেহের ঋণকে এই স্মৃতি প্রতিযোগিতায় জাগ্রত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জীবনে যাঁহারা সফলতা লাভ করিবার অবকাশ পান তাঁহারা বিশ্বের প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন; কিন্তু যে সব ব্যক্তি অশেষ আশার স্থল হইয়াও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যান—তাঁহারা বিশেষ করিয়া স্বীয় বন্ধুদের স্মৃতিতে অমরতা দাবী করেন। সুহৃদকুমার এই শেষোক্ত দলের। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রদ্যোৎকুমার ও কুলদাপ্রসাদ আশ্রমে কিছুদিন বাস করিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী মালতী সেন বিশ্ব-ভারতীতে অধ্যয়ন করিতেছেন।

বিশ্ব-ভারতী হইতে ছাত্ররা ইচ্ছা করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারিবেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিভাগের অধ্যক্ষের কাজ করিবেন। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে পরীক্ষার পাঠ্য ছাড়া বিশ্বভারতীর নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হইবে এবং লাইব্রেরীতে অনুশীলন করিতে হইবে। ইহাতে করিয়া ছাত্রদের জ্ঞানের দিক্‌চক্র স্ফুটতর ও সম্পূর্ণতর হইয়া উঠিবে আশা করা যায়—অথচ তাহারা পরীক্ষায় পাশ করিয়া অর্থ-উপার্জ্জনের চেষ্টাও করিতে পারিবে।

✓ গত চন্দ্রগ্রহণ-পূর্ণিমার রাত্রে উত্তরায়ণে পূজনীয় গুরুদেবের গৃহে সঙ্গতের ব্যবস্থা হইয়াছিল—যথাসময়ে আশ্রমবাসিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন—এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া পড়াতে আসন্ন শরতের গান পরিবর্ত্তন করিয়া অকস্মাৎ বর্ষার সুর ধরা হইল। বর্ষার সুরে ও বর্ষার জলে সেদিনকার উৎসব সরস হইয়া উঠিয়াছিল।

আশ্রমের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল মল্লিক মহাশয় পুনরায় আশ্রমের কাজে যোগ দিবার জন্য করাচী হইতে আসিয়াছেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে তিনবার আশ্রমের কাজে সাহায্য করিয়াছেন।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও কলাভবনের অধুনাতন শিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই সপরিবারে আশ্রমে আসিয়া বাস করিবেন।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযতুকিশোর চক্রবর্ত্তী শান্তি-নিকেতন সমবায় ভাণ্ডারের কাজে যোগ দিয়াছিলেন এ সংবাদ দিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহার শুভ বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

বাংলার প্রধান রাষ্ট্রনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে আশ্রমে এক দিবস অনধ্যায় ছিল। তাঁহার এই অকস্মাৎ তিরোধানে আশ্রমবাসিগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ } ভাদ্র, সন ১৩৩২ সাল। { ৮ম সংখ্যা

গান

১

বাজোরে বাঁশরী বাজো
সুন্দরি চন্দন মাল্যে
মঙ্গল-সন্ধ্যায় সাজো ॥
বুঝি মধু-ফাল্গুন মাসে
চঞ্চল পান্থ সে আসে,
মধুকর-পদভর-কম্পিত চম্পক
অঙ্গনে ফুটেনিতো আজো ॥
রক্তিম অংশুক মাথে,
কিংশুক-কঙ্কণ হাতে,
মঞ্জীর-ঝঙ্কৃত পায়ে,
সৌরভ-মন্থর বায়ে
বন্দন-সঙ্গীত গুঞ্জন মুখরিত
নন্দন কুঞ্জে বিরাজো ॥

ওগো আমাদের পূর্ণিমা আমার
রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে
লুকিয়ে দাঁড়ালে।
আপনারি মনে জানিনা একেলা
হৃদয় আঙিনায় করিছ কি খেলা,
তুমি আপনায় খুঁজিয়া ফের কি
তুমি আপনায় হারালে ॥
একি মনে রাখা, একি ভালবাসা ?
একি স্রোতে ভাসা একি কূলে যাওয়া ?
কভু বা নয়নে কভু বা পরাণে
কর লুকাচুরি কেন যে কে জানে
কভু বা ছায়ায় কভু বা আলোয়
কোন্ দোলায় যে নাড়ালে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য রত্নের অনুমার্গন

"ন রত্নমন্বিষ্যতিমৃগ্যতেহিতৎ।"

কালিদাসের কুমারসম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায় গায়ত্রীর ধ্যানই যে, গীতোক্ত জ্ঞান যজ্ঞ এই কথাটার যাথার্থ্য বারান্তরে বিধিমতে প্রদর্শন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান অধ্যায় সেই মুখ্য কার্য্যটিতে হঠাৎ প্রবৃত্ত না হইয়া তাহার গোড়াপত্তন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে!

গায়ত্রী যদিচ বেদোপনিষদের শীর্ষস্থানীয় মহামন্ত্র, কিন্তু তাহা এরূপ বাক্যাড়ম্বরশূন্য অকৃত্রিম সহজভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তাহার অর্থ এবং তাৎপর্য্য একটী পঠদ্দশার বালকও বলিবামাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তাহা এই—

সেই সবিতৃ দেবতার ভর্গ করি ধ্যান,
আমাদের সবা'রে দিবেন যিনি জ্ঞান॥

জিজ্ঞাসু॥ এই বই না!

প্রবোধয়িতা॥ বলিলাম "সেই সবিতৃ-দেবতার,"—সে দেবতা কোন্ দেবতা তাহার কোনো খবর রাখ কি?

জিজ্ঞাসু॥ আমি তো জানি এই যে, সবিতা-শব্দে সূর্য্য বুঝায়।

প্রবোধয়িতা॥ সূর্য্যের আলোক এবং উত্তাপের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত তাহা তোমার জানা আছে কি?

জিজ্ঞাসু॥ জ্যোতিষ বিদ্যার আমি একজন শীর্ষস্থানীয় এম্ এ,—এই সামান্য বিষয়টি (জ্যোতিষের ক খ বলিলেই হয়) আমার নিকটে অপরিচিত থাকিবার কোনো কারণ নাই। পৃথিবীসুদ্ধ ধরিয়া গ্রহগণের যখন-যে অংশ সূর্য্যের সম্মুখে পড়ে সেই অংশ সূর্য্যরশ্মিতে আলোকিত এবং উত্তাপিত হয়, তা বই—সূর্য্যরশ্মির বাকি অংশ গ্রহগণের ভোগে আসে না। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সূর্য্য-রশ্মির সেই বাকি অংশটার তুলনায় গ্রহগণের আলোকিত অংশ ক্ষুদ্রাৎক্ষুদ্র বালুকণা অপেক্ষাও বিস্তারে কম—অ্যাতো কম যে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

প্রবোধয়িতা॥ তাহা যখন তুমি জানো, তখন তুমি আমার কথার উত্তরে "এই বই না" বলিয়া আঁৎকিয়া উঠিলে কেন যে, তাহার অর্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অ্যাত বড় একটা অপরিমেয় বিশাল ব্যাপারকে "এই বই না" বলিয়া যদি অশ্রদ্ধা করিয়া উড়াইয়া দ্যাও, তবে কী যে তোমার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র তাহা বুঝিতে পারা কঠিন।

জিজ্ঞাসু॥ সূর্য্যের তেজোরশ্মি যাহা গায়ত্রী মন্ত্রে ভর্গ নামে অভিহিত হইয়াছে তাহা যত বড়ই বিশাল ব্যাপার হো'ক না কেন—তাহা জড় পদার্থ বই আর কিছুই নহে।

এইজন্য ব'ল—সূর্য্যের তেজোমণ্ডলকে দেবমহিমা-বোধে ধ্যান করা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি কাণ্ড। আমার বিবেচনায় তাই উহা বেদশাস্ত্রের শীর্ষস্থানে অধিকার পাইবার কোনো অংশেই যোগ্য নহে। একটি উদ্ভট শ্রেণীর শ্লোক আছে এইরূপ:—

"ভিনত্তিভীমং করিরাজকুম্ভং।
বিভর্ত্তি বেগং পবনাদতীব।
করোতি বাসং গিরিগহ্বরেষু।
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

ইহার অর্থ।

ভেদ করে ভীষণ গজরাজের মস্তক।
ধারণ করে বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর বেগ।
বাস করে পর্ব্বত গহ্বরে।
তথাপি সিংহ পশু বই আর কিছুই না॥

প্রবোধয়িতা॥ এ যাহা তুমি বলিলে একথা খুবই ঠিক্ এমন কি বেদবাক্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু হইলে—হইবে কী—তোমার কথাটার গোড়ায় গলদ্। তুমি যে

বলিলে—"সবিতা-শব্দে দৃশ্যমান সূর্য্য বুঝায় তোমার এ-কথাটা আধা সত্য—আধা মিথ্যা॥ বেদের পুঁথি খুলিয়া জিজ্ঞাসুর সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক॥ এই স্থাথ বেদের প্রধান ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য কী বলিতেছেন :—

দ্রষ্টব্য

নিম্নলিখিত সায়নাচার্য্যকৃত ভাষ্যে দুই তিন স্থানে আমার নিজের একটু আধটু মনোগত কথা আমি [ ] এইরূপ অবচ্ছেদক-চিহ্নের অর্গল দিয়া আটকিয়া রাখিলাম।

যঃ সবিতা দেবো নোঽস্মাকং, ধিয়ঃ—কর্ম্মাণি
ধর্ম্মাদিবিষয়া বাবুদ্ধিঃ, প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ।
তত্তস্য দেবস্য সবিতুঃ—সর্ব্বান্তর্যামিতয়া
প্রেরকস্য—জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য,
বরেণ্যং সর্ব্বৈরুপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়াচ
সম্ভজনীয়ং ভর্গো—অবিদ্যা তৎকার্য্যয়ো
ভর্জ্জনাৎভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতি পরব্রহ্মাত্মকং
তেজো ধীমহি।
যদ্বা সবিতা সূর্য্যো ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচো-
দয়াৎ প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ সর্ব্বস্য
প্রসবিতুর্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য,
তৎ সর্ব্বৈদৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং
সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং ভর্গঃ, পাপানাং
তাপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি।

ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ।

যে সবিতা দেবতা ও নানাদের সকল কর্ম্ম এবং ধর্ম্মাদি-বিষয়ক বুদ্ধি প্রেরণ করিবেন, সেই সবিতার অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের, বরণীয় কি না, সকলের উপাস্য সম্ভজনীয়, ভর্গ অর্থাৎ যাহা অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত কার্য্য সকলকে ভর্জ্জন করিতে সমর্থ—দহন করিতে সমর্থ—এই অর্থে ভর্গ, সেই স্বয়ংজ্যোতি পরব্রহ্মাত্মক তেজকে ধ্যান করি। অথবা যে সবিতা দেবতা কিনা সূর্য্য আমাদের বুদ্ধিসকল এবং কর্ম্মসকল প্রেরণ করিবেন—সকলের প্রসবিতা সেই দীপ্তিমান সবিতা দেবতার বরণীয় ভর্গ অর্থাৎ সমস্ত পাপের তাপক লোকপ্রসিদ্ধ দৃশ্যমান সম্ভজনীয় তেজো-মণ্ডল ধ্যান করি।

জিজ্ঞাসু॥ ভাষ্যকার প্রথমে বলিলেন ভর্গ-শব্দের অর্থ স্বয়ং জ্যোতি পরব্রহ্মাত্মক তেজ—পরে বলিলেন অথবা ভর্গ শব্দের অর্থ দৃশ্যমান সূর্য্যের তেজোমণ্ডল—তাঁহার এই দুই কথার কোন্ কথাটা যে সত্য তাহা বুঝিতে পারা আমার মতো শিখাবিহীন অশাস্ত্রী লোকের কর্ম্ম নহে।

প্রবোধয়িতা॥ দুই কথাই সত্য। এক হিসাবে প্রথম কথাটা সত্য, আর এক হিসাবে দ্বিতীয় কথাটা সত্য।

জিজ্ঞাসু॥ তাহা যদি বলো তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি দুই কথার কোন্ কথাটাই বা মুখ্য হিসাবে সত্য—কোন্ কথাটাই বা গৌণ হিসাবে সত্য।

প্রবোধয়িতা॥ তুমি যদি মনে কর যে ও দুটা কথার মধ্যে মুখ্যগৌণ সম্বন্ধ, তবে সেটা তোমার বড়ই ভুল।

জিজ্ঞাসু॥ ও দুটা কথার মধ্যে আর যে কিরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর।

প্রবোধয়িতা॥ অত ব্যস্ত হইও না; আমার কথাটা আগে আমাকে বলিতে দাও, তাহার পরে যাহা উত্তর প্রদান করিতে হয় করিও। আমি তোমাকে বলিতে চাহিতে-ছিলাম এই যে, ও দুটা কথার মধ্যে গম্যগমক সম্বন্ধ। যেমন ওস্তাদ গায়ক বা বীণাবাদক মীড়যোগে স্বর হইতে স্বরান্তরে ওঠানামা করিতেছেন দেখিয়া সেই মীড় দিয়া-সাধা মধ্য পথের স্বরলহরীকে আমরা বলি গমক স্বর এবং তাহার লয়স্থানীয় স্বরটিকে বলি গম্যস্বর, তেমনি সাধক প্রতীকোপা-সনা হইতে ব্রহ্মোপাসনায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া প্রতীকো-পাসনাকে যদি বলা যায় গমক এবং ব্রহ্মোপাসনাকে বলা যায় গম্য, তবে সে কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিতে ভাবুক লোকের একটুও বিলম্ব হয় না।

জিজ্ঞাসু॥ তুমি কি বলিতে চাও যে, অরুণোদয় যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাস, তেমনি পুতুল-পূজা ব্রহ্মোপসনার পূর্ব্বাভাস!

প্রবোধম্বিতা ॥ তুমি আমার কথার প্রকৃত মর্মটি এখনো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারো নাই। আমি যে প্রতীকোপাসনার কথা বলিতেছি তাহা বৈদিক প্রতীকোপাসনা তা বই তাহা তান্ত্রিক প্রতীকোপাসনা নহে। তান্ত্রিক প্রতীকোপাসনার আড্ডা যেমন পৌত্তলিকতার বিজয়ধূমে ভূর্ন্ধাসিত হয়, বৈদিক প্রতীকোপাসনার যজ্ঞভূমি তেমনি হোমাগ্নির ধূমে সুবাসিত হইত!

জিজ্ঞাসু॥ পৌত্তলিকতার আড্ডা ভূর্ন্ধাসিতই হউক আর সুবাসিতই হউক্ তাহাতে কিছু আইসে যায় না। যদি কোনো পৌত্তলিক পুতুলপূজা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মোপাসনায় দীক্ষিত হন, আর তদ্দৃষ্টে তাঁহার পরিত্যক্ত পুতুলপূজাকে আমি যদি বলি ব্রহ্মোপাসনার গমক, তবে তাহাতে কি দোষ হয়।

প্রবোধম্বিতা॥ তোমার এ কথার সবিস্তরে উত্তর দিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে বেজায় বেশী, আমি তাই যত পারি অল্প কথায় তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। প্রণিধান কর "অ্যাকে তো বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের এটা একটা সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত যে, সমুদ্র শায়ী নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে যেমন ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সমুদ্রগর্ভশায়ী জীবাকর হইতে (Protoplasm হইতে) জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মনুষ্য-মণ্ডলীর সুপরিস্ফুট জ্ঞানে চরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেরই এটা একটা স্থাথা কথা যে সদ্যজাত মনুষ্য সন্তানের অন্তরনিগূঢ় জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ তাহা অধিকাধিক পরিমাণে পরিস্ফুটতা লাভ করিতে থাকে। ইহা হইতে অধিক প্রমাণ আর কী হইতে পারে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞানের ক্রম-বিকাশ প্রকৃতির একটা প্রধানতম মূল নিয়ম। পূর্ব্বতন বৈদিক ঋষিদিগের নবন্মেষিত পারমার্থিক জ্ঞান অজ্ঞানে জড়িত থাকিবারই কথা কিন্তু সে যে অজ্ঞান তাহাতে কু'এর সংস্পর্শমাত্রও ছিল না,—তাহা অল্পবয়স্ক বালকের স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞানের ন্যায় মনোমুগ্ধকর মিঠাধরণের অজ্ঞান ছিল। আর সেইজন্য তাহাদের সেই কাঁটা খোঁচা বর্জ্জিত নির্ম্মল অজ্ঞান পরবর্ত্তী বৈদিক সময়ে আপনা হইতেই অপসারিত হইয়া গেল, পক্ষান্তরে যাঁহাদের জ্ঞানের অপরিপক্ক অবস্থায় তাহা অবিদ্যার দ্বারা আক্রান্ত হয় তাঁহাদের জ্ঞান হইতে সে আপদটাকে ছাড়ান কঠিন হয়।

জিজ্ঞাসু॥ অবিদ্যা এবং অজ্ঞানের মধ্যে কিছু যে প্রভেদ আছে একথা আমার কানে নূতন ঠেকিতেছে। আমি তো জানি এই যে অজ্ঞানও যা অবিদ্যাও তা'।

প্রবোধম্বিতা॥ অজ্ঞান শব্দটিকে কেহ যদি অবিদ্যা অর্থে প্রয়োগ করেন তাহা হইলে যে একেবারেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে তাহা আমি বলি না; এমন কি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণীত সর্ব্ববেদান্তসারসংগ্রহ গ্রন্থের অনেকানেক স্থানে করিয়াছেনও তাই; কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে :—

বেদান্ত দর্শনে যাঁহাদের স্বল্পমাত্রও অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত কোন বেদান্তগ্রন্থে অজ্ঞান শব্দের উল্লেখ দেখিলে তাহার অর্থ যে, অবিদ্যা, এটা বুঝিতে একটু তাহাদের বিলম্ব হয় না। পক্ষান্তরে, তোমার আমার ন্যায় তেভাষীয়া নব্য বাঙালীর লিখিত কোন প্রবন্ধে অবিদ্যা অর্থে অজ্ঞান শব্দ যদি ব্যবহার করা যায় তবে তাহার সে অর্থটা বেঘোরে পড়িয়া মাঠে মারা যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই [তেভাষীয়া বলিলাম এইজন্য যে আমাদের ন্যায় একালের বক্তা বা লেখকদিগের বাংলাভাষা ইংরাজি বাংলা এবং সংস্কৃতের একটা জগাখিচুড়ী]। কিন্তু ভাই অ্যাতো কথায় কাজ কী:—বাদ প্রতিবাদের দ্বন্দ্ব কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া একমুহূর্ত্ত যদি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ তাহা হইলে তুমি আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে জ্ঞান এবং বিদ্যার মধ্যে, তথৈব অজ্ঞান এবং অবিদ্যার মধ্যে বেশ্ একটু প্রভেদ আছে। মনুষ্যের সহজ জ্ঞানকে (অর্থাৎ মনুষ্য জন্মের সহজাত জ্ঞানকে) যথা সময় সৎশিক্ষা এবং সৎসঙ্গের অমৃতসিঞ্চন দ্বারা পাকাইয়া তোলা হইলে তাহা বিদ্যারূপে পরিণত হয়; তেমনি আবার মনুষ্যের বাল্য-

কালোচিৎ স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞানকে অসৎশিক্ষা এবং অসৎসঙ্গের বিষের ছিঁটা দিয়া পাকাইয়া তোলা হইলে তাহা অবিদ্যারূপে পরিণত হয়।

এখন দেখিতে হইবে এই যে দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে হইলে যেমন, সুস্থ শরীর পথযাত্রীর পক্ষে পুষ্টিকর অন্নাদি সেবন করিয়া শরীরে বলসঞ্চয় করা আবশ্যক এবং রোগাক্রান্ত পথযাত্রীর পক্ষে ঔষধপথ্যাদি সেবন করিয়া শরীরকে রোগমুক্ত করা আবশ্যক, তেমনি, সাধারণ সুলভ সহজ জ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞানে উত্তীর্ণ হইতে হইলে সরল এবং শুদ্ধচিত্ত সাধু পুরুষদিগের পক্ষে বল পুষ্টিসাধক সত্যান্ন সেবন করা আবশ্যক আর অবিদ্যাক্রান্ত কলুষিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে স্নানাদিক পরিমাণে তপঃসাধন করিয়া অবিদ্যা হইতে মুক্তিলাভ করা আবশ্যক। এজন্য এক্ষণকার কালের বিষয়াসক্ত নিকৃষ্ট অধিকারীদিগের ন্যায় অসংযতচিত্ত ব্যক্তিরা যদি যম নিয়মাদির দ্বারা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিতে একটুও যত্নবান না হইয়া হঠকারিতার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সেরূপ কার্য্যে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। হয় তাঁহারা বেদান্তের মহাবাক্য তিনটির অর্থ ভুল বুঝিয়া আপনার অবিদ্যাগ্রস্ত-আত্মাকে ব্রহ্মের স্থলাভিষিক্ত করেন—নয় তাঁহারা ঈশ্বরভক্তি গুরুভক্তি মৈত্রী, করুণা পাপাচারীর প্রতি উপেক্ষা পুণ্যাচারীর সদনুষ্ঠানে যোগদান, সমদর্শিতা প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনার অটল ভিত্তিমূলের পরিবর্তে অপরের অবলম্বিত ধর্ম্মের ছিদ্রান্বেষণ এবং সেই সঙ্গে আপনার নবাবলম্বিত ধর্ম্মের অত্যুক্তি-দূষিত গুণগরিমার ডঙ্কাপিটন প্রভৃতি বালির বাঁধের উপরে ভজন সাধনের গোড়া ফাঁদেন। বর্ত্তমান স্থলে কিন্তু শেষোক্ত রোগের চিকিৎসার বিধান ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা এইজন্য তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া বৈদিক ঋষিরা কীরূপ প্রতীকোপাসনা হইতে ব্রহ্মোপাসনায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাই সাধ্যমতে প্রদর্শন করিব মনে করিয়াছি। এবারে কিন্তু আর না—যদ্ স্বল্পং তন্মিষ্টং।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্যামদেশে শিল্পশাস্ত্র

শ্যামদেশে যে এখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সে কথা এখনকার বিদ্যালয়ের ছেলেরাও জানে। শ্যামদেশ বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। এক কথায় শ্যামদেশের বর্ত্তমান সভ্যতাকে অনেকাংশে ভারতীয় সভ্যতার রূপান্তর বলা যেতে পারে।

শ্যামরাজ্যে এখন প্রায় ৫০ হাজার ভিক্ষু ও ১০ হাজার শ্রমণ আছে। ভিক্ষুদের থাকবার জন্যে যে সব মঠ আছে, সেখানে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। সেই বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি কোথা থেকে এল?

যখন শ্যামরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন হয়, সেই সঙ্গে বৌদ্ধশিল্প শাস্ত্রও সেখানে প্রবেশ করে। শ্যামে বৌদ্ধধর্ম্মের আগে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে হিন্দু মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে শিল্পী সেদেশে যান। সেই সব শিল্পীরা নিজেরাই অনেক মূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং সে দেশীয় লোকদের ভারতীয় শিল্পকার্য্যে শিক্ষিত করে তুলেন। শ্যামে যেসব বৌদ্ধমূর্ত্তি এখন পাওয়া যায়, সে সব দেশীয় শিল্পীদের করা। এই সব দেশীয় শিল্পীরা কিন্তু ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। তারা যেসব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত, তার আকৃতি হত অনেকটা শ্যামদেশীয়র মত, কিন্তু তার পোষাক পরিচ্ছদ বা লক্ষণ হত একেবারে ভারতীয়। আবার বুদ্ধদেবের মুদ্রা বা আসন সম্বন্ধে যেসব নিয়ম ভারতে প্রচলিত ছিল তাও তারা মান্‌ত।

ভারতবর্ষ থেকে যেসব শিল্পী সিংহলে বা শ্যামদেশে গিয়েছিল তারা নিজেদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রও নিয়ে গিয়েছিল। সিংহলে কান্দি সহরে এখনও যেসব পুরান শিল্পী আছে, তাদের কাছে সংস্কৃতে লেখা পুঁথি এখনও পাওয়া যায়। সিংহলে শিল্প পুঁথি সাধারণতঃ "সারিপুত্র" বলে পরিচিত। তার নাম—

"সারিপুত্র শ্রবণো-বিম্ব প্রমাণম্।"

শ্যামদেশেও এই রকম একখানা শিল্পশাস্ত্র ছিল। তার নাম "বুদ্ধলক্ষণ।" সম্ভবত বইখানি এখনও প্রকাশিত হয় নি। এই বইখানা প্রকাশিত হলে আমরা জানতে পারব শ্যামদেশীয় শিল্পীরা কতটা পরিমাণে শাস্ত্র মেনে চল্‌ত। অনেক সময় যে শিল্পীরা শাস্ত্রবাক্য অমান্য করত, তার প্রমাণ আমরা ব্যাঙ্কক সহরে সুদর্শনদেব বর্মার মঠে দেখতে পাই। সেই মঠে শাক্যমুনির যে মূর্ত্তি আছে শ্যামদেশীয় রাজা (Phra Nangklao) তার অঙ্গুলি ছোট করে দিয়েছিলেন। সেই কাজটা তিনি পুণ্যের কাজ বলে মনে করেছিলেন। শ্যামদেশে যেসব বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে তার লক্ষণগুলি শ্যামদেশের রাজকুমার পরমনুজিৎ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে তিনি বুদ্ধদেবের জন্ম থেকে পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত সকল অবস্থার মূর্ত্তিগুলির লক্ষণ ব্যাখ্যা করেছেন। সেই মূর্ত্তিগুলির প্রতিকৃতি ও তার ব্যাখ্যা শ্যামদেশীয় পত্রিকায় Journal of the Siam Society, June 1913—The Attitudes of the Buddha By O. Frankfurter, Ph. D) দেওয়া আছে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

— —

এই যে ছোটদিন

এই যে ছোট দিনটি মোদের
কাট্‌ল হাসি খেলায়
একটি আলোর ফুল—
কালের নীরে একি শুধুই
হারিয়ে যাবে হেলায়
যেন মনের ভুল ?

স্বপ্ন যেমন ঘুমের শেষে,
গন্ধ যেমন শূন্যে মেশে,
আকুল হাওয়ায় দীপের শিখা,
রৌদ্রে শিশির-ভুল ?
আহা, অস্ত রবির রঙের মত
সন্ধ্যা মেঘের ভেলায়
কালের নীরে একি শুধুই
হারিয়ে যাবে হেলায়
অকূলে নির্ম্মূল ?
এই যে ছোট দিনটি মোদের
কাট্‌ল হাসি খেলায়
একটি আলোর ফুল ?

সারা জগৎ জুড়ে দেখি
চল্‌চে সকল খানেই
এম্‌নি আনাগোনা।
শেষ হয়ে সুর ক্ষণে ক্ষণে
উঠ্‌চে জ্বলে গানেই
তবেই সে যায় শোনা।
জীবন পানে দেখ্‌না চাহি
এই আছে সে এইত নাহি,
না-হওয়া সে হয়ে ওঠার
নিত্য জালে বোনা!
ওরে অন্তবিহীন মরণ সে ত
এই আমাদের প্রাণেই।
শেষ হয়ে সুর ক্ষণে ক্ষণে
জ্বল্‌ল কত গানেই
তরল হৃদয়-কোণা!
সারা জগৎ জুড়ে দেখি
চল্‌চে সকলখানেই
এম্‌নি আনাগোনা।

হারায় না ভাই কিছুই তবে
রবার যা তা রবেই,
হয়ত নূতন বেশে !
যাওয়া-আসার স্রোতের পরে
চল্‌চি ভেসে সবেই
অজানা কোন্‌দেশে !
স্বপ্ন যত, ভালোবাসা,
ব্যাকুল বুকের আকুল আশা,
চেনার আড়াল পেরিয়ে তা'রা
গোপন প্রাণেই মেশে।
তারা সকল সমাপনের দিনে
আপন কথা কবেই
যাওয়া-আসার স্রোতের পরে
চল্‌চে ভেসে সবেই
অজানা কোন্‌দেশে !
হারায় না ভাই কিছুই তবে
রবার যা তা রবেই
হয়ত নূতন বেশে !

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হকুসাই

১৮শ শতাব্দিতে জাপানে একটা সময় এ'ল যখন চিত্রকরর সমাজের সাধারণ ছবি আঁকতে সুরু করলেন। এবং সে সকল ছবি wood block print করে বাজারে সর্ব্বসাধারণের জন্য বিক্রী হতে লাগল। বিলাতে কি অন্য অন্য জায়গায় তখনও আর্টকে popular করবার চেষ্টা এমনভাবে হয়নি কিন্তু জাপানে তখন বড় বড় চিত্রকররা লাগলেন যাতে ছোট খাট জিনিষ সুন্দর হয়ে সমস্তের ঘরে ঘরে থাকতে পারে। এই চিত্রকরদের ukieoye চিত্রকর বলা হত। নানা রকমের চিত্রকর ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে লাগলেন—কেউ রইলেন সমস্ত জীবন অভিনয়ের বড় বড় অভিনেতাদের চিত্র, এবং তার নানাপ্রকার দৃশ্যাবলী নিয়ে এবং কেউ রূপসীদের প্রেমের খেলা মান অভিমান বিদায়, বিচ্ছেদ, উৎসব, নাচের ছবি নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। এবং কেউ মানুষের ঘরের, বাইরের খবর, গাছপালা পাহাড়, নদী, সবই ভাল করে দেখে শুনে গল্পের জন্য আঁকতে লাগিলেন। এই ukieye যুগে হকুসাই জন্মেছিলেন তার অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে—জাপানের Yedo নগরীতে।

ছেলে বয়স থেকেই তার নিজের ভাবনা নিজেকেই ভাবতে হ'ল। প্রথমে তিনি ত একটা বইএর দোকানে কাজে লাগলেন। কিন্তু ভয়ানক অলস বলে তার কাজে জবাব হ'ল। তিনি তখন ভাবলেন তার দ্বারা দোকানের কাজ—হবার নয়। কাঠ খোদাই বিদ্যা শিখ্‌তে পারলে জীবিকা অর্জ্জন করা শক্ত হ'বে না মনে করে তিনি এক গুরুর কাছে উপস্থিত হলেন কাঠ খোদাই শিখ্‌তে। কিছুদিন পর তিনি কাঠখোদাই ছেড়ে আর এক গুরুর নিকট চিত্রবিদ্যা শিখ্‌তে আরম্ভ করলেন। তখন তাঁর বয়স ১৮ বৎসর। অল্পদিনেই তিনি গুরুর প্রিয়পাত্র হয়ে গুরুদত্ত নাম ছবিতে ব্যবহার করতে লাগলেন। এই-ভাবে কিছুদিন যাবার পর তাঁর গুরুর পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট না হয়ে অন্য পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে লাগলেন। এই ব্যাপারে তার গুরু এত অসন্তুষ্ট হলেন যে তিনি তার দেওয়া নাম ব্যবহার করতে নিষেধ করে তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

অনেক দিন অনেক কষ্ট স্বীকার করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে calender এবং নানাবিধ জিনিষ বিক্রী করেও যখন তাঁর কোন রকমে দিন চলছিল না এমন সময় তিনি একটা কাজ পেয়েছিলেন যাতে তিনি কিছুকালের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

১৭৮৯ সালে তিনি অনেক বইয়ের জন্য ছবি একেছিলেন

এবং ৬.৭ বছরের মধ্যে বড় চিত্রকরদের মধ্যে স্থান পান এবং keno yusen নামক একজন চিত্রকরের অধীনে একটি বড় মন্দিরের চিত্রকার্য্যের সহায়তার জন্য আহূত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ yusen এর একটি ছবির সমালোচনা করার দরুণ yusen তাকে দলচ্যুত করেন তারপর তিনি অনেক চিত্রকরের অধীনে কাজ করেন কিন্তু কারও তিনি বেশী দিন থাকতে পারতেন না এবং প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সময়ই তাকে নাম পরিবর্ত্তন করতে হত। ১৭৯৯এ তিনি হকুসাই নামে নিজেকে চালাতে লাগলেন এবং এই নামেই আমরা তাকে চিনি। তাঁর সুনাম তখন ধীরে চারিদিকে ছড়াচ্ছিল। তার স্বাধীন চিত্তের একটি ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করছি একটি ডাচ জাহাজের কাপ্তান ও ডাক্তার দু খানা ছবি হাকুসাইকে এঁকে দিতে বলেন। হাকুসাই ছবিগুলোর জন্য খুব একটু উঁচু দাম হেঁকে বসল কাপ্তান কিন্তু বিনা বাক্য ব্যয়ে ছবিখানা কিনলেন কিন্তু ডাক্তার মহাশয় ছবির জন্য অর্দ্ধ মূল্য দিতে চাইলেন হাকুসাই নিজেকে অপমানিত বোধ করে ছবি বিক্রী করতে অস্বীকৃত হয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভৎসনা করে বললেন "এতটা বাড়াবাড়ী তোমার ভাল হয়নি আমরা গরীব আমাদের টাকার দরকার আমাদের এ রকম করলে কি করে চলবে?" কিন্তু হকুসাই উত্তর দিলেন "আমি জাপানীদের কথার মূল্য রেখেছি এক কথায় আর এক কাজ করা আমাদের ধর্ম্মনয় এটা তাদের জানা উচিত।" কিন্তু কাপ্তান সাহেব এ সব খবর শুনতে পেয়ে নিজেই সে ছবিটাও কিনে নিয়েছিলেন। হকুসাই জীবনে অনেক অদ্ভুত চিত্রকার্য্য করেছেন। তিনি একটি মন্দিরের জন্য এত বড় একটি ছবি এঁকেছিলেন যে কেউ নীচে থেকে তার কিছুই বুঝতে পারেন নি, মন্দিরের উপরে উঠে তারা ছবিটা ঠিক দেখতে পারেন। অথচ ছবিখানা তিনি অল্প কয়েক মিনিটে শেষ করেছিলেন। রাস্তার লোক জড় হ'য়ে তাঁর অদ্ভুত তুলি চালনা দেখ্‌ছিল, হকুসাই আগু পিছু অনবরত দৌড়াদৌড়ি করে ছবিখানা অতি অল্প সময়ে শেষ করেন। এ রকম অনেক বড় বড় ছবি তিনি করেছিলেন যাতে তার ক্ষমতার পরিচয় আমরা পাই। তিনি একদিকে যেমন এত বড় ছবি করেছিলেন অন্যদিকে আবার তিনি এত ছোট ছবিও করেছিলেন—যে শুধু চোখে তা দেখা বড় কষ্ট কর। তিনি যে কোন জিনিষে যে কোন সরঞ্জাম এ ছবি আঁকতে পারতেন। Figure এর ছবি নীচ থেকে উপর দিকে উপর থেকে নীচে দিকে আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত এঁকে যেতে পারতেন। এবং এই অসাধারণ ক্ষমতার সহিত তার কল্পনাশক্তির নিতান্ত যোগ থাকার জন্যই তিনি সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হতে পেরেছিলেন। তার সুনাম যখন প্রত্যেকের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল তখন জাপানে সম্রাট তাকে রাজসভায় একটি ছবি আঁকবার জন্য ডেকে পাঠান। হকুসাই একখানা Screen এ একটি নীল নদী এঁকে একটি মুরগীর পায় লাল রং লাগিয়ে তার উপর ছেড়ে দেন। মুরগী উপর দিয়ে চলে যাওয়ায় সেই নীল নদীর উপর লাল পায়ের দাগ ফেলে যায়। যখন সেই ছবিখানা রাজার সামনে ধরা হ'ল তিনি দেখলেন তিতসুতা নদীর উপর দিয়ে শরতের রঙীন Maple পাতা ভেসে চলেছে। এই ছবিখানাতে তিনি রাজসভায় খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন। হকুসাই একজন লেখকের সঙ্গে একযোগে বইএর জন্য ছবি আঁকতে থাকেন কিন্তু প্রথম অধ্যায় বের হবার পরই দুজনে ঝগড়া হয়ে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তিনি অনেকবার yedo থেকে অন্য জায়গায় অদৃষ্টের তাড়নায় বেরুন কিন্তু আবার yedoতে ফিরে আসেন। ১৮০৬ যখন তিনি yedoতে ফেরেন তখন চারিদিকে দুর্ভিক্ষ তিনি তার Sketch এবং অনেক ভাল ভাল ছবি অতি অল্প মূল্যে বিক্রী করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন কিন্তু বিধাতা তাঁকে আরও কষ্ট দিলেন তার বাড়ীতে একদিন আগুন লেগে সমস্ত পুড়ে গেল তার অসংখ্য ছবি ও Sketch নষ্ট হওয়ার জন্য পৃথিবীর অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। হকুসাই শুধু তার তুলি আর একটি ভাঙ্গা জলের পাত্র বাচাতে পেরেছিলেন কিন্তু তিনি তাই নিয়েই আবার নতুন উৎসাহে কাজে লাগলেন দারিদ্র্যের সঙ্গে তার লড়াই এমনভাবে অনেকদিন চলল, কিন্তু তাতে কখনও

তার কাজের সবলতা নষ্ট হয় নি তিনি ঠিক যুবকের মত উৎসাহের সহিত কাজ করতে লাগলেন। দৃশ্য চিত্রেই হকুসাই সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। এবং তার দৃশ্য চিত্র আঁকবার পদ্ধতি একেবারে তারই নিজস্ব। ফুজিয়ামার ৩৬ খানা দৃশ্যাবলীর চিত্রে তিনি চিরদিন অমর থাকবেন। জাপানে দেখা যায় যে বড় শিল্পীগণ তাহাদের ভাল চিত্র সম্বন্ধেই আঁকিয়া গিয়াছেন। ফুজিয়ামাকে তাঁহারা অগাধ ভক্তি ও ভালবাসার সহিত পূজা করতেন। এই ফুজিয়ামা সম্বন্ধে অনেক গল্প তাঁহাদের উপকথায় শুনতে পাওয়া যায়। হকুসাই ফুজিয়ামার আরও অনেক ছবি এঁকেছিলেন। তাছাড়া তিনি জীবনে যে কত ছবি করেছিলেন তার লেখাজোখা করা দুষ্কর। অনবরত তিনি আঁকিয়া চলিয়াছেন yedon প্রসিদ্ধ শাকো, প্রসিদ্ধ ঝরণা এবং নানাপ্রকার দৃশ্যাবলীর কিছুই তিনি বাদ দেননি। হকুসাই-এর Mangwa নামক পুস্তক এক আশ্চর্য্য জিনিষ। তাহা দশ অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছিল এই বইটিতে এত বৈচিত্র্য বিষয়ের সমাবেশ আছে যে ইহাকে জাপানী জীবনের Encyclopedia বলা যেতে পারে। ইহাতে প্রকৃতির কোন জিনিষ যে তার দৃষ্টি এড়াই নি স্পষ্ট বুঝা যায়। পাহাড়, নদী, গাছ, মাছ, জন্তু, পোকা, সমুদ্রের উন্মত্ত ঢেউ, ফুল, পাথর, নৌকা, বাড়ী, বাসনপত্র, মানুষ, ব্যঙ্গ চিত্র, দাতা, সাধু, যোদ্ধা, ড্রেগণ কিছুরই বাদ নেই। এই বইএর জন্য হকুসাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রথম অধ্যায়ের মুখপত্রে হকুসাই সম্বন্ধে তার বন্ধু যাহা লিখেছেন তাহা এই। "অসাধারণ প্রতিভাশালী চিত্রকর হকুসাই পশ্চিমে বেড়াবার পর আমাদের নগরীতে (Nagoya) Bokusenএর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে চিত্র সম্বন্ধে আলোচনার ফলে তিনি তিন শতের ও বেশী চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আমরা চিত্রবিদ্যা যাহারা শিক্ষা করিতেছেন তাহাদের উপকারের জন্য এই অধ্যায় বাহির করিতেছি।

হকুসাইকে এই পুস্তকের নাম কি হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু "Mangwa" এই কথাটি বলিলেন এবং তাহার সহিত আমরা তাহার নাম:যোগ করিয়াছি মাত্র" Mangwa শব্দের সঠিক অর্থ হ'ল "সহজ ভাবে অনবরত যাহা আঁকিয়া যাওয়া গিয়াছে।"

হকুসাই তার জীবনে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট চিরদিনই তাঁহাকে নানাপ্রকার কষ্টের ভেতর দিয়া টানিয়া নিয়া গিয়াছিল। তিনি অনেকবার বলেছিলেন যে তিনি একশত বৎসর আয়ু পেলে বড় চিত্রকর হ'তে পারতেন। কিন্তু তাঁহার, আন্দাজ ৮৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলতে শুনা গিয়াছে "যদি ঈশ্বর আমাকে ১০ বৎসর আরও আয়ু দিতেন" একটু পরে "যদি ৫ বৎসর আয়ু ও দিতেন তবে আমি বেশ বড় চিত্রকর হ'তে পারতাম।" তিনি ফুজিয়ামার একশত চিত্রাবলীর মুখপত্র লিখেছিলেন "ছয় বৎসর বয়সের সময় আমি নানা-প্রকার জিনিষ আঁকিবার জন্য উৎসুক ছিলাম, ১৫ বৎসর বয়সে আমি অনেক বইয়ের জন্য চিত্র করেছি কিন্তু এই সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত ও আমি আমার ক্ষমতা ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারি নাই। কেবলমাত্র ৭৩ বৎসর বয়সে আমি একটু একটু বুঝিতে পারিয়াছিলাম কি করিয়া পশু, পক্ষী, পোকা, মাছ ও গাছ আঁকা যাইতে পারে। আশী বৎসর বয়সে আমার বেশ ভাল রকম জ্ঞান হইবে। নব্বই বৎসরে আমি আরও ভাল হইব একশত এ আমি আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইব। একশ দশ এ আমার তুলির প্রত্যেক আঁচড় জীবন্ত হইয়া উঠিবে যে, আমার একথায় কেউ যেন ব্যঙ্গ না করেন"। হকুসাই চিত্রকর হিসাবে খুব বড় নন তাঁহার চিত্রে জাপানী Asikaga periodএর চিত্রকরদের মতন উচ্চ-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রধান প্রধান সমালোচকগণ তাঁহাকে এসম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু হকুসাইয়ের চিত্র দেখলে মনে হয় যে জগতে যে জিনিষগুলো চিত্রকরেরা সামান্য মনে করে অবহেলা করেছে তারই সৌন্দর্য্য তিনি আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। প্রকৃতিকে তিনি এত সহজভাবে এঁকে গিয়েছেন যে ছোট-

থাট জিনিষগুলোও আমাদের চোখকে তৃপ্ত করছে। তাঁর চিত্রে উচ্চভাবের অভাব আছে একথা স্বীকার করতে হ'বে। কিন্তু তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। তার Technique প্রাচীন চীন জাপানীয় চিত্রকরদের চাইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না। হকুসাইয়ের মত এত বৈচিত্র্যময় কর্ম্মঠ জীবন খুব কম চিত্রকরদের ভিতর পাওয়া যায়।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

বনফুল

বনফুল
ওগো বনফুল
এতদিন পরে হৃদয়ে আমার
দিতে এলে বুঝি ধীরে দুল!
বৈশাখে তুমি কোন্ ধরণীর বুকে
ছিলে বিলীন হইয়া আঁধারের মাঝে সুখে
বুঝি রুদ্র-তাপের দহন বহ্নি-জ্বালা
সহিতে না পারি দুখে
খুঁজিছ হিয়ার নদী-কূল?
বনফুল!
ওগো বনফুল
আজি তুমি ওগো এলে কোথা হ'তে
কোন্ অজানার কূল?
বৈশাখে যবে বাজাল তাহার ভেরী
তোমারে খুঁজিতে হল যে আমার দেরী
পরে ফিরে এসে আর
হেরিনি তাহার
ঈশানের কোণ ঘেরি
উচ্ছ্বাসে নভ সমাকুল
বনফুল!
ওগো বনফুল
চলে যেয়ো তুমি তোমার পথেতে
ওগো নামহীন ফুল।
শুধু বারে বারে আমার দ্বারেতে এসে
তুমি ক্ষণেকের তরে দাঁড়ায়ো কেবল হেসে
মোর দিওগো পরাণে
সৌরভে গানে
নিত্যনূতন বেশে
মত্ত আবেগ মাথা দুল
ওগো বনফুল!

শ্রীমতী অমিতা চক্রবর্ত্তী।

অভিনয়ের মূল কা'রা?

প্রাণী রাজ্যের নাচেনা কে? প্রধান প্রধান দেবতা থেকে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সবাই। জানেন তো—

"শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে"

নাচের আনন্দে আর মাত্রা অমাত্রা রইল না, শিব ব্রহ্মারা পর্য্যন্ত গোয়ালাদের সঙ্গে এক চোট নেচে নিলেন। একেই বলে "আনন্দে নিয়মো নাস্তি"। পৃথিবীতে অতি অসভ্য থেকে সম্রাট্ পর্য্যন্ত নাচের কদর করেন সমান। জীবজন্তুর কথা না হয় ছেড়েই দিন। জীব হল সচ্চিদানন্দময় তার আনন্দের যে অংশটা বাহিরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে প্রকাশিত হয় তাকেই বলে নাচ। জড় নিজে নাচে না তাকে নাচাতে

হয়। পরমেশ্বর তাঁর প্রচণ্ডশক্তি বলে এই গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে নাচিয়ে নিচ্ছেন। গাছপালাও নাচেনা কিন্তু কবিরা তাদের নাচিয়েছেন। সে নাচের শিক্ষক হল সমীরণ, তাই তার খেতাব দিয়েছেন "লতাবলী লাস্যকলা গুরু"। এটি জীবের সহজ ধর্ম্ম বলে নাচের আদি উৎপত্তি কোনদেশে, কোথা থেকে কা'রা পেল এসব গবেষণায় মন লাগে না। তবে সব জিনিসের ক্রমোন্নতির সঙ্গে নাচেরও ক্রমোন্নতি আর রকম-ফের হচ্ছে, দেখছি।

নাচ শব্দ এসেছে নৃত্ ধাতু থেকে, নৃত্ ধাতু থেকে নৃত্ত, পরে প্রাকৃতে নচ্চ, শেষে হল নাচ, আর একদিকে ঐ ধাতু থেকেই নট ধাতুর উৎপত্তি তা' থেকে হয় নাট্য। নৃত্ ধাতুর আদত মানে হচ্ছে গাত্র বিক্ষেপ, Dance বলতে যা বুঝায় ঠিক তা নয়, এই জন্যেই সংস্কৃতে দুএক জায়গায় নৃত্যতির মানে নাচে, এই রকম অর্থ করলে অর্থ বিগড়ে যায় দেখেছি সে সবখানে গাত্রবিক্ষেপ অর্থই ঠিক। Dance অর্থ পরে প্রধান হয়ে গিয়েছে বোধ হয়। আমরা নৃত ধাতু হ'তে নৃত্ত, নৃত্য আর নাট্য এই তিনটি শব্দ যা পারিভাষিক। নৃত্ত মানে ভাবাশ্রয়ে শরীরের চালন, নৃত্য মানে তাল লয়ের সঙ্গে নাচা, আর নাট্য মানে অভিনয়। অভিনয় মানে পরের অবস্থার অনুকরণ। এই অভিনয় মানুষ পেল কোথা থেকে কি দেখে, এই সব নিয়ে নানা জনের নানামত। সেই কথাই আজ আলোচনা করি। এ দেশের প্রাচীন অভিনেয়-বস্তু অর্থাৎ নাটকগুলি সংস্কৃতই বেশি। (যদিও তাতে আধা-আধি প্রাকৃত ভাষা থাকে তা'হলেও প্রধানভাবে সংস্কৃত বলেই তাদের ধরা হয়) ঐ সব নাটকের মধ্যে "সূত্রধার" শব্দটি দেখে অনেকে স্থির করেছেন পুতুল নাচ থেকে নাটকের উৎপত্তি যেহেতু সূত্র বলতে পুতুলের সূতো, তাই ধরে ধরে যিনি নাচান তিনি ছিলেন সূত্রধার অর্থাৎ তামাসার কর্ত্তা। নাটকের অন্যান্য অংশ বদলে গিয়েছে বটে যিনি সূত্রাধার তিনি এখনো পর্য্যন্ত টেঁকে থেকে ঐ যে প্রাচীন তথ্য তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

যাঁরা এর পাল্টা জবাব দেন তাঁরা বলেন আমাদের দেশে কিছু পুঁথিগত হলে তা সূত্ররূপে অর্থাৎ ছোট ছোট কথাতেই হত, তাকে বলা হত সূত্র, যেমন গৃহ্য সূত্র, ব্যাকরণ সূত্র, অলঙ্কার সূত্র ইত্যাদি। তেমনি নাট্যের ব্যাপার যখন পুঁথিগত হয়েছিল তখন নিশ্চয় সূত্ররূপেই হয়েছিল তার নামও ছিল নটসূত্র, এই সূত্রকে যিনি মনে ধরে রাখতেন, তার মানে—নটসূত্রে যিনি পণ্ডিত তিনি হচ্ছেন সূত্রধার, সূত্র মানে সুতো নয়। আলঙ্কারিকরা বলেন নাটকীয় কথা সূত্র (Hint) যিনি ধরেন অর্থাৎ ষ্টেজে এসে বলেন তিনি সূত্রধার। এটা ঠিক যে অভিনয় পুঁথিগত হবার অনেক আগে অভিনয়ের সৃষ্টি, তখন সূত্রধার ছিলেন কিনা কে জানে। আবার স্থাপক নামে আর একজনের খবর পাই।

কেউ দুএকজন কুশীলব শব্দটি দেখে মনে করেন আগে একজন কুশ আর একজন লব সেজে আসরে রামায়ণ গান করতেন, সেই রামায়ণ গান আর কুশলবের সাজগোজ বদলাইতে একেবারে অভিনয়ে পরিণত। পরে অভিনয় বলতে লাগলো যা'তা' কিন্তু কুশলব কুশীলব হ'য়ে নটদের ঘাড়ে চেপে রইল, এখন কুশীর ঈকার নিয়ে শাব্দিকমহলে ঘোর দ্বন্দ্ব, বোধ হয় ওটা দেশীয় প্রথায় উচ্চারিত হয়ে সংস্কৃতে ঢুকেছে।

যবনিকা শব্দটিও প্রমাণ করতে চায়, গ্রীকেরা আগে নাটক আরম্ভ করে পরে ভারতীয়রা শিখেছে। আমরা যেমন আজকাল আসরে প্রদীপ না জ্বেলে বিলিতী আলো জ্বেলে থাকি কেননা তাতে বাহার খোলে বেশি, তেমনি যদি গ্রীসের পর্দ্দা ভারতীয় নাট্যমঞ্চের শোভা বর্দ্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো বাধা কি ?

যা হোক অভিনয়ের মূল সম্বন্ধে আমাদের একটা উদ্ভট মত হয়েছে। মনে হয় মানুষেরই সহজাত প্রবৃত্তি এই অভিনয়কে ফুটিয়ে তুলেছে, কিন্তু তার আদিগুরু হব্যভব্য লোক নয় তাহা হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু। একদিন দেখি যে কতকগুলি ছেলেমেয়ে খেলা করছে তাদের মধ্যে সব ছোট-টির বয়স তিন, বড়টির বয়স ছয়। হঠাৎ সেখানে গিয়ে পড়ে দেখি তা দিব্যি খেলা করছে, তাকে খেলাও বলা যায়

অভিনয়ও বলা যায় কেননা অভিনয় মানে অনুকরণ। শিশুরা প্রত্যেকে তাদের বাড়ীর এক একজনের ভূমিকা গ্রহণ করে খেলে যাচ্ছিল, আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই অনুকরণের মধ্যে তাদের স্বাভাবিকতা খুবই স্পষ্ট ফুটেছিল এমন কি কা'রো কা'রো মুদ্রাদোষ পর্য্যন্ত অবিকল নকল করছিল অথচ এই সব শিশুরা কোনদিন অভিনয় দেখেনি বা অনুকরণ করতে শিক্ষা পায়নি। হয়তো এরকম আত্মীয় স্বজনের নকল আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যেও কেহ কেহ শৈশবে করে থাক্‌তে পারেন। তার পরে এ সম্বন্ধে আরো জানাবার ইচ্ছা হওয়ায়, অনেকবার শিশুদের খেলা অনুধাবণ করে দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে যে হয়তো সর্ব্বপ্রথমে অনুকরণ-প্রিয় শিশুরাই অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। পরে বড়দের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ায় তাঁরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে থাক্‌বেন, তারপর তাতে নাচ গান যুক্ত হতে হতে এক আকার থেকে আকারান্তরে পৌচেছে। এই অভিনয়ও যে মানুষের আপনার ভিতর থেকেই জেগে উঠতে পারে তাতে সন্দেহ কি? তাহলে এদেশ সেদেশকে নিয়ে টানাটানি কেন?

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

চিত্রচরিত্র

৩

নেপোলিয়ান

আমি এখনো সম্রাট্‌কে চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। গায়ে সেই ধূসর জামাটি, মাথায় টুপি—কোমরে ঝুলিতেছে বাঁকা তলোয়ার। একটি উটের উপরে—সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া; দুই চোখের দৃষ্টি একত্র হইয়া অতি দূরবর্ত্তী দীপ্যমান মরীচিকা মৃগয়ায় ছুটিয়াছে। জোড়া দুটি ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া—চতুষ্কোণ কপাল খানিতে গোটা দুই রেখা মনের পরিবর্ত্তনশীল চিন্তার ছায়ার মত ক্ষণে ক্ষণে কখনো হ্রস্ব কখনো দীর্ঘ কখনো গভীর—রেখামাত্র সার বা কখনো। পাৎলা দুটি ঠোঁট মনের কথা চাপিয়া রাখিয়াছে।

অদূরে বড় পিরামিডটি ছোট দুটি সাকরেদের সঙ্গে পালোয়ানের মত তাল ঠুকিয়া ছাতি ফুলাইয়া বড় স্পর্দ্ধার সহিত দাঁড়াইয়া। মহাকালকে যদি কেহ কেবলমাত্র বাহুবলে হারাইয়া থাকে তবে ইহারা। তাজমহল চালাক: সে শিল্পকলায় সময়ের মনকে হরণ করিয়াছে। কিন্তু ইহারা কারুকলার ধার ধারে না—প্রকাণ্ড ওই মরুভূমিটার মতই বিভূষণ—বিবসন। সাহারার আত্মার মত ইহারা উদাস উদার ঊষর এবং অকৃত্রিম। মৃত্যুকে ইহারা অমর করিয়া তুলিয়া জীবনের নিত্যতাতে সন্দেহ প্রকাশ করে। ইহারা যে মানুষের কীর্ত্তি সে কথাটা আজ আর কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। পঞ্চাশ শতাব্দী ওই শিখর হইতে বিস্ময়ে চোখ মেলিয়া আছে।

কিছুদূরে ওই স্ফিংক্সের নরমুণ্ডটি—আজো তাহার প্রশ্নের উত্তর সে পায় নাই। এই মরুভূমি জয় করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। জয়োদ্ধত ফরাসী বীর সে কথার খোঁজ রাখে না। তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া মিশরের সভ্যতা বিধ্বস্ত; মিশরের রাজারা মরিয়াছে: না তাহারো বেশি—মরিয়া বাঁচিয়া আছে; পিরামিড স্তম্ভিত; সাহারা চিন্তিত; আফ্রিকার হৃদয়ে সেই উত্তর না পাইয়া প্রকাণ্ড হাতের পাঁচ-আঙ্গুলে মধ্য-ধরণী সাগরের গর্ভে খুঁজিয়া মরিতেছে নীলা নদী।

ওই ওখানে গোটাকয়েক খেজুরের গাছ; সায়ের জলাটাতে আকাশ-গলা স্বচ্ছ একটু জলে কাঁপিতেছে সেই কয়েকটি ছায়া। হঠাৎ দূরে মরু-ভৌমিক দস্যু শানিত বর্শা-ফলক রৌদে দীপ্ত করিয়া ছুটিয়া গেল। সহসা একটা বালুর বন্যায় আকাশের চোখে ধূলা দিয়া একটা মরুর ঝড় গেল

ছুটিয়া। নীলার জল বাড়িতে বাড়িতে কুমীরের গর্ত্ত ও আকের ক্ষেতগুলি ডুবাইয়া ডাঙায় বিশ্রাম-রত বড় বড় কুমীরগুলিকে ভাসাইয়া তুলিয়া—নীলার জল আসিয়া ঠেকিল পিরামিডের পাথরের ভিত্তিতে—সেখানে আজো গত বছরের ভাসিয়া-আসা খড়কুটা লাগিয়া আছে। সূর্য্য পশ্চিম-সাগরে পড়িতেই ছিটিয়া-ওঠা জলের কণা ছড়াইয়া গেল আকাশে। মরুভূমির তারা, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, জ্বলন্ত—মনে হয় যেন এই তো হাতের কাছে—আকাশ যেন মোটেই দূরে নয়। সাহারার সারাদিনের রাগটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া শিশির পড়িতে লাগিল—শিশিরে এই তৃষ্ণার কতটুকুই মিটিবে!

চারিদিকে এই পরিবর্ত্তন মধ্যখানে ওই ছোট মানুষটি—কোনো দিকে যাহার লক্ষ্য নাই। সে মনে মনে বহুদূর ভবিষ্যতের সমুদ্রে সেতু বাঁধিতেছে—কিন্তু প্রশ্নের উত্তর কি সে দিতে পারিয়াছে! তবে আর হইল না।

৪

দোদে

ভোর রাত্রের ট্রেণখানা ক্লান্ত-চাকায় ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। নিঃশ্বাস-জমা এই শীতেও যেন সে ঘামিয়া উঠিয়াছিল। প্ল্যাটফরমে বড় লোক নাই—দু' একজন কর্ম্মচারী—কয়েকজন কুলী—বেলে-পাথরের মেঝে শীতে কন্ কন্ করিতেছে। গাড়ী থামিতেই একসঙ্গে যাত্রীর দল ছোট বড় লম্বা মাঝারি গোল চ্যাপটা নানা রঙের তোরঙ্গ লইয়া নামিয়া পড়িল। চারকোণা একটি মাঝারি তোরঙ্গ অতি কষ্টে টানিয়া একটি ষোল বছরের ছেলে গাড়ী হইতে নামিয়া মোটা জামাটা ভালো করিয়া গায়ে টানিয়া দিয়া কাহার যেন অপেক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ পিছন হইতে কিঞ্চিৎ বয়স্ক একজন ভদ্রগোছের ব্যক্তি আসিয়া তাহার পিঠে মৃদু একটি চড় মারিল। পূর্ব্বোক্ত বালকটি চমকিয়া ফিরিল—তাহাকে দেখিল—দুই হাতে তাহার হাত দুইখানি ধরিল—অবশেষে ক্লান্তি-মাখা আনন্দের হাসি হাসিল। চব্বিশ ঘন্টা অনাহারে, শীতে ও দুশ্চিন্তায় কাটাইলে যেমন হাসি সম্ভব—তাহার চেয়ে বেশী কিছু নহে। একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তোরঙ্গটি তুলিয়া দিয়া উভয়ে ঠিকানায় রওনা হইল। তখনো শীতের শেষ রাত্রে প্যারিস সহর কুয়াশার কম্বলখানা মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। সীন নদীর বুকে বড় নৌকাগুলি নিঃশব্দ; নদীর উপরকার সেতুটি স্তম্ভিত; ঈফেল স্তম্ভটি উচ্চ আকাশে উদ্‌গ্রীব হইয়া ঊষার খোঁজ করিতেছে; গির্জ্জা-চূড়ায় ঘড়িটি, Odeon......নাট্যশালার তীব্র আলোক রশ্মি বাতায়ন পথে বাহির হইয়া পড়িতেছে; শোনা যাইতেছে ভিতরের প্রশংসমান মৃদুগুঞ্জন। সহরের পথ পথিক্ বিরল; দুধের গাড়ীগুলি ঘুম ভাঙিয়া ঠেলিয়া চলিতেছে; সব্জী-বুড়িমাথায় দোকানদারেরা এখনো বাহির হয় নাই—কেবল কারখানার কুলিরা লুব্ধ-সভ্যতার ঘুম-ভাঙানো বীভৎস চীৎকারে ব্যস্ত হইয়া কোনো একটা নগণ্য কফিখানা হইতে একটু কিছু খাইয়া লইবার কালে বিরল-বসন হাত-পাগুলিকে পরস্পর ঘষিয়া গরম করিয়া লইতেছে।

তোরঙ্গ-চাপানো সেই গাড়ীতে দুই ভাই চলিয়াছে। বড়জন সহরেই ছোট খাটো একটা কাজ করে—ছোট ভাই দক্ষিণ অঞ্চল হইতে এইমাত্র আসিল। ইহার আগে উক্ত অঞ্চলে একটি ইস্কুলে সে ঝাড়ুদার ছিল। ইস্কুলের ছাত্রের চেয়ে ঝাড়ুদারের শিখিবার উৎসাহ বেশি—তাই সে আজ এখানে। বড় ভাইয়ের নাম কি জানি না—ছোট ভাইয়ের নাম দোদে।

ঘুমন্ত রাজকন্যার দেশ

আজ এমন বর্ষার দিনে বসে বসে মাথায় কতরকম ভাবনা আসছে আর তারি সঙ্গে মনে পড়ছে নিজের দেশ। জন্মালুম, যার মাটির থেকে আরম্ভ করে জল, আকাশ সবই

আমার প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আর তাকে ভাল বাসলুম নিজের প্রাণের মত করে। অন্য সাধারণ দিনের চেয়ে বর্ষারই বেশী করে দেশের কথা মনে আসছে। মনে হচ্ছে এই যে বহুদূরে বসে আছি মেঘগুলো যেন সেখানকার নানা বার্ত্তা এনে বর্ষণ করে দিচ্ছে নিজের দেশের কথা ভাবতে ভাবতে তারই সঙ্গে মনে পড়ল আর একটি কথা।

যখন একবার আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলে বদরিকাশ্রম বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন ফেরবার পথে আগ্রা ইত্যাদি দেখে ফতেপুরশিক্রি দেখতে গেলুম। ভ্রমন বৃত্তান্তের কোঠায় আমি কিছু লিখবনা তার কারণ এ সব ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন তবে শুধু আমার চোখে যা বিশেষ করে ভাল লেগেছিল তাই বলবো। যখন আমরা ফতেপুরশিক্রির দিকে দল বেঁধে গানে পাগল হয়ে চল্লুম তখন ছিল একেবারে দুপুর বেলা তাতে আবার দারুণ গ্রীষ্ম। ফতেপুরে যাবার পূর্ব্বে ভাবছিলাম হয়ত বা তাজের কায়দায় না হয়ত একটা বিরাট ভাবে ফতেপুরশিক্রিকে দেখবো কিন্তু যখন গিয়ে দেখলুম তখন একেবারে অবাক।

যখন আমরা ছোট ছিলুম তখন কচি মন রাজত্বের রাজার ভাণ্ডারের সব চেয়ে অমূল্য ধন ছিল পরীদের দেশের গল্প আর ছিল মিঠে মিঠে কল্পনা-রসে ভরা রাজা কন্যার গল্প। মন তখন যে ভাবে গল্প বেয়ে আকাশ পাতাল বেড়িয়ে বেড়াত এখন কিন্তু কিছুতেই পারে না। তখন সে মানুষের রাজ্যের কোন এক গল্পের আড্ডা থেকে অনন্ত তারা খচিত অন্ধকার আকাশের সবখানে অনায়াসে বেড়াতো কোথাও বাধা নেই। আর কেবল মনে হত যদি একখানা মিশমিশে ঐ অন্ধকার আকাশেরই মত কাল একটা ঘোড়া থাকতো তা হলে ঘুমন্ত রাজকন্যার দেশে চুপি চুপি গিয়ে পায়ের কাছ থেকে সোনার কাঠি মাথায় আর রূপর কাঠি পায়ে রেখে রাজকন্যা ও সব দেশটাকে জাগিয়ে তুলি।

ফতেপুরশিক্রি যখন দেখলুম তখন আমার মনে কেবলই ঐ রাজকন্যার ঘুমন্ত দেশের কথাই মনে হতে লাগলো। তাজের মত তার কোন রকম আড়ম্বর নেই একেবারে বড় শাদাসিদে কিন্তু সুন্দর। ছোট ছোট প্রাসাদ আর তারি মধ্যে বেগমদের হাওয়া খাবার, স্নানের, জায়গা, চোখ বেঁধে খেলবার আরো কত রকম ঘরোয়া ব্যাপার দেখলুম। তাজে দেখেছিলাম সম্রাট কবির প্রেয়সীর প্রতি ভালবাসার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি আর দেখলুম সাহাজা নর একান্ত ভালবেসে আদর করা মমতাজের গায়ের কোমল স্পর্শ। সম্রাট কবি যে ছোঁয়া শুধু তার প্রাণের আদরের প্রেয়সী ফুলকেই দিতেন তারই ছোঁয়া যেন শুভ্র তাজে পাবার জন্য পাগল হয়ে স্পর্শ করে ঘুরেছেন। ফতেপুরশিক্রিতে কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের সব ছোঁয়াই রয়েছে। কোথাও হাতীশালা, কোথাও ঘোড়াশালা, আবার গরমে বেগমদের প্রিয় আতরের ফোয়ারা। বাদশার পাশা খেলবার পাশাঘর পাথরে খোদাই করা আছে কোথাও দেয়ালে এখনও দু' একটা বেগমের তসবীর সবই আছে কিন্তু নেই শুধু বাদশা আর বেগম ও বাঁদীর দল। মনে হল এই ত সেই ছেলেবেলাকার ঘুমন্ত রাজকন্যার দেশ। সবই আছে অথচ আবার সবই নেই। ফোয়ারার গোলাপ জলের বদলে মেঘের একটু জল কোন রকমে গ্রীষ্মের মরুভূমির মধ্যে তৃষার্ত্তের অমৃতবারির মত হয়ে আছে। অনেক দূর থেকে বুকফাটা তৃষ্ণা নিয়ে দু' একটি টিট্টিভ আর ঘুঘু এসে তৃষ্ণা মেটাতে চেষ্টা করে। পাখীগুলকে দেখে মনে হল ঠিক আমাদেরই অবস্থা এদের এই যে কতদূর থেকে শুধু সৌন্দর্য্য-পিপাসা নিয়ে আমরা অমৃতবারির সন্ধানে এলুম বুকের তৃষ্ণা না মিটিলেও অন্তত গলাটা একটু ভিজে মাত্র। আর চারিদিকে মাঝে মাঝে ঘুঘুর ডাক।

আজ আমার নিজের দেশের কথা যতই মনে হচ্ছে ততই মনে হচ্ছে যে সব আছে সব নেই এ সেই দেশ যেখানে পাখী থেকে আরম্ভ করে রাজকুমারী পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে আছে। শুধু রাজপুত্রের আগমন হলে হয়। কিন্তু সে রাজপুত্র যে কে তা একদিন হঠাৎ প্রকাশ হবেই। সে রাজপুত্রের আশায় আমরা পথ চেয়ে আছি (পুত্র হয়ত গরিবের ঘর থেকেও বেরুতে পারে)। শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

শেষ বিদায়

যখন তুমি এসেছিলে শেষ বিদায় নিতে
আমি তুলিনি মুখ তব আঁখি পানে চাহিতে।
ললাটে তব ছিল না লেখা
একটিও তো দুখের রেখা
তব স্মিতহাসিখানি সরল কথা
নিয়ে রচিনু মনে মনে কল্পলতা,
ভাবিনু বুকে নেবো ভরে তব মধু বাণীতে

শেষ হ'ল তোমার কথা বলিতে না বলিতে
আসন্ন বিরহ শূন্য ভরিতে না ভরিতে
আমি নয়ন তুলে দেখি বারম্বার
তব চোখেতে হাসি রহিল নাক আর
মলিন মুখে চলে গেলে ওগো তুমি চকিতে।

শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল

সিঁধ-কাটা

স্বীকার করাই ভালো আমি সিঁধ কাটিতে পারি না অথবা পারি কিনা জানি না কারণ কোনদিন চেষ্টা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু যে সিঁধ কাটিতে পারে তাহাকে প্রশংসা করি এবং সম্ভ্রম করি। তাহাকে বড় দরের শিল্পী না বলিয়া পারি না। শিল্পীরা যে আনন্দ ও স্বস্তির মধ্যে কাজ করে—তাহার ভাগ্যে যে স্বস্তিটুকু ঘটে না কিন্তু আনন্দটুকু থাকেই; আনন্দ না থাকিলে কোনো শিল্প সৃষ্টি হয় না; আর আগেই বলিয়াছি সিঁধ-কাটা বড়দরের একটা শিল্পকলা। আলঙ্কারিকেরা বিশেষ কারণেই এই সন্দেহজনক বিদ্যাটিকে চৌষট্টি কলার মধ্যে স্থান দিয়া গৌরবান্বিত করেন নাই। মৃচ্ছকটিকের কবি রসিকপুরুষ ছিলেন এবং গৃহে তাঁহার গৃহিনী ব্যতীত সিঁধ-কাঠির লক্ষ্যস্থল আর কিছু ছিল না এমন যদি সন্দেহ করি তবে তাঁহার রচিত নাটকই আমার প্রধান সাক্ষী হইবে।

চোরও যে চুরি জিনিষটাকে সঙ্কোচ করে তাহা সিঁধের শিল্প চাতুর্য্য দেখিলেই স্পষ্ট হইয়া ওঠে। সে চুরিটার বীভৎসতাকে সুন্দর করিতে প্রয়াস পায়—মৃতদেহকে ফুল দিয়া ঢাকিয়া দিবার মত। সুবর্ণের প্রতি চোর, কবি ও প্রেমিকের সমান টান; অতি নিপুনভাবে চোর ও কবির মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো হইয়াছে। প্রসিদ্ধ চৌরকবি একাধারে চোর, কবি ও প্রেমিক ছিলেন। তিনি যে সুরঙ্গ পথ রচনা করিয়া রাজকন্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা একবার মাত্র দেখিবার জন্য রাজশাসন অগ্রাহ্য করিতে ভয় করি না—যদিও সুরঙ্গ ছাড়িয়া সুরঙ্গমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না—এমন প্রতিজ্ঞা কখনই করিতে পারি না।

ঘরে চোর প্রবেশ করিলে ক্ষতির সম্ভবনা। কিন্তু সিঁধটা সুন্দর হইলে চুরির ক্ষতি খানিকটা যেন পূর্ণ হয়; অন্তত এটুকু মনে না করিয়া পারা যায় না যে চোরটার সমবেদনা বোধ আছে; চুরি করিয়াছে করুক কিন্তু ঘরের দেয়ালে একটা কুশ্রী ছিদ্র রাখিয়া যায় নাই। অভাবের তাগিদেই সে চোর নতুন সে একজন বড়দরের শিল্পী—মানুষের রসবোধের প্রতি তাহার দৃষ্টি একাগ্র। সে চোর যদি ধরা পড়ে এবং আমি যদি তাহার বিচারক হই—তবে তাহাকে বেকসুর খালাস করিয়া দিব—এমন উদারতা আমার নাই তবে "আঘাতের উপর অপমান করে নাই" ভাবিয়া তাহাকে যে লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করিব—সে কথা নিশ্চিত।

হায় আজকাল জীবনের সব ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য্যের স্থান কমিয়া আসিতেছে! প্রয়োজন রস-বোধকে যাবজ্জীবনের জন্য আন্দামানে পাঠাইয়াছে। প্রাচীনকালের লোকেরা

সাহসী ছিল কিন্তু তাহারা একটা সীসার গুলি খাইয়া মরিতে কখনই রাজী হইত না—ইহা নিশ্চয়। আমাদের জীবন-যাত্রা অধুনা যেমন সুলভ হইয়া পড়িয়াছে মৃত্যুও তেমনি ছুই আনার একটি সীসকখণ্ডের অতিরিক্ত কিছু আর আশা করে না। হায় জীবনে মরণে আমরা প্রয়োজনের দাস হইয়াছি। মৃত্যুর সিঁধ-কাটি বীভৎস একটি রন্ধ্রপথে মানুষের বক্ষে প্রবেশ করে ইহাতে মনুষ্যত্বের অপমান।

মানুষের প্রতি করুণার চর্চ্চা সম্প্রতি নিশ্চয় কমিয়া গিয়াছে নতুবা দেখিতাম ওস্তাদ চোর মৃত্যুকালে সাকরেদকে সুন্দর করিয়া সিঁধ কাটিবার বিদ্যাটী শিখাইয়া মরিতেছে নতুবা দেখিতাম চোর-প্রেয়সী অভিযানকালে প্রিয়তমকে মাথার দিব্যি দিয়া বলিতেছে সিঁধের ছিদ্রটি চুরি-করিয়া-আনা সোনার বালাটির অপেক্ষা কম সুন্দর হইলে সে অলঙ্কার কখনই সে পড়িবে না—নতুবা শয্যায় সহসা জাগিয়া দেখিতাম লোহার সিন্দুকটি খোলা আর দেয়ালে একটি পদ্ম-পুষ্পাকার রন্ধ্র দিয়া প্রভাতের অস্পষ্ট আলোটি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিতেছে অলঙ্কার গিয়াছে বটে কিন্তু আমিও তো কম সুন্দর নই।

মহাকাল

চির অন্ততমিস্রার মঞ্জরীতে পূর্ণতব থাল
মৌন মহাকাল।
তোমার ললাট ঘিরি বৃথীশুভ্র তারকার মালা,
তোমার বক্ষতলে শতলক্ষ দীপের দেয়ালা,
বর্ষদিবারাত্রিমাস তব অঙ্গে বলয় কঙ্কণ,
বল্লরিত বসন্তের পুষ্পরেণু বিভূতি অঙ্কন,
উষার কনকবর্ণ স্নিগ্ধজ্যোতি কিরণ কিঙ্কিণী
বাজে রিনি রিনি।

স্বর্ণ-শলাকায় গাঁথা তব মুগ্ধ পিঞ্জর টুটিয়া
চলেছে ছুটিয়া
দণ্ডদিবাপলমাস অবিরল অনন্ত পাথায়,
মর্ম্মর-কম্পন তার কেঁদে ওঠে শাখায় শাখায়,
বর্ত্তমান বৃথা দেয় অতীতের চরণ ঘেরিয়া
শত আর্ত্ত-আকুতির অশ্রুভরা দুবাহু বেড়িয়া!
ধেয়ে আসে ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় কাঁপিতে কাঁপিতে
মিলায়ে চকিতে।

বর্ত্তমানের বৃন্তে কেন্দ্র করি উঠেছে উচ্ছ্বসি
গ্রহ সূর্য্য শশী
ভবিষ্য-অতীত দোঁহে পরিশ্রম করিয়া অপার
নানাবর্ণে বুনি দেয় চারু-চিত্র উত্তরী তোমার;
চন্দ্র-সূর্য্য করতাল দুইহাতে বাজায় দিগ্বালা,
ক্ষণে ক্ষণে নিভে আসে পূর্ণিমার প্রদীপের আলা,
নক্ষত্রের লাজ-বৃষ্টি চলিতেছে তোমার উৎসবে
একান্ত নীরবে।

তোমার আকাশ তলে মেলি দিয়া শিকড়ে শাখায়
দুইটি পাথায়—
শত শ্যামরসোচ্ছ্বাসে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে বনানী,
পাথার ঝাপট তার দাপটিয়া যায় বক্ষে হানি
অখণ্ড কালের মাঝে জাগাইয়া বিচিত্র বুদ্বুদ,
বর্ষতিথিদণ্ডপল অনুপল কতকি অদ্ভুত!
দূরত্বের ইন্দ্রধনু ফুটে ওঠে কালের আকাশে
বর্ণের বিলাসে।

চেতনারে দণ্ড করি কল্পনার রাঙা-রজ্জু দিয়া
চলেছি মন্থিয়া—
তোমার অগাধ শূন্য তাই হেরি দেখিতে দেখিতে
বর্ণেছন্দেগন্ধেগানে ব্যঞ্জনার অশান্ত ইঙ্গিতে

অদেখা দেশের দৃশ্যে—নাহি-শোনা আবৃত্তির রবে
অবোঝা সত্যের স্বপ্নে,—চিহ্নহীন প্রেমের উৎসবে
একূলে ওকূলে লাগে চেষ্টা ভরা প্রকাশের ঢেউ
জানে কি তা কেউ!

বিশ্বের দুকূলপ্লাবী মহাকাল মৌন অভিনব
নমি পায়ে তব।
তোমার আঘাতে ভাঙি পড়িতেছে সৃষ্টির দু'তট,
তব কৃপা অঞ্জলিতে ওঠে ভরি দণ্ডদিবা ঘট,
জানারে আবদ্ধ করি রাখিয়াছ অজানা শৃঙ্খলে,
দুরন্তেরে জন্ম দিলে নিতান্তই খেলিবার ছলে।
আপনারে নাহি জান রুদ্র তুমি এতই মহান্
শোনো মোর গান।

নূতন আরব্যোপন্যাস

সিন্ধবাদের অষ্টম বাণিজ্য-যাত্রা

সমাগত অতিথিদিগের আহার সমাপ্ত হইলে সিন্ধবাদ সকলের মধ্যে আসীন হইয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। "বন্ধুগণ আমি ক্রমান্বয়ে সাতবার বাণিজ্যে গিয়া আশাতীতরূপ ধনলাভ করিলাম। অর্থের আর আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না কিন্তু কিছুতেই দেশে মন টিঁকিল না। পৃথিবীর নব নব বৈচিত্র্য আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে আকর্ষণ করিতেছিল—তাই বাণিজ্যের উপলক্ষ্যে অষ্টমবার সমুদ্র-যাত্রা করিলাম। এবার আমার সাতখানি জাহাজ হীরক, মুক্তা, জাফরান প্রভৃতি বহুমূল্য বাণিজ্যপণ্যে বোঝাই করিয়া লইলাম।

তারপরে একটি শুভদিন দেখিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিলাম। কূলহীন সমুদ্রে সাত দিবস সাত রাত্রি ধরিয়া জাহাজ চলিল। এ দিকের সমুদ্রে ইতিপূর্ব্বে কোনো জাহাজের পতাকা আর উড়ে নাই। অষ্টম দিন প্রাতে এক দ্বীপে আমাদের জাহাজ ভিড়িল। এ এক আশ্চর্য্য দেশ এখানকার অধিবাসীদের নিকট হইতে ও গ্রন্থাদি ঘাঁটিয়া যে সব তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই আজ তোমাদের নিকটে বলিব।

এ এক ভেড়ার দেশ—এ দেশে থাকে ভেড়ার দল—ছোট বড় মাঝারি—কালো ধলো তামাটে—রোগা বেঁটে লম্বা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলিতে পারি না কিন্তু যতদিন হইতে ভেড়া জাতির ইতিহাস লেখা হইতেছে ততদিন এখানে ভেড়া ব্যতীত অন্য কোন জীব আসে নাই। সুতরাং সেখানে তাহাদের একাধিপত্য। ইহা একটি দ্বীপ—চারিদিকে গভীর সমুদ্র ঢেউ এর উপর ঢেউ তুলিয়া ইহাকে ঘিরিয়া আছে। তত বড় সমুদ্র পাড়ি দিয়া সেখানে সহসা কেহ যাইতে পারিবে না—এই কথা ভাবিয়া প্রবীন ভেড়ারা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ভেড়া জাতির প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটিলে জানিতে পারা যায় ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ মানুষ ছিল। ইহা যত সহজে তোমাদের বলিলাম—তত সহজে তাহাদের নিকট বলিতে পারি নাই। কারণ উক্ত দ্বীপের দক্ষিণপাড়ার পণ্ডিতেরা এই সত্যটাকে অস্বীকার করিয়া বলেন—কথাটা রূপকমাত্র। ইহার ভিতরে গভীর আধ্যাত্মিক সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। পূর্ব্বপাড়া বাসিরা বলেন—যে প্রাচীনকালে কোনও ভেড়া জাতির গৌরববিদ্বেষী চতুর ব্যক্তি ভেড়া জাতিকে খর্ব্ব করিবার জন্য তাহাদের জন্মসূত্রের সঙ্গে মানুষের নাম গাঁথিয়া দিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমপাড়াবাসিরা বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া করিয়া থাকেন তাঁহারা বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিতে সব জিনিষ দেখিতে চেষ্টা করেন সুতরাং এই গভীর ঐতিহাসিক বিষয়ে তাঁহাদের মত ইহা ভেড়াজাতির ক্রমবিকাশবাদ ব্যতীত কিছুই নহে। হীন মনুষ্যকুল হইতে যুগ যুগান্তের ক্রমবিকাশে এই উচ্চ ভেড়াকুলের বিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলা হইলে সিন্ধবাদে থামিলেন। ভৃত্য আসিয়া অতিথিদিগকে শীতল

সরবৎ বিতরণ করিয়া গেল। তৎপরে সিন্ধবাদ পুনরায় আরম্ভ করিলেন।

আমি বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিক বা ঐতিহাসিক নহি সুতরাং উপরি উক্ত তিনটী মতের সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না! আমি ভেড়াজাতির প্রাচীন সাহিত্য-শাস্ত্র হইতে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই বলিব! ইহাদের প্রাচীনতম গ্রন্থে দেখা যায় যে পবিত্র ভেড়াজাতির পূর্ব্বপুরুষ একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি বনের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলেন। যখন তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছেন তখন সেই বনের মধ্যে একটি ভেড়া দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই ভেড়াটিকে অনুধাবন করিয়া বন হইতে বাহির হইলেন। তাহার এই আশ্চর্য্য গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তিনি তাহাকে গৃহে আনিয়া দেবতার মত সিংহাসনে তুলিয়া ধূপ ধূনা দিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বেচারীর এই দেবভাগ্য টিঁকিল না—সে মরিল। তাহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইবার জন্য উক্ত পূর্ব্বপুরুষ সেই ভেড়াটির চর্ম্ম-খানি পরিয়া থাকিতেন। মৃত্যুকালে সেই অতি পবিত্র চর্ম্মখানি তিনি পুত্রকে দিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সকলেই মেষ-চর্ম্মে আবৃত হইতে লাগিলেন। যখন দেশের সব ভেড়া নিজেদের চর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করিল তখন বিদেশ হইতে জাহাজে জাহাজে এই দ্বীপে ভেড়ার চামড়া আমদানী হইতে লাগিল। সমাগত অতিথিগণ নিস্তব্ধ হইয়া এই আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিতে লাগিলেন—সিন্ধবাদ বলিয়া চলিলেন।

প্রথমে ইঁহারা মনে রাখিতেন যে এই ভেড়ার চামড়া তাঁহাদের ছদ্মবেশ মাত্র। কিন্তু কালক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এই অবান্তর কথাটা ভুলিতে লাগিলেন। এখন তাঁহারা প্রায় সবাই প্রাচীন সত্যটা ভুলিয়াছেন, দুই একজনের মনে কথাটা কখনো কখনো পড়ে তখনি তাঁহারা ভেড়াজাতির শাস্ত্র পুরাণ ঘাঁটিয়া কথাটাকে সম্পূর্ণ স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক বল এমনি যে কথাটা উড়িতে একটুও বিলম্ব করে না। প্রথমে ইঁহাদের চিন্তা করিবার প্রণালীটা মানুষের মতই ছিল—কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইঁহারা বহু চেষ্টা করিয়া তাহাও ভেড়াজাতির অনুরূপ করিয়া তুলিলেন—তাঁহারা এখন ভেড়াজাতির মতই ভাবেন। কেহ হঠাৎ অন্যরূপ ভাবিলে দক্ষিণ পাড়ার প্রবীনেরা উদ্যত গদা তুলিয়া তাড়া করিয়া আসেন—বলেন এ রকম করিলে কতদিন আর প্রাচীন ভেড়াজাতির অস্তিত্ব থাকিবে। ঐতিহাসিকেরা বলেন দেখ প্রাচীনকালের ম্যামথ্ লোমশহস্তী প্রভৃতি কত অতিকায় প্রাণী লোপ পাইয়াছে আর আমরা অতি প্রাচীন ক্ষুদ্রকায় ভেড়াজাতি এখনও বাঁচিয়া আছি কোন্ বলে ?

অমি আধ্যাত্মিকেরা বলিয়া উঠেন—আধ্যাত্মিক বলে—আধ্যাত্মিক বলে—

বৈজ্ঞানিকেরা একথা মানিবেন কেন ? তাঁহারা বলেন —আমাদের চর্ম্মখানিরই গুণে আমরা টিকিয়া আছি ; অন্যান্য দেশের মানুষেরা যে লোমে বহুমূল্য শাল তৈরী করে—আমাদের অঙ্গবাস সেই মূল্যবান লোমজ। ইহা ভেদ করিয়া বাহিরের দূষিত বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না—যেমন প্রবেশ করিতে পারে না আমাদের চারিদিকের সমুদ্র পার হইয়া আমাদের পবিত্র দ্বীপে কোন মানুষ। আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মত-দ্বৈধ লইয়া ঘোরতর তর্ক বাধিয়া উঠিলে হঠাৎ কোনো প্রবীন বিজ্ঞ ভেড়াশাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন মনে কি নাই যে শাস্ত্রে আছে ভেড়াজাতির তর্ক করা নিষেধ—ভেড়াজাতি কেবল অনুসরণ করিবে—প্রশ্ন করিবে না—জিজ্ঞাসা করিবে না—দৃষ্টিপাত করিবে না—কেবল অনুসরণ করিবে। এই কথা শুনিবামাত্র লজ্জায় উভয়দল নিস্তব্ধ হয় এবং সকলে মিলিয়া প্রবীনতম বৃদ্ধতম বিজ্ঞতম ভেড়ার পিছনে দলবদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে একটি পথে— সেই একটি মাত্র পথই তাহাদের দেশে আছে—ভেড়াজাতির পবিত্রতম দেবতার পাথরের মন্দিরের চারিদিকে। এই আধ্যাত্মিক প্রদক্ষিণ-প্রথাকে তাহাদের শাস্ত্রে বলে গড্ডালিকা-প্রবাহ ! ভেড়াজাতির সর্ব্ববিধ

উন্নতির জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন; একবার এই প্রবাহে গা ঢালিয়া দিতে পারিলে আর কোন ভাবনা নাই—প্রশ্ন নাই —জিজ্ঞাসা নাই—অনুসন্ধান নাই—অনুসন্ধিৎসা নাই—সকল বিষয় বাসনা আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তির চরম চরিতার্থতা এই প্রবীনতম প্রাচীনতম পবিত্রতম প্রবাহে। ব্যাপারটা মানুষ জাতির পক্ষে হঠাৎ বুঝিয়া ওঠা কঠিন কারণ মানুষের ভাষায় ইহার অনুরূপ কোনও শব্দ নাই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সিন্ধবাদ থামিলেন। সমাগত অতিথিরা তখনো গল্প চলিতেছে ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। সিন্ধবাদ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বন্ধুগণ আজ রাত্রি অনেক হইয়াছে অতএব এখানেই আমার কাহিনী শেষ করিলাম। আগামী কল্য তোমাদিগকে আমার পরবর্ত্তী কাহিনী শুনাইব। ইহা শুনিয়া অতিথিরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রয়ান করিলেন।

আশ্রম-সংবাদ

আগামী ৫ই আশ্বিন হইতে ৩রা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত পূজাবকাশের জন্য আশ্রম বন্ধ থাকিবে। অধিকাংশ ছাত্র এই সময় দেশে যান—কেবল আসন্ন পরীক্ষার্থীরা এবং বড়দের কেহ কেহ আশ্রমে থাকেন। শরৎ ও শীতের সীমান্তে এই সময়টি সবচেয়ে আরামজনক।

এবার বীরভূমের এই অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হইয়াছে। চারিদিকে চাষের অবস্থা প্রথমটা আশঙ্কাজনক মনে হইলেও এখন বেশ সুন্দর বলিতে হইবে। এত বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও আশ্রমে জ্বরপীড়ার প্রাদুর্ভাব এবার হয় নাই—সামান্য দু' একটি ম্যালেরিয়ার রোগী ব্যতীত অন্য কোনো কঠিন পীড়া দেখা যায় নাই।

আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বাঁধটি বর্ষায় স্ফীত হইয়া উঠিয়া আশ্রমবাসীদিগের স্নান করিবার সুবিধা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ছাত্রদিগকে নিয়মিতভাবে সাঁতার শিক্ষা দিতেছেন।

ছুটির পরে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। হল ঘর, নাট্যগৃহ ও বীথিকা মধ্যবিভাগের ও শমীন্দ্রকুটীর, পূর্ব্ব মঞ্চ (Cabin) ও সতীশ কুটীরে আদ্যবিভাগের ছেলেরা থাকেন। শিশুবিভাগ পূর্ব্বের আবাসেই আছে। মোহিত-কুটীর, পশ্চিম মঞ্চ (Cabin) ও সত্যকুটীরে বিশ্বভারতীর ছাত্ররা থাকেন।

বিশ্বভারতীর ছাত্ররা মাসে একদিন সম্মিলিত হইয়া পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্বন্ধে আলোচনা করেন। গত সভায় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্র কাব্যে পদ্মার প্রভাব' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শমীন্দ্র-কুটীর হইতে সঙ্গীত বিভাগ প্রথমে যেখানে ছাত্রীনিবাস ছিল—সেইখানে উঠিয়া আসিয়াছে। এই বিভাগে এক্ষণে পণ্ডিত শ্রীভীমরাও শাস্ত্রী হিন্দি গান শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন ও শ্রীবামন শিরোঙ্কর বাংলা গান, শ্রীরণজিৎ সিংহ সেতার ও এস্রাজ ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঠাকুর তবলা ও পাখোয়াজ শিখাইয়া থাকেন।

আমাদের পাঠকদের আশা করি মনে আছে গত বৎসর আশ্রমের ফুটবলের দল সিউড়ি হইতে ল্যাম্বোর্ণ কাপ প্রতিযোগিতায় জিতিয়া একটি কাপ পাইয়াছিলেন। এবারও সে খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে দলের সহিত আশ্রমের খেলিবার কথা ছিল তাহারা না খেলায় আশ্রমের দলে Semi-final এ উঠিয়াছে। রামপুরহাটের সুহাসিনী শিল্ড প্রতিযোগিতাও শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

শ্রাবণের কাগজে মোহনবাগানের সহিত খেলার সংবাদে একটু ভুল ছিল। ইহা এই রকম হইবে। প্রথম দিন মোহনবাগানের দল আশ্রমকে এক গোল দেন। অপর দুই দিন উভয় পক্ষে নির্গোল সমান-সমান খেলা হয়।

কলাভবনের সংবাদের মধ্যে একটু ভুল ছিল। শ্রীরামকিঙ্কর প্রামাণিকের স্থলে শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ হইবে।

আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের 'দাদু'

নামক একখানি গ্রন্থ বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত করিতেছেন। পূজনীয় আচার্য্যদেব ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

ছুটির পূর্ব্বে এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকেরা মিলিয়া বিসর্জ্জন নাটকটি অভিনয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আশ্রমের লোকের চলাফেরার সুবিধার জন্য নিজের হাতে একটি রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দিতেছেন।

পাকশালার বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রী প্রতাপচন্দ্র তলাপাত্রের যত্নে পাকশালার সম্মুখে সুন্দর একটি বাগান গড়িয়া উঠিতেছে এবং পাকশালায় পরিচ্ছন্নতাও পারিপাট্য বাড়িয়াছে।

টাটা-ভবনের নিকট হইতে শান্তিনিকেতনের গেট পর্য্যন্ত কঙ্করখচিত সুদৃশ্য একটি পথ সম্প্রতি তৈরী করা হইয়াছে।

আশ্রম হইতে গুরুপল্লীতে যাইবার পথটি এতদিনে সংস্কৃত ও সুন্দর হইয়াছে। রাত্রে অন্ধকারের অসুবিধাও দূর হইয়াছে—কারণ গুরুপল্লী পর্য্যন্ত বরাবর বিজলী-বাতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আশ্রমের সুযোগ্য চিকিৎসক শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায় কিছুদিন হইল সপ্তাহে একদিন করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয়বর্গের ছাত্রদের শারীর-বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন।

ক্ষতিপূরণ

জানি আর স্বর্ণপদ্ম ফোটে না ধরায়,
কমল-উন্মুখ প্রাতে পম্পাতীরে হায়
লঘু-পায়ে অপ্সরীরা স্নান সাঙ্গ করি
অবসন্ন-কেশ হতে মন্দার মঞ্জরী
ফেলি রাখি নাহি যায়; সুন্দরীসমাজ
স্বর্গমন্দাকিনী কূলে স্বপ্ন সুধু আজ।
আসন্ন আশ্বিনে এই ভোরের আঁচল
ভরি তোলে বারে বারে শিশির-উজ্জ্বল
ক্ষণ-স্বর্ণ শস্য কণা; দিগন্তের পরে
পরিপক্ক রৌদ্রগুচ্ছ পূর্ণতার ভরে
আনামিত ধান্য যেন।
এই কিবা কম!
সবারে করিয়া পূর্ণ আছ প্রিয়তম—
স্খলিত অঞ্চল আর গলিত কবরী,
ললিত কৌতুকে ছুটি কলনেত্র ভরি।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতারে বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ | আশ্বিন, সন ১৩৩২ সাল। | ৯ম সংখ্যা

বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগ

ভারতবর্ষ নাকি প্রাচীনকালে কেবল নিজের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখ্‌ত, কোন বিদেশী জাতির সঙ্গে মিশত না—এই রকম একটা নালিশ অনেক ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে করেন। এই নালিশের মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

প্রথমে ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা যাক যে ভারতবর্ষ কখন নিজের গণ্ডী থেকে বাহির হয়েছিল কি না অন্যদেশের সঙ্গে মেশবার জন্যে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, যে রাজা অশোক প্রথমে ভারত থেকে গণ্ডীর বাইরে গিয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রথম সিংহলে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে পাঠান, সেদেশে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্যে। তার আগে অবশ্য বিজয় সিংহ গিয়ে সিংহলে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। শুধু সিংহলের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করে তিনি চুপ করে রইলেন না, সিরিয়া, মিশর ও গ্রীসেও তিনি ধর্ম্ম প্রচারক পাঠালেন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করবার জন্যে। এই রকম করে রাজা অশোকের সময় ভারতবর্ষ নিজের গণ্ডী পার হয়ে এসিয়া, ইয়োরোপ ও আফ্রিকা—এই তিন মহাদেশের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তারপর মহারাজ কনিষ্কের সময় আমরা দেখি যে, চীনদেশের সঙ্গে ভারতের একটা বিশেষ যোগ স্থাপিত হয়েছে। সেই সময় তক্ষশিলা থেকে কাশ্যপ মাতঙ্গ বলে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু গিয়ে উপস্থিত হলেন, একেবারে চীনের রাজদরবারে। চীনের সঙ্গে ভারতের যে যোগ স্থাপিত হল প্রায় হাজার বছর অবধি সেটি স্থায়ীভাবে ছিল। আর এই হাজার বছরে হাজার হাজার ভিক্ষু গেছে চীনরাজ্যে, মধ্য এসিয়ায়, খোটানে, তুর্কীস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করে' ভারতীয় সভ্যতা সে-সব দেশে দান করবার জন্যে। ঠিক এরই পরে আর একটি ঢেউ গেল—ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশের দিকে। সেখানে খুব শীঘ্রই ভারতবাসীরা জলপথে গিয়ে জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে ভারতীয় উপ-

নিবেশ স্থাপন করল, আর স্থলপথে আসামের মধ্য দিয়ে গিয়ে ব্রহ্মে, শ্যামে, কাম্বোজিয়, চম্পা প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করল। এই রকম করে ভারতবর্ষ নিজের গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করে জগতের কাছে নিজেকে হাজির করল। সুতরাং আমরা বলতে পারি না যে ভারতবর্ষ সব যুগেই কালাপানি পার হবার ভয়ে ভীত হয়েছিল, আর নিজেকে সঙ্কুচিত করে রেখেছিল।

এ ছাড়া যখনই ভারতবর্ষ অন্য জাতির সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছে, তার কাছ থেকে যা ভাল, তার সভ্যতার যা সুন্দর তা গ্রহণ করেছে। এই দেবার বা নেবার ক্ষমতাই জাতির জীবনী শক্তির পরিচয় দেয়। যখন কোন জাতি বিদেশীর সভ্যতা ভাল নয় বলে চুপ করে বসে থাকে, তার ভাল অংশটী গ্রহণ করে না, তখনই বোঝা যায় যে সে জাতির জীবনী শক্তি নষ্ট হয়ে এসেছে। ভারতবর্ষ প্রথমে যখন গ্রীকদের সংস্পর্শে এল, তখন তাদের যা সৎ, যা সুন্দর তা নিয়েছিল। এটা অস্বীকার করবার যো নেই যে গ্রীকদের কাছ থেকে ভারতীয় শিল্পীরা গ্রীকশিল্পকলা শিখেছিল। এর মানে এই নয় যে গ্রীকরা আসবার আগে ভারতে কোন শিল্পকলা ছিল না। তার আগে ভরহুত ও সাঁচির শিল্পকার্য্য রয়েছে। কিন্তু সে সব শিল্প কাজে আমরা বুদ্ধদেবের কোন মূর্ত্তি পাই না। তার বদলে আমরা পাই ধর্ম্মচক্র বা বোধিবৃক্ষ যা বৌদ্ধরা পূজা করতেন। গ্রীকদের কাছ থেকে ভারতীয় শিল্পীরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির একটা আদর্শ পেল। গ্রীকমূর্ত্তির অনুকরণে ভারতীয় শিল্পীরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি তৈরী করতে লাগল। এই হল গান্ধার শিল্পের সুরু, যে শিল্পে আমরা গ্রীক প্রভাব অনেকটা দেখতে পাচ্ছি। সে সময় ভারতীয়রা সভ্যতায় পঙ্গু হয়ে যায় নি বলে তারা গ্রীকদের কাছ থেকে এই দানটি গ্রহণ করতে পেরেছিল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

রঙ্

রঙের জয়জয়কার সর্ব্বত্র। যার যত রঙের জোর জগতে সে তত কৃতকার্য্য তত জয়ী। জগৎটা যদি একরঙা হতো অর্থাৎ এতে যদি রঙের এত বৈচিত্র্য না থাকতো তবে আমাদের দৃশ্যানুভূতি একেবারেই অসাড় থাকতো। রঙ্ প্রথমত রঙিনকে বড় করে তোলে, এমন কি খেলাতেও তাই দেখি গোলামও রঙের জোরে টেক্কার মাথায় হাত বুলায়। জগতের সবকিছু প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে একটা না একটা রঙ্ আশ্রয় করে থাকে। ক্ষিতি অপ তেজের তো কথাই নেই। কেবল বাতাস আকাশ রঙকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল কিন্তু পণ্ডিতরা স্থির করেছেন বাতাস দূরে থেকে নিজের রঙ্ প্রকাশ করে—আকাশের নীল রঙ্ নাকি বাতাসের কারচুপি, প্রকৃতিদেবী আকাশকেও রঙ'তে ছাড়েন না। শরতের প্রভাতে আর সন্ধ্যায় আকাশের এমনি দশা হয় যে দোলের দিনেও ঠাট্টার সম্পর্কের কোন লোকের অমন হয় না। ব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ কিন্তু তিনি তেজোময়, তেজের তো একটা রঙ্ আছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ মানে যা আমরা চোখে দেখি, আর অপ্রত্যক্ষ মানে যা আমরা মনে মনে দেখি। প্রত্যক্ষ রঙ্ সবাই দেখেছেন কিন্তু অপ্রত্যক্ষ রঙ্‌টি কি? অপ্রত্যক্ষ রঙ্ হচ্ছে, সত্ত্বাদিগুণের রঙ্ রসের রঙ্ সুরের রঙ্ প্রভৃতি। এই রঙ্ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেছেন—"তচ্ছ শুক্ল নীল পীত রক্ত হরিত কপিশ চিত্র ভেদাৎ সপ্তবিধং" সূর্য্যের কিরণে এই সাতটি রঙ্ আছে তাই সূর্য্যদেব সপ্তাশ্ব। এই "সপ্ত" সংখ্যা যে পর্য্যাপ্ত, তা মনে হয় না, কারণ ঐ নামগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট রঙের নাম নয় ওকে রঙের জাতি-নাম বলাই ঠিক, কেননা সাদা বললে কি রকম রঙ্ আমরা বুঝবো। দুধ, কাঁচ জল রূপো সবইতো সাদা, তাই বলে কি সবগুলি রঙ্ এক রকমের? কাজেই সাদা বললে সাদা জাতীয়

রঙের একটা ধারণা হয় মাত্র, তারপর নিজের বিশেষ জ্ঞানে রঙটা কিসের মত তার একটা ঠিক করে নিতে হয়। মম্মটভট্ট, ঠিক বলছেন—"হিমপয়ঃশঙ্খাদ্যাশ্রয়েষু পরমার্থতো ভিন্নেষু……যদ্বশেন শুক্লঃ শুক্ল ইত্যাদ্যভিন্নাভিধান প্রত্যয়োৎপত্তিঃ"। নীল লাল হল্‌দের বেলাও তাই, নীলজাতীয় লালজাতীয় হল্‌দেজাতীয় রঙ্ বুঝায়। অতএব সাদা কি লাল কোন একটা নির্দ্দিষ্ট রঙকে বুঝাতে হ'লে একটা উপমা দিয়ে বোঝান ভাল। কাদম্বরীকার এ-বিষয়ে পাকা।

তারপর সাদা আর কালোকে রঙের পরিণাম বলা চলে, যে কোন রঙ্ গাঢ় হতে হতে কালোতে পৌছে, আর ফ্যাকাশে হতে হতে সাদায় পৌছে, এই সাদা ও কালোর মাঝে হ'লো অন্যান্য রঙ্।

এখন মূল রঙের কথা ভাবতে গেলে মনে পড়ে, সেই ছেলেবেলাকার ছড়া—

"লাল নীল আর হল্‌দে না মিশিয়া হয়
আর সব মিশলে ফলে নাহিক সংশয়"

কাজেই লাল নীল আর হল্‌দে রঙের কথাই আলোচনা করা উচিত ছিল, কিন্তু সে পন্থা ত্যাগ করে অন্য পথে যাওয়া গেল। ব্রহ্মের রঙ্ নাই বলে শুনতে পাই কিন্তু ভক্তরা সবচেয়ে তাঁকেই বেশী রঙিয়েছে, অতএব তিনি এখন থাকুন। বাকী হল মায়া বা প্রকৃতি (বলা আবশ্যক যে এখানে কোন বিশেষ দার্শনিক মত নেওয়া হচ্ছে না শক্তিমান্ আর শক্তিকে লক্ষ্য করা হচ্ছে) প্রকৃতি হলেন ত্রিগুণা অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তমো গুণযুক্তা। এই তিন গুণের তিনটি রঙ্ আছে অতএব প্রকৃতি তেরঙা, (এখানে ট্রাইকলার ব্লকের সঙ্গে ইচ্ছা হলে তুলনা করতে পারেন) শাস্ত্র বল্‌ছেন—"অজামেকাং লোহিত কৃষ্ণ শুক্লাং" লাল কালো সাদা এই হল তার রঙ্। তিনি সব সময়ে যে এই তেরঙা তা নয়, এক এক কাজের সময় তাঁর এক এক রঙ্ হয়। রজোগুণে (সৃষ্টির সময়) লাল রঙ্, সত্ত্বগুণে (স্থিতির সময়) কালো রঙ্, তমোগুণে (নাশের সময়) সাদা রঙ্। এই তিন গুণে তিন দেবতা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাঁরাও যথাক্রমে লাল কালো সাদা। আকর্ষণ সৃষ্টির প্রধান উপাদান, লাল রঙও আকর্ষক। কালো রঙ্ খুব ট্যাকসই, কাজেই স্থিতির রঙ্। তারপর নাশ হলে ধ্বংস হলে কিছু থাকে না, সব শূন্য হু হু করে, কাজেই নাশের রঙ্ সাদা, সব ফরসা।

এখানে এক কথা—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের দেবতা হয়ে যে শুধু তাই করেন তা নয়, তাঁদের মধ্যে কাজের পরস্পর অদল বদলও দেখা যায়। ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা হয়েও অগ্নিমূর্ত্তিতে কতশত গ্রাম নগরাদি ছারখার করেন। বিষ্ণুও অনেক অসুর দৈত্য সংহার করেন, শিবও মঙ্গলময় হয়ে সৃষ্টি রক্ষা করেন। তবে রঙের বেলাতেও কেন এমন ভাবের অদল-বদল হবে না?

সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ে রঙ্ যখন পাওয়া গেল তখন তদ্ধর্ম্মী যাবতীয় বস্তুতে যে রঙ্ থাক্‌বে তাতে আর সন্দেহ কি?

অতএব "লোহিত কৃষ্ণ শুক্ল" এই তিন রঙ্‌কেই প্রধানভাবে ধরা গেল। এখন রঙ্‌গুলির নাম সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌লে দেখি সাদা আর কালো বাদে অন্য সব রঙের নাম প্রায় এক এক জিনিষ থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন—লোহিত রক্ত; এসেছে রক্ত (Blood) থেকে। নীল মানে (Indigo), হরিত ও সবুজ, হরিত মানে দূর্ব্বা, সব্জি মানে কাঁচা ফল বা তরকারী (Vegetable). হল্‌দ হলুদ থেকে, বেগুনী বেগুন থেকে, এই রকম আরো দেখা যায়।

অক্ষরগুলির যেমন এক এক রকম ভাব জন্মিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে রঙের বেলাতেও তাই। এক এক রকম রঙ্ এক এক রকম ভাব মনের ওপর এনে দেয়।

প্রথমত সাদাকে ধরা যাক্। প্রশান্ততা, গৌরব, স্পষ্টতা আসক্তির অভাব প্রভৃতি সাদা রঙের দ্বারা মনে আসে। তারপর ভয় সঙ্কোচ আলস্য অবসাদ প্রভৃতি কালো রঙের সূচিত করে। এখানে একটি ভাববার কথা আছে, আমাদের দেশে মৃত্যুর পর শোকের চিহ্ন ধারণ করা হয় সাদায়, আর পাশ্চাত্য দেশে কালোয়। শোকেতে সব দেশেই সমান রূপে মনে দুঃখ উপস্থিত হয়। সুতরাং দুই দেশে তার অভি-

ব্যক্তিতে রঙে কেন তফাৎ হলো? মনে হয় মৃত্যুকে বিভিন্ন রকমে দেখার জন্য এই দুই রকম রঙের ব্যবহার হয়েছে। আমাদের দেশে মৃত্যু আবরক নয় অস্পষ্ট নয়, মৃত্যুর ও পারের খবর আমাদের মনীষীরা রাখতেন মৃত্যুর হাত ধরেই মুক্তির কাছে পৌছতে হবে হয়তো তার জন্য বহুজন্ম নাও কাটাতে হবে, এ সব তাঁরা জানতেন বলেই এই সাদা রঙ্‌টি যেটি সংহারকর্ত্তা অথচ শিবের রঙ্‌—সেটি গ্রহণ করেছেন।

ওদিকে মৃত্যু অত সুন্দররূপে দাঁড়াতে পারেনি মৃত্যুর পর সেই শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তিকে ভালয় বা মন্দয় অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কাজেই মৃত্যু সেখানে ভীষণ, আবরক প্রভৃতি রূপে মনে জাগে বলে তার চিহ্ন হলো কালো।

কালো রঙ যে ভয় উৎপাদন করে সে কথা আমাদের পণ্ডিতরাও মানেন। কিন্তু তাই বলে সব কালোই যে ভালনা তা নয়; স্বীকার করি কালো রঙের মধ্যে একটা অন্যায় ভাব আছে যেমন কাক কোকিল দুইই কালো দুইই দুষ্ট একজন গেরস্তের বাইরের আর একজন অন্তরের ক্ষতি করে। ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষসরা আমাদের কল্পনায় কালো তাদের কথা মনে করলে অন্ধকারে গা ছম্‌ছম্ করে এই রকম অনেক কিছু হলেও "কালো জগতের আলো" কেননা যত রঙের লুকোচুরি ঐ কালোর মাঝে। শ্যামশ্যামা-দুইজনই কালো দুইজনেই আর সকলের চেয়ে সেরা। ভক্তরা শ্যামামায়ের রূপ দেখেন "শত সূর্য্য জিনি জ্যোতি" সমস্ত রঙের চরম পরিণতি ঐরূপে, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র-শক্তি বিশিষ্ট চোখে ধরতে পারিনা বলে কালো মনে করি, যিনি করেন না তিনি বলেন—"কে তারে বলেগো কালো, আমি তো নেহারি সেরূপ মাধুরী লাখ বিজুরী জিনিয়া উজল"।

রাণী সুদর্শনা জগতের সমস্ত রূপ যে রাজাতে জমাট বেঁধে কালো রূপে ব্যক্ত হচ্ছিল তা তিনি ধরতে পারেননি বলে কি রকম নাকাল হয়েছিলেন জানেন তো? কাজেই এই কালোর গুরুত্ব কম নয়।

যাহোক, জীব জন্তু গাছপালা প্রভৃতির রঙ্ নিজে চোখে দেখ্‌চেন বলে তার কথা বিশেষ আলোচনা করলাম না। মোটামুটি দু একটা কথা বলে বক্তব্য শেষ করি। এই যে আমাদের জীবন, আলো বাতাসের মত যে সব ঋতুগুলির মধ্যে দিয়ে চলেছে সেই সব ঋতুগুলি ও এক একটি রঙেতে নিজের স্বরূপ বিকাশ করে। পোড়ামাটির রঙে গ্রীষ্মের অভিব্যক্তি হয়। ঐ রঙে শুষ্ক রুক্ষ ও একটা উগ্রভাব জড়িত আছে। গোলা পায়রার রঙে বর্ষার অভিব্যক্তি, কেমন একটা ঘোর ঘোর রঙে বর্ষাকাল ছেয়ে থাকে। রূপলি-সাদা রং শরতের, মেঘের টুকরো কাশফুল হংসাদি দ্বারা আকাশ আর পৃথিবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। মনে হয় যেন বর্ষার পঙ্কমালিন্য দূর করবার জন্য প্রকৃতিদেবী রাশি রাশি সাবান মেখেছেন।

সোনালি রঙ্ হেমন্ত সময়কে মনে জাগিয়ে তোলে। শীতের নীল্‌চেসাদা, ঐ রঙে একটা জবুথবুভাব সূচিত করে। বসন্তের বাসন্তী রঙ্ প্রসিদ্ধ, কিন্তু আমরা বলি লাল রঙই বসন্তের কেননা ওটা অনুরাগের রঙ্, বসন্ত ও অনুরাগের কাল। তারপর সুরেও রঙ্ আছে। উদাত্ত সাদা, অনুদাত্ত লাল, স্বরিত কালো, (যাজ্ঞবল্ক্য)। সাত-সুরের সাত রঙ্,সা—পদ্মপাতার রঙ্, রে—টিয়াপাখীর রঙ্, গা-সোনালী রঙ্, মা-কুঁদফুলের রঙ্, পা-কালো, ধা-হলদে নি-সবরঙেতে ছিট্‌ফিটে (নারদ)। রাগ রাগিণীগুলিরও রঙ্ নানারকমের। বোধ হয় রঙের ভাব আর সুরের ভাব সমানভাবে চলবার জন্য এই ব্যবস্থা। রসের রঙ্—আদি-শ্যাম, হাস্য-সাদা, করুণ—পায়রার রঙ্, রৌদ্র লাল, বীর-গৌর, ভয়ানক-কৃষ্ণ, বীভৎস নীল, অদ্ভুত-পীত (ভরত ২১। ক্রোধের সময় রৌদ্র রস, আর উৎসাহের সময় বীর রস, দুইয়ে এই প্রভেদ) আদিরসে প্রথম অবস্থায় রসিকদের গা-ঢাকা গাঢাকা ভাব থাকে বলে বোধ হয় শ্যামবর্ণ কল্পিত হয়েছে আর বর্ষাকালের রঙ্ ও আদিরসের রঙ্ এক হয়ে যাওয়ায় কবি বলেছেন "মেঘালোকে ভবতি"। তেমনি হাসির সময় দৃশ্যমান দাঁতগুলিরই প্রাধান্য থাকায় তাদের

রঙের সঙ্গে হাস্যরসের রঙ্ ঠিক কর' হয়েছে। যমের রঙের সঙ্গে ও বিষণ্ণ ভাবের সঙ্গে করুণ রসের রঙের সাদৃশ্য আছে। রেগে মানুষ লাল হয়ে ওঠে বলে রৌদ্ররসও লাল। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে ভয় হয় তাই ভয়ানক রস কালো। পচাজন্তুর রঙের সঙ্গে বীভৎস রসের রঙের মিল আছে। হল্‌দে রঙে চোখে চমক্ আনে বলে অদ্ভুতরস হল্‌দে।

এখানে একটু বলবার আছে, বলা হ'লো আদিরস শ্যাম, আর ভয়ানকরস কৃষ্ণ, কিন্তু আমরা সাহিত্যে ও অভিধানে শ্যাম কৃষ্ণ ও পাণ্ডু গৌর, প্রভৃতি শব্দগুলি এক অর্থে পাই। এর মানে কি? সত্যই ঐ-সব শব্দগুলি এক অর্থে বোঝালেও এক নয়, হেমচন্দ্র এইটুকু ধরিয়ে দিয়েছেন—"কৃষ্ণঃ নীলয়োঃ কৃষ্ণ হরিতয়োঃ কৃষ্ণশ্যাময়োঃ পীতরক্তয়োঃ শুক্ল গৌরয়োঃ" মানে কালোতে নীলেতে কালোতে সবুজে ইত্যাদি ক্রমে বিভিন্ন রঙ গুলি অনেকে এক রঙে মিশিয়ে ধরে নিয়েছেন বস্তুতঃ এরা পরস্পর ভিন্ন রঙ্। উদাহরণ যাঁরা দেখতে চান তাঁরা হেমচন্দ্রের অলঙ্কারের টীকা দেখুন। ভরতে (২১) যা রঙের একটা ফর্দ পাই তাতে দেখি সিত পীত মিলে পাণ্ডুবর্ণ, সিতরক্তে পদ্মবর্ণ সিত নীলে কাপোত (পায়রার রঙ্) পীত নীলে হরিত, নীলরক্তে কাষায়, রক্ত পীতে গৌর। তাহলে দেখুন—আমাদের ধারণা গৌর মানে ধব্‌ধবে সাদা যেমন "কৈলাসগৌর" কিন্তু শিল্পীরা বলেন কি? এই রকম হয়তো আরো কত ধারণা আছে।

যাই হোক কালপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ অর্থ জীব জন্তু সবই অমন পরিবর্ত্তিত হতে থাকে কত কত রঙ্ যে নূতন হচ্ছে—বা হবে তাতে আর সন্দেহ কি।

সাদা কালোর কথায় অনেক কথা এসে পড়ল এইবার লালের কথা বলে বিদায় নেব। বল্‌তে কি রঙ্ বল্‌তে যদি কিছু বুঝায় তো উচিত ছিল লালরঙ্‌কে বোঝান। কেননা রঙ্ থেকেই রাঙার উৎপত্তি। কাজেই রঙের রঙত্ব লালেই পূর্ণমাত্রায় আছে। সে যে অন্য কোন রঙের সঙ্গে মেশা নয় তা ফটোগ্রাফির রুবিল্যাম্পই যথেষ্ট প্রমাণ। সংস্কৃতে রাগ মানে লালকে বুঝায় ও অনুরাগ (love) কেও বুঝায়। অনুরাগের আকর্ষণী শক্তি সর্ব্ববিদিত। তাই বুঝি (আকর্ষণের দিক থেকে) গান বাজনা যখন এক সুরে মিশে যায় তখন তার নাম দেওয়া হয়েছে "রক্ত" অর্থাৎ লাল "তত্র রক্তং নাম—বেণুবীণা-স্বরাণাংমেকীভাবে রক্ত মিত্যুচ্যতে" (নারদ)।

রঙ্ রাঙা, রাগ, রঙ্গ, সবই এক বাড়ির ছেলে, এক বংশের। রঙ্ বা রাগ শব্দ পরে হয়তো সাধারণভাবে সমস্ত রঙ্‌কে বুঝিয়ে ছিল। সংস্কৃতে ও দেখি নীলীরাগ, তুলনা করুন বাঙলাতে—লাল-কালি।

মেঘদূতের যক্ষ যখন তাঁর প্রেয়সীর "প্রণয় কুপিতা" ছবি আঁক্‌তেন তখন "ধাতুরাগৈঃ" অর্থাৎ রাঙা জিনিষ দিয়ে আঁক্‌তেন। সংস্কৃতে রাগ শব্দে ক্রোধকে বুঝায় না—প্রীতিকে বুঝায়, কিন্তু দুয়ের রঙ্ সমান জাতীয় হওয়াতেই বা আমাদের ভাষায় রাগ মানে ক্রোধ হয়েছে। রঙের ধর্ম্ম হচ্ছে সে যাকে জুড়ে বসবে তাকে নিজের দ্বারা একেবারে ছেয়ে ফেলবে। প্রীতির বেলায় প্রীতিরবস্তু পরস্পর পরস্পরকে নিজের ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে সুতরাং রাগ বা অনুরাগ মানে প্রীতি অর্থাৎ মনের টান। এই অনুরাগের রঙ্ হল রাঙা। মনে রাখতে হবে অনুরাগ আর রিপু, দুটো এক জিনিষ নয়, একটিতে সৃষ্টিতত্ত্বের অপার কল্যাণকর রহস্য বিদ্যমান। আর দ্বিতীয়টিতে কেবলমাত্র সুখানুভূতির দ্বারা উত্তরোত্তর মনকে সজাগ রাখবার শক্তি বিদ্যমান, একটির দেবতা (রাঙা) ব্রহ্মা—প্রজাপতি, আর একটির—(শ্যাম) মন্মথ।

তাই প্রজাপতির জুরিস্‌ডিকসনের মধ্যে রাঙারই প্রাধান্য বেশী। নিমন্ত্রণ পত্র, দাম্পত্যের রেজিষ্টারীর ছাপ সীমন্ত-সিন্দুর, শুভদৃষ্টির বেশ লাল চেলী, পাণিতে গ্রহণের নিদর্শন লাল শাঁখা ও সূত্র, অধরের তাম্বুল, চরণের অলক্তক, সবই লালে লাল। (এই যে আমাদের মালক্ষ্মীরা তাঁদের খোকার লাল টুক্‌টুকে বউ কামনা করেন সেখানে লাল টুক্‌টুকে মানে গায়ের রঙে টুক্‌টুকে নয় গায়ের রঙ্ টুক্‌টুকে হলে বউটি কেবল খোকার নয় খোকার মায়েরও প্রীতির কারণ

না হয়ে ভীতির কারণ হতো, তবে নববধূর বেশ লক্ষ্য করেই বোধ হয় মা'রা বলে থাকেন লাল টুকটুকে) লাল রঙ্ মঙ্গল সূচক। এমন কি ঐ অলক্ষুণে গ্রহটা পর্য্যন্ত রঙের জোরে নাম আদায় করেছে—মঙ্গল। বসন্তোৎসবে শিমুলফুলে পলাশফুলে আবিরে ও রঙে্ কোকিলের চোখে প্রকৃতিদেবী ও নববধূর মত রাঙারঙে সাজ করেন।

রঙে্র রাজত্বে রাঙারই প্রাধান্য বেশী তা লক্ষ্য করলে পদে পদে টের পাওয়া যায়। যদিও আজ এই শরতের রূপলি সকালে বসে আছি তবু মহাকবির সেই গানটি মনে এসে খালি ধাক্কা দিচ্ছে, তাই—গাইতে ইচ্ছে করেছে—

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হলো
যেমন রাঙা বরণ তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'লো।
রাঙা হলো বসন ভূষণ
রাঙা হলো শয়ন স্বপন
ও মন, হলো কেমন দেখরে যেমন
রাঙা কমল টলমল।*

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।

একখানি পদচিহ্ন

আমি আমার মানস-দ্বীপের রবিন্‌সন্ ক্রুসো। অগাধ ঘুমের মত কালো একটা সমুদ্র চারিদিকে পাহারা দিয়া আছে। আকাশের চোখে কাজলের রেখাটি টানিয়া যেখানে দিক্‌বলয় মিশিয়া গিয়াছে তাহার পরপারে কি আছে জানিনা! সিন্ধুজাত উদ্ভিদের গন্ধে উদাস তীরভূমিতে সারাদিন পড়িয়া থাকিয়া দূর সমুদ্রে জাহাজের খোঁজ করিয়াছি—বৃথাই। ভাটার সময় জল যখন শঙ্খ, ঝিনুক, শুক্তি তীরে ফেলিয়া রাখিয়া হামাগুড়ি দিয়া নামিয়া গিয়াছে তখনো; জোয়ারের সময় হঠাৎ একটা অস্ফুট কলরব তুলিয়া ফেনাইয়া ফুলিয়া গড়াইয়া দুলিয়া জল যখন ধীরে ধীরে তীর রেখাকে গ্রাস করিয়াছে—তখনো; দুপুরের শান্ত সমুদ্র যখন নিজের কাছে নিজে একেবারে নাই হইয়া গিয়াছে—তখনো; আবার যখন পরিপূর্ণ পূর্ণিমার কোটালের বানে তীরে নীরে, জলে স্থলে, ঢেউয়ে স্রোতে, দূরে নিকটে, গর্জ্জনে সঙ্গীতে, জ্যোৎস্নায় ও জোয়ারে একটা প্রকাণ্ড উৎসব পড়িয়া গিয়াছে তখনো তখনো; আমি উদ্‌গ্রীব: আমি তীরে বালুস্তূপের উপরে উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছি।

কেমন করিয়া যে আমি এ দ্বীপে আসিলাম জানিনা। এ সমুদ্র আমি পার হইলাম কেমন করিয়া। এখানে আমার বাসা নয়—তাইতো মন বারে বারে উন্মনা হয়। বুঝি একটা জাহাজ-ডুবি, বুঝি একটা চোরা-পাহাড়, বুঝি একটা ঝড়। ওই যে দূর সমুদ্রে বুকের পাঁজরার মত কি একটা দেখা যায় ওইটাই কি সেই ভাঙা জাহাজ চোরা-পাহাড় আর ঝড়ের ষড়যন্ত্রের ফল! কিন্তু আজ আর সে বিচারে ফল কি? আজ ওই জাহাজটাতে সিন্ধু শকুনে বাসা করিয়াছে। সকাল বেলা দেখি তারা ঝাঁকে ঝাঁকে একে একে বাসা ত্যাগ করিয়া প্রথমে জাহাজটার উপরে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে ক্রমে বৃত্তটি বড় করিতে করিতে এক একদল এক এক দিকে তির্য্যগ্ গতিতে উড়িয়া চলিয়া যায়। আবার সন্ধ্যা বেলা দেখি—করুণ চীৎকারে সাথিদের খবর লইতে লইতে দলে দলে তাহারা ফিরিয়া আসে। যেদিন সন্ধ্যাকালে কালো সমুদ্রকে ভয়ঙ্কর করিয়া মেঘ নামে—তীরের নারিকেল গাছগুলির মাথা আসন্ন ঝড়ের অনাগত তালে দুলিবার জন্য প্রস্তুত হয় এই পাখীগুলির কর্কশ চীৎকার সেদিন বিভীষিকার মত লাগে।

---

* আমাদের ছাত্রপ্রিয় শ্রদ্ধেয় শ্রীরঙ্গাচার্য্য নন্দবাবু এই প্রবন্ধটি শুনে স্মিতহাস্যে লেখককে কৃতজ্ঞ করে থুয়েছেন।

নির্জ্জন এই দ্বীপটিতে আমি একলাই গৃহী সবই আমার গৃহস্থালী ; কোথাও চাষের ক্ষেত—কোথাও আঙ্গুরের বাগান—কোথাও সব্জীর বাগ—কোথাও ছাগলের খোয়াড়। এই যে দেয়ালে মই লাগানো দুর্গটা—ওইযে বারুদ রাখিবার মাটির তলের গুপ্ত কক্ষ—ওই যে শিশু গাছের বেড়া-দেওয়া বাগান বাড়ী—এই যে একখানা আধগড়া নৌকা। ইহার সবটার সঙ্গেই আমার পরিচয় হইয়াছে ; কেবল দক্ষিণ দিকের বনটি। রহস্যে নিবিড়, ছায়ায় আচ্ছন্ন, পাতায় শ্যামল বনটি। দুপুর বেলা ওখানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সন্ধ্যাবেলার নির্জ্জনতা দ্বিগুণ। উহাকে আজো চিনিতে পারিলাম না। উহার শাখায় কি কানাকানি, উহার পাতায় পাতায় কি কল কথা, উহার এগাছে ওগাছে কি জানাজানি উহার বাতাসে কি মর্ম্মরতা! কি কথা ওরা ফিস্‌ফিস্ শব্দে কয়? দীর্ঘশ্বাস উহাদের কোন দুঃখে? উহাদের শিকড় কোন্ রসাতল হইতে রস জোগায়? ওই বনের ছায়ায় প্রবেশ করিলে আমার শরীর যেন আর আমার আয়ত্তাধীন থাকে না—আমি ওই বনের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকি আমার দেহ হইতে মনের অংশ খসিয়া গিয়া শরীরটা কিছু পরিমাণে উদ্ভিদের গুণ প্রাপ্ত হয়।

আর এই নিঃসঙ্গ দ্বীপে আছে নিরাসক্ত একখানি চরণ চিহ্ন। সে চরণ নাই—সে ব্যক্তি নাই—শুধু আছে সেই পূর্ব্বপরহীন একখানি পায়ের একখানি ছায়া। ওগো তুমি কে? তোমাকে জানিনা ; জানিনা তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব। তুমি যেই হও তোমাকে আর পাইব না জানি—কিন্তু তুমি যে পথে আসিলে সে পথের চিহ্ন কেন মুছিয়া ফেলিয়া বিচ্ছিন্ন ওই ছাপখানা রাখিয়া গেলে।

ওগো আমার বিচ্ছিন্ন চরণ-চিহ্ন, ওগো আমার নিঃসঙ্গ দ্বীপের একমাত্র সঙ্গী, ওগো আমার নরনারী হীন নির্ব্বাসনের একমাত্র ধ্যানের ধন, তোমারই কল্পনায় মুগ্ধ হইয়া আছি। ওগো আমার পথরেখাহীন পদচিহ্ন, তুমি কোথা হইতে আসিলে—কোথায় গেলে কিছুই আজ আর জানিবার উপায় নাই।

কিন্তু আমিও কি একখানি অমনিতর বিশ্লিষ্ট পদচিহ্ন নই, নির্জ্জন এই দ্বীপে সমগ্র মানবসমাজের যাত্রাপথের একখানি পায়ের ছাপমাত্র। কোথা হইতে আমি আসিলাম কোথায় বা আমার গতি! শুধু বর্ত্তমানের দ্বীপটির বালুর উপরে একখানি চিহ্ন, আর কি?

চিত্র-চরিত্র

৫

ওয়ার্ডস্বার্থ

একটি হ্রদ ; সীসক-ধূসর আকাশের ছায়া তাহার জলে। তীরে তীরে অনুর্ব্বর পাহাড় ; তীরের নিকটের জলে মলিন তাহার ছায়া। পাহাড়ের কোলে ঢালু-ছাদ শাদা-দেয়াল সব বাড়ী ; ছায়া-মলিন জলে একটুখানি আশার মত বাড়ীগুলির প্রতিবিম্ব। হ্রদের অন্তকূলে শর ও খাগড়ার ঝোপ—তারা এমনি বাচাল যে দূরে একটুখানি হাওয়ার আভাস পাইতেই ফিস ফিস্ করিয়া ওঠে। এরা বড়ই ভাবপ্রবণ একটুখানি নাড়া পাইতেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের আর অন্ত নাই। কিছুদূরে একটি কুল-গাছ : ঠিক জলের কাছেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া ; কুঁড়ে লোকটা জলে নামিবার আগে যেমন ইতস্ততঃ করে অনেকটা সেই রকম। সবুজ তাহার পাতার ছায়া জলে শ্যামল দেখাইতেছে ; তার লাল ফলগুলির ছায়া তামাটে রঙ ধরিয়াছে সেই ধূসর হ্রদের জলে। যেখানে পাড়ির মধ্যে হ্রদের একটা শাখা ঢুকিয়া পড়িয়াছে—একরাশ সাদা ফুলের নাচন খানিকটা হাওয়ায়—খানিকটা ঢেউয়ে। জলের ফেনায় আর ফুলের স্তবকে চিনিবার উপায় নাই। কোকিল ভরসা করিয়া ডাকিবার আগে সাহসিকা এই ফুলগুলি আসিয়া জানাইয়া দেয় "আর নাই যে দেরী।"

এই হ্রদের তীরে, এই ফুলের ভিড়ে, ওই পাহাড়ের শিরে, কে ফিরিতেছে ওই লোকটি। নিরাসক্ত একটি আকুলতা তাহার গতিভঙ্গিতে একটি জাগ্রত অলসতা দিয়াছে। আলগা-বাঁধন সবল তাহার—শরীর; মূল্যবান তাহার পরিচ্ছদ—অপরিপাটি; ভাবুকের লক্ষণের মত ঈষৎ নত তাহার—মাথা; আপন-খুসীতে বোঝাই বলিয়া ঈষৎ দোদুল তাহার—চলাটি। দেহ তার সুন্দর নয় কিন্তু মুখটি! মুখখানি দেখিলেই মনে হয় যেন একখানি সুখের স্বপ্নের ছায়া লাগিয়া আছে; যেন ঘাস লতা পাতা ফুল সকলের সঙ্গেই তাহার চোখে চোখে কোলাকুলি চলিতেছে; যেন সুন্দর এই প্রকৃতির স্বচ্ছ ওই দর্পন!

কখনো কবি পকেটে হাত পুরিয়া, কখনো পাশের লতাটিকে একটু দোলাইয়া দিয়া, চোখ খারাপ থাকিলে অক্ষরের খুব কাছে যেমন চোখ লইতে হয় তেমনি ফুলের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কখনো, পাশের গাছের পাতার আড়ালে গীতমান পাখিটির সন্ধান লইয়া চলিয়াছেন কবি। এই নির্জ্জনতায় তিনি নিঃসঙ্গ নহেন। এই ফুল, লতা, পাতার কাহিনী লইয়া মনে মনে কবিতা রচনায় নিরত; মালী যেমন বনে বনে ফুল তুলিয়া সাজি ভরে ঘরে ফিরিয়া সুতা দিয়া তাহা গাঁথিয়া লয়—কবির পক্ষেও তেমনি। অগ্রথিত এই কবিতাগুলি লইয়া তিনি ফিরিবেন—প্রচুর আইভিলতা পর্য্যাপ্তিতে আচ্ছন্ন কুটীরে যেখানে আগুনের ধারে ভগ্নি ও স্ত্রী তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। কবি অন্যমনস্কভাবে গৃহ মধ্যে পদচারণ করিতে করিতে কবিতাটি আবৃত্তি করিবেন উদ্‌ব্যগ্র রমণীরা তাহা লিখিয়া লইতে থাকিবেন। এই মালা সহজে ছিঁড়িবার নহে যতদিন কাব্যরসিক ব্যক্তি থাকিবে ততদিন ইহাদের স্থায়িত্ব। ইহারা ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতা যে।

৬

ন্যুটহামস্থন

ক্রিশ্চিয়ানা; কঠিন শীতে জলস্থল জমিয়া গিয়াছে। তুষারপাতে চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর মত পাণ্ডুর: তাহাতে রাত্রি। পথে লোক নাই—দূরে দূরে আলোগুলি কুয়াশায় ঘোলা দেখাইতেছে—ট্রামের লাইনগুলির নির্জীব শীতলতা ছুরির মত চোখে বিঁধিতেছে। পথের মোড়ে মোড়ে কাঠের ছোট একটা আশ্রয়ের মধ্যে পাহারাওয়ালা বেচারা দাঁড়াইয়া—তাহার নাক ও গোফের উপরে নিঃশ্বাস জমিয়া ক্ষীণ শাদা একটা আবরণ পড়িয়াছে।

এমন সময়: সেই পথ: একটি লোক। ছিন্ন তাহার জুতা: জীর্ণ তাহার পোষাক: শীর্ণ তাহার দেহ। জুতা হইতে বাঁ পায়ের গোটা দুই আঙুল বাহির হইয়া ঠাণ্ডায় অসাড় হইয়া গিয়াছে। কোর্ত্তাটাতে এতগুলি তালি-যে তাহা ছক-কাটা দাবার ঘরের মতই বিচিত্র; হাতে কনুইর কাছে ছেঁড়া; তাহার নাকের ডগা আঙুলের আগা ও গালদুটা নীল হইয়া উঠিয়াছে শীতে; বারে বারে হাত দুইটা ঘষিয়া গরম করিবার ইচ্ছা কিন্তু পেটে খাদ্য না থাকিলে উত্তাপ কোথা হইতে আসিবে!

লোকটি ধীরে ধীরে একটি ছোট গলিতে ভাঙা বাড়ীর নিকটে আসিল। স্থির হইয়া শুনিল কেহ জাগিয়া নাই; জানালার কোনো ফাঁক দিয়াও আলো বাহির হইতেছে না। ফটকের কাছে দারোয়ানটা থাকে; সে জাগিয়া কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য ছোট একটা ঢিল ছুড়িল—কেহই জাগিল না।

তখন লোকটি সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল—দুই ধাপ উঠিল—জুতার শব্দে বাড়ী-অলার ঘুম যদি ভাঙে! সে জুতা খুলিল—এতক্ষণে বুঝিতে পারিল সারা পথ তাহার আঙুল দুইটা অনাবৃত ছিল। আঙুল দুইটা এতই অসাড় হইয়া গিয়াছে যেন আর তাহা আপনার নয়—বারে বারে হাতে স্পর্শ করিয়া সে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দ পাইতে লাগিল। অত্যন্ত প্রিয় আত্মীয়র ঘুম ভাঙাইতে লোকে যেমন চেষ্টা করে এও অনেকটা তেমনি। জুতা জোড়া বগলে পুরিয়া আবার সে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। আবার শব্দ! পায়ের তো নয়! ঠিক্ ঠিক্! নিজের বুকের

হৃৎপিণ্ডটার আছড়ানির আওয়াজ ! হয়তো ইহাতেই বাড়ী-অলার ঘুম ভাঙিবে। দুই হাতে সে বুকটা চাপিয়া ধরিল নিঃশ্বাসবন্ধ করিল কপালে দুইএক ফোঁটা ঘামও দেখা দিল। অন্ধকারে সাবধানে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া—এপাশে ওপাশে—হাতড়াইয়া কখনো থামিয়া—কখনো আন্দাজে—ঠক্ ঠক্ মাথাটা ঠুকিয়া গেল—সম্মুখেই দরজা।

এই সিঁড়িতে ওঠার ব্যাপারে সে এমন পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে মাটিতেই বসিয়া পড়িল—কিছুতেই আর উঠিতে পারিল না। দুই দিনের অনাহারে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল বমি করিবার ভয়ানক ইচ্ছা হইতে লাগিল—পাকস্থলীতে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া সে একবার ঘরের চারি দিকটা দেখিয়া লইতে আরম্ভ করিল। সব ঠিক্ তেমনিই আছে—টেবিলটা—চেয়ারখানা—আলমারীর উপরে বই দিয়া ঢাকা আধভরা জলের গেলাসটা—টেবিলের উপরে কাগজখানা! কাগজ না চিঠি? কাহার নামে? চিঠিখানা নিকটে আনিয়া দেখিল—খড়খড়ির ফাঁক দিয়া রাস্তার যে আলো আসিতেছিল তাহাতে ধরিয়া দেখিল হাঁ তাহারই নাম। আনন্দের চেয়ে বিস্ময় হইল তাহার অধিক! একটানে খামখানা খুলিয়া ফেলিতেই বাহির হইয়া পড়িল সেই সহরের বিখ্যাত একখানা পত্রিকার সম্পাদকের চিঠি—আর কয়েকটি মুদ্রার একখানা নোট। এই লোকটা—বাড়ী-অলার প্রাপ্য চুকাইতে না পারিয়া আপনার ঘরে আপনি চোরের মত প্রবেশ করে—সে আবার লেখক—সেই লেখার আবার মূল্য! আশ্চর্য্য কিন্তু সত্য! ইহার পরে একদিন লোকে এই নোটখানার বহু গুণ অর্থ ইহাকে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সহিত সমর্পণ করিয়াছিল। ন্যূট্ হামসুনের নাম কে না জানে।

দৈব ও পুরুষকার

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবংবিলঙ্ঘ্য কুরু পৌরষমাত্মশক্ত্যা,
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

ইহার বাংলা অর্থ।

উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ ধন্য! তারে লক্ষ্মী অনুকূল
অধম নরেই বলে চেষ্টা বৃথা—দৈবই মূল।
দৈবে করি তৃণ জ্ঞান, দেখাও পুরুষ তুমি বট,
বিফল হলেও যত্ন—ভাল সে, যদি না পিছু হট॥ *

পঞ্চতন্ত্র অথবা বিষ্ণুশর্ম্মার আদি পুরুষের হিতোপদেশ।

* চতুর্থ চরণের টীকা।

"বিফল হলেও যত্ন—ভাল সে, যদি না পিছু হট"

অর্থাৎ

তুমি যদি আলস্যবশত বা ভীরুতাবশত কর্ত্তব্য কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া পিছু হট তবে তোমার একূল ওকূল দুকূল নষ্ট হইবে—তাহা হইলে তুমি বাঞ্ছিত ফলে তো বঞ্চিত হইবেই তা ছাড়া—তোমার পৌরুষের মুখে কালি পড়িবে, আর সেই জন্য, তুমি লোকের ধিক্কারভাজন হইবে। পক্ষান্তরে, তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্যসাধনে কিছুতেই পিছপাও না হও—, পিছু না হট, তাহা হইলে তোমার যত্ন দৈবগতিকে বিফল হইলেও তোমার পৌরুষের মুখ দ্বিগুণতর উজ্জ্বল হইবে আর সেইজন্য তুমি ভদ্রসমাজের শ্রদ্ধা এবং সাধুবাদের পাত্র হইবে। অতএব তাহাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ কল্প।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতীকোপাসনা হইতে ব্রহ্মোপাসনায় সমুত্থান

কালিদাস তাঁহার বিরচিত কুমারসম্ভব কাব্যের গোড়াতেই হিমালয়কে দেবতাত্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথাঃ—

অস্ত্যুত্তরস্যাম্ দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ। অর্থাৎ হিমালয় কেবল যে একটা বহু যোজন বিস্তৃত প্রকাণ্ড পর্ব্বত তা' নহে, তাহার ভিতরে দেবতা জাগিতেছে। পূর্ব্ববৈদিক কালের ঋষিরা তেমনি বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহির্দৃষ্টিতে পঞ্চভূতের নাট্যলীলা দেখিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া অন্তর্দৃষ্টিতে সমস্তের মধ্যে দেবতা জাগিতেছে দেখিতেন। আর সেইজন্য সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের নিকটে জাগ্রত জীবন্ত দেবতাত্মারূপে প্রতিভাত হইত। সূর্য্যের মধ্যে তাঁহারা সবিতা দেবতা দেখিতেন, আকাশের মেঘমধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্র দেবতা দেখিতেন, অহোরাত্রির মধ্যে মিত্রাবরুণ দেখিতেন—এইরূপ জগতের আর আর কার্য্যক্ষেত্রে আর আর দেবতা জাগিতেছে দেখিতেন,—দেখিয়া তাঁহাদের পরিতোষার্থে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন। উত্তর-বৈদিক কালের ঋষিদিগের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে সকল দেবতার দেবতা একমাত্র অদ্বিতীয় পরম দেবতার খোঁজ পড়িল। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২০ সূক্ত ইন্দ্রদেবতার স্তবে আপাদমস্তক পরিপূর্ণ; তাহার পরের সূক্তে (১২১ সূক্তে) হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির সর্ব্বোচ্চ দেবতারূপে বরণ করা হইয়াছে এইরূপে :—

হিরণ্যগর্ভ॥ সমবর্ত্তাতাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ সায়ণাচার্য্য ইহার ভাষ্য করিয়াছেন এইরূপ :— হিরণ্যগর্ভ কিনা হিরণ্ময় অণ্ডের গর্ভভূত প্রজাপতি। * * * * * প্রপঞ্চ, উৎপত্তির অগ্রে, মায়াধ্যক্ষ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত হইলেন। যদিও হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মাই, [সুতরাং উৎপত্তি-বিহীন অজ আত্মা] তথাপি পরমাত্মার উপাধিভূত আকাশাদি সূক্ষ্মভূত সকলের ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়া কারণে সেই সকল উপাধিতে উপহিত হইয়া তিনি সমুদ্ভূত হইলেন [অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মা যিনি তিনি উপাধির গর্ভভূত হিরণ্যগর্ভরূপে সমুদ্ভূত হইলেন]। কস্মৈ শব্দটা অনির্দ্দেশ্য কিং শব্দের চতুর্থী বিভক্তি হওয়াতে হিরণ্যগর্ভ অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

বর্ত্তমান লেখকের মন্তব্য॥ পাঠকগণের সহজ বুদ্ধিতে কস্মৈ শব্দের অর্থ "কোন দেবতার উদ্দেশে" এইরূপ হওয়াই সম্ভবে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ভাষ্যকার কস্মৈ শব্দের অর্থ করিয়াছেন হিরণ্যগর্ভের উদ্দেশে। ঋষিদিগের সরল ভাষাকে মুচড়িয়া পাণ্ডিত্যগর্ভ কৃত্রিম ভাষায় পরিণত করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের এইরূপ দুর্বিসহ পরাক্রমে সহৃদয় ভাবুক এবং রসজ্ঞ পাঠকদিগের কর্ণে যে শেল বিদ্ধ হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। Max Muller তাই ভাষ্যকারের ও কথাটা গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার নিজের সহজ বুদ্ধি অনুসারে মূলের অর্থ করিয়াছেন এইরূপ "To whom shall we offer sacrifice"? বর্ত্তমান লেখকের সহজ বুদ্ধিতেও Max Mullerএর কথাটা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে কেন যে—তাহার কারণ এই :—১২০ সূক্ত ইন্দ্র দেবতার স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ; বর্ত্তমান সূক্তে (অর্থাৎ ১২১ সূক্তে) হিরণ্যগর্ভ দেবতার স্তুতিবাদ করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই বলা হইয়াছে "কোন দেবতাকে আমরা হবি প্রদান করিব?"—ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে ইন্দ্র দেবতাকে হবি প্রদান করিব, না হিরণ্যগর্ভ দেবতাকে হবি প্রদান করিব, এবং প্রকারান্তরে এটাও বোঝাইতেছে যে হিরণ্যগর্ভ দেবতা যেহেতু সকল দেবতার আদি দেবতা এইজন্য হিরণ্যগর্ভ দেবতাকেই হবি প্রদান করা বিধেয়।

এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে পূর্ব্ব বৈদিক সময়ের ঋষিরা, ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অলক্ষিত পদসঞ্চারে ব্রহ্মোপাসনার দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু॥ তোমার স্বপক্ষসমর্থনের জন্য হিরণ্যগর্ভ দেবতার উপাসনাকে তুমি যে ব্রহ্মোপাসনা বলিতেছ,—কিসের জোরে বলিতেছ।

প্রবোধয়িতা॥ [বেদের পুঁথি খুলিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক] এই দেখ সায়ণাচার্য্য কী বলিতেছেন—

যদ্যপি পরমাত্মৈব হিরণ্যগর্ভ, যদিচ হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মাই

[সুতরাং উৎপত্তিবিহীন অজ আত্মা] তথাপি তদুপাধি-ভূতানাং বিয়দাদীনাং সূক্ষ্মভূতানাং ব্রহ্মণ উৎপত্তে স্তদুপাহিতঃ অপি উৎপন্নঃ [তথাপি পরমাত্মার উপাধিভূত আকাশাদি সূক্ষ্মভূত সকলের ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়া কারণে সেই সকল উপাধির দ্বারা উপহিত হইয়া হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন]

ইহাতে স্পষ্টই বোঝাইতেছে যে সায়ণাচার্য্যের অভিপ্রায়-মতে হিরণ্যগর্ভ নিরুপাধিক ব্রহ্ম নহেন বটে—পরব্রহ্ম নহেন বটে, কিন্তু তিনি যে সোপাধিক ব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এটা অবশ্য তুমি জান যে, শাস্ত্রমতে সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য দেবতা, নির্গুন ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না।

জিজ্ঞাসু ॥ বুঝিতে পারিলাম।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

খপিস্ পণ্ডিত

সেজ ভাই ॥ আমি পণ্ডিত মহাশয়ের নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছি এই দেখ।

বড় দাদা ॥ পড়িয়া শোনাও।

পাঠ

প্রাতঃকালে একদল পড়ুয়া বালক,
খেলায় মাতিয়া গেল রাখিয়া পুস্তক।
সজোর গলা খ্যাঁকানি তার সঙ্গে আর,
"আসচি আমি দেখাচ্চি," বারেক দুবার।
হেন গরজন ধ্বনি হইল যেই বের।
হাসি খুসি ঘুরে গেল তখন তাদের ॥
প্রবেশিয়া পাঠগৃহে বই লয় হাতে।
একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বইএর পাতাতে ॥
পণ্ডিত মুহূর্ত্ত পরে আইল সেখানে।
চশমা বাহির করে পরে সাবধানে ॥
খসিবার ভয়ে তাহা পরিল কসিয়া।
তার পরে জুৎ করে লইল বসিয়া ॥
ছাত্রগণে আরম্ভিল পরে শিক্ষা দিতে।
ভূত পলাইয়া যায় কথার ভঙ্গিতে ॥
"এস দেখি তোমাদের দেখি একবার।
তোমাদের সঙ্গে হল পেরে ওঠা ভার ॥
আজকাল তোমাদের অনিয়ম ভারি।
বাবুকে না বলে আর থাকিতে না পারি ॥"
"ভারি নাকি অনিয়ম ?" ছাত্র এক কহে।
পণ্ডিত রাগিয়া বলে "অনিয়ম নহে ?
লজ্জা করে না তোমার বলিতে ও কথা,
পড়াশুনা ত্যাগ করে ছিলে সবে কোথা ?
দেখ দেখি চেয়ে কত হইয়াছে বেলা।
ছি ছি ছি ! বিদ্যার প্রতি এত অবহেলা ?
যাও পড়ে কাজ নাই ?" বলি তাড়াতাড়ি,
হস্ত হতে বালকের পুঁথি লইল কাড়ি।
পণ্ডিতের মুখভঙ্গি ক্রোধেতে বিকৃত।
দেখিয়া এক্ষণে সবে হয় চমৎকৃত ॥
কৈলাস মুখুজ্জে ছিল বসি এক পাশে।
নিরখি সরস লীলা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে ॥
বালক একটি বলে, "হাসচো যে বড় !"
কৈলাস ইঙ্গিতে কহে "কর্ত্তা খাপা বড় ॥"

বড় দাদা ॥ তোমার এ কবিতাটির নাম দিচ্চি আমি গুরুমারা বিদ্যা। আমার হিতবাক্য যদি শোন, তবে এই দণ্ডে তুমি উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সেই খণ্ডাংশগুলি একত্র করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ কর। তাহা হইলে উহার গাত্র হইতে গুরুহেলনের মহাপাপ খণ্ডিত হইয়া গিয়া উহা যারপরনাই সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে—দেব-স্পৃহনীয় নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই। [কবিতা রচয়িতার অধোবদনে স্বস্থানে প্রস্থান এবং যবনিকা পতন]। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানের চিঠি

• কোবে (জাপান)
১৫।৩,২৫ ইং রাত্রি।

ভাই রমেন, আশ্রম হইতে আসিবার দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। জাপান হইতে লিখিব বলিয়াছিলাম তাই এতদিন পরে লিখিতে বসিলাম।

১লা মার্চ্চ সকালে ৮ টার সময় আমরা কোবে পৌছিলাম। কলিকাতা হইতে যে জাহাজে আসিয়াছিলাম সেটা হংকংএ ৫ দিন দেরীতে পৌছে তাই অন্য ষ্টীমার ধরিতে না পারিয়া ঐ জাহাজেই জাপান আসিয়াছিলাম। জাপানের Shimonoseki বন্দরে আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া পড়িয়া রেলে কোবে আসি। আমরা বলিলাম, কারণ জাহাজে জাপানপ্রবাসী মিস্ত্রী ব্যবসায়ীর সঙ্গে জানাশোনা হয়।

জাপান সম্বন্ধে কি রকম কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলাম তা জানই, তাই দূর সমুদ্রতীর হইতে যখন ধীরে ধীরে জাপানের ছিন্নবিচ্ছিন্ন পাহাড়ের শ্রেণী চোখে পড়িল তখন হইতেই উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলাম কখন সেই যবনিকার অন্তরাল হইতে জাপানটি বাহির হইবে। আমাদের জাহাজ ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভোরে Shimonoseki বন্দরে প্রবেশ করিল। দুদিকে সারি সারি পাহাড়ের শ্রেণী জল হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমস্তটা পাহাড় সুন্দর ঝাউগাছে আচ্ছন্ন তারি ভিতরে ভিতরে লুকানো ২১টা কাঠের বাড়ী। ঐ দূরে উঁচু পাহাড়ের পায়ের কাছে সুন্দর বাড়ীঘর কলের চিমনী লোকজন ক্রমে সবই স্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে লাগিল। ভোরের আলোয় সেই বরফে শাদা পাহাড়ের চুড়া—ও নীচের বাড়ীঘর সবই অপূর্ব্ব মনে হইল।

এই সব করিয়া জাহাজ হইতে নামিতে ৯টা বাজিয়া গেল; তারপর Custom এ মালপত্র পরীক্ষা করাইয়া রেলষ্টেশনে গেলাম। যাইয়া শুনিলাম, কোবের Express প্রায় ১ ঘণ্টা আগে ছাড়িয়া গিয়াছে—রাত্রের Express এর জন্য তাই অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার এতে কোন দুঃখ হইল না ভাবিলাম বেশ ত। সমস্তটা দিন ঘুরিয়াই বেড়াইব। মালঘরে জিনিষপত্র জমা দিয়া আমরা প্রথমেই যাইয়া waiting room এ ঢুকিলাম। আমাদের দেশের মত Chair table এর ছড়াছড়ি নাই। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো গদিপাতা বেঞ্চের সারি। মাঝে বড় একটা tableএ কয়েকখানি দৈনিক কাগজ ও মাসিক পত্রিকা—ঘরের মাঝখানে একটা কয়লার stove। Waiting room হইতে যাইয়া restaurant এ ঢুকিলাম। ঢুকিতেই টবে লাগানো ফুলের ঝাড় হইতে টাট্‌কা ফুলের ভারী একটা মিষ্ট গন্ধ আসিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। খুসী হইয়া ভাবিলাম—হাঁ, সৌরভে ও নির্জ্জনতায় মনোরম বটে।

তারপর দুজনে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। Shimonoseki ছোট্ট একটি বন্দর; লোকজনের তেমন ভিড় নাই। রাস্তার দুইধারে পরিপাটীভাবে সাজানো দোকানপাট। বাড়ীঘরগুলি একেবারে জাপানী ধরণের—অর্থাৎ কাঠের দেয়ালে টালির ছাত, আর ভিতরে কাপড়ে ও পুরু কাগজের partition দিয়া ঘরগুলি পৃথক করা। জাপানী বাড়ীর ভিতরে ও উপরে প্রায় সমস্তটাই মাদুর পাতা—জুতা খড়ম দিয়া উপরে যাওয়া যায় না—বাইরে রাখিয়া আসিতে হয়। এখানে তাই মেয়েছেলে সকলেই একরকম পুরু মোজা পরে, সেটা গোড়ালীর একটু উপর পর্য্যন্ত উঠে ও তারপরে Burmese Slipper এর মত উঁচু খড়ম পায় দেয়। জাহাজে রেলে ও আফিসে সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা। সমস্তদিনই রাস্তায় ঘাটে কেবল খড়মের খটাখট্ শব্দ। বিংশ শতাব্দীতে একটা প্রধান দেশের প্রধান সহরে এমন নূতনত্বটা বেশ উপভোগ্য।

যাক্ কি বলিতেছিলাম। সেদিন Shimonoseki সহরে রোদ দেখা গেল না—সমস্তদিন মেঘলাভাবেই রহিল। তাই কখন যে সহরের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল আর কখন

যে ছুটী মিলিল তা বুঝিবার আগেই রাস্তায় ঘাটে বাতি জ্বলিয়া দিবসের অবসান ঘোষণা করিল।

এখানে একটা বেশ লক্ষ্য করিলাম যে লোকে গাছপালা ও প্রকৃতিকে সত্যই ভালবাসে। বাড়ীঘরের প্রাঙ্গণে হয়ত পাতাপড়া ন্যাড়া খাড়া গাছগুলি পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দিতেছে অথবা সামনেই ছোট্ট বাঁশঝোপ দাঁড়াইয়া আছে। আমরা এমন জায়গায় এসব গাছ কখনও হয়ত রাখিতাম না। Shimonoseki ষ্টেসনের বাইরেই হল সহরের বড় চৌমাথা বা esplanade। সেখানে দেখিলাম একটা গাছের কঙ্কালকে রীতিমতই তারের বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখা হইয়াছে। এখানে এই শীতকালের কোন সার্থকতা চোখে পড়ে না বটে কিন্তু বসন্তের হাওয়া লাগিতেই হয়ত গাছটী ফুলে পাতায় ভরিয়া উঠিয়া চারিদিকে শ্রী ফুটাইয়া তুলিবে।

রাত্রি ৯ টার ডাকগাড়ীতে চড়িলাম। এবার কিন্তু ১১১ নং গাড়ীতে নয়, একেবারে গদীআঁটা নীল রং এর Second Class এ। পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য করিবার মত। এখানের Railway খুব সুপরিচালিত, ব্যবস্থা বেশ ভাল। গাড়ীগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন – আমাদের গাড়ীটা একটু aristorcratic। এতে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীই আছে। শুধু তৃতীয় শ্রেণীর জন্য আরও ২০ মিনিট পরে আর একটা ডাকগাড়ী ছাড়িবে। এখানের সব গাড়ীগুলিই সমস্তটাই Darjeeling mail এর মত Corridor type এর। গাড়ীতে Dining Car ও Sleeping Car আছে প্রত্যেক গাড়ীর সঙ্গে আলাদা toilet room, W. C. Sharing room, Smoking room আছে হুকুম তামিল করিবার জন্য। গাড়ীতে গরম ও ঠাণ্ডা জলের pipe আছে আর রাত্রে steam pipe এ সমস্ত গাড়ীটাকে গরম করে রাখা হয় তাই যখন বাহিরে বরফ জমিয়া উঠিতেছে তখন Second Class Sleeping Car এ শুইয়া বাড়ীর স্বপ্ন দেখিতেছি। বেশ লাগে না কি ?

যাক্, ১লা আগষ্ট কোবে ষ্টেসনে নামিয়া রিক্সা করিয়া মিস্ত্রী ভদ্রলোকটীর বাড়ীতেই যাইয়া উঠিলাম।

১৮.৩.২৪ ইং

সকালবেলা।

আজ ১৮ দিন হইল জাপানে আছি। সমস্তটা জাপানই ইহার মধ্যে ঘুরিয়া লইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্বভাবটা চিরদিনই একটু ঢিলা ধরণের তার উপর এখনও শীতের প্রকোপ কমে নাই তাই এই ১৮ দিন কোবেতেই রহিয়া গেলাম।

কোবে সহরটা দক্ষিণে সমুদ্র ও উত্তরে পাহাড় এর মধ্যে কোন রকমে সঙ্কুচিত হইয়া আছে। পাহাড়ের গা হইতে জল পর্য্যন্ত খুব অল্পই জায়গা—সহরটা খুব লম্বা। লোকসংখ্যা প্রায় ৬।৭ লক্ষ প্রধানতঃ এটা কারবারের স্থান। জাপানে যত বিদেশী আছে তাদের অধিকাংশই কোবেতেই বাস করেন। গেল ভূমিকম্পের পর হইতে হঠাৎ সহরের বাণিজ্য ও বিদেশীদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা যে অংশটায় আছি সেটা সহরের একেবারে পূর্ব্ব সীমান্তে—এটাকে Foreign Settlement বলে। এখানেই যত বড় আমদানী ও রপ্তানীর কারবার—এদিকেই সব jetty, harbour ও বিদেশীয়দের বাড়ীঘর। আশ্চর্য্য এই যে এই ১৮ দিনের মধ্যে একদিনও ভুলে আমি আমাদের এই ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকু পার হইয়া সহরের খাঁটী জাপানী আবাসে যাই নাই।

আমার নিকট হইতে জাপানের সুকুমার কলা সম্বন্ধে কোন খবর পাওয়ার আশা নিশ্চয়ই কর না, এখানকার সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও কিছু বলিতে পারিব না। আমরা যেভাবে দেশ দেখিতে আসি তাতে শুধু দালান কোঠাই দেখা হয় আর হয়ত বাহিরের দুই একটা সামান্য বিশেষত্বই চোখে পড়ে—কিন্তু সামাজিক জীবনের যে ফল্গু নদীটি আমাদের চোখের অন্তরালে বহিয়া যাইতেছে সেটাকে দেখার সৌভাগ্য, সুবিধা হয় না, আর না হয় সেটাকে দেখার জন্য আমার ঔৎসুক্যই জাগে না। অতি অল্প সময়ের দেখাতে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। আমার খুব আগ্রহ হইয়াছিল দুই একটী ভদ্র

জাপানী পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইতে, তাদের ভাবনা, চিন্তার ধারাটা একটু বুঝিয়া লইতে, কিন্তু কে আমাকে পরিচিত করাইয়া দিবে বল? তাই এতদিন জাপানে রহিলাম, কিন্তু এ দেশ সম্বন্ধে মূল্যবান কিছুই বলিতে পারিব না।

জাপানকে দেখে মনে হয় যে এদেশের একমাত্র সাধনা যেন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে হজম করা, পশ্চিমের ভাবেই যেন সমস্তটা জীবন অনুপ্রাণিত হইতে চলিয়াছে। কাজ কারবারে, আচার ব্যবহারে ও পশ্চিমের প্রাণহীন কৃত্রিমতা আসিয়া পড়িতেছে। দেশটায় যেন একটা period of proselitisation চলেছে—পশ্চিমের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া জাপান পশ্চিমের সভ্যসভায় স্থান লইতে ব্যস্ত। আর ভাবিয়া দেখিলে, বাঁচিতে হইলে এ ছাড়া তাদের আর কোন পথ নাই। আমাদেরও হয়ত নাই; পশ্চিমকে পশ্চিমের অস্ত্র দিয়াই ঠেকাইতে হইবে, এ যুগে গুরুমারা বিদ্যা না জানিলে চলিবে না।

একটা প্রশ্ন মনে জাগিতেছে। আমাদের ধারণা যে দেশের নৈতিক জীবনের সঙ্গে দেশের বাঁচা-মরা ও দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ গূঢ়ভাবে জড়িত। কিন্তু এখানের সামাজিক জীবনে এত পঙ্কিলতা, তবু ত এরা দিব্যি সুস্থ দেহে সন্তুষ্ট চিত্তে বাঁচিয়া আছে আর আমরা এদের দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। তবে কি আমাদের দেশে Public morality র যে রকম অর্থ করা হইয়াছে এতে ভুল আছে? প্রশ্নটা ভাবিয়া দেখার মত।

* * *

কয়েকদিন হইল বাসা বদলাইয়াছি, আগে একটা খাঁটী জাপানী বাড়ীতে ছিলাম এবার একেবারে একটা পাঁচতলা দালানের একটা নির্জ্জন ঘরে আশ্রয় লইয়াছি! এটা এখানকার Y. M. C. A.। বাহিরের লোকদের জন্য থাকিবার ভাল বন্দোবস্ত আছে, মাসিক chargeও খুব কম। পূর্ব্বদিকের জানালায় দাড়াইলেই চোখে পড়ে—ডাইনে সমুদ্র, নৌকা, বন্দর; আর বামে সুন্দর সুন্দর পাহাড়ের সারি। কোন কোন দিন দেখি বরফ পড়িয়া পাহাড়ের মাথাটি সাদা হইয়া গিয়াছে! আজকাল রাত্রে শীতের পাণ্ডু জ্যোৎস্না দেখিতে বেশ ভাল লাগে, আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে চাহিয়া ভাবি, গেল বছর এমন দিনে সত্যকুটীরের বাইরে বিছানা করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম।

জানই ত এখানে Compulsory education। তাই ভোরে ৮ টা হইতে আমার জানালার নীচে দিয়া ছেলেমেয়েরা পিঠে পুঁথিপত্রের বোঝা লইয়া স্কুলে যায়—আর তারপর সমস্তদিনই এদের আনাগোনা। কত কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—লাল টুক্‌টুকে মুখখানি—নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে—রোজই জানালায় দাড়াইয়া দেখিতে খুব আনন্দ পাই। শৈশবের সেই চঞ্চল ভাবনাহীন জীবন হইতে কতকাল যে বিদায় লইয়াছি, আজ যখন নূতন কর্ম্মময় ভাবনাসঙ্কুল জীবন আসিয়া ডাক দিয়াছে তখন পিছনে তাকাইয়া শুধু কষ্টই হয়।

এখানে আজকালও খুব শীত। মাঝে মাঝে দিনের বেলায় বরফবৃষ্টি হয়। temperature এই কয়দিন maximum 49° ও minimum 33° ছিল। ঘরে বসিয়াই হাত জমিয়া আসিতে চায়।

কাগজে দেখিতেছি গুরুদেব শীঘ্রই চীনে যাইতেছেন।

অনেক কথা আরো বলিবার ছিল। সময়মত এদের পাওয়া যায় না। দুষ্ট ছেলের মত পালাইয়াই বেড়ায়।

যাক্ আজ এখানেই ইতি। তোমাদের Painting Brush কি রকম হইবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না তাই পাঠাইতে পারিলাম না। সুবিধা করিতে পারিলে পরে পাঠাইতে চেষ্টা করিব।

আমি আসচে ২২শে তারিখ কোবে ছাড়িব। সম্ভবতঃ ৪।৫ এপ্রিল হনলুলু পৌঁছিব।

তোমরা সকলে আমার প্রীতি-নমস্কার লও। ইতি—

তোমাদের—উপেনদা।

ঊষা

স্বপন-হারিণী দ্যুলোক-দুহিতা
ঊষসী ছুটিছে ওই !
ত্বরিতচরণ পরশে চমকি
ঝরে শিশিরের থই
দস্যু আঁধার ভয়েতে পালায়
পুষণ সূর্য্য কই ?

প্রণয়-পাগল তরুণ তপন
পতঙ্গ-লঘু পায়
বাসনা-বিপুল পৌরুষ করে
ধরিতে তাহারে চায়
কপোত-ধূসর আকাশ ব্যর্থ
বেদনায় রাঙা হায় !

উদয়-গিরির শিখরের ছায়ে
ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা—
(পিছে-পড়া যেন রাতের স্বপন
দিনের আলোতে ঢাকা,
মন্দাকিনীর তীরে খসা যেন
স্বচ্ছ হাঁসের পাখা।)

বিশাল-ললাট দিবসদেবের
রথ-চক্রের রবে
কোথা উড়ে গেছে আঁধার কাননে
তারা পাখীদল সবে—
শুকতারা বুঝি কেঁদে গলে যায়
শিশিরের সৌরভে।

কমল-মালিকা ঊষারে হেরিয়া
হোমানল মেলে আঁখি
নীরব গোষ্ঠ প্রাণময় করি
ধেনুদল ওঠে ডাকি,—
বনছায়ে ওঠে সামগীতি রব,
অলস কুলায়ে পাখী।

বিশ্ব-তরুর শাখায় তপন
বুনিছে ঊর্ণজাল
বজ্র-রাখাল গগন-আঙনে
হাঁকায় মেঘের পাল
রক্ত-অধীর নাড়ির মতন
কাঁপিতেছে মহাকাল।

ঊষা-পুষণের কাহিনী আকাশে
সোনার বরণে আঁকা—
শ্যামল ধরাতে পীত রবিকর
আধেক হয়েছে মাখা—
মনে হয় যেন আকাশোন্মুখ
শুক পক্ষীর পাখা।

চিরকাল ধরে' ছুটিছে ঊষসী
প্রণয়-পরুষ-ভীতা—
চিরকাল তারে মাগিছে তপন
বক্ষে বাসনা চিতা—
চিরকাল দোঁহে দূরে রয়ে যায়
মানস নির্ব্বাসিতা।

হাতে পাবে যবে দেখিবে তপন
ধূলি সে কেবল ধূলি—
দূরে থেকে তারে করেছে মধুর
সুদূরের সুধা-তুলি
চোখেতে যাহারে দেখেনি তাহাতে
পরাণ রয়েছে ভুলি।

চিরকাল তুমি রহিবে ছুটিতে
হে দেব সূর্য্য পুষা—
চিরকাল ধরি পরিবে জগৎ
পূর্ব্বরাগের ভুষা,
তুমি চির চারু তরুণ তপন,
স্থির-যৌবনা উষা।

নন্দ কুমার

"তরণী তব রয়েছে ঘাটে বাঁধা
সৈন্য সবে দাঁড়ায়ে পরিখায়
কারাগারের গুপ্তদ্বার খোলা
ওঠগো রাজা সময় বহে' যায়।

সময় বয়ে যায় গো, হের পূবে
ডুবিয়া গেছে কখন্ শুক্‌তারা
সময় বহে যায় গো শোনো ওই
অধীর হ'ল নদীর বারিধারা!

মোদের পানে নয়ন তুলি চাহ
ভুলোনা তব অনাথ প্রজাদেরে"
মন্ত্রী কহে গলিয়া আঁখিজলে
বন্দী রাজা নন্দকুমারেরে!

তড়িৎ বেগে উঠিয়া কহে বীর
"মন্ত্রী, তব এই কি উপদেশ—
প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাবো চলি
কপালে ছিল এই কি অবশেষ!

প্রাণের ভয়ে করিব চুরি প্রাণ
মৃত্যু সেকি এতই বিভীষিকা!
রাজার মত বরিয়া লব' তারে
পরাবো ভালে রক্তরাজটীকা!

জীবনে আমি রাখিনি কোন ভয়
করিনি ভয় রাজার রাজারেও,
মরণে আজি নোয়াবো মাথা ভয়ে
কপালে মোর আছিল শেষে এও?

রাজার মুখে ফিরেছি তুড়ি দিয়া
অত্যাচারে তুচ্ছ করিয়াছি,
জীবন জুড়ে আপন সম্মান
সবার পরে উচ্চ করিয়াছি!

মৃত্যু সে তো নিকষ শিলা কালো
প্রাণের সোনা তাহাতে হবে দাগা,
রহিবে ঘন তিমির উজলিয়া
একটি সেথা রক্তরেখা লাগা।"

এতেক বলি থামিল তবে রাজা
প্রতিধ্বনি মরিয়া গেল দূরে—
দীর্ঘশ্বাস উঠিল হাহা করি
সিক্ত ঘন অন্ধকার জুড়ে।

মন্ত্রী কাঁদে নয়নজলে ভাসি
জড়ায়ে ধরে রাজার দুটি পায়—
"তোমারে ফেলে একাকী হেথা রাজা
কেমনে তব মন্ত্রী চলি যায়!

আমারে তব সঙ্গে করি লহ
কোথায় যাবে মন্ত্রীহীন রাজা

তোমার লাগি খেটেছি প্রাণপণে
বৃদ্ধকালে এই কি তারি সাজা !"

ঈষৎ হাসি কহিলা রাজা তারে—
"সবারি সেথা একলা যেতে হবে
রাজ্য যদি হারালো রাজা তব
মন্ত্রী নিয়ে কি ফল বল তবে।

আমার হ'য়ে রাজ্য দেখো তুমি
পালন ক'রো বালক গুরুদাসে—
বিদায় দাও বন্ধু পুরাতন
জাগিছে ঊষা সুদূর পুবাকাশে।"

মন্ত্রী এলো বাহিরে চলি একা
চরণ দুটি উঠিতে নাহি চায়—
শুনিল রাজা নদীর কলতান
তরীর কাছি কাঁদিল করুণায় !

প্রার্থনা

তুমি কর আমার মঙ্গল, দাও সুখ মোরে নিরন্তর
এই মোর অন্তরের নিয়ত প্রার্থনা বিশ্বনাথ !
ভুলে যাই মূঢ় আমি কোন্ দুটি শ্রান্তিহীন হাত
নিখিল বিশ্বের শুভ অন্বেষণে নিয়ত তৎপর।
দীনতম কীট বলি মনে গণি যারে; তুচ্ছতম
ঘটনা যা মনোমাঝে অণুমাত্র স্থান নাহি পায়
সেও উজলিয়া উঠে ওই নেত্র-কিরণ-প্রভায়
স্পর্শমণি সহযোগে হীন ম্লান লৌহ খণ্ড সম।
তুমি যাহা মোর লাগি, নির্ব্বাচিয়া দিবে নিজ হাতে
শ্রেয় গণি' তারে যেন আদরে তুলিয়া লই মাথে।
যশ অপযশ ভার তোমার চরণে সঁপি দিয়া
সুখে দুঃখে নিরুদ্বেগ রহে যেন মোর দীন হিয়া।
তোমার বিধান যেন চরম বিধান বলি মানি
অন্তরে নাহিক জাগে কভু যেন বিদ্রোহের গ্লানি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আশ্রম-সংবাদ

খেলা

ভাদ্রমাসে আশ্রমের দল বর্দ্ধমানে বনবিহারী কাপ প্রতিযোগিতায় খেলিতে গিয়াছিল দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা হারিয়া গিয়াছে তৎপর দিন বর্দ্ধমানের দল আশ্রমে খেলিতে আসে। কিন্তু সে দিনের খেলায় নির্গোল সমান-সমান হয়।

শিউড়িতে ল্যাম্বোর্ণ প্রতিযোগিতায় আশ্রমের দল যোগ দিয়াছে তাহার উল্লেখ আমরা গত মাসের পত্রিকায় করিয়াছি। প্রথম দিনের খেলায় আশ্রমের দল শিউড়ির একটি দলকে পাঁচগোলে পরাজিত করিয়াছে। আগামী বুধবার অণ্ডালের একটি সাহেব দলের সহিত আশ্রমের চূড়ান্ত খেলা হইবে।

রামপুর হাটের সুহাসিনী শিল্ড প্রতিযোগিতায় আশ্রমের দল অন্যান্য বারের মত যোগ দিয়াছে একথা ভাদ্রের সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম। প্রথম দিনের খেলায় মহেশপুরের দলকে আশ্রম দুই গোলে পরাজিত করে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় শিউড়ির দলকে আশ্রম দুই গোল দিয়াছে এবং তাহারা আশ্রমকে তিন গোল দিয়াছে।

অভিনয়

পূজাবকাশের পূর্ব্বে আশ্রমের কয়েকজন ছাত্র ও

অধ্যাপক মিলিয়া বিসর্জ্জন নাটকটি অভিনয় করিতেছেন। নিম্নলিখিত ভাবে ভূমিকা বিতরিত হইয়াছে।

আগামী ২রা আশ্বিন অভিনয়ের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

গোবিন্দ-মাণিক্য	শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার
নক্ষত্ররায়	শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
রঘুপতি	শ্রী প্রমথনাথ বিশী
জয়সিংহ	শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত
চাঁদপাল	শ্রীশান্তিময় ঘোষ
নয়নরায়	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু
মন্ত্রী	শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী
পৌরগণ—	শ্রীঅমূল্য মুখোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সুধীরকুমার আচার্য্য সাগরময় ঘোষ, সলিলচন্দ্র মজুমদার জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারকনাথ লাহিড়ী, প্রসাদকুমার রায় প্রভৃতি।
প্রতিকার—	শ্রীপরেশনাথ বিশী।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় শেষ-বর্ষণ নামক একটি গানের মজলিশ হইয়া গিয়াছে। ইহা পূজনীয় আচার্য্য দেবের জোড়া-সাঁকোস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে টিকিট বিক্রয় করিয়া যে টাকা উঠিয়াছে তাহা দ্বারা আশ্রমের পিয়র্সন মেমোরিয়াল হাস-পাতালের সাহায্য করা হইবে। এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য আশ্রমের সুযোগ্য সঙ্গীতাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীভীমরাও শাস্ত্রী এবং কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রী কলিকাতায় গিয়াছেন।

পূজনীয় আচার্য্যদেব স্বাস্থ্যের জন্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে শীঘ্রই গমন করিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ছোট, বড়, মাঝারিদের জন্য তিনটি সাহিত্য সভা আছে। বড়টির সম্পাদক শ্রীমান্ কানাইলাল সরকার ও শ্রীমতী অমিতাদেবীর কর্তৃত্বে বড় সাহিত্য সভাটি বেশ নিয়মিতভাবে এবং উৎসাহের সহিত চলিতেছে। ছোট ও মাঝারিদের দুটিও নিপুনভাবে চালিত হইতেছে।

বিশ্বভারতীর ছাত্রদের একটি আলোচনা সভা আছে; মাসে ইহার দুইটি অধিবেশন হয়। শ্রীমান্ রামচন্দ্র ও শ্রীমতী ইভাদেবীর সম্পাদকতায় এই সভার কাজ পূর্ব্বের মত সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

রাত্রে আহারান্তে বৈতালিক দলের গান আজকাল ভালই চলিতেছে। সপ্তাহে তিনদিন মেয়েরা ও চারদিন ছেলেরা বৈতালিক গান করিয়া থাকেন। শ্রীতেজেশ্চন্দ্র সেন ও শ্রীবামন শিরোধকর ছেলেদের বিশেষ সাহায্য করেন। গুরু-পল্লীর ছেলেমেয়েরা রাত্রে উক্ত অঞ্চলে বৈতালিক গান করিয়া সকলকে আনন্দিত করেন।

আনন্দ-বাজার

আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর আশ্রমে আনন্দ বাজারের মেলা বসিবে। এই মেলাতে ছেলে ও মেয়েরা নানা রকম জিনিষের দোকান খুলিয়া থাকেন। বৎসরে একদিন করিয়া এই মেলাটি বসে—সেদিন বিদ্যালয় অনধ্যায় থাকে। ইহাতে আনন্দের দিক্ ছাড়া একটা শিক্ষার দিক আছে। রীতিমত কেনা-বেচার মধ্য দিয়া ছেলেমেয়েরা গণিতের ব্যবহারিক অংশটা শিখিতে সাহায্য পায়। অর্থ সঞ্চয় করা একটা মূল্যবান বিদ্যা—কিন্তু কেমনভাবে অর্থ হিসাব করিয়া খরচ করিতে হয় সে শিক্ষাও একান্ত আবশ্যকীয়। বস্তুত হিসাবমত খরচ করিতে না জানিলে হিসাবমত জমাইয়া লাভ নাই। খরচের অঙ্ক নাই বলিয়াই কুবেরের ধন তাহার ঐশ্বর্য্য নহে। আমাদের দেশে টাকার অভাব তত বড় কথা নহে যেমন যথার্থরূপে টাকা খরচ করিতে জানিবার বুদ্ধির অভাব। বদ্ধজলে দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি না করিয়া হানি করে—স্বাস্থ্য-জনক হইতেছে সচল জল; টাকা সম্বন্ধেও সেই কথা—বদ্ধ টাকাতে দেশের শক্তিকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মারী সৃষ্টি করে। এখন আমাদের বাঞ্ছনীয় হইতেছে টাকার সচল ও মুক্ত গতি যাহা কোনো আকাশ কালো-করা কলের সয়তানী বা প্রজার রক্ত জলকরা জমিদারীর খাজাঞ্চিখানায় রুদ্ধ না হইয়া অনায়াসে রক্তবাহী শিরা উপশিরার মত দেশের ঘরে ঘরে প্রাণের পর্য্যাপ্তিকে বহন করিবে।

পিয়র্সন

আজ দুই বৎসর হইল মহাত্মা পিয়র্সন আকস্মিক বিপদে ইটালীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রথমে আশ্রমে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার এখানকার কাজে জীবন উৎসর্গ করিবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এখানে আসিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন এই রকম একটি স্থানই তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্র। তাঁহার অন্তরের উদারতা এখানকার প্রান্তরের উদারতার মধ্যে আপনার সাড়া পাইল। আশ্রমের চারিদিকের ফাঁকা মাঠ তাঁহার নিকটে শূন্যতা মাত্র ছিল না— তাঁহার তরুণ মনে এমন কল্পনা শক্তি ছিল যাহা প্রতীয়মান শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া দেখিল। আর সেই কল্পনা বলেই চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বেকার এই খ্যাতিপ্রতিপত্তি হীন ক্ষুদ্র আশ্রম-নীড়টিকে তিনি চিনিতে পারিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে বিখ্যাত হইবার বহু পূর্ব্বেই তাঁহার খ্যাতির কারণ গুলি ঘটিয়াছিল কিন্তু সেই সময় কয়েকজন মাত্র প্রতিভাবান্ ব্যক্তি তাঁহার স্বরূপটিকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই আশ্রমটি সম্বন্ধেও সেই কথা—ছোটটির মধ্যে বড়র সন্ধান পাওয়া প্রতিভার পরিচায়ক। স্বর্গীয় পিয়র্সনের সেই প্রতিভা ছিল সতীশচন্দ্রের ছিল, অজিতকুমারের ছিল, আজ তাঁহারা সবাই এক দিব্যধামে। পিয়র্সন শান্তি-নিকেতনে আসিলেন। এক রকম সৌখীন উপকার করার প্রথা আছে তাহা উদ্বৃত্ত অংশ দানের মত, সে রকম উপহাসের অভিনয় করা পিয়র্সনের স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল তিনি আশ্রমটিকে ভালো বাসিলেন। তাঁহার প্রথমবার বিদায়কালের সভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই চৌদ্দ বৎসরেও ভুলিতে পারি নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রবাদ আছে পূর্ব্বে এই জন শূন্য মাঠে ডাকাতের আড্ডা ছিল তাহারা অসহায় পথিকের টাকাকড়ি কাড়িয়া রাখিত। এখন ডাকাত নাই কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাদের গুণটি এখানকার জল-হাওয়ার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি এখানে আগত পথিকদের মনটি কাড়িয়া লইতে পারে।" হইল তাহাই; এখানকার মাঠে, পথে, খোয়াইএ, পারুল বনে, কোপাই নদীতে, চিফ সাহেবের কুঠীতে, তরুমূলের মেলায় এবং খোলা মাঠের খেলায় এখানকার তুচ্ছতম ছাত্রদের জীবনের ক্ষুদ্রতম প্রাত্যহিকতায়, অধ্যাপকদের আত্মবিস্মৃত প্রচেষ্টার মধ্যে আশ্রমের উৎসব এবং আনন্দে বিপদে এবং দুর্দ্দিনে ইহার পরিপার্শ্বস্থ সাঁওতালগণের গান বাজনায়, শিক্ষায় সৌন্দর্য্যে, রোগে শোকে আপনাকে তিনি প্রসারিত করিয়া দিলেন। নিজে ছাড়া আর সকলেই তাঁহার লক্ষ্য গোচর ছিল—নিজেকে তিনি ভুলিয়া থাকিতেন বলিয়াই কবি তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই।

"আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাকো
আমরা তোমারে ভুলিতে পারিনে তাই।"

একতান

শেফালি-বিমুগ্ধ আর শিশির-মসৃণ
আলোক-চিক্কণ এই শরতের দিন
পড়ে আছে পক্ব-প্রায় ধান্যক্ষেত্র পরে
আলস-আবেশ মগ্ন আনন্দের ভরে
প্রসারিয়া সুবিপুল পক্ষ দুটি তার
স্বর্ণ ঈগলের মত।

মনে লাগে আর
ভোরের যে সরোবরে প্রথম কলস
এখনো হয়নি ভরা মৌন নিরলস
তারি মত প্রভাতটি।
সব মিলে আজ
আলোক, শেফালি, ধান্য, শিশিরের লাজ,
ঘন কালো বনরেখা দূর-দিগন্তের,
তার চেয়ে কালো কত দৃষ্টি নয়নের,
মধুভারে ভগ্নচাক মৌমাছির প্রায়
চিত্তে মোর গুঞ্জনের খঞ্জনী বাজায়।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ | কার্ত্তিক, সন ১৩৩২ সাল। | ১০ম সংখ্যা

বুধবার মন্দির

৩১শে আষাঢ় ১৩৩২

গান

তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে!
তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালি
পরাণ আমার পারিনে তাই পায়ে থুতে!
এতদিন ত ছিল না মোর কোনো ব্যথা
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা।
আজ ওই শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে
দিয়ো না গো দিয়ো না তায় ধুলায় শুতে!

আজকের প্রভাতে প্রথম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনেতে একটি কথা আপনি বেজে উঠল, মন সহসা আপনা-থেকে একটি কথা বললে। সে এই:—জানি এই সংসার থেকে যেতেই হবে, এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। বিদায় নিতেই হবে। তবুও একটা কিছু থাকবেই। এই কথাটা মনের মধ্যে জাগল, প্রশ্নরূপে নয়, প্রশ্নের উত্তররূপে তৈরি হয়ে।

আমরা সাধারণত সংসারে যখন বিচরণ করি, থাকি, তখন সেই থাকার কথাটাই বড় হয়ে মনে ওঠে। এই দেহটিকে নিয়ে, প্রাণ নিয়ে টিঁকে থাকা মাত্র, এই রকম আরও থাকব; আহার করছি, নিদ্রা যাচ্ছি, চলছি ফিরছি এই আছি, এটা এতটা সুস্পষ্ট বলে', একে একমাত্র থাকা বলে' মনে হয়। এই থাকা, একে কোন্ কালো নিকষের উপর যাচাই করে নিতে হবে?—এই যাওয়ার উপর প্রতি-দিনের এই 'আছি'কে যাচাই করা চাই। এই দুয়ের মিলনে, এই দুয়ের মাঝখানে 'আছি'র সত্য আছে। এক-দিক ঘেঁসে যখন দেখি তখন অন্য কথাটা মনেই থাকে না, মন বলে থেকেই যাও না! আরও থাকাটাই যেন বাঁচা, যেন থাকা—যখন যাওয়ার কথাটা অত্যন্ত দূরে থাকে তখন মনে হয় এইটেই বড়। কিন্তু চলে যেতেই হবে, বিদায় নিতেই হবে, দিনের অবসানে গোধূলি যেমন করে রাত্রির কথা বলে, এ-'থাকা' তেমনি করেই যাবার কথা বলে।

শুধু খেয়ে-দেয়ে হেসে-খেলে যে আছি, তার অবসান ত হতেই হবে। তা হলে এই 'আছি'র ভিতর কোন্ সত্যকে বলতে পারি, এ থাকল, এ কালের অতীত, এর প্রতিষ্ঠা কালে নয়, এর আপন সত্যে?

আজ সকালে দিনের প্রথম মুহূর্তে আপনা-থেকে এই কথাটি আমার মনে এসে উপস্থিত হল—জানি যেতে হবে, কিন্তু আমি যে আছি এর ভিতরকার প্রধান সত্যটি কি, কোন্ টুকুকে সত্য করে পেয়েছি, কি রেখে যায়? আমার নিজের জীবনে সকলের চেয়ে বড় সত্য এই যে,—এই বিশ্বের প্রতি আমি উদাসীন ছিলাম না, জগতকে শিশুকাল থেকে ভাল বেসেছি, আমার পক্ষে সূর্য্য বৃথা উঠেনি, সূর্য্যাস্ত যে বাণী নিয়ে আসত, মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করেছি, ফুল আমার হৃদয়কে হিল্লোলিত করেছে। কত লোক কত রকমে সার্থক হয়েছেন, কেউ জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়িয়েছেন, কেউ বা নানা কর্ম্মে নানা কীর্ত্তিতে ধন্য হয়েছেন। এখানে জন্মে কোনও সত্যকে স্পর্শ করলুম না, এ না-জন্মানোর চেয়ে খারাপ। আমার কথা এই, বিশ্ব সংসারকে অন্তরের সঙ্গে স্পর্শ করেছি, অনুভব করেছি, আপনার মধ্যে তাকে উপলব্ধি করেছি, সে সকলের চেয়ে বড় হয়ে আমার অন্তরে ধ্বনিত হয়েছে। আমাদের দেশের এই বাণী—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' আনন্দ থেকে সব হয়েছে সব চলছে, নইলে কিছুই হত না, কিছুই চলত না—বারবার ভাবি যিনি এ বাণী পেয়েছিলেন, তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন! তিনি আকাশে চেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন, ছয় ঋতু উৎসবে উৎসবে তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল—তিনি অনুভব করেছিলেন আকাশ ভরে যিনি রয়েছেন তিনি আনন্দ, তিনি নানাভাবে নানারূপে আপনাকে প্রকাশ করছেন। তা-হলে সেই আনন্দময় সত্য, যে পরিমাণে আমার মধ্যে সত্য হয়েছে, সেই পরিমাণে আমি সত্য হয়েছি। আপনার যে নিত্য সত্য, যে আনন্দময় সত্য, নিখিলের মধ্যে সেইটিকে উপলব্ধি করার দ্বারা আমার নিখিলের মধ্যে স্থান হয়। আপনার ধন জন মান টাকাকড়ির মধ্যে যখন আটকে থাকি তখন নিখিলের মধ্যে আমার স্থান নেই।

এই সত্যটি জীবনে উপলব্ধি করা যখনই হয়, অসীম কালকে তখনই মনের মধ্যে গ্রহণ করা যায়। এই অসীমতা শুধু কালের বিস্তারের মধ্যে নয়। এই যে ফুল আজ সকালে ফুটেছে সে সন্ধ্যায় ম্লান হয়ে যাবে, কিন্তু তার ঝরে যাওয়াটা একটা মায়া মাত্র। সেই মুহূর্ত্তটুকু যার মধ্যে, সে সুন্দর হয়ে ফুটেছে তার মধ্যে সকল কাল ধ্বনিত হয়েছে, সে সব বিশ্বের হয়েছে, সব বিশ্ব তাকে নিয়ে আনন্দিত, তার বাণী সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। এই বিশ্বের যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, ফুলে যেমন এক মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়েছে, জীবনেও সে ধরণের প্রকাশ আছে, এবং জীবনে যেসব ক্ষণে এই প্রকাশ হয়েছে তারা সার্থক হয়েছে। জীবনের পরম সার্থকতাকে এই সব ক্ষণকালের মধ্যে পেয়েছি উপলব্ধি করেছি। কীর্ত্তি রেখে যাব এ মিথ্যা। ইতিহাসের প্রাচীর দিয়ে বড় বড় কীর্ত্তির দুর্গকে মানুষ রাখতে চেয়েছে, কালের মধ্যে ভেঙ্গে চুরে তারা কোথায় চলে গেছে। বাইরে যা রইল, তা বাইরের হাতে। কালের নির্ম্মম আঘাতে তা যাবে, কিম্বা কাল তাকে ধরে রাখবে। কিন্তু অন্তরে যে সত্যকে পাই, তাকেই যথার্থ পেয়েছি। কর্ম্ম নেপোলিয়ন করেছেন, আলেকজ্যাণ্ডার করেছেন, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা কি পেয়েছেন? নানা সুখ দুঃখে তাঁরা উঠেছেন পড়েছেন, বাহবা নিন্দা অনেক পেয়েছেন, কিন্তু এর মধ্যে সত্য কোথায়? অথচ অজ্ঞাত অখ্যাত কেউ সে দিনও ছিলেন আজও আছেন, যাঁরা পরিপূর্ণ প্রেমে নিখিলের আনন্দে আপনাকে মিলিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁদের জীবন সার্থক হয়েছে। এইটাই বড়। তাই বারে বারে যখন গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে এই আকাশে, নক্ষত্রলোকের নীচে, নিজের প্রীতিকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি, ফুলের এই প্রীতির নিঃশ্বাসটুকুর মত আমারও মন যখন বলে উঠেছে ভাল লাগল, অমনি সমস্ত বিশ্বের অর্থটি বলা হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টিতে এমন কিছু আছে যা মানুষের ভাল লাগাই চাই।

এই কলহ বিদ্বেষ যা পরস্পর থেকে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করছে, নিখিলের অধিকার থেকে আমাদের বিচ্যুত করছে, তাকে সরিয়ে যেতে হবে।—'করা' জিনিসটা আমার কাছে বড় নয়। এই যে তীর্থে এসেছি এর দেবতার চরণকে স্পর্শ করে যেতে হবে, সেই আনন্দরূপকে জেনে যেতে হবে। মারব ধরব জয় করব সংগ্রহ করব—এ বলা সহজ—'ভাল বেসেছি, 'ভাল লাগল' এই কথা বলাই সব চেয়ে কঠিন।

তাই দয়া যখন চাইতে হবে তখন বলতে হবে, সব সহজ করে দাও! মনের কত অভ্যাসে, বাইরের কত কথায় মন আলোড়িত হচ্ছে। দশ জনের ইচ্ছায় মনের কত শুভ ইচ্ছা মরে যাচ্ছে—আমাদের অন্তরাত্মার স্বচ্ছতা আবিল হয়ে যাচ্ছে।

ফুলের মত সহজ হতে হবে। এ জীবনে আনন্দময়কে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করেছিলুম, সেই সব ক্ষণ গুলি সত্য হোক—যাবার আগে যেন দেখতে পাই কোন্ কোন্ বসন্তে ফুল ফুটেছিল, কোন্ শরতে ফল ফলে ছিল, প্রেমের সফলতা কোন মুহূর্ত্তে হয়েছিল। সেই রইল পৃথিবীতে। বিশ্ববীণার যে সুর উঠছে তার সঙ্গে জীবনের সঙ্গীতের মিল হয়েছিল, বেসুর হয় নি, এইটাই হল সার্থকতা। আর জীবনের বাকী সব ক্ষণে ভাল মন্দ কত কি করেছি—কর্ম্ম সে কিছুই নয়, দেশে কালে সে মিলবে না। যা নিখিলের সঙ্গে মিলেছে তা রয়ে গেল। চলে যাবার তটভূমির উপর আজ এই কথাটির দেখা পেলুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুবাদ

সেই তো পুরুষসিংহ উদ্যোগী যে জন,
তারি লক্ষ্মীলাভ।
দৈবপানে চেয়ে থাকে কাপুরুষগণ
দুর্ব্বল স্বভাব।
দৈবেরে পরাস্ত কর আত্মশক্তি বলে
পৌরুষ তাহাই।
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবুও না ফলে
তাহে দোষ নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষ বর্ষণ

১

এস নীপ বনে ছায়াবীথি তলে,
এস কর স্নান নব ধারা জলে॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পর দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ,
কাজল নয়নে যূথী মালা গলে
এস নীপবনে ছায়া বীথি তলে॥
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসি খানি সখি
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বন মর্ম্মরে,
ঘন বরিষণে জল কল কলে;
এস নীপ বনে ছায়া বীথি তলে॥

২

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর
বিরহ কাতর শর্ব্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্ম্মরি ॥
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিছে বাজিয়ে
মোর হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি ॥

৩

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কি এনেছিস্ বল,
হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল ॥
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথী বনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল ঝরানোর ছল।
কি আবেশ হেরি চাঁদের চোখে
ফেরে সে কোন্ স্বপন লোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল ॥

৪

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা!
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।

৫

বন্ধু রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন
শ্রাবণের প্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথী হারা রাতে ॥
বন্ধু বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে
আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে।

৬

শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে,
শেষ বরষার ধারা ঢেলে ॥
সময় যদি ফুরিয়ে থাকে
হেসে বিদায় কর তাকে,
এবার না হয় কাটুক্ বেলা অসময়ের খেলা খেলে।
মলিন, তোমার মিলাবে লাজ,
শরৎ এসে পরাবে সাজ।
নবীন রবি উঠবে হাসি
বাজাবে মেঘ সোনার বাঁশী,
কালোয় আলোয় যুগলরূপে শূন্যে দেবে মিলন মেলে।

৭

দেখ দেখ শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছেরে শিউলি ফুলে রে
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টীপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো সখি
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি,
মালতীর বনে বনে

ওই শুন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়
আয় আয় আয়।

৮

এস শরতের কিরণ প্রতিমা
এস হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে ॥
বিরহ তরঙ্গে অকূলে সে যে দোলে
দিবা যামিনী আকুল সমীরে।

৯

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎ প্রাতের আলোর রাণী ॥
সারা বেলা শিউলি বনে
আছি মগন আপন মনে
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার বুকে ব্যথার বাঁশী খানি ॥
আমি যা বলিতে চাই হল বলা
ওই শিশিরে শিশিরে অশ্রু গলা ॥
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মূরতি এই বিরাজে
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপানি ॥

১০

কার বাঁশী নিশি ভোরে বাজিল মোর প্রাণে,
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা ॥
শরতের আলোতে সুন্দর আসে
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে
হৃদয় কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা
মরিলো ॥

১১

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতের কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া ॥
কোন্ অমরার বিরহিনীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে
এলে নাহিয়া ॥
ওগো অকরুণ কি মায়া জানো
মিলন-ছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া ॥

১২

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে—
বাঁশি তোমায় দিয়ে যাবো কাহার হাতে?
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায়-গাথা, আগমনী, কত যে
ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে ॥
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে’
সময় যে তার হল গত
নিশি শেষের তারার মত,
তারে শেষ করে দাও শিউলি ফুলের মরণ সাথে ॥

১৩

গান আমার যায় ভেসে যায়
চাস্‌নে ফিরে দে তারে বিদায় ॥
দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধুলার আঁচল হেলায় ভরা,
শিশির ফোঁটায় মালা-গাঁথা বনের আঙিনায় ॥

কাঁদন হাসির আলো ছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভুলে-যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেল চলে কতই তরী
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়॥
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই যে

এই যে তোমারে আজি হেরিতেছি চোখে
বাসনা-বিশাল ছুটি আঁখির আলোকে,
এই যে পলক লাগি পারি পরশিতে
তোমার আঁচল খানি, ফুল খুলে দিতে
কবরী খসিয়া পড়ে আকাশের পথে
নীড়গামী বলাকার ক্লান্ত পাখা হ'তে
স্বচ্ছ আঁধারের মত গোধূলির পরে,
শিশির-তৃষিত ছুটি অকলঙ্ক করে
আপনারে নানাভাবে তুলিতেছ পূরি,
নিজের রূপের সনে এই লুকোচুরি,
এই ক্ষণে ভরে-দেওয়া এই পুনরায়
অঙ্গের সীমান্তে অঙ্গ মিলায় মিলায়,
কিছু যার দেখিয়াছি কিছু দেখি নাই,
একদিন মনে হবে অপূর্ব্ব ইহাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মোপাসনা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানে সমুত্থান।

প্রবোধয়িতা॥ আব্রহ্মস্তম্ব (অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণ-গুচ্ছ পর্য্যন্ত) সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা সুদুর্ভেদ্য মহারহস্য। যিনি যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন, তাহারও যেমন আর তোমার আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিদিগেরও তেমনি পৃথিবী-শুদ্ধ মনুষ্যের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি তাহার কাছে অবিদ্যারই নামান্তর। উপনিষদে তাই আছে—"যদি এমন মনে কর যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মকে অতি অল্পই জানিয়াছ।"

"আমি ব্রহ্মকে না জানি এমনও নহে, জানি এমনো নহে—এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদের মধ্যে জানেন তিনিই তাঁহাকে জানেন।"

এখানে এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক যে ব্রহ্মকে যিনি যতটুকু জানিতে পারিয়াছেন তাহা না জানিতে পারার তুলনায় এত অল্প যে তাহা অজ্ঞানেরই নামান্তর। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহা যে একেবারেই নিষ্ফল তাহা নহে। তাহাতে আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রতি যদিও আমাদের ধিক্কার জন্মে তথাপি তাহার একটি মহাফল এই যে তাহাতে এক-দিকে যেমন আমাদের সে জ্ঞানটুকু অতীব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়,—আর একদিকে তেমনি ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাদের জ্ঞানের সমস্ত অভাব প্রাণের টানের দ্বারা পূরণ করিয়া দেয়। তখন সাধক সদ্‌গুরুর নিকটে গমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণে অধিকারী হন। পরে যাহা ঘটে তাহা কবি তুলসীদাস দুই কথায় বলিয়াছেন এইরূপ :—

সদ্‌গুরু পাওএ, ভেদ বাতাওএ জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লা কি ময়লা ছুটে, যব আগ করে পরবেশ॥

অগ্নির দাহনে যেমন সুবর্ণের গাত্র হইতে গাদ কাটিয়া যায়, তেমনি জ্ঞানাগ্নির দাহনে শ্রদ্ধা ভক্তির গাত্র হইতে অবিদ্যামূলক অন্ধ সংস্কারের গাদ কাটিয়া গিয়া তাহা স্বয়ং-জ্যোতি ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হয়।

জিজ্ঞাসু॥ তুমি বলিয়াছিলে তোমার স্মরণ হয় কি যে গায়ত্রীর ধ্যানই যে গীতোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ একথাটির যাথার্থ্য তুমি আমার নিকটে বিধিমতে প্রমাণ করিবে। কিন্তু

এখনো পর্য্যন্ত সে বিষয়টির কোন উচ্চ বাচ্য করিলে না। তোমার ঐ মুখের প্রতিজ্ঞাটিকে কীরূপে তুমি কার্য্যে বলবৎ কর তাহা দেখিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছে। অতএব আর ইতস্ততঃ না করিয়া কথিত বিষয়টির একটা স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিতে আর বেশী বিলম্ব করিও না।

প্রবোধয়িতা॥ আমি আমার প্রতিজ্ঞাত কথাটিকে কার্য্যে বলবৎ করিবার জন্য সায়নাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে গায়ত্রীর যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যকবোধে তাহা করিতে গিয়া দেখিলাম—যে সায়নাচার্য্য দুইরূপ অর্থ ব্যাখা করিয়াছেন, বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসকদিগের উপকারার্থে একরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন আর প্রতীকোপাসক দিগের উপকারার্থে আর একরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার কৃত ঐ দুইরূপ অর্থ ব্যাখ্যার দেশকাল পাত্রোপযোগিতা প্রদর্শন করিবার মানসে পুরাতন বৈদিক ঋষিরা কীরূপে প্রতীকোপাসনা হইতে ব্রহ্মোপাসনায় এবং ব্রহ্মোপাসনা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানে সমুথান করিয়াছিলেন তাহা আমাকে অগত্যা দেখাইতে হইল। এইরূপে আমি আমার মুখ্য বক্তব্য বিষয়টির গোড়া ফাঁদিয়া লইলাম।

জিজ্ঞাসু॥ গোড়া ফাঁদা কার্য্য যথেষ্ট হইয়াছে—এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হইলে ভাল হয়।

প্রবোধয়িতা॥ তথাস্তু—আগামী মাসের পত্রিকায় আমি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হইব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুলি বদল

প্রীতিভাজন সম্পাদক মহাশয়,

পুরাতন জনশ্রুতি আছয়ে কত যে।
ঠিকানা তাহার পাওয়া না যায় সহজে॥
অহ্নি সন্ধি ঘুঁটি তার রতন যে দুটা
পেয়েছি, দিচ্চি তা—ধর, একটুও না ঝুটা॥
একদা মহর্ষিদেব ঘণ্টা দুই ধরি অবিশ্রান্ত।
বিতরিতেছিলেন সদুপদেশ ধরম সংক্রান্ত॥
পল্লীগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ এক অতি বিচক্ষণ,
তুড়ি দিয়া হাই তুলি "দুর্গা দুর্গা" বলিবে যেমন—
জিহবাগ্রে আগত দুরগা'-নাম চাপিয়া সহসা
বলিল "ওঁ তৎসৎ, তুমি মাত্র এভবে ভরসা"!
এক ব্রাহ্মণ যবে এইরূপে ভাঙিল আলস্য,
সাঙ্গ হল উপদেশ, অন্য এক ব্রাহ্মণ সদস্য
বলিল "তারাপ্রসন্ন আমার জ্যেষ্ঠ সুতের নাম,
মধ্যমের নাম, শ্যামাপ্রসন্ন গো রাখিয়াছিলাম।
ছিল তারা তারা-শ্যামা, মগন আছিনু যবে মোহে।
তৎ-সৎ-প্রসন্ন, আজিকে থেকে, হৈল বাছা দোঁহে॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূর্য্যোপাসনার সেরা আদর্শ

ঘড়ির পো ধর্‌মিষ্ঠ অতি
নিত্য পূজে অহস্পতি।
দীক্ষিত ঢঙ্কার মন্ত্রে,
সাবাস বলি ঘটিকা যন্ত্রে!
যত ফুটিবার ফুটি সরসী সলিলে,
আনন্দ সলিলে পদ্ম ভাসিতে থাকিলে,
যত উর্দ্ধে উঠিবার উঠিয়া উরধে
বিরাজিলে দিনকর গগন মুরধে,
ঘড়িটি আমার প্রতি দিবস
ঢং মন্তর জপি দ্বাদশ
ঘণ্টা মিনিট যুগল হস্ত

ভুরুর মাঝারে করিয়া স্তম্ভ,
স্বরজে প্রণমি বলিয়া "গুরু"।
দিবসের করে কারজ সুরু ॥
গভীর নিশীথে যবে গো চন্দ্র।
ত্রিজগত মাঝে একা অতন্দ্র ॥
ফের পুন মোর ঘটিকা যন্ত্র,
ধীরে ধীরে জপি দ্বাদশ মন্ত্র
স্মরি দিনকরে যুগল করে
বিধুর চরণে প্রণমে পরে।
আকাশবাণী॥ বিধুর চরণ মধুর কিরণ,
সরস পরশে যাতনা হরে। *

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভুট্টাক্ষেতে

মাগো আমার মন মানে না
মন না মানে আজ
আমায় তুমি মিথ্যা বকো
মিথ্যা দেওয়া লাজ!

শুধু কি তায় জল দিয়েছি
দিয়েছি তায় মন
বুকের মাঝে কেমন করে
আজকে সারা খণ।

সেদিন কাঁচা ভুট্টা ক্ষেতে
সবুজ টিয়া পাখী—
সাঁঝের আগে সাথীর খোঁজে
উঠ্‌তেছিল ডাকি।

পথিক এসে দাঁড়ালো মোর
ঝর্ণা তলাটিতে
হিয়া আমার করলো চুরি
তুষার বারি দিতে।

ওগো পথিক দূর বিদেশী
কোন্ পথে যে গেলে
আমার ভরা কলস খানি
হঠাৎ ভেঙে ফেলে।

শিরিষ শাখে শুক্‌নো পাতা
বাজ্‌ছে রিনি রিনি
তোমায় বুঝি পড়ছে মনে
বল্‌ছে চিনি চিনি।

সেদিন কাঁচা ভুট্টা ক্ষেতে
অনেক ছিল আশা
সবুজ শীষে লুকিয়ে ছিল
কত সুখের বাসা।

আজকে পাকা ভুট্টা ক্ষেতে
কেউ না আসে হায়
আধেক কাটা ফসল রাশি
লুটিয়ে ভুঁয়ে যায়।

---

* ভাষ্যকার॥ শব্দের যবনিকা ভেদ করিয়া ঘটিকা-যন্ত্রটির ভক্তিকুসুমাঞ্জলি আশ্রমের দুইটি মুখ্যস্থানীয় নৈবেদ্য-ডালিতে পৌঁছিতেছে—ইহা যাঁহার চক্ষু আছে তিনি দেখিতে পান—(১) ভোগ্য ভক্তিস্থানীয় আনন্দময় কোষে অথবা রসপূর্ণ কারণ শরীরে এবং (২) কর্ম্মকর্তৃস্থানীয় বিজ্ঞান-কোষে অথবা তপঃক্ষীণ সূক্ষ্ম শরীরে।

উতল কেশে দাঁড়িয়ে আছি
আঁধার নামে ওই
একটু থামো জননী মোর
একটু হেথা রই।

ফিরবে না সে পথিক জানি
ফিরবে না সে দিন
একটি বারই বাজেরে হায়
দুখীর হৃদি-বীণ।

ফসল আঁটি মাথায় বহি
ফিরবো আমি ঘর
এমনি করে' জীবন যাবে
কতই না বছর।

আবার ক্ষেতে ফসল হবে
পাক্‌বে পুনরায়
আবার তারে মাথায় নিয়ে
ফিরবো ঘরে হায়।

বুকের বোঝা হাল্কা আমার
হবে না কথ্‌খনো
আজকে থামো একটু মা-গো
আমার কথা শোনো।

পূর্ণিমা

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
আকাশের চাঁদ লক্ষ্যি
নিটোলগড়ন মধু চাকখানি
কনক-চাঁপার মধু আনি আনি,
ভরিয়া তুলিছে সারারাত জাগি
তারাদল মধুমক্ষী।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
যায় যদি রাত শোক কি?
শেফালি-শিথিল সমীরণে যদি
তারার প্রদীপ নিভে নিরবধি
চাঁদের আলোয় আমরা জাগিব
সাথে জাগিবেন লক্ষ্মী।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
আঁখি হ'তে ঘুম রক্ষি'
ফিরিছে স্বপন কাঁদিয়া কাঁদিয়া
মালতীর চোখে পরশ সাধিয়া
আকাশে শুভ্র মেঘ-মল্লিকা
জাগে অতন্দ্র অক্ষি।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
আসে নিদ্রার ঝোঁক কি?
ঘুমাক সকলে; আমরা ক' জনি
উত্তরায়ণে * কাটাবো রজনী

* কোজাগরী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এই কবিতাটি উত্তরায়ণে পঠিত হইয়াছিল।

চিত্তের ক্ষুধা মিটিবে আজিকে
স্বপ্নের ফল ভক্ষি'।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
ঘুমে ঢুলে পড়ে চোখ কি ?
এমনি নিশীথে পারি বুঝিবারে
মথন-ক্লান্ত আদি পারাবারে
নব বিশ্বের বিস্ময় সম
উঠেছিলা চির-লক্ষ্মী।

কে জাগেরে আজ কোজাগরী নিশি
ঘুমায় না নীড়ে পক্ষী—
আঁখি মেলে দেখি একি মনোরম,
কামনা-নদীর সঙ্গম সম
কল্প সাগর—সেথা শতদলে
শরৎ মাধুরী লক্ষ্মী।

কল্প-কথন

মহাভারত

(মারাঠার গিরিপথ)

আরংজেব

এই যে পাহাড়ী ইঁদুর এবার ধরেছি।

শিবাজী

তাইতো দেখ্‌ছি—ম্লেচ্ছরাজ! কিন্তু মনে থাকে যেন এখানে তুমি একলা এ তোমার দিল্লী নয় যে সৈন্য-বলে তুমি বলী—আর একে জান তো ?

আরংজেব

আফজল খাঁকে যে বিশ্বাস ঘাতকতা করে' মেরেছে তার কাছে কি আমি প্রস্তুত না হয়েই এসেছি। এই দেখ।

(বস্ত্রের তলে লৌহের বর্ম্ম এবং গুপ্ত অস্ত্র প্রদর্শন)

শিবাজী

ওঃ একেবারে শঠে শাঠ্যং—সমানে সমানে দেখছি। তবে আর আমাদের মধ্যে ভদ্রতার ভূমিকাটুকু করবার—

আরংজেব

না কোনো প্রয়োজন নেই; লৌকিকতা বাদ দিয়ে একেবারে কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে।

শিবাজী

তবে সেটা আমার দিক থেকেই সুরু হোক্। বারে বারে যে আমার রাজ্য আক্রমণ কর্‌ছ তার অর্থ কি ?

আরংজেব

রাজ্য তোমার ? পঁচিশ বছর আগে এ রাজ্য কোথায় ছিল ?

শিবাজী

পঁচিশ বছর আগে ছিল না কিন্তু পাঁচশ বছর আগে ছিল। এটা হিন্দুস্থান!

আরংজেব

কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভারতের অদৃষ্ট-গগনে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র উদয় হয়েছে।

শিবাজী

শুধু অদৃষ্ট-গগনে নয় তোমাদের অদৃষ্টেও অর্দ্ধচন্দ্র আছে।

আরংজেব

পরিহাসরসিক! তোমার কথা শুনে ভুলে যেতে হয় যে এটা রণক্ষেত্র!

শিবাজী

আমি কিন্তু কখনই তা ভুলি নে।

আরংজেব

বুদ্ধি আছে—একেবারে গো-ব্রাহ্মণের মত কথা বল না দেখ্‌ছি।

শিবাজী

সাবধান মোগল—হিন্দু ধর্ম্ম তুলে উপহাস সহ্য করেনা।

আরংজেব

ধর্ম্ম তোমাদের কোথায়? কে তার নিয়ন্তা? হাঁচি, টিক্‌টিকি যে জাতির ভাগ্য বিধাতা—তার থেকে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যায়? গরু তোমাদের কাছে পবিত্র?

শিবাজী

যার যেথানে দরদ।

আরংজেব

তা বটে। গরুর বুদ্ধি নেই কিন্তু দুধ আছে—আর সেই জন্যই আমরা এসেছি—এই শেষ নয় এর পরেও সব আস্‌বে।

শিবাজী

এর পরেও তাকে রক্ষা করবার লোকের অভাব হবেনা।

কিন্তু আসল কথা হোক্ তুমি হিন্দুর জন্য হিন্দুস্থান স্বীকার কর কি না?

আরংজেব

তোমার সাধের হিন্দুস্থান যে মুসলমানে ছেয়ে ফেল্‌ল।

শিবাজী

চাঁদের কৃষ্ণ-পক্ষটা দেখে বিচার করলে তার কলঙ্কের প্রতি পক্ষপাত করা হয়। ঘোর অমাবস্থার রাত্রিতেও মনে রাখ্‌তে হবে তার অন্য দিকটায় সবটাই জ্যোৎস্না।

আরংজেব

কোথায় তোমার সেই অন্য দিক?

শিবাজী

আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে

আরংজেব

বিশ্বাসে নয় বিশ্বাসঘাতকতায় ভণ্ড! বিশ্বাসকে দাঁড় করাতে হ'লে শক্তি চাই জেনো।

শিবাজী

বিশ্বাসই শক্তি! শক্তি যেথানে কম—বুদ্ধি সেথানে অভাব পূরণ করে।

আরংজেব

জানি—সেই বুদ্ধিই একদিন আফজল খাঁকে হত্যা করেছিল।

শিবাজী

ইস্ হত্যার নামে যে শিউরে উঠ্‌ছ। হাতে যে তস্‌বী মালা ঘুরাও—তার গুঁটি গুলো যে মানুষের মাথা দিয়ে তৈরী।

আরংজেব

এবং তার সুতোটা আমার অহঙ্কারের—এই অহঙ্কারের বলেই হিন্দুস্থানকে ইসলামথণ্ডে পরিণত করবো।

শিবাজী

পারবেনা, পারবেনা, বিধাতার নিয়মের বিরুদ্ধে তোমার স্পর্দ্ধা!

আরংজেব

আল্লার ইচ্ছাতেই মুসলমান এ দেশ জয় করেছে।

শিবাজী

তোমার সে আল্লা কোথাও নেই। আমাদের দুর্ব্বলতা-তেই তোমাদের শক্তি!

আরংজেব

জানি—দুর্গের সেই ভগ্ন অংশটাকে গেঁথে তুল্‌তে অবসর না দেওয়াতেই আমার রাজনীতি।

শিবাজী

হে রাজনীতিক—মনে রেখো ভবিষ্যতে এই হিন্দু-মুসলমানের দুই পদার্থ নিয়ে গণ্ডগোল বাধাবে সেই তোমার চেয়েও বড় রাজনীতিকের জন্য তুমি পথ প্রস্তুত করে' রাখ্‌ছো।

আরংজেব

বর্ত্তমান ছাড়া অন্য দুটো কালকে স্বীকার করা দুর্ব্বলতার চিহ্ন।

শিবাজী

এবং তোমার রাজনীতির মরণও সেথানে।

আরংজেব

কিন্তু তোমার রাজনীতি বুঝি হিন্দুস্থানকে হিন্দুর জন্য আগ্‌লে রাখাতেই।

শিবাজী

আমার হিন্দুস্থানে অহিন্দুর স্থান নেই।

আরংজেব

তোমার সে হিন্দুস্থান কেবল তোমার মনেই

শিবাজী

মনে যা আছে তাকে বাইরে রূপ দেবো এই আমার প্রতিজ্ঞা।

আরংজেব

স্পর্দ্ধা বটে। বাদশা আকবর এইটি করে গেছে। তখন থেকে চেপে ধর্‌লে এতদিন এরা থাকৃতো কোথায়?

শিবাজী

তোমার চেয়ে তাকে বেশি ভয় করি। তোমার সঙ্গে ভদ্রতার দরকার করেনা—কিন্তু তার ভিতরে বাইরে দুই রকম।

আরংজেব

হিন্দুকে যথেষ্ট ভয় সে দেখায় নাই।

শিবাজী

হিন্দুকে যথেষ্ট লোভ সে দেখিয়েছিল। ভয়ের মার শরীরকেই মারে—কিন্তু লোভের মার অন্তঃসার শূন্য করে ফেলে। অপকারকে সহ্য করা যায়—কিন্তু অপকার যখন ভালবাসার রূপ ধরে—তখন তাকে থামায় কে?

আকবরের প্রবেশ

আকবর

ব্যস্ত হয়োনা—আমার নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছি—আমি আকবর।

আরংজেব

তুমি

শিবাজী

তুমি

আকবর

তোমরা দুজনেই ভুল করছ। তোমরা উভয়েই অখণ্ড ভারতের অধীশ্বর হ'তে চাও কিন্তু কেউ অখণ্ড ভারতকে দেখ্‌তে পাওনি।

শিবাজী

ম্লেচ্ছকে বাদ দিলে যদি ভারত খণ্ড হয় তবে পাঁচশ বছর পূর্ব্বে তার অখণ্ডতা ছিল কোথায়?

আকবর

সে হিসাবে দেখ্‌লে হিন্দুস্থান হিন্দুর ও নয়—পাঁচ হাজার বছর আগে এ দেশে তাদের নাম কে জান্‌তো? মানুষ তো গাছ পালা নয় যে তাকে এক দেশ থেকে আর এক দেশে আন্‌লে শুকিয়ে যাবে- দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে এই জন্যই সে সচল

শিবাজী

তবে নিজের দেশ বলে কি কিছুই নেই?

আকবর

আছে বইকি। দেশ আপন হয় জন্মের দ্বারা নয় প্রেমের দ্বারা। প্রদীপের দেশ তার ঘরটুকু। সেই টুকুকেই সে আলোকিত করেছে - কিন্তু সূর্য্যের দেশের সীমা কোথায়?

শিবাজী

আমার হিন্দুস্থান সেই প্রদীপের দেশ—সীমা আছে বলেই তাকে এমন নিবিড় ভাবে ভাল বাস্‌তে পারি। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি ফুটো কলসীকেই শ্রেয় মনে কর—কারণ তার কোথাও সীমা নেই—কোথাও বাধা নেই।

আকবর

ভৌগলিক ভারতবর্ষ সেই কলসী—কিন্তু তার অমৃত আধারকে ছাপিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে গেছে—এই খানেই তার বিশেষত্ব।

আরংজেব

এ কথা কি বাদশা। আমি ভারতের অমৃতের সন্ধানে ব্যস্ত নই সত্যি কথাই বলি। আমি চাই জয়, আমি চাই শক্তি।

আকবর

জয়ে সুখ নাই বৎস—ভালবাসায় সব তৃষ্ণার নিবৃত্তি। প্রেমের আকর্ষণেই মাতৃবক্ষ থেকে দুগ্ধ উচ্ছসিত হয়—অন্যথা—

আকবর

জানি বের হয় রক্ত। আমার সিংহাসন সেই রক্তের সাত সমুদ্রের পারে অবস্থিত—

তুমিই হিন্দুদের শক্তি বাড়িয়ে তুলে আমাদের পরমুখাপেক্ষী করে রেখেছে।

আকবর

হিন্দু-মুসলমান এই দুই বাহুবলে ভারতবর্ষ বলী।

আরংজেব

মিথ্যা কথা—দুই হাতে তলোয়ার ধরা চলে না।

শিবাজী

হিন্দু-মুসলমান দুই বিভিন্ন ধর্ম্ম একদেশে কখনই স্থান পেতে পারে না।

আকবর

কেন পারে না! এই দুই ধর্ম্মের কল্পনা যখন বিধাতার সৃষ্টিতে স্থান পেয়েছে তখন পৃথিবীতেও তাদের স্থান হবে।

আরংজেব

ওরা চায় সব দিক থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে।

শিবাজী

আর ওদের ইচ্ছা সকলকে করে গ্রাস।

আকবর

হিন্দু ধর্ম্ম যে সকলের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চল্‌তে চায় এটা একটা জোর করে বলা উল্টা কথা। যুগের পরে যুগে হিন্দুধর্ম্মের মাঝে বিদেশীয়, বিজাতীয়, বিধর্ম্মী কত জন ধারাই যে স্থান পেয়েছে সে হিসাব কে রাখ্‌ছে, দুহাতে কত লোককে যে সে আপন করে নিয়েছে তা নিজেই জানেনা। যতই সে সাম্‌লে চলুক—তার সকলকে আপন-করা প্রেমের বিনাশ নেই।

শিবাজী

ক্ষান্ত হও হিন্দুধর্ম্মান্তক!

আকবর

আজ ইসলাম যে সকলকে গ্রাস করে সেটা তার ভয়ের চিহ্ন, শক্তির নয়!

আরংজেব

ভয়ের চিহ্ন!

আকবর

একজাতির অসভ্য লোক আছে যারা নিজেদের বৃদ্ধদের কেটে খেয়ে ফেলে। তারা ভাবে বৃদ্ধদের উদরসাৎ করলেই স্বভাবতই তাদের গুণ গুলি পাবে। ইসলাম নিজেদের ছাড়া অন্যদের ভয় করে তাই সে জোর করে অন্যকে নিজের দলে টান্‌তে চায়।

আরংজেব

কাফের!

আকবর

তোমরা আমার কথা শুন্‌বে না জানি। তোমরা এই যে সমস্যাটাকে তৈরী করে তুল্‌ছ—এর সমাধান করতে ভারতবর্ষের অনেক অশ্রু অনেক রক্ত ফেল্‌তে হবে।

আরংজেব

তুমিই সে সমস্যার সূত্রপাত করে গেছ আমি চেষ্টা করছি তাকে দূর করতে।

আকবর

হিন্দুকে মুসলমান করে! তার চেয়ে ভাল হয় দেশশুদ্ধ লোক আত্মহত্যা করে মরে গেলে—তাহলে আর কোনই বালাই থাকে না!

আরংজেব

হিন্দুদের প্রতিপক্ষপাত করে তোমার কি লাভ হয়েছে! তোমার চেয়ে আমার সাম্রাজ্য কত বৃহৎ দেখ—

আকবর

আকারে বড় বটে কিন্তু তার মধ্যে অর্দ্ধেক শূন্য—

আমার ভারতবর্ষ তোমাদের উভয়ের চাইতেই বড়; তাতে হিন্দু মুসলমান উভয়ের স্থান হয়।

আরংজেব

তাতে লাভ কি?

আকবর

লাভ এই বিধাতার মনে যে কল্পনা ছিল তাতে সহায়তা করে আমি সৃষ্টি কর্ত্তার আসন পেয়েছি

আরংজেব

তবে তুমি সৃষ্টিই কর—আমি চাই জয় করতে।

প্রস্থান

আকবর

ভুল, ভুল করলে! আর তুমি!

শিবাজী

আমি চাই হিন্দুস্থানকে রক্ষা করতে- হর হর ব্যোম—

প্রস্থান

আকবর

ভুল ভুল—দুজনেরই ভুল। এরা শুধু ভৌগলিক ভারতবর্ষকেই দেখ্‌ল—ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ কারো চোখে পড়্‌ল না। হে ভারত ইতিহাসের বিধাতা—তুমি তাকে কোন্ পথে নিয়ে চলেছ—ওদের একবার দেখিয়ে দাও।

প্রস্থান

কৃপণ

আমি ঘুরি তোমারি সন্ধানে
কত দিনরাতে
মম জীর্ণ তরীখানি কাঁপে
আঘাতে আঘাতে
যদিও তুমি নিয়ে যাবে
দুঃখ হতে দুখে
হাসি আমার ছুটবে মেতে
তব ঝড়ের মুখে।
জানি জানি তুমি কৃপণ
তুমি নিঠুর বটে
ফুটাবো রঙ কিন্তু তব
অন্ধকারের পটে।
ভিখারী তুমি হাত বাড়াবে
মম ভিক্ষাতরে
যদিও তোমা লাগি আজি
জগৎ কেঁদে মরে।

শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল

যদি

ফুল যদি বন্ধ হ'য়ে হয় পুন কুঁড়ি!
সতেরো বছর তব যদি গিয়ে ঘুরি
বাহিরে আসিতে চলি বালিকা-বয়সী!
উদ্ভিন্ন-যৌবন তব হৃদয়েতে পশি
ঘুমায়ে পড়িত নদী তরঙ্গ সমান
বাতাসের অবসানে। আনিতাম দান
যা কিছু বলিত ভালো অবোধ নয়ান—
একটি ধানের গুচ্ছি শিশির-স্খলন;
নাবালক শেফালিকা; পথ গিয়া ভুলি
অবাক দাঁড়াতে মুখে পুরিয়া অঙ্গুলি।
দেখিতে বিস্ময়ে—তব হাস্য কোলাহলে
চকিত কাঠবিড়ালী শালছায়া তলে
দূরে গিয়া তব পানে রহিত চাহিয়া।
আজ আমি জাল বুনি সেই স্বপ্ন দিয়া।

আশ্রম-সংবাদ

গত ২০শে নভেম্বর বিশ্বভারতীর চতুর্থ বৈদেশিকী অধ্যাপক ডাক্তার কার্লো ফার্মিকী (Carlo Formichi) শান্তিনিকেতনে আগমন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে আশ্রমের আম্রকুঞ্জে আশ্রমবাসী ছাত্র ছাত্রী অধ্যাপক ও মহিলাগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সভায় স্বয়ং পরম পূজনীয় আচার্য্যদেব উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় শঙ্খধ্বনির মধ্যে সভায় পদার্পণ করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে স্বাগত করেন। এতদুপলক্ষ্যে পূজনীয় আচার্য্যদেব একটি পুরাতন গানকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া সময়োপযোগী করিয়া তুলিয়া ছিলেন তাহা গীত হয়। তৎপরে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে মাল্যচন্দনে অভিনন্দিত করিলে স্বয়ং আচার্য্যদেব ভারতবর্ষের, বিশ্বভারতীর. এবং নিজের তরফ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

ইহার উত্তরে অধ্যাপক বলেন-যে বন্ধুগণ আমি সমগ্র ইতালীর সম্ভাষণ এবং শুভ কামনা বহন করিয়া তোমাদের কাছে আসিয়াছি। ইটালী ও ভারতবর্ষের মধ্যে ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক যোগ আছে কিন্তু এইবার আন্তরিক যোগ সাধন করিবার সময় আসিয়াছে। আমি ইটালী হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বাহ্ণে ইটালীর বর্ত্তমান অধিমন্ত্রী (Prime minister) মুসোলিনীর নিকট হইতে তার পাইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি ভারতীয় বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র বিশ্বভারতীর মঙ্গল কামনা করিয়াছেন এবং ইটালীর যাহা গৌরবের বস্তু সেই চিত্রকলা ও সাহিত্যের যাবতীয় গ্রন্থাবলী তিনি বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় আরো বলেন যে ইটালী গভর্মেণ্ট বিশ্বভারতীতে ইটালীয় ভাষা আলোচনার জন্য একজন অধ্যাপককে পাঠাইতেছেন—তিনি শীঘ্রই আসিয়া পৌছিবেন।

ডাক্তার কার্লো ফার্মিকী জাতিতে ইটালীয়। ইনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-তত্ত্বের (Indology) অধ্যাপনা করেন। এখানে তিনি উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর আমরা আগামী মাসে প্রকাশ করিব।

আশ্রমের পুরাতন অধ্যাপক ও বন্ধু শ্রদ্ধেয় মরিস সাহেব আশ্রম হইতে ছয় মাস কাল অনুপস্থিতির পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি পূজনীয় আচার্য্য দেবের নিকটে থাকিয়া তাহার কাজে সাহায্য করেন।

সম্প্রতি আশ্রমে এ, ই, উইলিয়মস্ নামক একজন অধ্যাপক আসিয়াছেন। ইনি জাতিতে মান্দ্রাজীয়—ইনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমন করিয়া নানারূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। ইনি ছোট ছেলেদের অধ্যাপনা করেন।

ডাক্তার কুন্ হুন রাজা নামক একজন অধ্যাপক আশ্রমে আসিয়াছেন। ইনি জার্ম্মাণীতে ও অক্সফোর্ডে বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইনি শিক্ষাভবনে বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ড হইতে পালি, সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য মিসেস্ এ, জেচ্ ইলিয়ট্ নামক একজন ইংরাজ মহিলা আশ্রমে আসিয়াছেন।

পূজনীয় আচার্য্যদেব দুই মাস কাল অনুপস্থিতির পরে পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়াছেন। তাঁহার শরীর এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ আছে।

শ্রদ্ধেয় এণ্ড্রুজসাহেব সম্প্রতি বিশেষ কারণে আফ্রিকা যাত্রা করিয়াছেন। সেখানকার শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়দের মধ্যে স্বার্থ লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে—এণ্ড্রুজসাহেব তাহা মিটাইতে চেষ্টা করিবেন। তাঁহার বিদায়ের উপলক্ষ্যে আশ্রমে একটি সভা হইয়াছিল।

আফ্রিকার সঙ্গে এতদিন আমাদের যে যোগ ছিল তাহা দাসত্বের যোগ। আফ্রিকা শূদ্রের মত ক্রীতদাস জোগাইয়া এতদিন সভ্যসমাজের সেবা মাত্র করিয়া আসিয়াছে। এখনও তাহার সঙ্গে যে যোগ তাহা খনির যোগ—প্রাণের যোগ নহে। খনির সম্পদ ফুরাইলে মানুষ নিজের দেশে ফিরিয়া আসে। আফ্রিকা বহু চেষ্টা করিয়াও মানুষকে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। যেদিন তাহারা সেখানে কৃষকতা আরম্ভ করিবে সেই দিনই আফ্রিকার অতল্যাদশা ঘুচিবে। সভ্যতা শস্যের মত মাটির দান। এই যোগ আরম্ভ না হইলে কোনদিন বিবাদ মিটিবে না।

সুরুলের কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্বপরিচালক মিঃ এল, কে, এল্মহর্ষ্ট মহাশয় কিছুদিন হইল দেশে ফিরিয়া বিবাহ করিয়াছেন। তিনি নিজ প্রদেশে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সাধারণ বিদ্যালয় হইতে একটু বিশেষ রকমের হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে এখানে নূতন ধারা অবলম্বন করা হইবে। ইহা অনেকটা শান্তিনিকেতনের আদর্শে গঠিত হইবে।

আজকাল আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণ ছেলেদের হাতের কাজ শিখাইবার দিকে অনেকটা দৃষ্টি দিয়াছেন এবং কিছু সফলতাও লাভ করিয়াছে। প্রত্যহ বিকালে ৩টা হইতে ৪॥০ পর্য্যন্ত হাতের কাজ শেখানো হয়। এই সময় ছুতারের কাজ, তাঁতবোনা, কামারের কাজ, ও রাজ-মিস্ত্রির কাজ শিখানো হয়। অনেক ছেলে এখন ছোট ছোট আসন ও গামছা বুনিতে পারে এবং অনেকে, ছোটখাটো ডেস্ক, বাক্স, আলমারী প্রভৃতি কাঠের জিনিষ তৈরী করিতে পারে। গত বৎসর ইহারা ছেলেদের জন্য ২৫টি কাঠের ডেস্ক তৈরী করিয়া দিয়াছিল।

কয়েকদিন পূর্ব্বে কলাভবনে একটি চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। ইহাতে কলাভবনের ছাত্রদের অনেক ছবি ছিল। শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথের ও আচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের কয়েকখানি ছবিও ছিল। এখানকার কলা-ভবনের ছাত্ররা প্রতিদিনই দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। ইহাদের অনেকের অঙ্কিত চিত্র, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, বাঙালোর, মাদ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রশংসিত ও উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এতৎ ব্যতীত এখানকার ছাত্র শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাদ্রাজ জাতীয় কলাবিভাগে, শ্রীমান্ মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সিংহলের আনন্দ-কলেজে এবং শ্রীমান্ রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী লক্ষ্ণৌ কলাবিভাগে প্রশংসার সহিত কাজ করিতেছেন।

এবারকার চিত্র-প্রদর্শনীতে ছবি ছাড়া আশ্রমের ছাত্রীদের সেলাইএর কাজ স্থান পাইয়াছিল। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা সেলাইএর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। সেলাই শিক্ষার জন্য কলাভবনের শ্রীযুক্তা সুকুমারী ঘোষ বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীমতী হিরণবালা দাস, শ্রীমতী ইভা দেবী, ও শ্রীমতী সত্যবতী দেবীর সেলাই তিনটি সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩২ সাল। { ১১শ সংখ্যা

গান

আমার ঢালা গানের ধারা
সেই তো তুমি পিয়েছিলে
আমার গাঁথা স্বপন মালা
কখন্ চেয়ে নিয়েছিলে॥
মন যবে মোর দূরে দূরে
ফিরেছিল আকাশ ঘুরে
তখন আমার ব্যথার সুরে
আভাস দিয়ে গিয়েছিলে॥
বিদায় নিয়ে যাব চ'লে
মিলন পালা সাঙ্গ হ'লে—
তখন আলোয় হাওয়ায় মেঘে
এই কথাটি রইবে লেগে
এই শ্যামলে এই নীলিমায়
আমায় দেখা দিয়েছিলে॥

কেতকী

একলা বসে বাদল শেষে শুনি কত কি
এবার আমার গেল বেলা, বলে কেতকী।
বৃষ্টিসারা মেঘ যে তারে
ডেকে গেল আকাশ পারে
তাইতো সে যে উদাস হল নইলে যেত কি!
ছিল সে যে একটী ধারে বনের কিনারায়
উঠত কেঁপে তড়িৎ আলোর চকিত ইসারায়
শ্রাবণ ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে খবর পেত কি?

শেফালি

ওগো শেফালি
আমার সবুজ ছায়ার আঁধারে তুই জ্বালিস্ দীপালি
আমার তারা আকাশ থেকে
রূপের লিপি দিল এঁকে
লেখে শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি
আমার বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
আমার গোপন কাননবীথি বিবশ বাতাসে
সারাটা দিন ঘাটে ঘাটে
নানা কাজে দিবস কাটে
সন্ধ্যাবেলা বাজে তোমার করুণ ভূপালি

গান

শান্তি মন্দির পুণ্য অঙ্গন হোক্ সুমঙ্গল আজ হে
প্রিয় সুহৃৎপ্রবর বিরাজ হে.
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে।
চির-সমুৎসুক তব প্রতীক্ষা
সফল কর, লহ প্রেমদীক্ষা
মাল্যচন্দনে সাজহে
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে॥
জয় জয় বুধোত্তম অতিথিসত্তম
জ্ঞান-তাপস রাজহে॥
জয় হে।
এস আম্র-নিকুঞ্জ ভবনে
শিশির-সিঞ্চিত স্নিগ্ধ পবনে,
হউক্ সুন্দর শুভ আতিথ্য,
হোক্ প্রসন্ন তোমার চিত্ত,
তব সমাগম পুলক দীপ্ত
আজি বন্ধু সমাজ হে।
জয় জয় বুধোত্তম অতিথিসত্তম,
জ্ঞান-তাপস রাজহে,
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবান্ন

সায়াহ্ন

মৃন্ময়ী
গোলাপ-জাগানো প্রাতে জাগায়ে কখন্
শিশির-নিমীল আঁখি লজ্জাবতী বনে
চলে' গেছে শুকতারা। রুচি সূর্য্যকর
স্বর্ণ-শীর্ষ শস্য সম ক্লান্ততর এবে
লুটায়ে পড়েছে দূর দিগন্তের বুকে
সুধা সঞ্চয়ের ভারে। আসিছে শর্ব্বরী
কাঁখের ডালাটি পূর্ণ তারার ফসলে
ব্যস্ত করে জড়াইয়া শিথিল অঞ্চল
বল্লরিত কটিতটে। হাতে আছে তার
তীক্ষ্ণ চন্দ্র কলাটির করুণ কাটারি
ব্যগ্র উল্লাসের ভরে।
মোর ধান্য রাশি
কানায় কানায় ভরে উঠিয়াছে আজি
সোনার বন্যায়। জোয়ার-জাগানো চাঁদ,
উচ্ছ্বসিত হেমন্তের হৈম মন-সাধ
তোমারে হেরিয়া যেন।
মোর ভৃত্যদল
আজি সবে স্বর্ণলোভে হয়েছে উন্মাদ,
নাহি আসে কেহ হায় পক্ক শস্যক্ষেতে

কাটিতে সোনার ধান—যেতে চায় সবে
কোন্ দূর দুরাশার রহস্য-গুহায়!
কে জানে তাদের লাগি কি আছে সেখানে
দুঃখ সুখ? হিরণ্যাক জাদুকর এসে
সুবর্ণ মরীচিময় দুর্গতির পানে
টানিছে তাদের চিত্ত। অঘ্রাণের ক্ষেত
নীরবে রেখেছে ধরি ধরণীর প্রাণ
সেই আদি যুগ হ'তে। ক্ষুধা জগতের
তারি তরে রাখিয়াছে সান্ত্বনার সুধা
উৎসুক ওষ্ঠের কাছে। অবহেলি তারে
আজি পুন বাসনার ব্যগ্র পাখা মেলি
চলেছে কোথায় এরা! অংশুমান্ এস
কি সংবাদ?

অংশুমানের প্রবেশ

অংশুমান্

স্বর্ণ-বহ্নি-লুব্ধ মত্ত পতঙ্গ সমান
তোমার ভৃত্যের দল ছুটেছে সকলে
দুরাশা অনল-দীপ্ত দিগন্তের দিকে
প্রলয়-উল্লাস টানে। কিছুতেই তারা
ফিরিল না; সবে মিলি এবে বুদ্ধি হীন
ছুটেছে সোনার লোভে; বৃদ্ধ জাদুবিদ্
শিখাবে তাদের নাকি মন্ত্র স্বর্ণকর
গৃহে বসি মন্ত্র বলে সুবর্ণের রাশি
জমায়ে তুলিবে তারা; বলিল হাসিয়া
সেই তব ভক্ত ভৃত্য শোভন উশীর
তোমারে বলিতে তারা করিয়াছে স্থির
আর তারা ফিরিবেনা ফসলের ক্ষেতে,
আর তারা ফিরিবেনা পল্লী-গৃহ কোনে
আর তারা শস্য কাটি নবান্ন উৎসবে
মিলিবেনা এক সাথে। আজ হ'তে তারা
স্বর্ণ গড়া মন্ত্র শিখি জাদুবিদ্যা বলে
দিক্‌প্লাবী উচ্চতর সভ্যতার স্রোতে
ভেসে যাবে রাত্রি দিন।

মৃন্ময়ী

হায়রে অবোধ
কেমনে তোদের পরে করি আমি রোষ!
দুর্ব্বার সুবর্ণ-ধারা জানিস্ কি হায়
পশিয়াছে বাসনার মরু বালুকায়;
সেথায় নাহিকো ছায়া নাহিকো আশ্রয়
আষাঢ়ে ঝরেনা সেথা আকাশের স্নেহ
মৃত্তিকায় পাত্র ভরি।

অংশুমান্

মধ্য রাতে আজি
জাদুকর হিরণ্যাক আপনার হাতে
উশীরে শিখাবে মন্ত্র; তারপর তারা
যাবে সবে বাসনার সুদুর্গম পথে
গিরি শিখরের পানে। তব ধান্যক্ষেতে
একাকী ফিরিবে শুধু অতীতের প্রেত
স্মৃতির মশাল হাতে।

মৃন্ময়ী

নাহিকো সময়
ক্রোধের; ওরে বৎস ফিরাবো তোদের;
ছায়া হ'তে ছায়া এই স্বর্ণ-মরীচিকা
গোধূলি-গগন পটে স্বপনের লিপি
ক্ষণিকের ভ্রম; হায় দেখিতে দেখিতে
সূর্য্য ডুবে গেলে সব মিলাবে কোথায়
ব্যর্থতার কালো মেঘে!

অংশুমান্

ফিরাবে তাদের!
কিন্তু জানিয়ো নিশ্চয় সোজা লোক নয়
এই বৃদ্ধ জাদুকর; বাধা দিলে তারে
কঠিন বিপদজালে তোমারে ফেলিবে
জেনো তাহা!

মৃন্ময়ী

আছে দুঃখ তাই বলে হায়
কর্ম্ম স্রোত বন্ধ করি কবে কে কোথায়
বসিয়া স্থানুর মত! মোর ভৃত্যদল
আজন্মের আদি গেহ, শষ্পশ্যাম রাখী,
ধরার নাড়ীর টান ছিড়ে চলে যাবে
আমি তা নিশ্চিন্তে শুধু দাঁড়াইয়া ধীরে
দেখিব। বিপদ আছে—বেদনাশ্রু মোর
সুখসূর্য্যসমুজ্জ্বল একদা প্রভাতে
আনন্দে উঠিবে ঝলি। বিধাতা তাদের
মুক্তাভ্রমে তুলি নিয়া আপন সাধের
মধ্যমণি হারটিতে দিবেন দুলায়ে
সার্থক-বেদনা মোর রহিবে ফলিয়া
দিনের দগ্ধতা পরে সন্ধ্যা তারাসম।

উভয়ের প্রস্থান।

২

রাত্রি প্রথম প্রহর

হিরণ্যাক

আজি শুভলগ্নে বৎস মধ্য রজনীতে
তোমারে শিখাব মন্ত্র; মন কর স্থির
দিকে দিকে নিক্ষেপিত ক্ষুব্ধ চিত্তটারে
ফিরাইয়া লয়ে এসো ধ্যানাসনে তার।
মায়া মোহে বিজড়িয়া ভুলিয়োনা যেন
কর্ত্তব্য তোমার—মনে রেখো সব কথা।

উশীর

এই কি নিশ্চিত প্রভু? ভাবো আর বার
যদি কোন পন্থা থাকে ভেবে দেখ মনে
নিরুপায়ের উপায়। স্বহস্তে আমারে
আজন্মের বাসগৃহে বহ্নি অভিশাপ
বাধা করিয়োনা দিতে। শুধু এইটুকু
দয়া কর।

হিরণ্যাক

হায় বৎস, এখনো তোমার
চিত্ত ফেরে উঞ্ছলোভে ফসলের ক্ষেতে
নিতান্ত ভিক্ষুকসম; রবে কি পড়িয়া
পল্লীর প্রাঙ্গণে নিত্য নিঃস্ব শিশুসম
পুষ্ট প্রকৃতির অন্নে? নাহি দেহে বল?
মনে শক্তি? চিত্তে আশা? হৃদয়ে কল্পনা?
স্রোতমুখে নিরাপদে ভাসাইয়া তরী
মানুষে কি শান্তি পায়? স্রোতের উজানে
আনন্দে বাহিব তরী তবেতো মানুষ
মোরা; গুপ্ত প্রকৃতির যত সঞ্চয়ের
ধন আবিষ্কার করি মোরা লাগাইব
কাজে; ওই হের দেখা যায় মেঘচ্ছায়াসম
সভ্যতার গিরিচূড়া স্বর্ণ আভাময়!
ফিরাও ফিরাও বৎস পল্লীপ্রান্ত হ'তে
সহজ সুখেতে মুগ্ধ হৃদয় তোমার।

উশীর

অরোরার ভাতি সম তব বাক্যচ্ছটা
পলকে আলোকি' তোলে রহস্য-ভয়াল
দুরাশার মেরুপ্রান্ত। তাই হবে প্রভু
স্বহস্তে সুখের গৃহ পল্লীর প্রাঙ্গণ
ঘোর বহ্নি বজ্রপাতে পোড়াইয়া দিব।
তারপরে মায়ামুক্ত ছিন্ন স্নেহজাল
আসিব চরণে তব মধ্য রজনীতে
শুভলগ্ন প্রতীক্ষিয়া। বিদায় এক্ষণে।

উশীর প্রস্থানোদ্যত

হিরণ্যকের প্রস্থান

মৃন্ময়ী

যেয়োনা যেয়োনা বৎস দাঁড়াও উশীর
আরবার ভেবে দেখ চিত্ত কর স্থির।
একেবারে ভুলেছ কি শ্যামা ধরিত্রীর
আজন্মের অন্ন ঋণ? ছিড়েছ কি তার

স্নেহ-সুকোমল শ্যাম রাখীর বন্ধন
স্বর্ণমায়ামৃগলোভে ? যেয়োনা যেয়োনা।

উশীর

সুপ্তি-রুদ্ধ কর্ণে বৃথা ঢালিতেছ দেবি
তোমার অমৃতমন্ত্র ! পারিনা ফিরিতে ;—
তাই তব গুঞ্জরণ জাগায় ধিক্কার
লুপ্ত-মধু কমলের ক্ষুব্ধ বক্ষ মাঝে
চঞ্চল ভ্রমরে হেরি ! পারিনা পারিনা
দেবি-ক্ষমা করো মোরে।

মৃন্ময়ী

শিশির ঝরানো রাতি আসিতেছে ওই
বলাকার পক্ষ-চ্যুত স্বচ্ছ অন্ধকার
নীরবে পড়িছে খসি। দূর মাঠ পারে
দুরন্ত দানব সম ক্ষুধিত বাতাস
হা হা করি ফিরিতেছে ফসলের ক্ষেতে
উঞ্ছবৃত্তি উপজীবী। ওই শোনো দূরে
সাঁওতাল রমণীরা চোরকাঁটা-ঢাকা
লুপ্ত মাঠ পথ বেয়ে সারি বদ্ধ হয়ে
গান গেয়ে চলিয়াছে। সমস্ত প্রান্তর
সেই ক্লান্ত কণ্ঠ সুরে লভিয়াছে যেন
ভাষা-হারা আকুতিরে। সুদূর পশ্চিমে
নিভে আসা শ্মশানের শেষ দীপ্তি সম
অস্ত লীলা সমাধান। মৌন সন্ধ্যা তারা
নীরব ইঙ্গিত ভরে এনেছে ফিরায়ে
গৃহের শিশুরে যত গৃহের অঙ্গনে।
মনে কি পড়েনা বৎস একদিন হোথা
ওই পল্লী-গৃহকোণে কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহ
এলাইয়া দিতে ? কখনো উৎসব দিনে
নবানীত ধান সূক্ষ্ম শুচি সৌরভেতে
ছড়াইয়া দিত ধরণীর ভালবাসা।
পল্লী বালিকারা যত নবান্ন সন্ধ্যায়
চঞ্চল আলোর মত নাচিত গাহিয়া
চাষের গৌরব গাথা ! আজি সেই সুধা
ঠেলিয়া ফেলিয়া কি গো চলে যাবে তুমি
দুরাশার ছলনায় ? যেয়োনা যেয়োনা।

উশীর

সত্য করে বলি দেবী জন্মেছে ধিক্কার
পর-অন্ন-পরিপুষ্ট এই জীবনের
প্রতি। একান্ত দুর্ব্বল মোরা প্রকৃতির
শিশু ; আপন মাহাত্ম্য যত মিলাইয়া
দিয়া ক্ষীণ প্রতিধ্বনি সম কাঁপিতেছি
ভয়ে ধ্বনির তর্জ্জনী তলে। এই গর্ব্ব
থাক্ মোর, অক্ষম জীবনে লইয়াছি
বুঝে সত্যেরে আপন করি আলোকেতে
মোর। সত্যের সোনার মৃগ চলিয়াছে
ছুটে আলো-ছায়া-সুবিচিত্র জীবনের
বনে—তারেও হেনেছি শর—বিনা প্রশ্নে
তার অন্তরের অন্তঃপুরে নাহি ছিল
প্রবেশের অধিকার কভু। ঘুচাইয়া
ধীরে রহস্য গুণ্ঠন খানি লব আমি
জিনি দুর্ব্বোধের চিত্ততলে যত কিছু
ভাষা নিতান্ত দুরূহ। আমি চাহি জয়।

মৃন্ময়ী

জয়ে সুখ নাহি বৎস প্রেম যদি পাস্
দেখিবি সকল তথ্য হয়েছে সরল
তরল-তুষার সম তপ্ত রবি করে
দূর হিমালয়ে। ধরণীর স্তন হ'তে
শুভ্র দুগ্ধ বাহিরায় স্নেহ আকর্ষণে,
লোভের লোলুপ দৃষ্টি সে শুভ্রতা পরে
আনে রক্তপাত। ধরার ইচ্ছার সনে
তোমার ইচ্ছার কর যোগ—সেই পুণ্য-
সঙ্গমেতে শ্যামল সভ্যতা উঠিবেক
পুনরায়।

উশীর

মিথ্যা তারে ফিরে ডাকা কল্পনা যাহার
দূর-স্বর্ণ সুমেরুর শিখরের শিরে
নির্ণিমেষ চেয়ে আছে সন্ধ্যা তারা সম
চির অস্তহীন। পারিনা ফিরিতে আর।

অংশুমানের প্রবেশ

অংশুমান

ফিরাবো ফিরাবো তোমা হে বন্ধু আমার
এই মোর পণ, স্বর্ণ-চূড় সভ্যতার
ক্ষণিক বুদ্বুদ সহিবেনা অনন্তের
একটি ফুৎকার। সুবর্ণ বাঁশরী-মুগ্ধ
কুরঙ্গের মত তুমি ছুটে চলিয়াছ
নাহি জান কোথা—নাহি জান ফলাফল—
নাহি জান হিরণ্ময় জাদুকরে; আমি
তার হাত হ'তে বাঁচাবো তোমায়।

উশীর

সে চেষ্টা করোনা বন্ধু প্রাণ ভয় আছে।

অংশুমান

মৃত্যুর অধিক মৃত্যু সম্মুখে যাহার
তার কাছে কোন্ ভয়? হে দেবি তোমার
স্বর্ণ ফসলের ক্ষেতে হইবে না কভু
লোভের কলঙ্কপাত। গোধূলি আকাশে
স্বর্ণ-শস্য রাশি যথা সন্ধ্যা এসে ধীরে
তুলি লয় সঙ্গোপনে; সারা রাত্রি ধরি
অনন্ত আকাশ ক্ষেত্রে মেলি দিয়া রাখে
নক্ষত্র-ফসল-কণা। নবীন প্রভাতে
পূর্ব্বাশার পাত্র খানি ভরিয়া যতনে
আনি দেয় ধরাতলে। সেই মত তারে
মৃত্তিকার পাত্র হ'তে অমৃতের রসে
রেখে দিব সঞ্জীবিয়া। সোনার স্বপন
রঙীন কুয়াশা সম নব সূর্য্যোদয়ে
দিগন্তের চক্ষু হ'তে যাবে মিলাইয়া।

সকলের প্রস্থান

৩

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর

উশীর

বিপদের গন্ধ পেয়ে আসিয়াছি ছুটে
পায়ে তব। তব প্রাণ বধিবার লাগি
অংশুমান করিছে মানস—সাবধানে
থেকো।

হিরণ্যাক

প্রাণহত্যা মোর! আমি তো অমর
নাহিকো জগতে জেনো হে গুরু-বৎসল
হেন শস্ত্র হেন শক্র হেন দুঃসাহসী
যে মোরে বধিতে পারে। তবে যদি কেহ
কখনো স্পর্শিতে পারে স্বর্ণ-কাঠি মোর
হ'ব আমি হতমন্ত্র চির জন্ম তরে—
কিন্তু তার জীবলীলা হবে অবসান
অচিরাৎ এও জেনো।

উশীর

তবে চলিলাম।

প্রস্থান

হিরণ্যাক

স্থির লগ্নে আসিবারে করোনা অন্যথা।
ক্ষণেক বিশ্রাম আমি লভিব এক্ষণে।

শয়ন ও নিদ্রা

অংশুমানের প্রবেশ

অংশুমান

ধীরে ধীরে আরো ধীরে শিরায় শিরায়
বহুক শোণিত স্রোত—যেন শব্দে তার
স্বপ্নমান পাখীটিও নাহি জাগে শাখে।

ওই শুভ্র জ্যোৎস্না রাশি আকাশ ব্যাপিয়া
পক্ক-ধান্য ক্ষেত্র সম পুঞ্জ সুধাভারে
স্বর্ণ-শীর্ষে আনমিত। পরিপূর্ণ চাঁদ
স্বপ্ন-সূক্ষ্ম জ্যোৎস্না-জাল দিয়েছে ছড়ায়ে
ধরণীর কোণে কোণে—চাহিছে হাসিয়া
অঘ্রাণের ভরা ক্ষেতে। নীড়গ হাঁসের
পক্ষচ্যুত শিশিরাম্বু ঝরিয়া ঝরিয়া
উঠেছে কোমল হ'য়ে শ্যাম শষ্পদল
এতক্ষণে—তারি কোন দূর গ্রাম-গৃহে
সন্ধ্যা-তারা-আমন্ত্রিত পল্লী-বালিকারা
দেখায়ে সায়াহ্ন দীপ বাস্তু-বেদীমূলে
খুলিয়া দিয়াছে কণ্ঠ। সেই সব কথা
এখনি স্বপন বলে হতেছে প্রত্যয়।
বন্ধ কর ক্ষণতরে জ্যোতি-বৈতালিক
হে গ্রহ-চন্দ্রের দল। মুহূর্ত্তের তরে
অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে মুগ্ধ মহাকাল
দাঁড়াক ভুলিয়া পথ—বুক ভরে লই
অঞ্চল-বীজিত এই শেষ সমীরণ
জীবধাত্রী বসুধার—চোখ ভরে লই
পদ্মবন-স্বপ্নলীন এই আলোখানি
শেষতম পূর্ণিমার—নাসিকায় লই
শিশির-তৃষিত এই প্রাচীন ধরার
সুধামৃদু গন্ধটুকু—লাগুক শরীরে
রাতের গুণ্ঠন খানি—দুই হস্তে ধরি—
চক্ষে ধরি বক্ষে ধরি আনম্র মস্তকে
এই তৃণ এই ধূলি এই ফুল দল—
এই যত মূক সঙ্গী যুগযুগান্তের
একান্ত আপন বলি। আবার একদা
এমনি অঘ্রাণ রাতে শস্য সমারোহে
যখন আসিব ফিরে—দেখিব রয়েছে
বহুজন্মবন্ধু সব পরিচিত মুখে
কোমল প্রতীক্ষা মেলি। আজিকে বিদায়—
ওই যে ঘুমায় পড়ি মুগ্ধ জাদুকর—
ওই যে সোনার কাঠি—নিতে হবে তাই
আজন্মের অন্ন-ঋণ পুণ্য বসুধার
শোধ করি দিব—কিছু রাখিব না বাকি।

সোনার কাঠি গ্রহণ ও প্রস্থান

উশীরের প্রবেশ

উশীর

শুভ লগ্ন সমাগত; মূক প্রকৃতির
আজন্মের অন্নপাশ স্বহস্তে ছিঁড়িয়া
জ্বালায়ে সুখের গৃহ—আসিয়াছি দীক্ষা
লাগি।

হিরণ্যাক

সিদ্ধি কর লাভ। মধ্য রাত্রি বটে!
সন্ধ্যার কাটিয়া ঘোর নভতলে জ্বলে
প্রস্ফুট তারকা রাশি শিশির-মার্জ্জিত।
খসিয়া পড়িয়া গেছে যে কয়টি তারা
দুলেছিল অলকেতে দিক্-বধূদের
এতক্ষণে। রক্ত-আঁখি চাহিয়া মঙ্গল
ক্লান্তি মাখা; ধ্রুবতারা চির অনিমিখ;
পীতচ্ছটা বৃহস্পতি অনন্ত তিমিরে
চেয়ে আছে অন্তর্যামী যেন; ভরা চাঁদ;
ওই দেখ উল্কাপিণ্ড চলেছে সাঁতারি
অগাধ শূন্যের তলে—পশ্চাতে রাখিয়া
নীলপীত ক্ষীণচিহ্ন—মিলায় মিলায়
জলে রেখাটির মত।—আর দেরী নয়।
তোমারে করুক রক্ষা হে বৎস আমার
এই শুভ স্বর্ণমন্ত্র পণ্য প্রকৃতির
শস্যের দাসত্ব হ'তে। নিজ বাহুদ্বয়
একান্ত সম্বল হোক্—শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি নিজ।
এস বৎস!

সোনার কাঠি গ্রহণে উদ্যত

এই মোর স্বর্ণকাঠি! কই!
একি! নাই! দেখি দেখি—একি সর্ব্বনাশ!
কে নিয়েছে? রক্ষা নাহি তার! কোন্ সাহসিক!
জীবন নিশ্চিত তার!

উশীর

একি পরিণাম!

হিরণ্যাক

পরিণাম তোমার কি? স্বর্ণ রবি করে
সুধা-উদ্ভাসিত মেঘ অস্ত-অবসানে
আপন তমিস্রামাঝে যেমন বিলীন
আমি সেই মত!

উশীর

আর আমি!

হিরণ্যাক

থামো থামো!
আজ হ'তে আমি হতজ্যোতি তারাসম
তিমির-চরণে আপনার অদৃষ্টেরে
ঘুরিয়া মরিব তৃপ্তিহারা আবর্ত্তনে
খ্যাতি দ্যুতি হীন।

উশীর

আর আমি আমরণ
শস্য-কাটা ক্ষেতে উঞ্ছ-ভুক্ বায়ুসম
ফিরিব মাতিয়া আপনার ব্যর্থতায়
হা হা অট্টহাসি!

হিরণ্যাক

দূর হও—হেথা হ'তে!

উশীর

তাই হ'ব তাই হ'ব—করেছ আমারে
পাষাণের মত তুমি! কি আছে আমার
আজ—গেছে গৃহ ক্ষেত—স্নেহের বন্ধন
গেছে সব—আমি আজি আমার কঙ্কাল।

হিরণ্যাক

তোরি লাগি আজি মোর এই সর্ব্বনাশ
তুই পুন দোষ দিস্—দুরূহ পাষাণ!

উশীর

এখনো সময় আছে। জননীর স্নেহ
সে তো নহে মায়া দণ্ড—সে যে অন্তহীন
ধ্রুবনক্ষত্রের মত দুঃখের শিখরে
চির রাত্রি জাগরূক্। অয়ি মাতৃ ক্রোড়—

প্রস্থান।

হিরণ্যাক

অন্ধকার অন্ধকার এই জীবনের
চারিভিতে স্পন্দমান অন্ধকার এক
অমেয় অসীম। কে জেনেছে তত্ত্ব তার—
কে পেয়েছে বল তলে তার পৌঁছিবারে!
আজি যারে সত্য বলে জেনেছে সবাই
কালি সে মিথ্যার মিথ্যা। চির সত্য নামে
কিছু নাই; আজিকার সত্য—কালিকার
সত্য—চলিতেছে এই মত। কল্পনার
চোরাবালি পরে দাঁড়ায়ে জগৎখানি।
একদিন নড়ি গিয়া ভিত্তি কল্পনার
চুর চুর ভেঙে পড়ে গ্রহ তারাময়
বিশ্ব অট্টালিকা। ফিরে আসে আর বার
সেই মহা অন্ধকার আদিম অগাধ।

প্রস্থান

৫

রাত্রি তৃতীয় প্রহর

মৃন্ময়ী

প্রত্যাশার মরুস্থানে বসিয়া বসিয়া
সময় বহিয়া গেল—বালু-ঘাটিকায়
উৎপতিত বালুসম—অবশেষে দেখি
ক্লান্ত সন্ধ্যা তারকাটি দগ্ধ দিগন্তরে

মরুর পথিক সম বহে নিয়ে এলো
দুখের বারতা। এত কাজ চারিভিতে :
একটি জীবন ; এত প্রেম চরাচরে :
একটি অঞ্জলি ; এত লক্ষ্য দশদিকে :
তূণীরে একটি শর ; তবে তাই দিয়ে
প্রত্যক্ষ সত্যেরে হেনে চলে যাই হেসে
লোকান্তরে। হে দুর্ভাগা বৎসগণ ওরে
তোদের দেবোনা যেতে বিলয়ের স্রোতে—
এ প্রাণ থাকিতে মোর—তোদের জীবনে
আমারে অজস্ররূপে ফিরে পাবো মনে
এই আশা রয়ে গেল। হয়েছে সময়
মধ্য রাত্রি সমাগত—নিজ প্রাণ দিয়ে
আনিব হরণ করে স্বর্ণকাঠিটিরে
বৃদ্ধ জাদুকর হ'তে—

[অংশুমানের প্রবেশ]

অংশুমান্

দেবী তব জয় !

মৃন্ময়ী

একি অংশুমান্—

অংশুমান্

দেবী তব জয় হোক্।
এই সে সোনার কাঠি এনেছি হরিয়া—

মৃণ্ময়ী

একি সর্ব্বনাশ করিয়াছ অংশুমান্

অংশুমান্

আমার সময় শেষ। ক্লান্ত শশধর
পদ্মবন মধু-রক্ত প্রৌঢ় হংসসম
মন্দাকিনী তীর ত্যজি মন্থর ডানায়
নামিতেছ ধীরে ধীরে কপোত-ধূসর
জাহ্নবী পুলিনে বুঝি—এখনি পূরবে
পারাবত পদরক্ত পূর্ব্বরাগ রেখা—
দেখা যায় ;—নাহি তব কোনো ভয় সখা ;
ক্ষয় তব হবে স্নানে পুন সুনবীন।
শুক্ল-দ্বিতীয়ার দোলা একদা আবার
তোমারে আনিয়া দিবে দিক্-বধূদের
কোমল কোলেতে। মোর কিবা আশা আছে !
তুমি চাঁদ যুগে যুগে ধরারে ঘিরিয়া
নব নব পূর্ণিমায় গাঁথিবে মালিকা
জ্যোৎস্নায় মৃণাল-ডোরে। স্মরিও তখন
একান্ত আশ্রয়হীন স্বপ্নগুলি মোর।
এ জীবনে এরা সখা পেলোনাক ফল
পেলনা নির্ভর কোনো—অবজ্ঞার শর
বিঁধেছে হানিল শুধু মর্ম্মে ইহাদের।
তুমি বলো কানে কানে প্রাণে ইহাদের—
হেন লোক আছে যেথা চরম প্রত্যয়ে
ইহারা বিশ্রয় পাবে—চাঁদ চির চাঁদ।

[উশীরের প্রবেশ]

উশীর

দেবী তব হোক্ জয় সোনার বুদ্বুদ
মুহূর্ত্তে ফাটিয়া গেছে। আসিয়াছি ফিরে—
কিন্তু একি ! অংশুমান্ !

অংশুমান্

নাহিকো সময়—
ভ্রমান্ত হয়েছে তব সেই সান্ত্বনায়
নিলাম বিদায় !

উশীর

তুমি বুঝি আনিয়াছ
জাদুকাঠিখানি। বন্ধু, মোর হয়ে তুমি
যে দণ্ড করিলে ভোগ বেঁচে থেকে তার
প্রায়শ্চিত্ত হবে—মৃত্যু নহে—বেঁচে থাকা
সেই দণ্ড মোর।

অংশুমান্

যে ধূলিতে রক্ত মোর
মিশিতেছে আজ তারি পরে রেখো সখা

অসীম বিশ্বাস। প্রাণ দেবতার সে যে
অমর-আলয়। সে ধূলি শ্যামল কভু—
নবধান্যদলে; সে ধূলি বিচিত্রবর্ণ
বন পুষ্পরাগে; সে ধূলি গোধূলি নভে
ক্ষণিক মাণিক; লক্ষ আশা-আশঙ্কায়
বক্ষে মানবের সে ধূলি রচিছে নিত্য
কল্পস্বর্গলোক। শুভ্র ছায়াপথখানি
অনন্তের ভালে তাহারি তিলক লেখা।
এ ধূলি মিশিয়া যাক্—নাহি তাহে ক্ষতি
আবার ফিরিয়া পাবে হে বন্ধু আমারে
বর্ষে বর্ষে অঘ্রাণের নবান্ন উৎসবে।

(মৃত্যু)।

মৃন্ময়ী

ডুবিছে ওষধিপতি জাগে নব রবি
মিশিছে জ্যোৎস্নার সাথে অরুণ কিরণ।
উদয়াস্ত গিরিছায়া উভয়ে আসিয়া
সঁপিল আশিস্ হস্ত অংশুমান্ শিরে।

উশীর

উষার ধূসর পথে ওই দেখা যায়
চলিয়াছে কৃষকেরা ফসলের ক্ষেতে
শূন্য ডালা ভরিবারে। শিশির-সিঞ্চনে
উঠেছে কোমল হ'য়ে ব্যগ্র পদতল
তাহাদের; নবধান্য গুচ্ছ দিয়ে সখা
ঢেকে দিব সব ক্লান্তি তব জীবনের;
মালতী শেফালি ঘন করবী সম্ভারে
সাজাইয়া দিব তোমা জয়যাত্রা পথে।
বেঁধে দাও শ্যামরাখী ধরণীর সাথে
মানবের হাতে হায়—গাহ মুক্ত স্বরে
নবান্ন নবীন হোক্ দেবী তব জয়।

স্বদেশী মানচিত্র

ভারত আমার দেশ উত্তরে বিরাজে হিমালয়,
পূরবে পশ্চিমে রাজে পয়োনিধি দক্ষিণে মলয়।
আরব চীন সিংহল যবদ্বীপ তাহার বাহিরে।
নীচে রহে রসাতল ভর করি অনন্তের শিরে॥
উপরে দ্যু, দ্যুতিমান ব্রহ্মলোকে লভয়ে মহিমা।
রোগ শোক জরা পরশিতে নারে যাহার ত্রিসীমা॥

মানচিত্রের দিগ্‌দর্শনী

যাত্রাকালে আর্য্যদের পূরবে পড়িল পূর্ব্ব দিক,
পশ্চাতে রহিল পড়ি পশ্চিম একথা খুব ঠিক।
পূরব পশ্চিম অগ্রপশ্চাৎ প্রাচী ও প্রতীচী
একই কথা; না বুঝিয়া মূঢ় জন বকে মিছামিছি।
উত্তর উদীচী দুইই শিরে ধরি উৎ উষ্ণীষ।
সূচয়ে উচ্চ প্রদেশ ভনে দ্বিজ শবদ বাগীশ॥
সামনে বাগে পড়িল উদয় গিরি বামে হিমধাম।
বাঁ দিক লভিল তাই উত্তর উদীচী দুই নাম॥
কাজেই দক্ষিণ দিক পড়িল ডাহিন হাত বাগে,
অবাচী আর এক নাম দক্ষিণের কানে ভাল লাগে,
অব উপসর্গ নিম্নবাচক বাগীশ জন কহে।
উচ্চ নীচ ভূমি বাগে উদীচী অবাচী—মিথ্যা নহে।

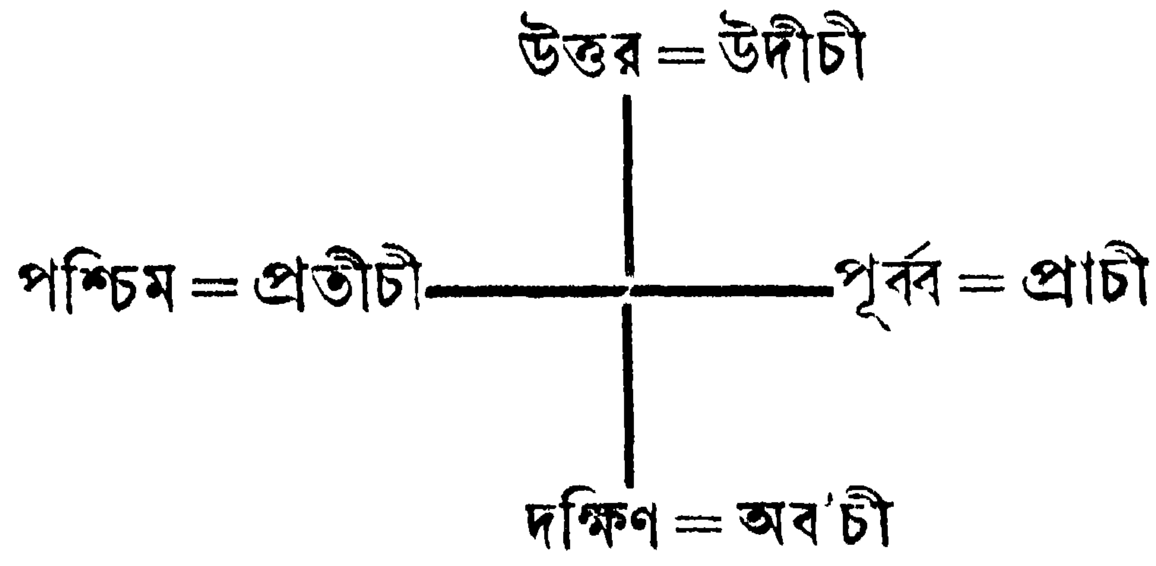

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলের যুগ

কলের কলি-থেকে গাত্রোত্থান।
নিষ্ফল সত্যে পর্য্যবসান॥

চৌদিকে অকুল সিন্ধু বন্ধ হল পবন সহসা,
বুদ্ধি ভাবি আকুল, কি হবে মোর তরণীর দশা?
"ধনে প্রাণে মরিব গো" বলে বুদ্ধি হইয়া হতাশ।
বিধাতার কৃপায়, সপ্তাহ পরে উঠিল বাতাস॥
বুদ্ধির আননে দেখা দিল হাসি, ঘুচি গেল দুখ,
পাইল্ পেয়ে ধাইয়া চলিল তরী ফুলাইয়া বুক।
কূলে পঁহুছিল যবে তরণী, লাগায়ে কারিকর।
বিরচিল ধোঁয়া কল বুদ্ধি হ'য়ে বদ্ধ পরিকর॥
মেদিনী পুরিল কলকারখানা হ'য়ে দুর্নিবার;
সুখীর বাড়িল সুখ, দুঃখীর বাড়িল দুঃখ ভার।
চাষীর মাথায় পশি সর্ব্বনেশে দুরাশার নেশা,
হইতে লাগিল ইহ পরকাল ধূম যন্ত্রে পেষা।
চলিতে লাগিল রেলশকট বিকট মূর্ত্তি ধরি,
বিষ ভরা কৃষ্ণধূমে উদ্ভিদের প্রাণবধ করি।
দেশ ছেড়ে পলাইল গিরি নদী বনদেবতারা।
কলের পীড়নে ভাগীরথী গেল শুকাইয়া মারা॥
দূষিত হইয়া বায়ু বন্ধনে পড়িয়া নদী নালা
স্বাস্থ্য হল শব শিব, নৃত্যকালী হল জ্বরজ্বালা।
ভয়ঙ্করী কোটিঘ্নী-যোজনান্তরে করি বজ্রপাত।
সহর নগর গ্রাম নিমেষে করিল ভূমিসাৎ॥
টকরা টকরি দ্বন্দে মেদনী হইলে হুলুস্থুল,
লাভ্যের লোভনে পড়ি দুরবুদ্ধি হারাইল মূল।
"বিষম সমস্যা" বলে বুদ্ধি, "হালে নাহি পায় পানি"
সর্ব্ব আর শ্রবণে পশিল তার দৈব এই বাণী॥
"লয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দেশ সুদ্ধ যখন গৃহস্থে।
এক পুত্র, এক কন্যা সঁপি দিয়া পৃথ্বীমার হস্তে॥
সুখে কাটাইবে কাল ব্রহ্মানন্দরস করি পান,
সময় হইলে আর ব্রহ্মলোকে করিবে প্রয়াণ।
এখন যা' ভাবিছ শুধু কেবল, কবির স্বপন,
নিরখিবে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে নয়নে আপন॥"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সপ্তম অধ্যায়

চতুর্থ পঞ্চম অধ্যায়ে এই তত্ত্বটি আমি বিবৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম যে সাধক ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিলে তবেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অধিকারী হন আর সেই প্রসঙ্গে ঈঙ্গিতছলে এই একটি কথা বলিয়াছিলাম যে সোপাধিক ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভব, নিরুপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না। পাঠক যেন ভুল না বোঝেন—এরূপ না বোঝেন যে নিরুপাধিক ব্রহ্ম স্বতন্ত্র এবং সোপাধিক ব্রহ্ম স্বতন্ত্র। এক ব্রহ্ম আপনাতে আপনি নিরুপাধিক ভাবে এবং নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সোপাধিক ভাবে নিত্য নিয়ত বর্ত্তমান। উপনিষদ শাস্ত্রে দুই স্থানে দুইটি সার মন্ত্র বচন সন্নিবেশিত হইয়াছে প্রথমটি হচ্ছে "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম", দ্বিতীয়টি হচ্ছে আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি। স্বরূপতঃ তিনি সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্—অনন্ত সত্য এবং জ্ঞান সেই অনন্ত ব্রহ্মকে সহস্র বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিলেও সাধক আপনার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিমনের আয়ত্তের মধ্যে কোন ক্রমেই প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে ধরিতে গিয়া পরাভব মানিয়া ফিরিয়া আসে। সেই অনন্ত ব্রহ্মের যতটুকু প্রসাদামৃত আমরা আমাদের বুদ্ধিমনের অঞ্জলিপুটে পাই তাহা দ্বারা উপাসনাদি কার্য্য বিহিত মতে সাধন করা ব্যতিরেকে ভক্ত সাধকের উপায়ান্তর নাই।

ইহার অব্যবহিত পরেই তাই দ্বিতীয় বেদ মন্ত্রটি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তাহার বাংলা অনুবাদ এই যে —"আনন্দরূপে অমৃতরূপে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন।" তাঁহার সেই প্রকাশ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর দেদীপ্যমান, আর সেইজন্য সাধকের পক্ষে তাহা সবিশেষ ফলপ্রদ। উপনিষদে আছে নতত্রসূর্য্যোভাতিনচন্দ্রতারকম্ নেমাবিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্ বিভাতি। সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না চন্দ্র তারা প্রকাশ পায় না এ অগ্নি কোথাকার কে? একা কেবল পরমাত্মাই স্বয়ং প্রকাশ, আর এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই স্বয়ং প্রকাশেরই অনুপ্রকাশ। একজন অভিনব ব্রতী সাঁতার শিখিবার সময় যেমন সোলায় ভর করিয়া সন্তরণ অভ্যাস করে সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের যাত্রীরা সচরাচর কোন না কোন দৃশ্যমান উপাধি অবলম্বন করিয়া তন্মনভাবে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হন।

জিজ্ঞাসু॥ মহাজোরের সহিত তুমি এই যে বলিতেছ যে পরমাত্মার প্রকাশ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেদীপ্যমান, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য একজন জ্যোতির্ব্বিদ মহাপণ্ডিত তাহার পরিবর্ত্তে আর এক কথা বলিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন যে আমি সমস্ত আকাশ দূরবীক্ষণ দ্বারা আপাদ মস্তক ঝাঁটাইয়া দেখিয়াছি যে ঈশ্বরের নাম গন্ধও কোথাও নাই; তাঁহার কথা একটা সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, তোমার কথা একটা কপোল কল্পিত সিদ্ধান্ত মাত্র।

প্রবোধয়িতা॥ তোমার বৈজ্ঞানিক মহাপণ্ডিতটি যদি ঈশ্বরকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া থাকেন দূরবীণ কষিয়া কি তিনি তবে দেখিয়াছিলেন?

জি॥ তিনি গ্রহ চন্দ্র তারা দেখিয়াছিলেন, সূর্য্য দেখিয়াছিলেন, এবং জগতের আদিম নভুল পদার্থ (Nebulous matter) দেখিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত আর কিছুই দেখেন নাই।

প্রবোধয়িতা॥ ঐ যে সকল জ্যোতিষ পদার্থ তিনি দেখিয়াছিলেন বলিতেছ তাহা কি বাস্তবিক সত্যপদার্থ না তাহা কেবল তাঁহার মনের একটা কল্পনা?

জিজ্ঞাসু॥ তাহা বাস্তবিক সত্য তাহাতে আর ভুল নাই।

প্রবোধয়িতা॥ যাহাকে তুমি এবং তোমার গুরু জ্যোতির্ব্বিদ মহাপণ্ডিত উভয়ে একবাক্যে বলিতেছ "বাস্তবিক সত্য" তাহা কি আকাশস্থিত বিশেষ কোন একটি বা একাধিক জ্যোতিষ পদার্থের ধর্ম্ম অথবা নিখিল দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম।

জিজ্ঞাসু॥ অবশ্য তাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম।

প্রবোধয়িতা॥ সেই যে বাস্তবিক সত্য যাহা তুমি এবং তোমার গুরু উভয়ে তোমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়াছ তাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথায় দেখিয়াছ? তাহা চর্ম্ম চক্ষে দেখিয়াছ না মনশ্চক্ষে দেখিয়াছ? স্বপ্নেও তো উভয়েই তোমরা নানাবিধ দৃশ্য দেখিয়া থাক, কিন্তু তাহাকে তোমরা অবাস্তবিক বলিয়া উড়াইয়া দাওই বা কেন আর জাগ্রত কালের দৃশ্যমান বস্তু সকলকে অকাটা বাস্তবিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করই বা কেন? তোমাদের এরূপ কার্য্য কি এক যাত্রায় পৃথক্ ফল নহে?

জিজ্ঞাসু॥ নিদ্রাভঙ্গ হইলেই স্বপ্নগত বস্তু সকলের নাম গন্ধও অবশিষ্ট থাকে না, পক্ষান্তরে, জাগ্রতকালের দৃশ্যমান আকাশস্থিত জ্যোতিষ্পদার্থ সকল আজিও যেমন কালিও তেমনি, মাসান্তে ও তেমনি; বৎসরান্তেও তেমনি, যুগ যুগান্তেও তেমনি নিরন্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং থাকিবে।

এইজন্যই বলি যে স্বপ্নের বিষয় সকল অবাস্তবিক সত্যাভাস আর জাগ্রতকালের আকাশস্থিত জ্যোতিষ্পদার্থ সকল বাস্তবিক সত্য।

প্রবোধয়িতা॥ এটা যখন উভয়েই কেহই তোমরা মান না যে শরীরের মৃত্যুতে মনুষ্যের আত্মার মৃত্যু হয় না তখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন স্বাপ্নিক পদার্থ সকল লোপ পাইয়া যায় তেমনি প্রাণ বিয়োজিত হইয়া গেলেই দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই তোমাদের মতে তোমাদের নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করে। দুয়ের মধ্যে অস্থায়ীতা অবিকল সমান—কেবল ছোট বড়র প্রভেদ।

জিজ্ঞাসু॥ তোমার এ কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে। ধরিতে গেলে সমস্ত জগত সংসার একটা মহাশূন্য এবং যাহা শূন্য হইতেও অধম সেইরূপ একটা অলীক আড়ম্বর বই আর কিছুই নহে।

প্রবোধয়িতা॥ দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি অলীক আড়ম্বরই বল আর বাস্তবিক সত্যই বল তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, তোমার নিকটে আমার জিজ্ঞাস্য কেবল এই যে প্রথমে তুমি এই যে বলিলে "সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা মহাশূন্য, সেই অগাধ মহাশূন্য হইতে দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতেই বা আসে কেমন করিয়াই বা আসে?

জিজ্ঞাসু॥ সত্য কথা বলিতে কি দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে কোথা হইতে আসে এবং কেমন করিয়া আসে তাহার বাষ্পও আমি জানি না এবং আমা অপেক্ষা শত সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বা তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত যে তাহার বাষ্পও জানেন তাহা আমি বিশ্বাস করি না।

প্রবোধয়িতা॥ তুমি যে কি বিশ্বাস কর না তাহা আমি জানিতে চাহি না, তুমি যে কি বিশ্বাস কর সেইটিই তোমার নিকটে আমার জিজ্ঞাস্য।

জিজ্ঞাসু॥ আমার জাগরিত অবস্থায় আমি যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি সমস্তই বাস্তবিক সত্য এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

প্রবোধয়িতা॥ তাহা যদি তুমি বিশ্বাস কর—বাস্তবিক সত্যে যদি তুমি বিশ্বাস কর তবে তোমার ভয় কিসের?

জিজ্ঞাসু॥ তুমিও যেমন আমিও তেমনি একটা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র উপদ্বীপের উপরে বাস করিতেছি; তাহার দশদিক প্রগাঢ় অন্ধকারে পরিবেষ্টিত, অথচ তুমি আমাকে অম্লান বদনে বলিতেছ যে তোমার ভয় কিসের! ইহাতে আমি হাসিব কি কাঁদিব ভাবিয়া পাইতেছি না।

প্রবোধয়িতা॥ তুমি যদি আমার কথাটা একটু মনোযোগের সহিত শোনো তা'হলে তুমি এটা অন্তত বুঝিতে পারিবে যে তোমার ভয় ঘুচান তোমার নিজের হস্তে নির্ভর করিতেছে। মনে কর তুমি একটা বিজন প্রদেশে অন্ধকারময় ঘরে প্রবেশ করিয়া ভয়ে আক্রান্ত হইয়াছ, কিন্তু এটা তুমি নিশ্চিত জান যে সেই ঘরের একটা কোণে তৈলপূর্ণ প্রদীপ রহিয়াছে, প্রদীপটা এবং তাহার সল্তে গাছি দুইই মৃত্তিকা জাত পদার্থ, তৈল এবং সলতে উভয়েই জল মৃত্তিকার বিকার জাত পদার্থ, সুতরাং জল মৃত্তিকারই সামিল এই জল মৃত্তিকার মধ্যে অদৃশ্য অগ্নি (বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে বলেন সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বান্তর্যামী তাপপদার্থ সেই অদৃশ্য অগ্নি) বর্ত্তমান রহিয়াছে। তুমি যদি তোমার জামার থলির মধ্য হইতে দীপশলাকোষ বাহির করিয়া তাহার একটা শলা ঘসিয়া প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেই প্রদীপটার সলতের মুখে ছোঁয়াইয়া প্রদীপের অন্তর্গত অদৃশ্য অগ্নিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলো, তাহা হইলে তোমার ভয়ের কারণ সেই যে প্রগাঢ় অন্ধকার তাহা পলাইতে পথ পাইবে না। এ যেমন দেখিলে তেমনি তোমার জাগ্রত কালীন দৃশ্যমান বিষয় সকলের বাস্তবিক সত্তার উপরে তোমার সেই যে দৃঢ় বিশ্বাস তাহাতে যদি গীতাদি শাস্ত্রোক্ত উপদেশাগ্নি ছোঁয়াও—তাহা হইলে তোমার অন্তর্নিগূঢ় অজ্ঞানান্ধকার নিমিষের মধ্যে অপসারিত হইয়া যাইবে তাহাই তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তা বই হাল ছাড়িয়া দিয়া কাঁদুনী গীত গাওয়া সৎপুরুষোচিত কার্য্য নহে।

জিজ্ঞাসু॥ তুমি আমাকে কি করিতে বল?

প্রবোধয়িতা॥ আগামীবারে সমস্তই তোমাকে খোলসা করিয়া বলিব। মাঝের কটা দিন তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অগ্রাণী

স্তিমিত-তারার দেশে কোন দূর নিশীথ-নভসে
তব রাজধানী।
অবসন্ন শেফালিকা বিদায়ের বিষণ্ণ প্রদোষে,
শিশির-কুণ্ঠিত প্রাতে গন্ধাতুর যেই প'ল খ'সে'—
আসিলে অগ্রাণী।

কাঁপি ওঠে জ্রবঙ্কিম কাননের বসন প্রান্ত রে
পরশন জানি
শস্য-কাটা শূন্য-ছবি উদাসীন প্রাচীন প্রান্তরে
অকস্মাৎ দিয়ে ফেলি লয়হারা মোর প্রাণ তোরে
অলস্যা অঘ্রাণী।

উতলা কুন্তলে তব একগুছি ধানের মঞ্জরী
দোলে শীষখানি,
নিটোল আঙুলে তব পদ্ম এক হিমে ঝরি-ঝরি,
কুয়াশা-অঞ্চলতলে তনুলতা উঠিছে শিহরি
হে তন্বী অঘ্রাণী।

আতপ্ত অঞ্চলে স্নিগ্ধ রৌদ্রখানি এনেছে বহিয়া
তব দুটি পাণি,
ঝরে-পড়া শেফালির বোঁটা দিয়ে মালাটি গাঁথিয়া,
সুপ্ত নূপুরের স্বপ্নে দিকে দিকে নিদ্রা বিথারিয়া
এসেছ অঘ্রাণী।

আপক্ক ধান্যের ক্ষেতে সুধাভারে আনম্র ফসলে
লঘু পদ হানি
হিমোৎসুক নগ্নমাঠে নবান্নের মায়া মন্ত্র বলে
সঞ্চারিয়া গ্রামে গ্রামে সঞ্জীবিয়া এস এস চলে
হে লক্ষ্মী অঘ্রাণী।

বিশ্বকর্ম্মা

গ্রহ-সূর্য্যের লক্ষ চাকায় ওই কে হাঁকায় রথ!
কালে কালে আর ভুবনে ভুবনে পড়েছে কাহার পথ!
অতীত যাহার সম্মুখে চলে পিছনে ভবিষ্যৎ!
বিশ্বকর্ম্মা রাজ
জগতে বাহির আজ!

কালের হাতুড়ে পিটিছে কে ওই আকাশের ইস্পাত
লক্ষ তারকা ফুলকি সমান চৌদিকে উৎখাত
মহাকাল কেঁপে ওঠে খনে খনে শুনি সে শব্দপাত!
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

অস্ত্র যাহার শাণাবার তরে মেঘের পাথর ওই
গগন-ধনুতে বিদ্যুৎ-ছিলা কর্ম্ম-কাতর ওই
ধূমকেতু যার নীল অম্বরে লম্বিত মহা মই!
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

তপ্ত রক্ত লক্ষ চক্র আকাশে ঘুরিছে যার
কুট-নিঃশ্বাস জটিল মেঘেতে উঠিছে কারখানার—
পাথর-গলানো লৌহ-টলানো ভীষণ বহ্নি ধার!
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

সপ্ত সাগরে লক্ষ ঢেউয়ের অসংখ্য মজুরেরা
বহ্নি-বিলাসে ছুটিয়া চলেছে লঙ্ঘি তটের বেড়া
হাতুড়ির ঘায়ে পাথর ভাঙা যে সকল কাজের সেরা!
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

প্রলয়ের স্রোত চলেছে ছুটিয়া; সৃষ্টির দুটি তীর
প্রবল প্রেমের বাহু বন্ধনে বাঁধিয়া রেখেছে স্থির;
ভাঙনের শাখে বাসা কেন হায় জীবনের পাখীটির!
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

লক্ষ লোকের বাসনারে লয়ে পোড়ায়ে করিছ খাঁটি,
অশ্রু-সলিলে ভিজায়ে ভিজায়ে মরুরে শ্যামল মাটি,
মনের কোনেতে ছোট নীড়খানি গড়িতেছ পরিপাটি!
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

পাহাড়-ধসানো হাতে গাথা তব ঝুমকো ফুলের মালা
লক্ষ ভুবন গড়িয়া তোমার মেটেনি বুকের জ্বালা

তাই নিরজনে সাজাও বসিয়া ফাগুনের ফুলডালা
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ

একি অদ্ভুত কঠিন পাথর ভাঙিছ বজ্র-বলে,
মনের সহিত মনটি মিশায়ে দিতেছ কি কৌশলে,
এক হাতে তব প্রলয়-হাতুড়ি অন্য হাতের তলে
শিরিষ ফুলের সাজ
বিশ্বকর্ম্মা-রাজ।

বাঁধ

কেন তুমি অমনভাবে চুপটি করে রও,
বাঁধের কালো জল!
থাকলে কিছু গোপন কথা আমার কানে কও,
বাঁধের কালো জল!
আকাশ পানে নয়ন হানি দেখ্‌তে চাহ কারে,
নয়ন-কালো জল।
কোন্ সে প্রিয় নামটি তুমি বল্‌ছ বারে বারে,
নয়ন-কালো জল!
কিসের লাগি খুঁড়ছ মাথা চারটী কূলে তব,
অয়ি অগাধ-বোবা!
মাটির কানে কোন্ বারতা ঢাল্‌ছ অভিনব,
অয়ি অগাধ বোবা!
দুপুর বেলা স্নানের লাগি আস্‌ছে যারা হায়
—প্রশ্ন-পিয়াসিনি—
তাদের কাছে তোমার হিয়া জান্‌তে কিবা চায়?
প্রশ্ন-পিয়াসিনি!
পঙ্ক ফুঁড়ি যে পঙ্কজ তোমার জলে ফোটে,
ঊর্ম্মি-শিহরিনি
সেও কি কিছু তোমার কানে বলেই নাগো মোটে,
ঊর্ম্মি-শিহরিনি।
প্রশ্ন হেথা সবাই করে জবাব দিতে কেউ
—তরল-নিশিথিনী—
নাই গো; তবে সবাই কেন জাগিয়ে দেবে ঢেউ,
তরল-নিশিথিনী।
শ্যাওলা-ঘন তোমার কূলে তপ্তমাথা থুয়ে
বন্ধু-প্রিয় জল
প্রলাপ তব শ্রোত্র-পেয় শুন্‌বো আমি শুয়ে,
বন্ধু-প্রিয় জল।

আশ্রম সংবাদ

বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে আশ্রমের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় গত আশ্বিন মাসে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ আশ্রমের সহিত চিকিৎসা-সূত্রে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি অনেক সময় নিজের পশারের ক্ষতি করিয়া আশ্রমের কাজে ব্যয় করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ছাত্রদিগকে শারীরতত্ত্ব ও First aid শিক্ষা দিতেছিলেন—এই কাজেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহার এই অকস্মাৎ মৃত্যুতে আশ্রমবাসিগণ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।

বিদেশ হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে ডাক্তার শ্রীমান শ্যামকান্ত গোবিন্দ সর্দ্দেশাই সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আশ্রমের একজন প্রাক্তন ছাত্র; আশ্রম হইতে ১৯১৬ খৃঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাইতে বি, এস, সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। কয়েক বৎসর পুর্ব্বে জার্ম্মাণীতে রসায়ন শাস্ত্র পড়িতে যান। বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে

ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন। ইতিমধ্যে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আসেন—সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিশ্বভারতীতে ইটালিয়ান ভাষা শিখাইবার জন্য ইটালি গভর্মেণ্ট অধ্যাপক টুচিকে প্রেরণ করিয়াছেন। অধ্যাপক টুচি বিশ্বভারতীতে দুইটি শ্রেণীতে উক্ত ভাষা অধ্যাপনা করিতেছেন—তিনি আশা করেন চারি মাসের মধ্যে ছাত্ররা চলনসই রকমের শিখিতে পারিবে।

গত মাসে খবর দিয়াছিলাম অধ্যাপক ফর্মিকী বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক শনিবারে "Dynamic Development of the Indian Religions from the Rig Veda to Buddhism" নামে একটি বক্তৃতা ধারাবাহিক ভাবে দিতেছেন। এতৎব্যতীত তিনি বিশেষজ্ঞদের সহিত অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও কামন্দকীর নীতিশাস্ত্র পড়িতেছেন।

গত ২৪শে নভেম্বর বাংলার লাট লর্ড লিটন ও তদীয় পত্নী পরম পূজনীয় আচার্য্যদেবের অতিথি হইয়া আশ্রম দেখিতে আসিয়াছিলেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আশ্রমে আসিয়া দুইদিন বাস করিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি পাঠ ভবনের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। পৌষ উৎসবের পর হইতে পাঠ-ভবনের নূতন বৎসর সুরু হইবে।

পৌষ উৎসবের পরে ভ্রমণের জন্য এক সপ্তাহের অবকাশ থাকে। সেই সময় ছাত্ররা নানা দলে বিভক্ত হইয়া নানা দিকে বেড়াইতে যায়।

পৌষ-উৎসব আসিয়া পড়িয়াছে। এই আশ্রমের চতুর্বিংশতিতম জন্মতিথি। এই উপলক্ষে স্বয়ং আচার্য্যদেব আশ্রমে উপস্থিত থাকিবেন। ৭ই, ৮ই, ৯ই পৌষ এই তিন দিনের কার্য্যতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৭ই পৌষ—মঙ্গলবার—৭-৩০ ঘটিকা মন্দিরে উপাসনা। মেলা—সমস্ত দিন ব্যাপী—(যাত্রা, সিনেমা, আতসবাজী।)

৮ই পৌষ—বুধবার—আশ্রমিক সংঘের (প্রাক্তন ছাত্রদের সভা) বার্ষিক অধিবেশন—৮—৩০ ঘটিকা। মেলা—সমস্ত দিন।

৯ই পৌষ—বৃহস্পতিবার—বিশ্বভারতীয় পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ৮ ঘটিকা।

ভ্রম সংশোধন

গত মাসে লিখিয়াছিলাম শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী লক্ষ্ণৌতে কাজ করিতেছেন শ্রীরমেন্দ্রবাবুর পরিবর্ত্তে শ্রীবীরভদ্র চিত্রারাও পঠিত হইবে।

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৬ষ্ঠ বর্ষ } পৌষ, সন ১৩৩২ সাল। { ১২শ সংখ্যা

সুন্দর দাস

সবৈয়া বা সুন্দর বিলাসের কবি সুন্দর দাসের নাম হিন্দী সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিত নয়; বহুদিন পূর্ব্বে বম্বে হইতে সুন্দর বিলাসের একটী সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। তাঁহার "জ্ঞানসাগর" গ্রন্থও বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের নিকট আদৃত, রাজপুতানার উদাসীন সন্ন্যাসীরা এখনও তাঁহার বহুপদ গান করেন।

সুন্দরদাস ছিলেন জাতিতে বৈশ্য, দাদূ দয়ালের শিষ্য। দাদূর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজপুতানার দ্যোসার নামক নগরে বুসর-কুলজাত খণ্ডেলবাল মহাজনের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন; কথিত আছে তিনি দাদূর আশীর্ব্বাদ লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করেন; বাল্যকালে তিনি এই ভক্ত দয়াল সাধুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন—

দাদূজী জব দৌসহ আয়ে
বালপনৈঁ হম দরসন পায়ে।

তাঁহার যখন ছয় বৎসর বয়স তখন তিনি দাদূর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দাদূ ১৬০৪ অব্দে নারায়ণে গ্রামে দেহরক্ষা করেন; তাহার পর হইতে সুন্দরদাস তাঁহার ভক্ত ফতেহ-পুরবাসী প্রাগ্‌দাসের নিকট বাস করিয়া কিছুকাল পরে এগার বৎসর বয়সের সময় কাশীতে যান্ এবং সেখানে ১৯ বৎসর থাকিয়া হিন্দুশাস্ত্র এবং ভাষাগ্রন্থ ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতি পাঠ করেন।

মধ্য যুগের সকল শ্রেণীর সাধুর জীবনেই আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদের অনেকেই কিছুদিন কাশীতে বাস করিয়াছিলেন; কাশীর শুধু তীর্থ হিসাবেই মাহাত্ম্য থাকিলে এখানে শৈব বা বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য কাহারও সমাগমের সম্ভাবনা হইতে পারিত না।

কাশী ছিল সে আমলের সংস্কৃতির (Cultureএর) অসাম্প্রদায়িক প্রধান কেন্দ্র; এখানে বৈষ্ণব রামানন্দ, তুলসী দাস হইতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি বড় বড় বৈদান্তিক শাস্ত্রবেত্তার ও সমাগম হইত। শিক্ষার্থী বা ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম-প্রচারক এখানে আসিয়া বিভিন্ন মতাবলম্বী সুধীগণের সংস্পর্শে ও সংসর্গে তাহার শিক্ষা পূর্ণতর করিয়া তুলিতে পারিত।

ভারতের ধর্ম্মজগতের এই কেন্দ্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মনীষিগণের সম্মেলনে শিক্ষা উদার ও গভীর হইতে পারিত।

১৬২৬ খৃষ্টাব্দে সুন্দরদাস কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ফতেহপুরে বাস করেন; এইখানেই তিনি দাদূপন্থী সাধুসজ্জনের স্পর্শে গুরুর বাণীর নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন। ফতেহপুরের নবাব আলীফ খাঁ তাহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন।

এই সময়ে তিনি দেশভ্রমণে বাহির হন গুজরাট পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুভক্তগণের স্পর্শে আসেন; তিনি পূর্ব্বদেশ অর্থাৎ বিহার পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। এতদিন ফতেহপুর তাঁহার প্রধান বাসস্থান ছিল কিন্তু প্রাগ্দাসজীর মৃত্যুর পরে ফতেহপুরে তাঁহার আর মন টিঁকিল না; তিনি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেই লাগিলেন।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সুন্দরদাস "জ্ঞানসাগর" রচনা করেন; তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; তৎরচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও পদ এবং সাখীগুলি যে বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়া পরে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "সুন্দর বিলাস" রচনার ও তারিখ পাওয়া যায় না; তবে সুন্দর বিলাস ও যে এককালে রচিত হয় নাই তাহা গ্রন্থ পাঠেই বোঝা যায়; 'সুন্দরবিলাস' নামটী তাঁহার দেওয়া নহে; সুন্দরদাস ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থের যে সংগ্রহ করেন সেই পুঁথি অদ্যাপি রক্ষিত আছে; তাহাতে "সবৈয়া" নামটী দেখিতে পাওয়া যায়; খুব সম্ভবত গ্রন্থের অধিকাংশই 'সবৈয়া' ছন্দে রচিত বলিয়া ইহার নাম 'সবৈয়া' হইয়াছিল; পরবর্ত্তীকালে সুন্দরদাসের কোন ভক্ত ইহার নাম 'সুন্দরবিলাস' রাখেন।

১৬৯০ খৃঃ অব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে সুন্দরদাস রাজপুতানার অন্তর্গত সাংগানের নামক স্থানে দেহ রক্ষা করেন; কথিত আছে মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই সাখীগুলি রচনা করেন:—

"মান লিয়ে অন্তঃকরণ তজ্ঞ ইংদ্রিনি কে ভোগ।
সুংদর ন্যারৌ আতমা লগ্যো দেহ কোঁ রোগ॥
বৈদ্য হমারৈ রামজী ঔষধি হু হরিনাম।
সুংদর যহৈ উপায় অব সুমরণ আঠো জাম॥
সুংদর সংশয় কো নহীঁ বড়োঁ মহুচ্ছব যেহ।
আতম পরমাত্ম মিল্যো রহে কি বিনসৌ দেহ॥
সাত বরষ সৌঁ মেঁ ঘটৈ ইতনে দিন কী দেহ।
সুংদর আতম অমর হৈ দেহ যেহ কী যেহ॥"

ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ অবশ্যম্ভাবী আমার মন তাহা স্বীকার করিয়া নিল। হে সুন্দর, আত্মার নয়, দেহেরই রোগ হইয়াছে। এখন আমার বৈদ্য রামজী এবং ঔষধ হরিনাম; তুমি অনুদিন সেই উপায়ই স্মরণ কর। হে সুন্দর নিঃসংশয়ে আজ মহোৎসব আসিয়াছে; দেহের বিনাশে আমার আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছে। এই দেহ আমার ৯৩ বৎসরের পুরাণ হইয়া গিয়াছে এইবার ইহার ক্ষয় হউক, আত্মা, হে সুন্দর, অক্ষয়, অমর।

সুন্দরদাসকে বৈদান্তিক কবি বলা হইয়াছে; কথাটা এক হিসাবে সত্য; হিন্দী সাহিত্যে দুইজন সাধক বৈদান্তিক হইয়াও কাব্য রচনা করেন; তাঁহাদের এই কাব্য বেদান্ত প্রচারের বাহন হইয়াছিল; ইঁহাদের মধ্যে নিশ্চল দাস "বিচার সাগর" রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন; অন্যতম সুন্দরদাসকে কিন্তু নিছক বৈদান্তিক বলিয়া দিলে ঠিক হইবে না।

সুন্দরদাস ছিলেন দাদূর শিষ্য; দাদূর যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ভক্তরূপেই দেখিয়াছি; কিন্তু জ্ঞানের উপর সেই ভক্তি প্রতিষ্ঠিত; সেই জ্ঞান পরম ব্রহ্মের উপাসনায় ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে; তাঁহাদের জ্ঞান বা ভক্তিতে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা রামকে ভজনা করিতেন, কিন্তু সে রাম কবীরের রামের মত পরমাত্মার নাম প্রতীক্ মাত্র।

যহ রাম দশরথ ন উপজে
ন যহ সীতা বিহ্যাই।

ভক্ত দাদুর শিষ্য বৈদান্তিক পরব্রহ্মবাদীই বা হইলেন কিরূপে এবং তাঁহার রচনার মধ্যে গুরু উপদিষ্ট ভক্তির পরিবর্ত্তে জ্ঞানের কথাই বা আমরা এত পাই কিরূপে?

ইহার উত্তরে একটা কথা বলা যাইতে পারে; দাদু এক ব্রহ্মর উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার ব্রহ্মবাদ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এইখানে আর একটী কথা মনে পড়ে।

আমাদের মনে হয় মধ্যযুগে শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তের সহিত মানুষের অন্তরে স্বভাবজাত ভক্তিবাদের একটা বোঝাপড়া চলিতেছিল; শঙ্করাচার্য্যের কিছুকাল পরেই রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য বেদান্তের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া নব্যভক্তি-বাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এই বোঝা পড়ার একদিকের পরিণতি শাঙ্করমত ও অপরদিকে শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম। শঙ্করের বেদান্তবাদ দার্শনিক মতবাদ মাত্র, ইহা কোনদিনই মানুষের Religion হইতে পারে না; উপাসনার মানুষ একটা প্রতীক চাহে; এই কারণেই শঙ্করের মতবাদের সহিত ভক্তিবাদের যে বোঝা-পড়া হইল তাহাতে ভক্তির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই কিন্তু সে ভক্তি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই মতবাদ যাঁহারা অবলম্বন করিলেন তাঁহারা নিজের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী কোথাও ভক্তিকে বড় করিলেন কোথাও বা জ্ঞানকে বড় করিলেন।

রামানন্দ ছিলেন এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক। রামানুজ প্রভৃতি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সাধকদের বৈষ্ণবমতবাদে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যকে স্বীকার করিয়া জাতি ভেদকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; শঙ্করাচার্য্যের মতবাদকে অনেকে নানাকারণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলেন; তাহার একটী কারণ তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন নাই। রামানন্দ কবীর, নানক দাদু, সুন্দরদাস প্রভৃতি এই দুই মতবাদের মধ্যবর্ত্তী যে পথ গ্রহণ করিলেন তাহাতে তাঁহারা জাতিভেদ স্বীকার করিলেন না সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিকে ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই নব্যমতাবলম্বীদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী কেহ জ্ঞানকে বড় করিয়াছেন কেহ বা ভক্তিকে বড় করিয়াছেন; কিন্তু এই একটীকে বড় করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই দুইটার সমন্বয়ের চেষ্টাও চলিয়াছে।

সুন্দরদাস তাঁহার জ্ঞানসাগর গ্রন্থে সাধনার ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে এই ব্যাপারটী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন প্রথমে ভক্ত হইতে হইবে। জ্ঞানসাগর গুরু ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের আকারে গ্রথিত হইয়াছে। গুরু বলিলেন—

নির্গুণ নিজরূপ নিয়ারা। পুনি সগুণ সংত অবতারা।
নির্গুণ কী ভক্তি সু মন সোঁ। সংতনি কী মন অরু তনসোঁ॥
যেকাগ্র হি চিত্ত জু রাখৈ।
হরিগুণ সুনি সুনি রস চাখৈ।
পুনি সুনৈ সংত কে বৈনা।
যহ শ্রবণ ভক্তি মন চৈনা॥
হরিগুন রসনা মুখ গাবৈ।
অতিসৈ করি প্রেম বঢ়াবৈ॥
যহ ভক্তি কীর্ত্তন কহিয়ে।
পুনি গুরু প্রসাদ তৈঁ লহিয়ে॥

নির্গুণ ব্রহ্ম লইয়া কথা চলে না; তাঁহার উপাসনা শুধু মনেই; কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম যিনি সন্তরূপে অবতীর্ণ হ'ন তাঁহার উপাসনা তনু মন দিয়া করিতে হইবে। চিত্ত একাগ্র করিতে হইবে; হরিগুণ শ্রবণের রসপান করিতে হইবে; শুধু তাহাই নহে এই রসনা দিয়া তাঁহার কীর্ত্তন করিতে হইবে, হৃদয় প্রেমরসে ভরপুর করিয়া তুলিতে হইবে।

সুন্দরদাস বলিলেন প্রথমে দাসরূপে তাঁহাকে ভজনা করিতে হইবে পরে সখারূপে; এইভাবে তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

প্রথম সমর্পণ মন করৈ, দ্বিতিয় সমর্পণ দেহ।
তৃতিয় সমর্পণ ধন করৈ, চতুঃ সমর্পণ গেহ॥
গেহ দারা ধনহঁ, দাস দাসী জনহঁ।

বাজ হাথী গনঁ, সর্ব্ব দৈ বৌ তনঁ।
শিষ্য বাণী সুনঁ, আতমা অর্পনঁ॥

তিনি ভক্তের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা খাঁটী বৈষ্ণবের প্রদত্ত বর্ণনা হইতে প্রায় অভিন্ন।

এই ভক্তি লাভ করিলে পরে পরাভক্তি লাভের অধিকার জন্মে; সুন্দরদাস শুদ্ধির তিনটী উপায়ের কথা বলিয়াছেন ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। ভক্তির লাভের কথা ত বলা হইল, এইবার যোগের কথা; যোগের কথা বলিতে গিয়া তিনি পাতঞ্জল-যোগের পন্থা গ্রহণ করিয়া প্রথমে যম, নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহার সহিত জপ, হোম, আসন প্রভৃতির কথাও বলিয়াছেন। ইহার পর জ্ঞানের কথা আসিয়াছে; তৎপ্রচারিত পুরুষপ্রকৃতিবাদ সাংখ্যবর্ণিত পুরুষ প্রকৃতিবাদ হইতে অভিন্ন।

কবীরের ন্যায় সুন্দরদাসও "শব্দ ও গুরুর মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। দেবতা যে অন্তরেই বাহিরে নহে, তাঁহার পূজা যে অন্তর দিয়াই করিতে হইবে বাহ্য উপকরণ দিয়া নহে এ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

মন মাহৈঁ সব সৌজ সুথাপৈ।
বাহর কে বংধন সব কাঁপৈ।
শুনাসু মন্দির অধিক অনুপা।
তামহি মূর্ত্তি জোতি স্বরূপা॥
সহজ সুখাসন বৈটে স্বামী।
তাগে সেবক করৈ গুলামী।
সংজম উদক স্নান করাবৈ।
প্রেম প্রীতিকে পুষ্প চঢ়াবৈ॥
চিত চংদন লৈ চরবৈ অংগা।
ধ্যান ধুপ খেবৈ তা সংগা।
ভোজনভাব ধরৈ লৈ আগে।
মনসা বাচা কছু ন মাঁগৈ॥
জ্ঞান দীপ আরতি উতারৈ।
ঘংটা অনহদ শব্দ বিচারৈ॥
তন মন সকল সমর্পণ করঈ।
দীন হোঈ পুনি পায়নি পরঈ॥
মগ্ন হোই নাচৈ অরু গাবৈ।
গদগদ রোমংচিত হোহ্ আবৈ
সেকবভাব কহে নহিঁ চৌবৈ।
দিন দিন প্রীতি অধিক হী জোবৈ॥

বাহিরের সকল বন্ধন কাটিয়া ভক্ত অন্তরেই পূজার সকল আয়োজন করে। শূন্যের মধ্যে যে অনুপম মন্দির তাহার মধ্যে জ্যোতিস্বরূপ প্রভু বিরাজ করিতেছেন; সেবক সংযমের জলে স্নান করিয়া তাঁহাকে প্রেমপ্রীতির পুষ্প উপসর্গ করে। ধ্যানের ধূপ এবং নির্মল চিত্তের চন্দনে সে নিজেকে পবিত্র করিয়া লয়; শুদ্ধ ভাবের নৈবেদ্য তাঁহাকে সাজাইয়া দেয়, বিনিময়ে সে কিছুই চায় না। আরতি করে সে জ্ঞানের প্রদীপ দিয়া, অনাহত যে শব্দ অবিশ্রান্ত বাজিয়া চলিয়াছে তাহাই হয় তাহার ঘণ্টা। সে তাহার দেহ মন সকলই সমর্পণ করিয়া দীনভাবে প্রভুর পায়ে নিজেকে লুটাইয়া দিয়া মগ্ন হইয়া নাচে আর গান করে। তাহার এ প্রেম নিত্য বাড়িয়াই চলে।

সুন্দরদাস নানাস্থানে তাঁহার গুরু দাদুর গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন; সবৈয়ার ৩৪টী অঙ্গের (অধ্যায়ের) একটী অঙ্গ ত' গুরুকীর্ত্তনেই পূর্ণ; এই গুরুবাদের মধ্যে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—এই যে গুরুর পূজা সাধক করিতেছেন তাহার কতটুকু শরীরী গুরুর উদ্দেশ্যে আর কতখানিই অশরীরী ভাবরূপী গুরুর উদ্দেশ্যে। এই গুরুবাদ মানুষের স্বভাবজাত এবং আমাদের প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে গুরুবাদী।

সুন্দরদাসের মন বেদান্তের দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তাই দেখি তিনি স্থানে স্থানে নারীর নিন্দা করিয়া গিয়াছিলেন; আজন্ম সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

সবৈয়া গ্রন্থটী জ্ঞানসাগরের প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছে, তবে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে।

এখানেও সেই পরমাত্মার প্রেম লাভ করিয়া দ্বৈতভাব মিটাইয়া দিয়া জীবন পবিত্র করার কথা বলা হইয়াছে; সুন্দরদাসের সাখী অর্থাৎ দোহা সোরঠা ইত্যাদি ছন্দে রচিত উপদেশগুলির এবং পদাবলীর মধ্যে সেই একই কথা বলা হইয়াছে; সাধুকে পতিব্রতা নারীর সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে—

পতিব্রত হী মেঁ যোগ হৈ, পতিব্রত মেঁ হী যাগ।
সুংদর পতিব্রত রাম সৈ, বহৈ ত্যাগ বৈরাগ॥

এই মনুষ্যদেহ দেবতাবাঞ্ছিত—

সুংদর মনুষা দেহকী মহিমা কহিয়ে কাহি।
জাহঁ বাংছে দেবতা, তূঁ তোঁ খোবৈ তাহি॥

তাহাকে নষ্ট করিও না; সেই পরপ্রেম লাভ কর। যখন তাহা লাভ করিলে তখন

লাগী প্রীতি পিয়া সো সাচী,
অব হুঁ প্রেম মগন হোই নাচী॥
লোক বেদ ডর রহ্যৌ ন কোঈ,
কুল মরজাদ কদে কী খোই॥
লাজ ছোড়ি সির ফরকা ডারা,
অব কি হঁসো সকল সংসারা॥
ভাবৈ কোঈ করহু কসৌটী,
মেরে তনকী বৌটি বৌটি॥
সুংদর ভাবলগ সংকা রাখৈ,
তব লগ প্রেম কহাঁতে চাখৈ॥

প্রিয়তমকে যেদিন সত্যই ভালবাসিয়াছি সেইদিন হইতেই আমার লোকলজ্জা, বেদের ভয় কুলের মর্যাদা সকলই চলিয়াগিয়াছে; সকল সংসার হাঁসুক আমি প্রেমে মগ্ন হইয়া লজ্জা ছাড়িয়া তাঁহার সম্মুখে নাচিতেছি; যতদিন শঙ্কা থাকিবে ততদিন এ প্রেম কোথায় পাইব?

একবার সে প্রেমের বর্ষা নাবিলে তখন সকল বিকার দূর হইয়া যায়, তনু মন শীতল হইয়া যায়

দেখৌ ভাই আজ ভলৌ দিন লাগত।
বরিষা রিতু কৌ আগম আয়ৌ বৈঠী মলারহি গাবত॥
রাম নামকে বাদল উনয়ো, ঘোরি ঘোরি বস পাগত।
তন মন মাঁহি ভঈ শীতলতা, গয়ে বিকার জু দাগত॥
জা কারনি হম ফিরত বিয়োগী নিশদিন উঠি উঠি জাগত।
সুংদরদাস দয়াল ভয়ে প্রভু সোই দিয়ৌ জোই মাংগত॥

আজ শুভদিন আসিয়াছে; রাম নামের বাদল লাগিয়াছে, মল্লার রাগিনীর আলাপ চলিতেছে, সেই রসের ধারায় আমি স্নান করিতেছি; আমার অন্তরের সকল বিকার চলিয়া গিয়াছে, তনু মন শীতল হইয়া গেল; যাহার জন্য আমি নিশিদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম আজ প্রভু দয়া করিয়া তাহা আমায় দান করিলেন।

এইবার অন্তরে পরম দেবের আরতি আরম্ভ হইল,

আরতী পরব্রহ্মা কী কীজৈ,
ঔর ঠৌর মেরৌ মন ন পতিজৈ॥
গগন মংডল মেঁ আরতি সজি,
শব্দ অনাহদ ঝালরি বাজি॥
দীপক জতান ভয়া পরকাসা,
সেবক ঠাঢ়ৈ স্বামী পাসা॥
অতি উচ্ছাহ অতি মংগল চারা,
অতি সুখ বিলসৈ বারংবারা॥
সুংদর আরতি সুংদর দেবা,
সুংদরদাস করৈ তহাঁ সেবা॥

আমি পরমব্রহ্মের আরতি করিতেছি, অন্যত্র আমার মন শান্তিলাভ করিবে না; গগনমণ্ডলে আরতি সাজান হইয়াছে, অনাহত শব্দের ঝঙ্কার উঠিতেছে, জ্ঞানের দীপ প্রকাশ পাইয়াছে; সেবক তাহার প্রভুর কাছে দাঁড়াইয়া আরতি করিতেছে; এ যে পরমোৎসব, পরম মঙ্গলঘটা লাগিয়াছে; সুন্দর দেবতার সুন্দর আরতি হইতেছে; সুন্দরদাস সেখানে সেই আরতি করিতেছেন।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

ধূলির স্বর্গ

কবিত্বের লাগি আর যাবো কোথা বল
কোন্ মানসের পারে সাগরের তীর—
হেথায় যা শোভা দেখি নাহি তার তল
অগাধ-সৌন্দর্য্য কত করিয়াছে ভিড় !
এই যে টালির ছাদ নারিকেল শাখা—
ওই ফিরিঅলা যায় পশরা হাঁকিয়া
এই যে মলিন গলি জীর্ণ শীর্ণ বাঁকা
এরাই হরিছে চিত্ত থাকিয়া থাকিয়া !
যেথা লক্ষ মানুষের গোপন বাসনা
ইষ্টকে পাথরে কাঠে গড়িছে নিয়ত—
অণু পরমাণু হ'তে সঙ্গীত সাধনা
অলখ্ উদ্দেশ্য পানে উঠে অবিরত।
এ ধূলির স্বর্গ যদি কিছু নহে হায়
নন্দন-মন্দার তবে দাঁড়াবে কোথায় !

মাটির পুতুল

জানি জানি তুমি মাটির পুতুল
জানি জানি তুমি পুত্তলিকা !
জানি জানি তুমি দু-দিনের দীপে
চিরদিনকার জ্যোতির শিখা !
কাঁপে তব তনু নিঃশ্বাস ভরে
তবু প্রাণ মোর বিশ্বাস করে
তুমি অচপল পুলক-অতল
গত-হলাহল সুধার টীকা।
জানি জানি তুমি পুত্তলিকা !

আকাশ-নদীর উজান বাহিয়া
ডিঙায়ে তারায় উপল নুড়ি
কাল স্রোতধার বহে অনিবার
সৃষ্টির মুখে বাজায়ে তুড়ি।
সে প্রবাহ বলে ভাসিছে জগৎ
চমকিয়া ওঠে দূর ছায়াপথ
লাগে ঢেউ তার পাঁজরে আমার
কাঁদে হাহাকার জগৎ জুড়ি
সৃষ্টির মুখে বাজায় তুড়ি।

এই যে ধরায় কত যুগ হ'তে
শিশির-আখরে রজনী ধরি
গোপন কাহিনী কোমল আঙুলে
বারে বারে হায় উঠিছে ভরি,
অলখ্ পায়ের স্তুতি-ছন্দেতে
লুটায় শেফালি মৃদু গন্ধেতে,
এরাতো মরেনা, এরাতো ঝরেনা
এরাতো ডরেনা কালের তরী।
বারে বারে হায় উঠিছে ভরি।

যে গোপন টানে শেফালির ছায়া
ঝরে-পড়া ফুলে ভরিয়া উঠে
আকাশের সুখ ছায়ালোক-পাতে
ধরণীর বুকে নড়িয়া উঠে,
নয়নে তোমার যায় ওই দেখা
চির-জীবনের অঞ্জন-রেখা
অধরে তোমার প্রাণেশসভার
সঙ্গীত ধার কাঁদিয়া লুটে।
ঝরে-পড়া, ফুলে ভরিয়া উঠে।

মৃত্তিকা আজি অমৃৎ হয়েছে
কালো মাটি আর মাটি সে নয়

তব তনুখানি তিলক করিয়া
আঁকিব আবার ললাটময় !
অমৃতের সেই জ্যোতি-স্বাক্ষর
দেখাইবে মোরে ওপারের ঘর,
চিরকাল সুখে সবার সমুখে
গাহিব এমুখে তনুর জয় ।
কালো মাটি আর মাটি সে নয় ।

বিশ্বযাত্রা

উল্কাসম বাষ্প-যানে চলেছি ছুটিয়া
কচি ধান ক্ষেত দেয় দুদিকেতে হানা
নব রবিকর পাতে উঠে চমকিয়া
আকাশ উন্মুখ যেন টিয়াটির ডানা ।
যেদিকে ছুটেছি আমি বিপরীত তার
ছুটেছে ধানের ক্ষেত, আকাশের মেঘ
শরতের স্বচ্ছ নভে মেলি পক্ষভার
শঙ্খ চিলে নিয়ে যায় কিসের আবেগ ।
দণ্ড পল অহোরাত্রি যুগ যুগান্তর
মাটির আকাশ তলে উধাও বনানী
শিকড় পল্লব দুই পক্ষে করি ভর
কোন্ মানসের পানে ছুটেছে না জানি ।
বিশ্বগতি বিপরীতে একাকী মানব
ছুটেছে কোথায় ? এ কি যাত্রা অভিনব !

যমজ

আজি মনে হয় এই স্তব্ধ দুপুরের
মুগ্ধ নয়নেতে বুঝি লেগেছে স্বপন
সূচিভেদ্য নীলিমার কোন্ সুদূরের
পলকে শিহরি তোলে চিলের ক্রন্দন ।
এই নারিকেল বীথি, ওই অট্টালিকা
কলের ধোঁয়ার ওই মলিন নিঃশ্বাস
গর্জ্জমান ইঞ্জিনের চীৎকারের শিখা
লক্ষ লোক পূর্ণ এই কলুষ আবাস ।
ইহাদের কে যে সত্য মিথ্যা কে যে হায়—
আজি আমি কিছুতেই না পারি বুঝিতে
প্রাণের নূপুর বাজে সকলেরি পায়
আনন্দের নীড় আছে সকলেরি চিতে ।
সত্য মিথ্যা এরা দুটি সহোদর ভাই
একদিকে তাহাদের কোনো ভেদ নাই ।

অর্ব্বাচীন

কলের কোলের মেয়ে কলিকাতা অয়ি
বংশ তব নাহি পুছি —ভালবাসি তোমা ;
সুন্দরী নগরী তুমি এ সংবাদ বই
কিছু না জানিতে চাই পুরী নিরুপমা ।
মানস নয়নে মম হেরেছি তোমার
ধূলায় ধূসর পথে মানসের ঢেউ,
শীতল শীকর তার লাগে বারম্বার
আমার পঞ্জরে হায়—জানিল না কেউ ।
যে মহা প্রচণ্ড শক্তি মন্থিত সাগরে
কাল বৈশাখীর ঝড়ে দিয়ে যায় হানা—
সে বিপুল সে বিরাট তোমার পাঁজরে
গড়েছে অপূর্ব্ব নীড় আছে মোর জানা ।
সৌন্দর্য্যে গেঁথেছ তুমি সত্যের সুতায়
তাইতো সহসা তারে দেখা নাহি যায় ।

সেদিন

পড়িবে পড়িবে মনে এই কথা সখি
সুতীক্ষ্ণ স্মৃতির অসি সেদিন ঝলকি
অতীতের কোষ হ'তে উঠিবে সহসা।
সেদিনের সন্ধ্যাখানি মনে হবে যথা
সুবর্ণ মুদ্রার মত পশ্চিমের দিকে।
ওই রক্ত বাসখানি মনে হবে ফিকে ;
হেমন্তের হৈম আলো কঙ্কনে আসিয়া
মূরছি পড়িয়া যাবে উঠিতে হাসিয়া।
অবসন্ন দিবসের বিষণ্ণ প্রদোষে
নির্জ্জন বলভি-তলে সঙ্গোপনে ব'সে
কাহারে উদ্দেশ করি নক্ষত্র সভায়
মর্ম্ম-বিগলিত গান গাবে একা হায়।
ব্যর্থ গান আসিবেক তব কাছে ঘুরে
সেদিন সেজন রবে কত কত দূরে।

শকুন্তলা

হে সুন্দরি শকুন্তলে বহুবর্ষ পরে
তোমারে স্মরিছে আজি বিদেশের কবি
তুমি ঠাঁই লভিয়াছ অনন্তের ঘরে
তাই চির-উদ্ভাসিত তব নিত্য ছবি!
বনজ্যোৎস্না লতাকুঞ্জে তব গাত্রলীন
খিন্ন শতদলগুলি গেল যা ঝরিয়া
তারি গোটা দুই লাগি চির রাত্রি দিন
উদ্ভ্রান্ত অধীর চিত্ত মরিছে কাঁদিয়া!
অধিক করিনা আশা তোমার নিকটে
জীবনের জীর্ণ জ্বরে না পারি ঘুমাতে—
মোরে শান্ত করি দাও—চাহি বারে বার
তোমার অমর-করা একটি চুমাতে!
দুষ্মন্ত পাবে না টের নাহি কালিদাস—
এ গুপ্ত রহস্য আর কে করিবে ফাঁস।

অলোকা

এ নহে মাটির ঢেলা আঘাতে তোমার
ভেঙে যাবে শতখান। জ্বলন্ত অঙ্গার
যতই আঘাত তারে করিবে সুন্দরী
উঠিবে অপূর্ব্ব হ'য়ে ইন্দ্র জালে ভরি।
তোমারে পেয়েছে যারা হাতের মুঠায়
তাহারা পেয়েছে শুধু ধুলা বালি হায়,
আমি দেখিয়াছি সেই মানস-প্রতিমা
কালে কালে দেশে দেশে নাহি যার সীমা।
আমি দেখিয়াছি সেই আনন্দ-সঘন
বিশ্বের আদিম চেষ্টা—যে প্রাণ এখনো
স্বচ্ছন্দ ছন্দের ভরে যুগে যুগে চলে
নব নব জীবনের খিলানের তলে—
আপনি না পায় অন্ত আপন মহিমা
আমি দেখিয়াছি সেই আনন্দ-প্রতিমা।

Santiniketan P. O.
Dt. Birbhum.
October 1st.

My Dear—

Your letter reached me just as I was leaving Srinagar after a sudden telegram announcing Dipu Babu's death and calling me to Boro Babu. I had to arrange to depart so suddenly that I had no time to write letters for which I hope you will forgive me.

I have now been back here for three days and find it rather warm after the cool weather in Casmere. But the peace and quite of the Asram is ample compensation for the heat. I miss Dipu Babu very grately and wish I could have been with him during his last illness, but unfortunately I was on my way to Amarnath and never received the news that he was ill. Everyone will miss him greatly, for he was so kind and thoughtful to us all.

I shall stay on here for the vacation except that I intend to visit Ranchi and Giridih for a few days after the middle of October. If you think of coming to the Asram, please find out beforehand whether I shall be here at that time as I do not want to miss you again.

I shall probably go away from October 15th to 30th.

With regard to to your question about the apparent failure of life, I will be able to answer that more fully when we meet. Perhaps I will come to see you in Calcutta if you let me know when you will be there. Failure will not come to you, if you make the ideal of your life "নিষ্কাম প্রেম"। "Love never falleth" is that Saint Paul says in his 13th chapter to Corinthians, one of the noblest writings on Love that has ever been seen. If only we learn to love people, then life can no longer be a drudgery for each new person that we meet is so interesting to us that he cannot be dull.

With much love.

Yours affectionately,
W. W. Pearson

Santiniketan.
March 19th.

My dear—

I was happy to receive your letter and hasten to reply to it as the time is drawing near for my departure for Europe. I expect you now that I am going to spend the summer with my sister in England and do not return to Santiniketan till after the October vacation. I shall be leaving Bolpur on April the 8th or 9th and shall stay for one or two days in Calcutta on my way to Colombo from where I sail on April the 20th.

With regard to your difficuities in your life of spiritual aspiration, it is perfectly natural for doubt to creep in at some time or other and I myself have been through such a time of doubt and difficulty in the past.

There is not much that I can offer in the way of advice except that I think it is a mistake when you are beset by doubts to read too much in the hope that by reading much your doubts will be cleared away. The tendency of over reading is merely to confuse the mind and deepen one's doubts. It is much better to try meditation and trustful and quite waiting in the silence, to attain to the Truth which is in each one of us. We seldom give a chance to our 'Antarayami' to reveal His message of truth to us and so we are always full of perplexity and fear.

I am sending you a book by Aurabindo Ghose entitled "The Ideal of the Karmayogin" and would like you to read it very carefully, especially the first essay and the two others, "The Strength of Stillness" and "The Stress of the Hindu Spirit." Also buy a small book by Aurabindo Ghose entitled "The Yoga and its Objects" puplished by the Prabartak Publishing House at Chandernagore at 9 annas. Every word of it is worth reading over and over again. Then when you have read those two books, if you feel that they have helped you, buy a copy of Aurabindo's "Essays on the Gita" published by a publisher in Madras and read those Essays together with the Bhagadvadgita itself and I am sure that you will find that you make great progress in your spiritual Sadhana.

This life has some purpose in it, and I feel that its purpose is that we may realise the hidden spirit which is in each one of us, and which is itself striving to express itself in individuals in specific forms, each are different from the other. You must not try to become like some other person, but must realise yourself and yourself only even if by so doing you have to break through all the conventions and traditions of the Society in which you are living. There is a law within each of us that must be followed in preference to all laws made by Society or Religion and that is the law which we must strive to discover and to follow. Do not be too much troubled because you doubt God or His goodness for that every doubt may be intended to strengthen your faith in the God who is revealing Himself in you own particular individuality. It is perhaps true that you are discovering in yourself a disbelief in the traditional God, just as I discovered in myself a disbelief in the traditional God of the Christians, but that disbelief is the means by which you will discover your own God, infinitely richer and more precious than any God of the Scriptures or of the Creeds of the best religious systems of the world.

With much love to yourself and to your friends.

W. W. Pearson

একবৃক্ষে দুই পক্ষী

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

ইহার সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ

সুন্দর দুটি পক্ষী থাকে সখ্যে মিলি এক বাস বৃক্ষে।
একটি খায় স্বাদু ফল, না খাইয়া অন্যটি নিরিক্ষে ॥
দৈন্যে আপন শোচে ভোক্তাটি শোক তার ঘুচি যায়।
মহিমা আপন সখা পাখিটিতে দেখিবারে যবে পায় ॥

অর্দ্ধে অর্দ্ধে একের পূরণ

(রূপক পদ্য)

দ্রষ্টা অর্দ্ধ ॥ (স্বস্থানে থাকিয়া) ॥
এলে তুমি কাঁপায়ে মহী, রণের যেন তুরগ !
ভোক্তা অর্দ্ধ ॥ (দূর দেশ হইতে আসিয়া) ॥
কোথায় মহী জানি না আমি, স্বর্গের এ স্বরগ !
অমৃত রাশিতে গলিয়া গেল বিন্ধ্য হিমাচল।
নিভিয়া গেল যুগান্তের দুঃখ দাবানল ॥
দ্রষ্টা অর্দ্ধ ॥ কি এনেছ সে দেশ থেকে দেখিতে গিয়াছে সাধ।
ভোক্তা অর্দ্ধ ॥ এনেছি উপবাসী হিয়া, ক্ষমহ অপরাধ ॥
তৃষ্ণী অগস্ত্যঋষি একজন আছে আমার ভিতর।
মিটিছে না আশ, পিয়া এ-আজ মিলন সুধাসাগর।

দ্বিজের ত্রিষ্টুভ।

কী দেখ্‌চি এ ! কী করুণা ! কী প্রেম ! কী স্নেহ !
এত করুণা স্নেহ প্রেম দেখে নাই কভু কেহ ॥
যে যন্ত্রণা সহিনু আমি বাঁধা পড়ি গিয়া করমে।
ছাড়িব না চরণ প্রভু ছাড়িব না কোন জনমে ॥
জ্বলিতেছিল হৃদে মোর তাপানল অনিবার।
নাহি ঠাঁই আজিকে সেথা আনন্দ রাখিবার ॥
দেখা দিলে যেই নয়নে মোর বাঁধা পড়ি গেল দিঠি।
যত কিছু ছিল মনের সাধ নিমেষে গেল মিটি ॥
অনন্যগতি হেরিয়া ভকতে পাপ তাপ জরা মরণ।
সরব অশুভ আপন গুণে করিলে তুমি হরণ ॥
পাষাণে অঙ্কুরে বীজ করুণা ধারায় তব।
ত্রিজ হল দ্বিজ এ দীন জনম লভি নব ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

যেন বাদল দিনে নীরব বাঁশী
দূর দিগন্তে তাদের সারি
হারায়েছে মন আমারি।
চঞ্চল বায়ে ভোরের মালতী
কোন্ অজানার জানায় মিনতি
কোন্ পথ চেয়ে বিরহীর পাতি আসন
কম্পিত হাতে জ্বালায় বেদনা বাতি বিজন।
পাই নাই আর যারে ভালবাসি ॥

যাব যাব আজ অকাজে
যেথা তাহারি চরণ রাজে
পথে পথে কি ধূসর সাজে
বিফল তাহার বেদনা বাজে।
পাই নাই আজ তার চোখের হাসি ॥

শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল

গান

সাঁওতালি কে বাঁশি বাজায়
আপন মনে অনেক দূরে,
বাতাস কাঁপে থরথরিয়ে
একটানা তার করুণ সুরে—

একলা ঘরে ক্ষণে ক্ষণে
চমক লাগে আমার মনে,
কাজ ফেলে তাই বসে' আছি
আবেশ-মাখা এই দুপুরে।
স্বপন-রাঙা কোন্ ছবি যে
ঘনিয়ে আনে আঁখির আগে,
না-জানা কোন্ ব্যাকুলতা
আভাসে মোর মনে জাগে!
সবুজ ধানের শ্যামল মায়া
গ্রামের পথে গাছের ছায়া—
সরল হিয়ায় ব্যথায় ভরে'
ভেসে আসে পরাণ পুরে॥

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আশ্রম সংবাদ

উৎসব

আশ্রমের চতুর্বিংশতি পৌষ উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবার উৎসবে স্বয়ং আচার্য্যদেব উপস্থিত ছিলেন বলিয়া অতিথি সমাগম অন্যান্য বারের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিহ। প্রায় দুইশত পুরুষ অতিথি ও পঞ্চাশ জন মহিলা অতিথি আশ্রমের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অতিথিদের থাকিবার জন্য নয়টি তাঁবুর ব্যবস্থা ছিল ইহা ছাড়া শান্তিনিকেতনের অতিথিশালা, ও ছাত্রাবাসের দুইটী গৃহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহিলা অতিথিদের বাসের বন্দোবস্ত ছাত্রী-নিবাসের সন্নিহিত একটি বাড়ীতে হইয়াছিল। এবারে মেলাক্ষেত্রে একটি নহবৎখানা তৈরী হইয়াছে—উৎসবের কয়েকদিন সেখানে রসুন চৌকির ব্যবস্থা ছিল।

৭ই ও ৮ই তারিখ মেলা থাকে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ৬ই হইতে ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত বেচা কেনা চলে। এবারে মেলায় প্রায় ৬০ খানি দোকান আসিয়াছিল তন্মধ্যে অধিকাংশই খাবারের ও মণিহারি দোকান—ইহা-ছাড়া ছোটখাটো বাজিওয়ালা এবং নাগর-দোলা প্রভৃতি অন্যান্যবারের মত আসিয়াছিল।

৭ই তারিখ দুপুর বেলা যাত্রা গানের বন্দোবস্ত ছিল; নিকটস্থ আদিত্যপুর গ্রামের যাত্রাদল আদিশূর পালা অভিনয় করিয়াছিল; ৮ই রাত্রে উক্তদল যুগল-বীর পালা অভিনয় করে। ৭ই রাত্রে আতস বাজি পোড়ানো হইয়াছিল। ৮ই দুপুরে মেলাতে নানা রকম খেলা ও ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং রাত্রে আতস বাজি ও বায়োস্কোপের ব্যবস্থা ছিল। ম্যাডান কোম্পানী স্বেচ্ছায় সিনেমা দেখাইবার ভার লইয়া আশ্রমের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

৭ই প্রাতে আচার্য্যদেব মন্দিরে যে উপদেশ দেন তাহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। মন্দির শেষ হইলে সকলে মিলিয়া "কর তাঁর নামগান" গানটি গাহিতে গাহিতে ছাতিমতলা প্রদক্ষিণ করিয়া ফেরেন।

৮ই প্রাতে আম্রকুঞ্জে প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মিলনসভার অধিবেশন হয়। এবার প্রায় ত্রিশজন প্রাক্তন ছাত্র উৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। এই সভাতে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছিলেন। তৎপরে পূজনীয় আচার্য্যদেব স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করেন।

এই সভাভঙ্গ হইলে প্রাক্তনদের কার্য্যকারী সভার অধিবেশন হইয়া নিম্ন-লিখিতগণ আগামী বৎসরের জন্য কার্য্যকারক নির্ব্বাচিত হন।

আশ্রমিক সংঘের সম্পাদক—শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।
ধনরক্ষক—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী।
পত্রিকা-সম্পাদক—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।
পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযদুবিশোর চক্রবর্ত্তী।
সংসদের প্রতিনিধি—শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার।

৯ই প্রাতে আম্রকুঞ্জে পরিষদদের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সংসদের সদস্যগণ সহ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য সভায় প্রবেশ

করিলে বৈদিক স্বস্তি বচনের মধ্যে সভা আরম্ভ হয়। সভায় আচার্য্যদেব প্রথমে নিজের বক্তব্য বলেন তৎপরে অধ্যাপক ফর্মিকী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার হাকিম বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে নিজেদের মত প্রকাশ করেন।

তৎপরে আচার্য্যদেব ডাক্তার ষ্টেনকোনো ও শ্রদ্ধেয় এণ্ড্রুজ সাহেবের নিকট হইতে উৎসবের সম্ভাষণ-পূর্ণ প্রাপ্ত পত্র পাঠ করেন। ইহার পরে সভা ভঙ্গ হয়—এবং বিকাল বেলা ইহার যে পুনরধিবেশন হয় তাহার প্রতিবেদন পরে প্রকাশিত হইবে।

১০ই তারিখ প্রাতে খৃষ্টোৎসব উপলক্ষ্যে আচার্য্যদেব মন্দিরে উপদেশ দেন।

মিঃ ও মিসেস্ বাকে নামক একটি ডাচ্ দম্পতি আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন ইঁহারা ভারতীয় সঙ্গীত শিখিতেছেন এবং ইউরোপীয় সঙ্গীত শিখাইতেছেন।

নিম্নলিখিত ছাত্র ছাত্রীগণ এবার আশ্রম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীআব্দুল মস্লাফ।
শ্রীকার্যনজী।
শ্রীচন্দ্রকান্ত পাটেল।
শ্রীক্ষেমজী।
শ্রীসুশীল দেববর্ম্মা।
শ্রীপরেশনাথ বিশী।
শ্রীকানাইলাল সরকার।
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীনীহাররঞ্জন সরকার।
শ্রীঅনন্ত গড়করী।
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীসৈয়দ মুজতবা আলী।
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।
শ্রীশেষ
শ্রীপ্রহ্লাদ
শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীমতী অমিতা চক্রবর্ত্তী।
শ্রীমতী মমতা সেন।
শ্রীমতী তাপসী দাস।

আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত সম্প্রতি আশ্রমের কাজ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য অধ্যাপককে হারাইয়া আশ্রমের সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র শ্রীঅনাথনাথ বসু সম্প্রতি আশ্রমের কাজে অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার মত উৎসাহী কর্ম্মীকে পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্র সম্প্রতি বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আশ্রমে চার বৎসরকাল থাকিয়া নিজের সহৃদয়তা ও উৎসাহ দ্বারা সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্ম্মী শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চৌধুরীর শুভবিবাহ আগামী ৪ঠা মাঘ সম্পন্ন হইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী মাঘ মাস হইতে শান্তিনিকেতন পত্রিকার ৭ম বর্ষ আরম্ভ হইবে। গত বৎসর আমাদের ব্যবস্থার যে সমস্ত ত্রুটি ছিল তাহা আগামী বৎসর দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

পত্রিকার আয়তন বর্দ্ধিত হইবে—এবং ইহাতে বিশ্বভারতীর যাবতীয় সংবাদ, প্রতিবেদন, সংসদ ও পরিষদের কার্য্যতালিকা বিস্তৃত বিবরণ ও বিশ্বভারতীর সদস্যদের জ্ঞাতব্য সংবাদাদি প্রকাশিত হইবে। বিশ্বভারতীর প্রত্যেক সদস্যই ইহা গত বৎসরের মত বিনামূল্যে পাইবেন।

বিশ্বভারতীর সংবাদ ব্যতীত পূজনীয় আচার্য্যদেবের উপদেশাদি, নূতন গান, স্বরলিপি ও অন্যান্য চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে।

পত্রিকার কার্য্য পরিচালনায় অনেক ত্রুটি গত বৎসরে হইয়াছে—তাহা দূর করিবার জন্য বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতনের সহিত দূরে থাকিয়া সংশ্লিষ্ট থাকিতে চাহেন তাঁহারা এই কাগজের গ্রাহক হইলে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

পুরাতন গ্রাহকদের মধ্যে যাঁহারা ইহার গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা না করেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী ১৫ই মাঘের মধ্যে জানাইলে আমরা অযথা ভিঃ পিঃ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইব না।

পুরাতন গ্রাহকদের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিষেধপত্র না পাইলে আমরা তাহাদিগকে ভিঃ পিঃতে নূতন বৎসরের কাগজ পাঠাইব। গ্রাহকগণ যদি মণিঅর্ডারে পত্রিকার বার্ষিক দেয় ২৲ টাকা পাঠান—তবে আর তাঁহাদিগকে ভিঃ পিঃ খরচ বহন করিতে হয় না। টাকা কড়ি ও কাজের চিঠি পত্রাদি শ্রীযদুকিশোর চক্রবর্ত্তী ম্যানেজার শান্তিনিকেতন পত্রিকা—শান্তিনিকেতন, বীরভূম। এই ঠিকানায় পাঠানোই প্রশস্ত।

বিনীত

শ্রীযদুকিশোর চক্রবর্ত্তী।

ষষ্ঠ বর্ষের সূচী

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তীর্থযাত্রা ২৫
বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মূল্য নিরূপণ ৪৯
কালের মূল্য নিরূপণ ৭৩
শ্রীমং রবীন্দ্র কবীন্দ্র চিরঞ্জীবেষু ৯৭
There is many a slip Betwen the cup and the lip. ১৪৫
ব্রহ্মস্বরূপ অমূল্য রত্নের অনুমার্গন ১৪৪
প্রতীকোপাসনা হইতে ব্রহ্মোপাসনায় সমুত্থান ১৯১
(ষষ্ঠ অধ্যায়) ব্রহ্মোপাসনা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানে সমুত্থান ২০৮
স্বদেশী মানচিত্র ২২৮
এক বৃক্ষে দুই পক্ষী
হিতৈষনা ৯৮
কালের যুগ ২২৯

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র ১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান ১০, ১৭, ৩, ১৫০, ১৬৩, ২১৯, ২২০, ২৪৫
চিঠি ২৬
আকন্দ ৩৮
বর্ষশেষ ৯৩
বিদায়কালে ইটালীয়ার প্রতি ১১৯
পত্র ১৩৯
বর্ষামঙ্গল ১৪৪
আলোচনা ১৫২
বুধবার মন্দির ২০৩

S. R. M. Naidu

Artificial gems and their manufacture ১৪
Wire-less Telegraphy ৫২
Mica and its uses ৮৬

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

বিক্রমশিলার পথে ২৭
ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ২৯
রাজগীরের পথে ৫৬
শ্যামদেশে শিল্পশাস্ত্র ১৬৭
বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগ ১৮৩

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র ৬৫

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কার ৫৭

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অভিভাষণ ১

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী

সিংহলী কথা ১১
মিষ্টিকথা ৪১
বাঙালা শিশু সাহিত্য ১৪৫
অভিনয়ের মূল কারা ১৭২
রঙ ১৮৪

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

স্বরলিপি ১৭, ৪৩, ৬৩, ৮৮

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

গিরিগহ্বরে একরাত্রি ১২
ছবির দরদ ২৮
সিংহলের পত্র ১০৮

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র

সুফী ভক্ত কবি সাহ আব্দুল লতিফ ৫৪

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

পথের স্মৃতি ৭৬
হকুসাই ১৬৯
সচল ও অচল—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ৮৪

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০২

জাহাঙ্গীর বকিল

বসন্তের দিনে ১৪০

কবিতা ৬৮

শেষ বিদায় ১৭৭

কৃপন ২১৬

গান ২৪৫

শ্রীমতী মাখন দেবী

স্বভাব সঙ্গীত ১৫৭

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এই যে ছোট দিন (কবিতা) ১৬৮

গান ২৪৫

শ্রীমতী অমিতা চক্রবর্ত্তী

বনফুল (কবিতা) ১৭২

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

ঘুমন্ত রাজকন্যার দেশ ১৭৫

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস

জাপানের চিঠি ১৯৪

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রার্থনা ১৯৯

সুন্দরদাস—শ্রীঅনাথনাথ বসু ২৩৫

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বিশ্বযাত্রা ২৪১

যমজ ২৪১

অর্ব্বাচীন ২৪১

সেদিন ২৪২

শকুন্তলা ২৪২

আশ্রম-সংবাদ ১৯, ৪৫, ৭২, ৯৬, ১০৮, ১৪০, ১৬১, ১৮১, ১৯৯, ২১৭, ২৩৩, ২৪৬

উৎসের অনুসন্ধান ২২, ৩৪, ৬৫, ৮০, ১১৪, ১৩৩

পুস্তক পরিচয় ২৪, ৪৮, ৭১

নীলগিরি ৪৫

কোপাই ৭৯

খোয়াই ৭৯

রেল ষ্টেশন ১১৩

বাতায়নিকা (কবিতা) ১১৬

বনতুলসীর গন্ধে পারুলডাঙার মাঠে ১১৭

দময়ন্তী ১৩৭

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন ১৪২

ছায়াপ্রাসাদ ১৪৭

চিত্র চরিত্র ১৪৮, ১৭৪

নাম করণ ১৫৬

রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের আলোচনা। ১৫৮

সিঁধকাটা ১৭৭

মহাকাল ১৭৮

নূতন আরব্য-উপন্যাস ১৭৯

ক্ষতি পূরণ ১৮২

একখানি পদচিহ্ন ১৮৮

সু টহামসুন ১৯০

দৈব পুরুষকার ১৯১

উষা (কবিতা) ১৯৭

নন্দকুমার " ১৯৮

এই যে (কবিতা) ২০৮

ভুট্টাক্ষেতে " ২১০

পূর্ণিমা " ২১১

কল্পকথন ২১২

যদি ২১৬

অঘ্রাণী ২৩১

নবান্ন ২২০

বিশ্বকর্ম্মা ২৩২

বাঁধ ২৩৫

ধূলির স্বর্গ ২৪০

মাটির পুতুল ২৪০